

# পঞ্চাশটি গল্প

সিদ্ধার্থ সিংহ



শ্রীরমাপদ চৌধুরী ও শ্রীমতী সুষমা চৌধুরীকে

এই বই প্রকাশের খবর শুনে

যাঁরা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন...

## ভূমিকা

পঞ্চাশটি গল্প? আমি? অসম্ভব। লিখতাম কবিতা। কোনও দিন ভাবিইনি গল্প লিখব। কিন্তু দেখতে দেখতে কবে যে এতগুলো গল্প লিখে ফেলেছি, খেয়ালই করিনি।

তার মধ্য থেকে বেছে যে গল্পগুলো এখানে সাজিয়ে দিলাম, সেগুলো মূলত ছাপা হয়েছে দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়, এখনকার ওয়ান স্টপ এবং সানন্দা'য়।

গল্পগুলো যে ভাবে ছাপা হয়েছিল, ঠিক সে ভাবেই রাখা হল। ইচ্ছে করলেই একটু সংযোজন বা পরিমার্জন করে সদ্য লেখার মতো করে দেওয়া যেত, কিন্তু তা হলে যে সময়ে এগুলো লেখা হয়েছিল, সেই সময়টাকে ধরা যেত না।

ধরা যেত না— কিছু দিন আগেই বাসভাড়ার প্রথম ধাপ ছিল মাত্র দশ পয়সা। পুরো কসবা অঞ্চলটাই চলে গিয়েছিল ভামেদের কবলে। '৭১-এ কী ভাবে মারা হত এক-একটা নির্দেশ তরতাজা ছেলেকে।

ইচ্ছে ছিল, 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল' গল্পটা রাখার। কারণ ওটা আমার প্রথম প্রকাশিত গল্প এবং ওই গল্পের জন্য আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। গোটা রাজনৈতিক মহল তোলপাড় হয়েছিল। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতার খবর হয়েছিল। কিন্তু এখন আবার নতুন করে পড়তে গিয়ে মনে হল, গল্পটা ভীষণ দুর্বল। অন্তত আমার ৫০টি গল্পের মধ্যে ওটাকে কিছুতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

এই বইয়ের বেশির ভাগ গল্পই মজার। বিশেষ করে 'আমার ছেলে কিচ্ছু খায় না', 'মুক্তিপণ', 'নয়তো', 'যদি', 'চা'। আবার 'বুকের ভিতর অচিন পাখি', 'ঘাসফুল' 'ডালাপালা'র মতো সিরিয়াস গল্পও আছে।

আছে 'আমাদের মাইকেল জর্ডন', 'মাছের চোখ', 'স্ট্রিট পাঞ্চ', 'হিরে'র মতো খেলার গল্প। পর্বতাভিযান নিয়ে 'স্বর্গের সিঁড়ি'। 'আই', 'পুনর্জন্ম',

‘অপারেশন নিশাচর’-এর মতো রহস্য এবং কাকতালীয় গল্প। রয়েছে ‘মিল অমিল’, ‘মৌ-পিউল’, ‘কলহ’-র মতো প্রেমের গল্প। বাদ যায়নি তুচ্ছতাক-তন্ত্রমন্ত্রের উপরে ভিত্তি করে লেখা ‘মায়া-কাজল’, ‘কোণের ঘরের ভাড়াটে’, ‘ডাব বাবা’। রয়েছে একদম ভিন্ন স্বাদের— ‘গুপ্তধন’, ‘ছাতা’, ‘আবুলিশ’, ‘কোড’, ‘ঘটকালি’, ‘কাকামণি’, ‘আশ্চর্য পুকুর’, ‘চোর’, ‘ডাল্লার প্রবুদ্ধ আর জংলি’ও।

দু’মলাটে বন্দি এই গল্পগুলো কতখানি গল্প হয়ে উঠেছে, সেটা বিচার করবেন পাঠকেরা। আমি শুধু বলতে পারি, যখন যে গল্পটা লিখেছি, আমি আমার মতো লিখেছি। এর মধ্যে একটা গল্পও যদি কারও মনে সামান্যতমও আঁচড় কাটে, তা হলে জানব, আমার এই বই সার্থক।

নমস্কারান্তে—

সিদ্ধার্থ সিংহ



## সূচি

টা টা ১
আড়াল ৭
যদি ২২
বালক ৩০
চোর ৪১
কালো স্ল্যাক্স আর সোনালি কাজ করা কামিজ ৫০
ছাতা ৬০
মাছের চোখ ৬৭
পুনর্জন্ম ৮১
নয়তো ৯৩
কোণের ঘরের ভাড়াটে ১০০
ঘটকালি ১১২
প্রেম ১২০
অপারেশন নিশাচর ১২৫
আমাদের মাইকেল জর্ডন ১৩৪
স্বর্গের সিঁড়ি ১৪৯
কালো পিঁপড়ে ১৬২
এর পরে কী ১৭২
মুক্তিপণ ১৭৮
ঘাসফুল ১৯১
মিল অমিল ২০৬
মৌ-পিউল ২১২
আমার ছেলে কিচ্ছু খায় না ২২১

অমরত্ব ২৩১  
কলহ ২৪০  
জবান ২৪৫  
হিরে ২৪৯  
আশ্চর্য পুকুর ২৬০  
স্পেস ২৬৬  
কোড ২৭২  
স্ট্রেট পাঞ্চ ২৮৩  
আই ২৯৪  
ডাব বাবা ৩৩০  
আবুলিশ ৩৪০  
গুপ্তধন ৩৪৪  
বুকের ভিতর অচিন পাখি ৩৫৬  
মুখোমুখি ৩৭০  
দেখা হবে ৩৮০  
ডালপালা ৩৮৬  
অন্ধের ও পিঠে ৩৯৭  
আবির যে দিন ৪০৯  
চা ৪১৫  
মায়া-কাজল ৪২১  
ডাক্তার প্রবুদ্ধ আর জংলি ৪২৫  
কাকামণি ৪৩৬  
বড়কী ৪৪২  
ছিট ছিট দাগ ৪৬২  
ধর্ম-অধর্ম ৪৭১  
ঘুমকাতুরে ৪৮০  
ঋ-তানিয়া ৪৯৩

# ৪৫

## টা টা

— টা টা।

শব্দটা শুনেই ঞ্চ কুঁচকে তাকাল শ্যামলী। — আবার?

সিটের তলায় বাস্ক ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে রেখে জানালার ধারে বসে কথা বলছিল রজতাভ। আর জানালার ও পারে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে শ্যামলী। এই নিয়ে প্রায় ছ'বার টা টা শুনতে হয়েছে ওকে। তাই আর থাকতে না পেরে বলল, ট্রেন ছাড়তে এখনও মিনিট কুড়ি বাকি। এখন থেকেই টা টা করছ...

— তোমাকে আবার টা টা করলাম কোথায়? রজতাভ অবাক।

শ্যামলী বলল, টা টা করলাম কোথায় মানে? তুমি কি আজকাল সব কিছু ভুলে যাচ্ছ নাকি? এই নিয়ে ক'বার বলেছ জানো? ছ'-ছ'বার। আমি শুনেছি।

— ছ'... বা.. র.! কথাটা বলতে বলতে কেমন যেন একটু উদাস হয়ে গেল ও। শ্যামলীর দিকে তাকাল। কিন্তু মনে হল, শ্যামলীকে না, ও অন্য কিছু দেখছে। প্ল্যাটফর্ম গমগম করছে। কামরার ভেতরে যাত্রীদের যাতায়াত, সিট খোঁজার ধুম। কেউ কেউ মোবাইল কানে দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। এত শোরগোলের মধ্যেও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ও। ঘোরের মধ্যেই কেটে কেটে বলল, তোমাকে কিন্তু একবারও বলিনি।

শ্যামলী যেন আকাশ থেকে পড়ল। — তা হলে কাকে বলেছ?

— এখন যেটা বললাম, সেটা ওই মেঘটাকে। এর আগে যেটা বলেছিলাম, সেটা ওই গাছটাকে। তার আগে যেটা বলেছিলাম, সেটা বলেছিলাম, ওই প্ল্যাটফর্মে যে উদ্যম বাচ্চাটা খেলা করছে, ওই যে কালো মতো, ওকে। একবার বুঝি ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাওয়া এক দল সারসকেও বলেছিলাম। কর শুনে বলতে বলতে চার নম্বরে এসে থেমে গেল ও। তার পর বলল, বাকি দুটো কাকে বলেছি, মনে নেই।

— আর মনে করতে হবে না। কাঁধের ওই ব্যাগটার ভেতরে কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ার আছে। পরোটা আর আলুভাজা দিয়ে দিয়েছি। মনে করে খেয়ে নিয়ো। আর কালকে বাড়ি পৌঁছেই একটা ফোন কোরো।

— ফোন? হ্যাঁ, একটা ফোন তো করা উচিত।

— একটা ফোন মানে?

— না। পৌঁছলাম কি না সেটা জানানোর জন্য...

— শুধু তার জন্য? এমনি ফোন করবে না?

— কেন?

— কেন মানে? আমি তোমার কেউ নই? শ্যামলীর কথায় ঘোর কাটল রজতাভর। মনে মনে বলল, ক'মাস আগে তো সতিই কেউ ছিলে না। যখন অফিস থেকে আমাকে এই অজপাড়াগাঁয়ে ছ'মাসের জন্য বদলি করল, তখন থাকার জন্য তোমাদের বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। দু'-তিন দিন বাইরের হোটেলে খেতে দেখে তোমার মা-ই বলেছিলেন, আমরা তো আমাদের জন্য রান্না করিই। এই বাড়িতে থেকে তুমি আবার বাইরে গিয়ে খাবে, সেটা ভাল দেখায় না। তুমি বরং কাল থেকে আমাদের সঙ্গেই খেয়ো। কেমন?

প্রথম প্রথম আমি রাজি হইনি। নিজেই একটা স্টোভে দুটি ফুটিয়ে নিতাম। কিন্তু আগে তো এ সব কোনও দিন করিনি। অভ্যাস নেই। একদিন ভাতের মাড় গালতে গিয়ে হাঁড়ি উল্টে হাতের মধ্যে গরম মাড় পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফোসকা। ক'দিন অফিসেও যেতে পারলাম না। প্রথম কয়েক দিন তোমার মা ভাত ডাল তরকারি, কোনও কোনও দিন মাছ, কোনও কোনও দিন অমলেট করে নিয়ে এসে একেবারে মেখেটেখে বাচ্চা ছেলেকে খাওয়ানোর মতো করে মুখের কাছে গ্রাস ধরে ধরে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয় দিন কী একটা কাজে তোমার মা বাপের বাড়ি চলে গেলেন। পাশের গ্রামে। সে দিন তুমি আমাকে খাইয়ে দিতে এসেছিলে। আমি বলেছিলাম, মেখে দিয়েছ, এইই অনেক। ও ঘর থেকে একটা চামচ এনে দাও, আমি ঠিক খেয়ে নেব।

তুমি বলেছিলে, ডাল ভাত তরকারি না হয় খেতে পারবেন। কিন্তু মাছ? চামচ দিয়ে মাছের কাঁটা বাছবেন কী করে?

আমি বলেছিলাম, সে ঠিক বেছে নেব।

তুমি বলেছিলে, বেছে নেব মানে? মা নেই বলে কি কেউ নেই নাকি?

বলেই, হাত ধুয়ে এসে তুমি ভাত মাখতে শুরু করে দিয়েছিলে। প্রায় জোর করেই, অত্যন্ত যত্ন করে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিলে। পরের দিন তুমি যখন খাওয়াচ্ছিলে, তখন মজা করে তোমার হাতে টুক্কস করে কামড়ে দিয়েছিলাম। তুমি এতটুকুও রাগ করোনি। বরং আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলেছিলে। বলেছিলে, ভারী দুষ্ট তো আপনি।

হাত ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেও তুমি আমাকে খাইয়ে দেওয়ার জন্য রীতিমত বায়না করতো। দিন নেই রাত নেই, যখন-তখন আমার ঘরে চলে আসতো। আশপাশে কোনও ধোপাখানা নেই। তাই আমার জামা প্যান্ট আমিই ধুতাম। পরিস্কার হয়নি বলে তুমি আবার জোর করে সাবানজলে চুবিয়ে দিতো। নিজেই কলতলায় থুপথুপ করে ধুয়ে কেচে ছাদে মেলে দিতো। কিছু বলতে গেলে, তোমার মা বলতেন, ও ওই রকমই।

ছুটিছাটার দিনে তুমি আমাকে তোমাদের গ্রাম দেখাতে নিয়ে যেতো। কোনও দিন নিয়ে যেতে থোকা থোকা শাপলা ফুটে থাকা পুষ্করিণীর পারে। কোনও দিন নিয়ে যেতে ইট খসে খসে পড়া কোন যুগে তৈরি সেই সতী মায়ের মন্দিরে। যেখানে শনি মঙ্গলবারে মানত করলেই নাকি হাতেনাতে ফল পাওয়া যায়। একবার নিয়ে গিয়েছিলে দু'ক্রোশ দূরের চড়কমেলায়। সেখানে আমরা দু'জনে পাল্লা দিয়ে ফুচকা খেয়েছিলাম। নাগরদোলা চড়েছিলাম। অনেক রাত অবধি ঘুরেছিলাম। ফেরার সময় আচমকা আকাশ ভেঙে সে কী ঝড়বৃষ্টি। মাথা বাঁচানোর জন্য আমরা একটা প্রকাণ্ড অশ্বখ গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম। জলের ছাঁট এত এলোপাথাড়ি আসছিল, সরতে সরতে আমরা একজন আরেক জনের গায়ের সঙ্গে একদম লেপটে গিয়েছিলাম। তুমি একেবারে ভিজে চুপচুপ হয়ে গিয়েছিলে। আমিও। মাঝে মাঝে বিকট শব্দ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আকাশে। সেই আলোয় তোমাকে ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কোনও অঙ্গরা বুঝি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। আমি ঠিক থাকতে পারিনি। কী এক অদ্ভুত অনুভূতিতে সারা শরীর শিরশির করে কেঁপে উঠেছিল। হঠাৎ তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তুলেছিলাম। তুমিও সে দিন চুপচাপ থাকোনি। সাড়া দিয়েছিলে একই ভাবে।

তার পর কত ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে আমার ঘর, ঘরের বিছানা। কত কথার পর কথা। কথা দেওয়া। এক দিনের জন্য বাড়ি গেলেও তাড়াতাড়ি

ফিরে আসার জন্য দিব্যি-কাটাকাটি। স্বপ্নের পর স্বপ্ন বোনা। আমাদের বাড়ি কেমন হবে। ছেলের নাম কী রাখব। কেলুচরণ মহাপাত্র তো দেহ রেখেছেন, এখন কার কাছে মেয়েকে ওড়িশি নাচ শেখাব! তোমাকে কি প্রতি তিন বছর পর পরই বদলি হতে হবে! কত ভাবনা। এই করব। ওই করব। সেই করব।

কিন্তু ছ'মাসে আর কত কী করা যায়! যে ক'দিনের জন্য আমি এখানে এসেছিলাম, দেখতে দেখতে তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। তোমাকে যে দিন প্রথম বললাম সে কথা, তুমি বললে, যাওয়ার আগে তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলে যেতো। আমি বললাম, সে তো বলবই। ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে না! তুমি বললে, সে কথা নয়। আমাদের কথা। আমি কিন্তু নিজের মুখে মাকে কিছু বলতে পারব না। যা বলার তুমিই বলবে।

কিন্তু কী বলব আমি? কী ভাবে বলব? মনে মনে অনেক কথা সাজিয়ে একদম তৈরি হয়ে যে দিন দোতলায় তোমার মায়ের ঘরে গেলাম, আমি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই উনি বললেন, খুব ভাল হয়েছে, তুমি এসেছ। তুমি না এলে আমিই তোমাকে ডেকে পাঠাতাম। তুমি তো আগেই বলেছিলে চলে যাবে। তা যাও। কিন্তু বাবা, তোমাকে যে সামনের আষাঢ়ে এখানে একবার আসতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন?

উনি বলেছিলেন, সামনের আষাঢ়ে শ্যামলীর বিয়ে।

শ্যামলীর বিয়ে! আমি থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম। পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছিল।

উনি বললেন, ওর জন্মের আগে থেকেই ও বাগ্দত্তা। আমি যখন বিয়ে করে এই শ্বশুরবাড়িতে এসে উঠি, তখন নীচের ঘরে, এখন তুমি যে ঘরটায় থাকো, সেই ঘরে একজন ভাড়াটে ছিল। তারাও ছিল সদ্য বিবাহিত। ওই ভাড়াটে বউয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাল ছিল। আমরা দু'জনে এক সঙ্গেই অন্তঃসত্ত্বা হই। তখন ঠিক করি, যদি আমাদের দু'জনেরই ছেলে বা মেয়ে হয়, তা হলে ওদের দু'জনের মধ্যে আমরা খুব ভাল বন্ধুত্ব পাতিয়ে দেব। আর আমাদের দু'জনের মধ্যে যদি একজনের ছেলে আর একজনের মেয়ে হয়, তা হলে তাদের বিয়ে দিয়ে আমাদের বন্ধুত্বটাকে একটা মিষ্টি সম্পর্কে বেঁধে নেব।

ওর ছেলে হয়েছিল। কিছু দিন পর আমার মেয়ে। খুব মিলমিশ ছিল আমাদের। ছেলেটার যখন বছর আটেক বয়স, তখন ওর বাবা হঠাৎ একদিন

গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। অকালে স্বামীকে হারিয়ে ছেলেকে নিয়ে ও চলে যায় ওর বাপের বাড়ি। এর কয়েক বছর পরে হার্ট অ্যাটাকে শ্যামলীর বাবাও চলে গেলেন। তবু আমাদের দু'জনের মধ্যে কিন্তু যোগাযোগটা ছিলই। ছেলেটি এখন জাহাজে কাজ করে। খুব কষ্ট করে জীবনে দাঁড়িয়েছে। বেশ কিছু দিন ধরেই ফোনে ফোনে আমাদের কথা হচ্ছিল। গত পরশু ও এখানে এসেছিল। ওর ছেলে নাকি সামনের আষাঢ়ে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি আসছে। ও চায় তখনই ওর ছেলের বিয়েটা সেরে ফেলতে।

— শ্যামলীকে বলেছেন?

— বলার কী আছে? ও তো জানে।

— জানে!

— জানে মানে কী, সেই ছোটবেলা থেকেই তো জানে। নতুন করে আর বলার কী আছে। মেয়েমানুষ, আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু, বিয়ে তো দিতেই হবে। আমরা দু'জনে মিলেই আষাঢ় মাসের বারো তারিখটা ঠিক করেছি। ওই দিনটা খুব ভাল। তুমি আমার ছেলের মতো, তুমি না এলে আমি সব দিক সামলাব কী করে বলো তো...

সে দিন তোমার মায়ের সঙ্গে আরও অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু যে কথা বলার জন্য আমি গিয়েছিলাম সেটা আর বলতে পারিনি। কেন বলতে পারিনি, তুমি বারবার জিজ্ঞেস করলেও, আমি তার কোনও উত্তর দিতে পারিনি। আমি ইচ্ছে করলেই আমার যাওয়াটা আরও কয়েকটা দিন পিছিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু কী লাভ! বরং যত তাড়াতাড়ি এই জায়গাটা ছাড়তে পারি, যত তাড়াতাড়ি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে পারি, ততই আমাদের দু'জনের পক্ষে ভাল। তাই আজকের দিনটাই আমি বেছে নিয়েছি চলে যাওয়ার জন্য।

— কী গো, চুপচাপ কেন? কথা বলবে না? শ্যামলী ফের প্রশ্ন করতেই ধাতস্থ হ'ল রজতাভ। যেন অন্য একটা জগৎ থেকে এইমাত্র ইহজগতে এসে পড়ল— উঁ? হুঁ। তার পরেই বুঝতে পারল অনেকক্ষণ ধরে ওর মাথার মধ্যে কী সব যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। ও শ্যামলীর চোখের দিকে তাকাল। একটুখানি চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, ভাল থেকে। টা টা।

— আবার টা টা?



— এটা তোমাকে বললাম। টা টা মানে বিদায়। ছেড়ে চলে যাওয়া। মনে রাখবে, জীবনটা অনেক বড়। এ জীবনে অনেক কিছু ঘটে। অনেক কিছু ভাল লাগে। ভাল লাগা মানেই তাকে আঁকড়ে ধরে থাকা নয়। তাকে না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়া নয়। জীবন একটা জার্নি। সেই চলার মধ্যে অনেক কিছু আসবে। আবার যাবেও। যার যতটুকু সময় থাকার কথা, তার ততটুকু থাকাই ভাল। তার থেকে বেশি নয়। তোমার জীবনে আমার হয়তো এইটুকুই বরাদ্দ ছিল...

— এ সব কী বলছ তুমি?

— ওই দ্যাখো সিগন্যাল হয়ে গেছে। এক্ষুনি ট্রেন ছাড়বে। সরে দাঁড়াও।

— না। আমি যাব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

— ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। পাগলামো করো না।

— আমি তোমার সঙ্গে যাব।

— কী হচ্ছে কী? লেগে যাবে যে... সরো।

— আমি তোমার সঙ্গে যাব।

— তা হয় না শ্যামলী। তুমি একজনের বাগ্‌দত্তা।

— আমি মানি না। আমি তোমার সঙ্গে যাব...

— আরে ছুটছ কেন? পড়ে যাবে যে। কী হচ্ছে কী? লেগে যাবে, সরে যাও...

ও বলার জন্য, না কি ট্রেনের গতির সঙ্গে পাশ্লা দিয়ে বড় বড় পা ফেলে আর ছুটতে পারল না বলেই, শ্যামলী ওই কামরার জানালা থেকে পেছনে চলে গেল, রজতাভ বুঝতে পারল না। প্ল্যাটফর্ম শেষ হতেই ও আর একবার বলল, টা টা। এটা কার জন্য বলল, মনে হয় ও নিজেও জানে না।





## আড়াল

কলিংবেল টিপতেই ভিতর থেকে কুকুরের সে কী ভয়ঙ্কর ঘেউ ঘেউ! কলিংবেলের শব্দ-শুনতে না পেলেও কুকুরের কান-ফাটানো এই চিংকার তো কানে যাবেই। তাই দ্বিতীয় বার আর বেল টেপেনি তিনি। এরই মধ্যে সদর দরজা খুলে সামনে এসে যিনি দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখেই তার মনে হল, ইনিই তিয়াসের মা।

খুব কম দিন হল না, তিয়াসের সঙ্গে ও মিশছে। কিন্তু এ পথ দিয়ে যেতে যেতে দূর থেকে একদিন দেখালেও তিয়াস কখনও তাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসেনি। কিছু দিন হল তিয়াসের ছোটখাটো নানান আচরণ নিয়ে তিনি মনের মধ্যে বেশ তোলপাড় হচ্ছিল। সন্দেহটা যখন মনের মধ্যে একেবারে গোঁড়ে বসেছে, তখনই সে ঠিক করেছিল, আচমকা একদিন তিয়াসের বাড়ি গিয়ে দেখবে, সে যা ভাবছে, সেটা সত্যি কি না।

কিন্তু, প্রথম দিনই অযাচিত ভাবে কোনও মেয়ের পক্ষে তো ছুট করে তার প্রেমিকের বাড়ি যাওয়া ঠিক নয়। বাইরের লোকের কথা না হয় বাদই দিলাম, ওর বাড়ির লোকেরা কী ভাববে! তাই খুব ছোটবেলাকার বন্ধু রঞ্জনাকে সব কথা খুলে বলেছিল সে।

রঞ্জনা বলেছিল, সে নয় যাওয়া যাবে। কিন্তু তুই যে বলছিস, ও যখন বাড়ি থাকবে না, তখন যাবি। তুই বুঝবি কী করে ও কখন বাড়ি নেই?

তিনি বলেছিল, ও বাড়ি ঢুকলেই মোবাইল অফ করে দেয়। আর যতক্ষণ না বাড়ির বাইরে বেরোয়, ততক্ষণ অফই থাকে। ফলে ফোন করে যখন দেখব, ওর মোবাইল অন, তখন ও কোথায় আছে জেনে নেব। ওর বাড়ি তো বেশি দূরে নয়। যদি দেখি এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে ওর বাড়ি ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই, তখনই যাব।

— ও যদি মিথ্যে কথা বলে? কাছাকাছি থেকেও যদি বলে দূরে আছি?

— না না। অতটা মিথ্যে বলবে কি! ও জানবে কী করে যে, ওর বাড়ি যাওয়ার জন্য আমি ওটা জানতে চাইছি। তা ছাড়া যে যাই বলুক, ও কিন্তু অতটা খারাপ না। আমাকে যথেষ্ট ভালবাসে। এই তো ক’দিন আগে, আমার জ্বর হয়েছিল দেখে উপোস করে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পূজো দিয়ে এসেছিল। যাতে আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠি। আর ওর যদি খারাপ মতলবই থাকত, তা হলে সে দিন অমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও আমাকে ছেড়ে দিত না। এরই মধ্যে কবে যেন আমরা কোথায় একটা যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনেই, কোনও বাড়িতে বোধহয় কোনও অনুষ্ঠান ছিল, রাস্তার পাশেই গাদাগুচ্ছের কী সব ঐঁটো পাতাটাটা ফেলেছে। কতকগুলো কুকুর সেখানে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। তুই তো জানিস, ছোটবেলায় আমাকে একবার কুকুরে কামড়েছিল। চোদ্দোটা ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছিল। তার পর থেকে কুকুর দেখলেই আমি একশো হাত দূরে থাকি। আমাকে থমকে যেতে দেখে, ও বলেছিল, কোনও ভয় নেই। আমি তো আছি। চলো। বলেই, আমাকে অন্য পাশে নিয়ে যে দিকে কুকুর, সে দিকে চলে গিয়েছিল ও। আমরা কুকুরগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম। কুকুরগুলো তাকালও। কিন্তু কিছু করল না। জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার পর ও বলল, দেখলে তো, তুমি যদি কিছু না করো, ওরাও তোমাকে কিছু করবে না। আমি বলেছিলাম, না বাবা, কুকুরকে আমি বিশ্বাস করি না। ওই একবারেই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। আর যেখানেই যাই, যেখানে কুকুর আছে, আমি কিছুতেই সেখানে যাব না। ও বলেছিল, আমার সঙ্গে থাকলে তোমাকে কখনও কোনও কুকুর কামড়াবে না। বলেই হো হো করে হেসে উঠেছিল।

— তাতে কী হল? রঞ্জনা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলল, সেটাই তো বলছি। তার পর থেকে আমাকে নিয়ে বেরোলে, রাস্তায় কোথাও কোনও কুকুর থাকলে, আমি দেখতে না পেলেও, ও কিন্তু দূর থেকেই ঠিক দেখতে পেত। এবং বুঝতে পারতাম, আমি যাতে ভয় না পাই, সে জন্য ও আমাকে আগলে নিয়ে যাচ্ছে। আর সত্যি কথা বলতে কী, কুকুরে আমার যে এত ভয় ছিল, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ও-ই অনেকটা কাটিয়ে দিয়েছে। যে আমার এত কেয়ার নেয়, সে কি এত ছোটখাটো ব্যাপারে আমাকে মিথ্যে বলবে! আমার মনে হয় না।

— সেটা দ্যাখ। তুই যেটা ভাল বুঝবি। ও নেই দেখে হয়তো গেলি। তার পর গিয়ে দেখলি, ও বাড়িতে, তখন?

— তখন না হয় যা হোক কিছু একটা বানিয়ে বলব। কিন্তু সত্যিটা তো জানতে পারব। প্রত্যেক দিন তো আর মনের মধ্যে সন্দেহ নিয়ে দন্ধে দন্ধে মরতে হবে না। আর আমি যেটা আঁচ করছি, সেটা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো হয়েই গেল। এই সম্পর্কটাকে টিকিয়ে রাখার কোনও মানেই হয় না। তাই না?

— হ্যাঁ। সেটা ঠিকই বলেছি। অন্যমনস্ক ভাবে রঞ্জনা কথাটা বললেও, সে দিন থেকেই তাকে তাকে ছিল তিনি। আজ সকালেই যখন ফোন করে জানতে পেরেছে, তিয়াস এইমাত্র বেরোল, ফিরতে একটু দেরি হবে— তখনই ও ঠিক করে ফেলল, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর বাড়ি যেতে হবে। সেই মতো সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে রঞ্জনাকেও বলে দিয়েছিল, রেডি হয়ে পাড়ার মুখে চলে আসতে।

তাও বেরোতে বেরোতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। মাথার উপরে বৈশাখ মাসের খাঁ খাঁ রোদ্দুর। তেমনই গরম। চার রাস্তার মোড়ে এসে একটা অটোয় উঠে পড়ল ওরা। দশ মিনিটের পথও নয়, অটোটা যত তিয়াসের বাড়ির কাছাকাছি আসতে লাগল, তিনি ততই ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকতে লাগল, হে ঈশ্বর, আমি যেটা সন্দেহ করছি, সেটা যেন সত্যি না হয়, সত্যি না হয়, সত্যি না হয়...

দরজা খুলে অচেনা দুটো মেয়েকে দেখে তিয়াসের মা বললেন, কাকে খুঁজছ মা?

তিনি কানে তখন কোনও কথা ঢুকছে না। একমনে শুধু ঠাকুরকে ডাকছে, তিয়াস যেন বাড়িতে না থাকে, না থাকে, না থাকে...

তিনি কে কিছু বলতে না দেখে রঞ্জনাই বলল, তিয়াস আছে?

উনি বললেন, না মা। ও তো একটু বেরিয়েছে।

— ও। কখন আসবে?

— ডাক্তারের কাছে গেছে তো। কতক্ষণ লাগে।

— ডাক্তারের কাছে? কেন? ওর কী হয়েছে?

— না। ওর কিছু হয়নি। ওর ছেলেটা তো ক’দিন ধরে খুব ভুগছে...

ছেলে! তিনি পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। চারশো চল্লিশ

ভোল্টের বিদ্যুৎ আছড়ে পড়ল তার ওপর। থরথর করে কেঁপে উঠল তিনি। তিয়াসের ছেলে আছে! ও বিবাহিত! ও এর আগে বিভিন্ন খবরের কাগজে পড়েছে, বদমাশ গোছের কিছু লোক আছে, যারা বিয়ের পরেও নিজের নাম ভাঁড়িয়ে, পরিচয় গোপন করে একের পর এক বিয়ে করে। কারও কারও কাছে এটা আবার পেশাও। যৌতুক হিসেবে যতটা যা পেল, পেল। বিয়ের পরদিন কিংবা তার ক’দিন পরে ‘একটু আসছি’ বলে কিংবা সদ্য বিয়ে করা বউকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে সব সোনাদানা নিয়ে চম্পট দেয়। অনেক ক্ষেত্রে তার আগের বউও নাকি তার সঙ্গে সাঁটে থাকে। ভাবা যায়! এগুলো অবশ্য গ্রামের দিকেই বেশি হয়। তা বলে কি শহরে হয় না! শহরেও কিছু কিছু ছেলে আছে, যারা বাড়িতে বউ বাচ্চা থাকলেও অন্য মেয়ে দেখলেই ছোঁক ছোঁক করে। এবং কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়লেও সে যে বিবাহিত, সেটা বেমালাম চোখে যায়। এ সব এখন আকছারই ঘটে। কিন্তু তার জীবনে যে এ রকম কোনও ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা সে ঘুণাঙ্করেও কল্পনা করতে পারেনি।

কিছু দিন ধরে তিনি ওকে সন্দেহ করছিল ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা যে এতখানি, সেটা ভাবতেই পারেনি। ভেবেছিল, ও হয়তো অন্য কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়েছে। সেটা হয়তো ওর বাড়ির লোকেরা জানে। মেয়েটা হয়তো ওদের বাড়িতেও যাতায়াত করে। ওর মায়ের হয়তো তাতে সম্মতিও আছে। এ দিকে তার সঙ্গে এত দিনের সম্পর্ক, তাই তার মুখের উপরে সরাসরি ‘না’-ও বলতে পারছে না। তাই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। বাড়ির লোকেরা যাতে জানতে না পারে, সে জনাই হয়তো বাড়িতে ঢুকলেই মোবাইল অফ করে দিচ্ছে। কিন্তু এটা কী শুনল সে! কী! চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। ঝাপসা চোখে রঞ্জনার দিকে তাকাল। দেখল, রঞ্জনাও তার দিকে তাকিয়ে আছে। কোনও কথা হল না। তবু যেন চোখে চোখে কত কথা হয়ে গেল। তা হলে এত দিন ধরে তিয়াস তার সঙ্গে খেলা করছিল! ছি ছি ছিঃ...

দুটো মেয়ে যখন এসেছে, তিয়াসের খোঁজ করছে, নিশ্চয়ই এরা তিয়াসের বন্ধু। সন্তানের বন্ধু তো সন্তানের মতোই। তাদের কি দোরগোড়া থেকে খালি মুখে ফিরিয়ে দেওয়া যায়! তাই তিনি বললেন, ভিতরে এসো।

— না না, ঠিক আছে মাসিমা। ও যখন নেই... পরে অন্য একদিন আসবখ’ন... রঞ্জনা বললেও তিনি তখনও হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। মাথা কোনও কাজ করছে না। সারা মুখ জুড়ে থমকে আছে একরাশ কালো মেঘ। আর বুকের মধ্যে সে কী হাহাকার! কান্না পেয়ে গেল তার। কিন্তু না। সে কাঁদবে না। তিয়াসকে সামনে পেলে সে শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করবে, ও কেন তার সঙ্গে এ রকম করল? কেন? কেন? কেন?

এটা তাকে জানতেই হবে। না। সে এখন বাড়ি যাবে না। তিয়াসের সঙ্গে আগে দেখা করবে, তার পরে অন্য কথা। কিন্তু তিয়াসের মাকে সেটা বুঝতে দিল না সে। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে রঞ্জনা কে বলল, চল না। উনি যখন বলছেন...

রঞ্জনা বলল, ও কখন আসবে তার কোনও ঠিক আছে!

— ডাক্তার দেখাতে আর কতক্ষণ লাগবে? তিনি বলতেই তিয়াসের মাও সায় দিলেন, না না। বেশিক্ষণ লাগবে না। এই তো সামনেই গেছে। আমার মনে হয়, এক্ষুনি চলে আসবে। ফোন করে দেখতে পারো। ওর কাছে তো মোবাইল আছে।

রঞ্জনা বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন তো। অ্যাঁই, তোর কাছে ওর নম্বর আছে না?

— আছে। কিন্তু এখন করা কি ঠিক হবে? ডাক্তারের কাছে গেছে যখন, ফোন করে বিরক্ত করার কোনও মানে হয় না। ধীরে সুস্থে ডাক্তার দেখাক। আমরা বরং একটু অপেক্ষা করি, নাকি? কী বলিস?

— কতক্ষণ বসবি?

— খানিকক্ষণ তো বসি...

— যদি তার মধ্যে না আসে?

— তখন না হয় ফোন করব। কিংবা একটা চিঠি লিখে যাব।

তিয়াসের মা বললেন, হ্যাঁ মা, সেটাই ভাল। আমার বয়স হচ্ছে তো। কোনও কিছু আর মনে রাখতে পারি না। তোমরা বলে গেলেও, তোমাদের নাম হয়তো ঠিক মতো মনে করে আমি ওকে বলতেও পারব না। রোদের মধ্যে আর দাঁড়িয়ে থেকো না। এসো এসো, ভিতরে এসো।

ওরা ভিতরে ঢুকল। কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার মতো। পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। সামনেই বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে বসার ঘর। খুব

একটা সাজানো গোছানো নয়। চার দিক ঘিরে মুখোমুখি যে চারটে সোফা, সেগুলোও ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ। মাঝখানে সেন্টার টেবিল। তাতে কয়েকটা ম্যাগাজিন। সোফায় বসতে বসতে তিন্নিরা দেখল, ও দিক দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। তিয়াসের মা পাখার সুইচ অন করতে করতে বললেন, একটু চা খাবে তো মা?

দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল, না না, থাক না।

— থাকবে কেন? তিয়াস থাকলে কি চা না খেয়ে তোমরা যেতে পারতে? তোমরা চায়ে চিনি খাও তো?

রঞ্জনা বলল, হ্যাঁ খাই।

কিন্তু না, চা নয়। একটা ট্রে-তে আলাদা দুটো প্লেটে দুটো করে ছানার সন্দেশ আর দু'গ্লাস জল দিয়ে গেলেন তিনি। বললেন, আগে এটা খেয়ে নাও।

রঞ্জনা বলল, এ সবের কী দরকার ছিল মাসিমা...

উনি বললেন, নাও নাও, খাও। লজ্জা কোরো না। আমি চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছি।

ভদ্রমহিলা পিছন ফিরতেই প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে ঠোঁট দিয়ে আলতো করে একটুখানি ভেঙে মুখে নিল রঞ্জনা। টুকরোটা মুখে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দেখল, তিন্নির মুখ একেবারে থমথমে। চোখটাও ছলছল করছে। যেন এফুনি বাঁধ ভেঙে কান্না বেরিয়ে আসবে। তাই রঞ্জনা বলল, এ রকম করিস না। উনি কী ভাববেন বল তো... নে, খা।

কান্না ভেজানো গলায় তিন্নি বলল, না রে, আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না।

— বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করবি বল। তবু আজ এলি দেখে তো ব্যাপারটা জানতে পারলি। না এলে তো জানতেই পারতিস না।

কাঁপা কাঁপা গলায় তিন্নি বলল, আমি এত বড় ভুল করলাম! মানুষ চিনতে আমার এত ভুল হল!

— তোর হঠাৎ ওকে সন্দেহ হল কেন?

— আসলে আমি আর ও তো মাঝে মাঝে মিলেনিয়াম পার্কে যাই। আমি খেয়াল করিনি— আমাদের কলেজে জুঁই বলে একটা মেয়ে ছিল। ও নাকি আমাকে ওর সঙ্গে দেখেছিল। পরে, রাস্তায় একদিন দেখা হওয়ায় ও-ই



বলল, তিয়াসের সঙ্গে মেলামেশা করছিস? বুঝেসুঝে মিশিস। ও কিন্তু খুব একটা সুবিধের ছেলে না।

— তার পর?

— যতই কলেজের বন্ধু হোক, ও বলেছে দেখেই কি ওর কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আমি এত দিন ধরে ওর সঙ্গে মিশছি, ও কেমন, আমি জানি না? আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু তার পর থেকেই ওর অনেক আচরণ আমার চোখে পড়তে লাগল। আগে তো ও এ রকম করত না! কেমন যেন খটকা লাগল। তখন আমি দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাতে লাগলাম। দেখলাম, সত্যিই ওর চালচলন বেশ সন্দেহজনক।

— কী রকম?

— যেমন, আগে খুব ঘন ঘন ফোন করত। কিন্তু ক'দিন হল, ফোন করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। আমি করলেও সব সময় ঠিক মতো ধরত না। ধরলে, আশপাশের গাড়িঘোড়ার শব্দে বুঝতে পারতাম, ও রাস্তায়। ওর কথা বলার ধরন দেখে বুঝতে পারতাম, ওর পাশে কেউ আছে। কিন্তু আমি যে সেটা বুঝতে পারছি, সেটা ওকে বুঝতে দিতাম না। যদি বলতাম, বাড়ি গিয়ে আমাকে একটা ফোন করো তো... ও বলত, ঠিক আছে। কিন্তু কোনও দিনই ফোন করত না।

— কেন?

— কেন আবার, বউ আছে না? যদি টের পেয়ে যায়! এই সব ছেলেদের গায়ে না বিছুটি পাতা ঘষে দিতে হয়।

— ওর ব্যবসা আছে বলেছিলি না?

— ধুর, ওটা ওর নাকি? ওর বাবার। ওর বাবাই চালায়। ও মাঝে মাঝে গিয়ে বসে।

ওদের কথার মধ্যেই ক্রিং ক্রিং করে ফোন বেজে উঠল। রঞ্জনা চাপা গলায় বলল, কী রে, টেলিফোন বাজছে তো, ধরার কেউ নেই নাকি?

তিনিও কান খাড়া করল, হ্যাঁ, টেলিফোন বাজছে। তিয়াসের ব্যাপারটা নিয়ে ও এতটাই টেনশনে আছে যে শুনতেই পায়নি। খানিকক্ষণ পর রিংটা থেমে গেল। রিং হয়ে হয়ে থেমে গেল, না কি কেউ ধরল, বোঝা গেল না। তিনি বলল, কথায় কথায় আমি ওকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের বাড়িতে ল্যান্ড ফোন নেই? ও বলেছিল, আছে তো। যেই বলেছিলাম, তা

হলে ওই নম্বরটা দাও না... ও বলেছিল, ল্যান্ড নম্বর দিয়ে কী করবে? আমি বলেছিলাম, বাড়ি ঢুকলেই তো মোবাইলের সুইচ অফ করে দাও। যদি কোনও বিপদ-আপদ হয়, দরকারের সময় তোমাকে যদি মোবাইলে না পাই, তখন অন্তত ল্যান্ড ফোনে তো খবরটা দিতে পারব।

রঞ্জনা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তখন ও কী বলল?

— বলল, মোবাইলে না পেলে একটা এসএমএস করে দেবে, তা হলেই হবে। আমি বলেছিলাম, তাও তোমার বাড়ির নম্বরটা দেবে না? ও মুখের উপরে বলে দিয়েছিল, না।

— জিজ্ঞেস করিসনি, কেন দেবে না?

— করেছিলাম তো। ও বলেছিল, ফোনটা তো মায়ের ঘরে। ফোন এলে মাকেই ছুটে গিয়ে ধরতে হয়। কিন্তু মায়ের শরীরটা তো ভাল নয়, তাই শুধু আমি নই, আমাদের বাড়ির কেউই আর কাউকে ল্যান্ড নম্বর দেয় না। এবং আমরা নিজেরাও পারতপক্ষে ওই ফোনে ফোন করি না...

সন্দেহে ফের আলতো করে কান্না বসাতে বসাতে রঞ্জনা বলল, শরীর খারাপ? কই, দেখে তো মনে হল না। দিব্যি হাঁটাচলা করছেন। চা করছেন। আসলে ও সব কিছু না। ল্যান্ড নম্বর না দেওয়ার যত সব ফন্দিফিকির। বুঝেছিস? আরে বাবা, মায়ের ধরতে যদি অসুবিধেই হয়, ফোনটা তো অন্য ঘরেও রাখতে পারে।

তিনি বলল, আমি কি সে কথা বলিনি? তখন ও বলেছিল, সে নয় রাখলাম। কিন্তু অন্য ঘরে ফোন রাখলে, সেটা ধরবে কে?

— তখন বললি না কেন, তোমার বউ...

— তখন কি আর জানতাম... তার পরেও যত বার ল্যান্ড নম্বর চেয়েছি, ও প্রতিবারই কোনও না কোনও অজুহাত দেখিয়ে ঠিক এড়িয়ে গেছে। একবার তো বলেই ফেলল, টেলিফোন নম্বরের জন্য তুমি এ রকম করছ কেন বলো তো? ভেবে নাও না, আমাদের বাড়িতে ফোন নেই।

— সে কী রে?

— তা হলে আর বলছি কী। জানবি, যাদের মধ্যে গলদ থাকে, তাদের সঙ্গে কথায় পারবি না। আমি তো ভাবতেই পারছি না, ও এ রকম...

ওরা যখন কথা বলছে, হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। চি চি চি চি... চি চি



চি চি... চি চি চি চি... মনে হল, কেউ বুঝি পর পর তিন বার সুইচে হাত ছুঁয়েই ছেড়ে দিল। আর ওইটুকু আওয়াজেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিয়াসের মা বললেন, ওই যে, তোমাদের তিয়াস এসে গেছে।

কলিংবেলের শব্দ শুনে ওর মা কী করে বুঝলেন তিয়াস এসেছে! সত্যিই কি তিয়াস! দু'জনেই ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। উনি দরজা খুলতেই ওরা অবাক। হ্যাঁ, সত্যিই তিয়াস।

ওর মা কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ওদের দু'জনকে দেখে তিয়াস যেন ভূত দেখল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কেমন ঘোর লাগা গলায় বলল, তুমি?

তিনি ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু কোনও কথা বলল না। রঞ্জনা বলল, এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তা, ও বলল, এটা তিয়াসদের বাড়ি। আমি বললাম, তা হলে চল না, দেখি ও আছে কি না। ও বারবার করে বারণ করেছিল। তবু আমি ওর কথা শুনিনি। প্রায় জোর করেই কলিংবেল টিপে দিয়েছিলাম। আপনার মা বললেন, আপনি নেই। তবে এক্ষুনি ফিরে আসবেন। তাই...

তিয়াসের মা সেন্টার টেবিল থেকে কাচের গ্লাস দুটো ট্রে-তে তুলে নিতে নিতে তিয়াসকে বললেন, কী রে, তোর ছেলেকে কোথায় রেখে এলি?

— ও বিনুকের কাছে আছে। আসছে।

তিনি জানে, বিনুক ওর বোন। তিয়াসের মুখেই শুনেছে, ও খুব ভাল মেয়ে। লর্ডস বেকারির কাছে এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুলে সায়েন্স নিয়ে টুয়েলভে পড়ে। ওর কাছে তার কথা শুনে সে নাকি তার সঙ্গে আলাপও করতে চেয়েছিল। তা হলে কি সেটাও মিথ্যে কথা! যত খারাপই হোক, বাড়িতে জলজ্যান্ত একটা বউদি থাকতে কোনও নন্দ কি তার দাদার প্রেমে সায় দিতে পারে! দাদার প্রেমিকার সঙ্গে আলাপ করতে চাইতে পারে! না। এটা হতে পারে না। তা হলে কি ও যা বলে, সবটাই মিথ্যে! জুঁই ঠিকই বলেছিল, ও খুব একটা সুবিধের ছেলে না। তিনি যখন এ সব ভাবছে, তিয়াসের মা বলে উঠলেন, ডাক্তার কী বলল?

— একটা মলম দিয়েছে আর তিন রকমের ট্যাবলেট। বলল, এতেই সেরে যাবে।

— তুই চা খাবি তো?

— বলেছি না, চায়ের ব্যাপারে আমাকে কখনও জিজ্ঞেস করবে না।

— জানি তো, চায়ে তোর কোনও ‘না’ নেই। তোমরা কথা বলো মা...  
চায়ের জল বোধহয় ফুটে গেল...

ওর মা রান্নাঘরের দিকে যেতেই তিয়াস বলল, তুমি যে এ দিকে আসবে,  
কই, তখন তো বললে না?

— তুমিও তো বলেছিলে, আমি দূরে আছি। ফিরতে দেরি হবে।

— তখন কি আর জানতাম, ডাক্তারখানা আজ এত ফাঁকা থাকবে!

— এত বড় একটা ঘটনা তুমি আমার কাছে চেপে গিয়েছিলে?

— কী?

— কী, বুঝতে পারছ না?

— না।

— সে বুঝবে কী করে?

তিমির কথা শুনে রঞ্জনা বুঝতে পারল, ব্যাপারটা এ বার অন্য দিকে মোড়  
নেবে। তাই সেটাকে আটকাবার জন্য সে তিয়াসকে জিজ্ঞেস করল, আপনার  
ছেলের কী হয়েছে?

— আর বলবেন না। ক’দিন ধরে খুব ভুগছে...

— কী হয়েছে?

— প্রথমে ঘাড়ের কাছটায় একটু ঘা মতো হয়েছিল। তার পর...

কথা শেষ হওয়ার আগেই ট্রে-তে করে তিন কাপ চা নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে  
তিয়াসের মা বললেন, মেয়ের কাছে গিয়েছিলি?

মেয়ে! রঞ্জনা আর তিমি দু’জনেই দু’জনের দিকে তাকাল। শুধু ছেলে নয়,  
মেয়েও আছে!

তিয়াসের মা ফের বললেন, ও কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে একা একা আছে।  
আমি একবারও যেতে পারিনি। জানিস তো, আমি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারি  
না। পারলে একবার দেখা দিয়ে আসিস।

তিমি অবাক। এ কী বাড়ি রে বাবা! ছেলে অসুস্থ। মা অসুস্থ। মেয়েও কি  
অসুস্থ নাকি! না হলে উনি এ কথা বললেন কেন! তা হলে কি তিয়াসও  
অসুস্থ! নিশ্চয়ই অসুস্থ। তার সঙ্গে ও যা করেছে, সেটা কি কোনও সুস্থ  
লোকের কাজ!

তিমি যখন এ সব ভাবছে, প্লেটে করে চায়ের কাপ সেন্টার টেবিলে

নামাতে গিয়ে তিয়াসের মা দেখলেন, যে ভাবে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিন্নির দিকের প্লেটের সন্দেশ দুটো ঠিক সে ভাবেই পড়ে আছে। তাই তিন্নিকে বললেন, কী গো, এখনও খাওনি? নাও নাও, তাড়াতাড়ি শেষ করো। চা ঠান্ডা হয়ে যাবে যে...

উনি চলে যেতেই তিয়াসের দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে বেশ কড়া গলায় তিন্নি বলল, তোমার বউ কোথায়?

— বউ!

রঞ্জনা বলল, এই চুপ কর না... এগুলো পরে হবে। মাসিমা শুনলে কী ভাববেন বল তো!

— কী আর ভাববেন! জানতে পারবেন, তাঁর ছেলে কেমন! তাঁর ছেলে কী ভাবে একটা মেয়ের জীবন নিয়ে এত দিন ধরে ছিনিমিনি খেলেছে...

তিয়াস বলল, ছিনিমিনি খেলেছি! আমি!

— অনেক হয়েছে আর ন্যাকামি করো না। আমি সব জেনে গেছি।

— কী জেনেছে? তিয়াস গলা চড়াতেই রঞ্জনা বলল, চুপ করুন না তিয়াসদা। যা হওয়ার হয়ে গেছে।

— কেন চুপ করব? দেখছেন না, আপনার বন্ধু কী সব উল্টোপাল্টা বলছে... ও কি আমার সঙ্গে এখানে ঝগড়া করতে এসেছে?

তিন্নির দিকে তাকাল রঞ্জনা, তুই চুপ করবি? নে, চা খা।

— না। আমি খাব না। চা তো দূরের কথা, ওদের বাড়ির এক গ্লাস জলও আমি ছৌঁব না।

তিয়াস জিজ্ঞেস করল, কেন? আমি কী করেছি?

— এত কিছু পরও আবার জিজ্ঞেস করছ, কেন? আমি কী করেছি? তোমার লজ্জা করে না...

ঠিক তখনই এমন চি চি চি চি চি... করে একটানা কলিংবেলটা বেজে উঠল যে, তিন্নির কথা ভাল করে শোনাই গেল না। তিয়াস বলল, দাঁড়াও, দরজাটা খুলে দিয়ে আসি। ঝিনুক এসেছে।

ও উঠতেই দু'জনে সদর দরজার দিকে তাকাল। দেখল, একটি মেয়ে ঢুকল। কোলে একটা ছোট্ট খরগোশ। এইই নিশ্চয়ই ঝিনুক। তিন্নির মন তখন এতই খারাপ যে কোনও কিছু ভাবার মতো অবস্থায় নেই। রঞ্জনা একটু অবাক হল। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে তিয়াস কী করে বুঝল, ওর বোন

এসেছে! আরও অবাক হল, ওর বোনের ঢং দেখে। কিছু দিন আগে দেব আর কোয়েলের 'প্রেমের কাহিনি' নামে একটা সিনেমা এসেছিল। সেখানে খরগোশকে প্রেমের প্রতীক হিসেবে দেখানোর পর থেকে অনেক উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েই খরগোশ পোষা শুরু করেছে। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন ন্যাকা ন্যাকা। ঝিনুকও যে তার ব্যতিক্রম নয়, এটা সে বুঝতে পারল। মনে মনে বলল, যন্তু সব আদিখ্যেতা!

ঝিনুক ঢুকতেই ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল তিয়াস। এ আমার বোন ঝিনুক। আর এ হল তিনি...

'তিনি' শব্দটা শুনেই ঝিনুক বলল, ও মা, তুমি তিনি? দাদার কাছে তোমার কত কথা শুনেছি। আমি তো দাদাকে কবেই বলেছিলাম, 'তা' হলে একদিন বাড়িতে নিয়ে আয়। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে। যখনই এ কথা বলি, ও বলে, আজ নয়, কাল। কাল নয়, পরশু। অবশেষে নিয়ে এল তা হলে...

রঞ্জনা বলল, না। তোমার দাদা আমাদের আনেনি। আমরা নিজে থেকেই এসেছি।

— তাই নাকি? বাঃ। দারুণ ব্যাপার। সেই যখন এলে, আগেই তো আসতে পারতে। তোমাদের চিনে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

খুব গম্ভীর গলায় তিনি বলল, না। কিন্তু তোমার বউদি কোথায়?

— বউদি! মানে?

— তোমার দাদার বউ।

— দাদার বউ! দাদা আবার বিয়ে করল কবে!

— তার মানে?

— আমি তো সেটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি...

এ বার একটু থতমত খেয়ে গেল তিনি। বলল, না মানে... শুনলাম... ছেলেকে নিয়ে তোমার দাদা ডাক্তার দেখাতে গেছে...

কথাটা শুনেই হো হো করে হেসে উঠল ঝিনুক। ও, তুমি দাদার ছেলেকে চেনো না? বলেই, হাসতে হাসতে কোলের খরগোশটাকে দেখিয়ে বলল, এই তো দাদার ছেলে।

— এটা!

— হ্যাঁ, এই খরগোশটাকে ও এত ভালবাসে যে আমাদের বাড়ির লোকেরাই শুধু নয়, গোটা পাড়ার সবাই বলে, এটা ওর ছেলে।

— আর মেয়ে?

— মেয়ে তো উপরে। ইয়া বড়। একেবারে বাঘের মতো। দেখলে কেউ বলবে না, ও কুকুর। ভীষণ বুঝাদার। আমাদের প্রত্যেকের পায়ের শব্দ চেনে। আমাদের কলিংবেল টেপার শব্দ শুনেই বুঝতে পারে, কে এসেছে। টিভি চালিয়ে দিলে নীচে আর নামতেই চায় না। বসে বসে টিভি দেখে...

ঝিনুক বলেই যাচ্ছিল। আর সেটা হাঁ করে গিলছিল তিনি। সে কত কী না ভেবেছিল! আর যাকে নিয়ে তার এত সন্দেহ, সে কিনা একটা কুকুর! মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়েও এল শেষ শব্দটা— কুকুর!

— হ্যাঁ। কেন? তুমি কি ভেবেছ? বলেই, তিয়াসের দিকে তাকিয়ে ঝিনুক বলল, কী রে দাদা, তুই ওকে তোর ছেলেমেয়ের কথা বলিসনি?

টোক গিলে তিয়াস বলল, আসলে আলাপের প্রথম দিনই আমি যখন জানতে পারলাম, ও কুকুরকে ভীষণ ভয় পায়, কুকুর থেকে একশো হাত দূরে থাকে— তখন আমার মনে হয়েছিল, আমাদের বাড়িতে কুকুর আছে শুনলে ও হয়তো কুকুরের ভয়েই আমার সঙ্গে আর মিশবে না, তাই...

— তাই বলিসনি? তুই কী রে?

রঞ্জনা বলল, সে নয় বলেননি, ঠিক আছে। কিন্তু বাড়ি ঢুকলেই মোবাইলটা অফ করে দেন কেন?

তিয়াস মাথা নত করে বলল, না মানে... আসলে... অবলা জীব তো, ও তো অতশত বুঝে না। যদি হঠাৎ কখনও ডেকে ওঠে... আর সেই ডাক শুনে যদি তিনি বুঝে যায় আমাদের বাড়িতে কুকুর আছে। তাই...

— সে জন্য মোবাইল অফ করে দিতে? সে জন্যই ল্যান্ড নম্বর দাওনি? অবাক হয়ে প্রশ্ন করল তিনি।

— না মানে... আসলে...

রঞ্জনা বলল, ও যখন ফোন করে, আপনি রাস্তায় থাকলে, আপনার সঙ্গে তখন কে থাকে?

— আমার সঙ্গে? কে?

— কেউ না থাকলে কথা বলতে বলতে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাও কেন? তিনি জানতে চাইতেই তিয়াস বলল, আসলে তুমি ফোন করলেই আমি তটস্থ হয়ে যেতাম। দেখতাম, আশপাশে কোনও কুকুর আছে কি না। ভয়ে ভয়ে থাকতাম, হঠাৎ ডেকে উঠবে না তো!

— তা হলে জুঁই ও কথা বলল কেন? ফের প্রশ্ন করল তিনি।

— কোন কথা?

— তুমি খুব একটা সুবিধের না।

— আমি সুবিধের না? এটা তোমার মনে হল?

— এটা আমি বলছি না।

— তা হলে?

— জুঁই বলেছিল।

— সে তো বলবেই।

— কেন?

— কারণ, বাচ্চা।

— কার?

— আমার মেয়ের।

— তোমার মেয়ের? আঁতকে উঠল তিনি।

সেটা দেখেই তিয়াস তড়িঘড়ি বলে উঠল, না না। আমার মেয়ের না। আমার ডগির বাচ্চা। ওর বাচ্চা হবে শুনে জুঁই আমাকে আগেই বলেছিল, বাচ্চা হলে আমাকে একটা দিস তো। আমিও বলেছিলাম, দেব। কিন্তু বেচারি তিনটে বাচ্চা দিলেও সব ক'টারই ইনফেকশন হয়ে গিয়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও কাউকে বাঁচাতে পারিনি। জুঁই সে কথা বিশ্বাস করেনি। ও ভেবেছিল, আমি বুঝি কারও কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। তাই বলেছিল, তুই আমাকে বললে কি আমি তোকে টাকা দিতাম না? শুনে, আমার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। আমি ওকে যা-তা বলেছিলাম। সেই থেকেই ওর সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি বন্ধ। মাঝে মাঝে এর-তার মুখে খবর পাই, বিভিন্ন লোকের কাছে আমার নামে ও যা-তা বলে। তা হলে তোমাকেও বলেছিল?

— হ্যাঁ, বলেছিল তো। কিন্তু তুমি আমাকে এ সব আগে বলোনি কেন?

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সে! কিছু একটা বলতে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল। দাদাকে বিব্রত হতে দেখে তিনি দিকে তাকিয়ে ঝিনুক বলল, তুমিও পারো বাবা! কবে কোন কুকুর তোমাকে একবার কামড়েছে, সেই জন্য তুমি পৃথিবীর সব কুকুরকেই ভয় করতে শুরু করে দিয়েছ? তুমি জানো, শুধু কুকুর নয়, তুমি যদি বিষাক্ত সাপকেও ভালবাসো, সে ভুল করেও

তোমাকে কখনও ছোবল মারবে না। কারণ, পশুপাখিরা ঠিক বুঝতে পারে, কে তাকে ভালবাসে। বুঝেছ?

মাথা কাত করতে করতে তিনি যখন দেখল, সন্দেশ শেষ করে রঞ্জনা চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়েছে, তখন ও-ও প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে অর্ধেকটায় কামড় বসিয়ে দিল। আর সেটা দেখেই ফিক করে হেসে ফেলল রঞ্জনা। বলল, কী রে, গলা দিয়ে এ বার নামবে তো?

সন্দেশ খেতে খেতেই উপর নীচে মাথা দোলাল তিনি। বোঝাতে চাইল, নামবে। খুব নামবে।





## যদি

— শোনো মৌনাকী, তোমাকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। তবে একটা কথা, আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি কিন্তু সকাল দশটার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারবে না। আর রাত দশটার আগে বাড়িতে ঢুকতে পারবে না...

ছেলের মায়ের কথা শুনে মেয়ের বাড়ির লোকেরা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন। এর আগেও দু'-চার জন তাঁদের মেয়েকে দেখে গেছেন। তবে না, কেউই তেমন পূরনোপন্থী নন যে, 'একটু হাঁটো তো মা, দেখি...' কিংবা 'বলো তো পাঁচফোড়নে কী কী থাকে?'-র মতো প্রশ্ন করবেন।

একজন শুধু বলেছিলেন, আগে কী করেছ জানতে চাই না। যদি কারও সঙ্গে তোমার কিছু থেকে থাকে, ঠিক আছে। তবে আমার বাড়ির বউ হয়ে এলে কিন্তু আর কারও সঙ্গে প্রেমটেম করো না।

আর একজন বলেছিলেন, কোনও মেয়ের সঙ্গে মেশো না তো?

পাত্রের দিদির কথা শুনে সে বারও ওঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিলেন। এ আবার কেমন ধারা কথা! এটা আবার কেউ জিজ্ঞেস করে? হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে পারে, কোনও ছেলের সঙ্গে মেশো কি না। এটা জিজ্ঞেস করলে, তার একটা মানে হয়। কিন্তু মেয়ে দেখতে এসে কেউ যদি কোনও মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, কোনও মেয়ের সঙ্গে মেশো না তো? তার উত্তর কী হবে, সে তো সবারই জানা। তাই সবাই যখন মেয়ের মুখ থেকে 'হ্যাঁ' শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। ঠিক তখনই খুব স্পষ্ট করে মৌনাকী বলল— না।

না! 'না' শুনে মেয়ের বাড়ির লোকেরা অবাক। ও মিথ্যে বলল কেন? ওর তো হাজার একটা মেয়ে বন্ধু। যখন তখন আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। আর সেই গল্পের না আছে কোনও মাথা, না আছে কোনও মুণ্ড। তা হলে ও মিথ্যে বলল কেন?



এই প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি মারতে না মারতেই বাড়ির লোকেদের কানে ভেসে এল তাঁদের বাড়ির মেয়ের কথা— আমি লেসবিয়ান নই।

মৌনাকীর কথা শুনে পাত্রের দিদির মুখ খুশিতে ভরে উঠল। যাক্ বাবা, বাঁচালে। এখন চার দিকে যা ঘটছে, ছেলেরা ছেলেকে, মেয়েরা মেয়েকে প্রেম করছে। বিয়ে করছে। বিয়ের পরে কেউ কেউ সেক্স চেঞ্জ করছে। এটা তাও মন্দের ভাল। কেউ কেউ তো আবার বাই সেক্সচুয়াল। শুনে ভাল লাগল যে, তুমি সে রকম নও।

মৌনাকীর কাকা খুব গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। ছেলের দিদির কথা শুনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন, এরা কোন দুনিয়ার লোক! খবরের কাগজে কোথায় ফলাও করে ছাপা হল, একজন লোক দু'বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করেছে কিংবা কোনও একটি ছেলেকে একটি ছেলে প্রেম করে বিয়ে করেছে। বিয়ের পরে অপারেশন করে নিজে মেয়ে হয়েছে। অথবা কোনও মেয়ে, আর পাঁচটা মেয়ের মতো একটা ছেলেকে বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনের পাশাপাশি একটি মেয়ের সঙ্গেও সমান তালে বজায় রেখেছে গোপন সম্পর্ক— পড়ে অমনি ভাবতে শুরু করে দিল, গোটা পৃথিবীই বুঝি এ রকম হয়ে গেছে। ছিঃ। এরা একবারও নিজেদের দিয়ে বিচার করে না! আরে বাবা, এ রকম ছুটকো-ছুটকা দু'-একটা ঘটনা এক হাজার বছর আগেও ঘটত। পাঁচশো বছর আগেও ঘটত। এখনও ঘটে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। কিন্তু এগুলো হচ্ছে ব্যতিক্রমী ঘটনা। এ রকম ব্যতিক্রমী ঘটনা দিয়ে গোটা পৃথিবীকে বিচার করলে চলবে না।

মেয়ের কাকা আরও অনেক কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন মেয়ের বাবা-মা'ও। সেই ভাবনা থেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, নাঃ। আর যার সঙ্গেই বিয়ে দিই না কেন, অন্তত এই পরিবারের সঙ্গে বিয়ে দেব না।

তাই ওই বাড়ি থেকে একাধিক বার যোগাযোগ করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা সবিনয় জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মেয়ের বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে গেছে।

তার পরেও সম্বন্ধ এসেছে। মেয়েকে দেখে গেছে। কিন্তু ভবানীপুর থেকে আজ যে পরিবারটি তাঁদের মেয়েকে দেখতে এসেছেন, এঁদের কথাবার্তা তো একেবারেই অন্য রকম। কারও সঙ্গেই মিলছে না। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর এত বছরের জীবনে তিনি কখনও কোনও হবু শাশুড়িকে এ ধরনের কথা বলতে শুনেছেন বলেও তাঁর মনে হল না।

যে খবরের কাগজে ওঁরা ‘পাত্র চাই’-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সর্বাধিক বিক্রিত সেই বাংলা দৈনিক পত্রিকাতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে কাজ করেন পাত্রের মা। বাবা হাইকোর্টের আইনজীবী। তাঁদের এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে ডাক্তার। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। সেই ছেলের বিয়ের জন্যই ফোন করেছিলেন তাঁর মা। প্রথমেই বলেছিলেন, আপনারা তো বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, মেয়ে দেখতে-শুনতে ভাল। তার মানে কি সুন্দরী নয়?

মেয়ের বাবা বলেছিলেন, সুন্দরী হলে তো সুন্দরীই লিখতাম। যেটা সত্যি, সেটাই লিখেছি। মিথ্যে বলব না, সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, আমার মেয়ে মোটেই সে রকম দেখতে নয়। তবে দেখতে-শুনতে খারাপও নয়।

— লিখেছেন, গায়ের রং চাপা। তা, চাপা মানে কী রকম? কালো?

— না। ঠিক কালো নয়। তবে ফরসাও নয়। শ্যামবর্ণ বলতে পারেন।

— শ্যামবর্ণ না উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ?

— দেখুন, কোনটা শ্যামবর্ণ আর কোনটা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সেটা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তাই আমি কোনও বিতর্কে জড়াতে চাই না।

— তা হলে ‘শ্যামবর্ণ’ না লিখে ‘চাপা’ লিখেছেন কেন?

— কারণ, ছাপার অক্ষরে দেখে আর ফোনে বিবরণ শুনেই তো ছেলের বাড়ির লোকেরা আমার মেয়েকে তাঁদের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবেন না। তাঁরা অন্তত দু’-চার বার আসবেন। মেয়েকে দেখবেন। কথা বলবেন। যাচাই করবেন। কথাতেই তো আছে, লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। তখনই তো তাঁরা সব দেখতে পারবেন। জানতে পারবেন। তাই মেয়ের বাবা হিসেবে মেয়ের সম্পর্কে আমি একটু কম কমই লিখেছি।

— এটা আপনার ভুল ধারণা।

— ভুল ধারণা! কোনটা!

— এই যে, ছেলের বাড়ির লোকেরা অন্তত দু’-চার বার আসবে। মেয়েকে দেখবে। কথা বলবে। যাচাই করবে...

— করবে না?

— না। অন্তত আমরা করব না। আমরা একবারই যাব। দেখব। আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। মেয়ের সঙ্গে কথা বলব। উভয়ের উভয়কে পছন্দ হলে ওখানেই পাকা কথা দিয়ে আসব।

— তাই?

— হ্যাঁ। আপনাদের কবে সময় হবে বলুন।

— সামনের রোববার?

ছেলের মা বলেছিলেন, না। রবিবার হবে না। ওই দিন আমার অফিস আছে।

— রোববারও অফিস?

— হ্যাঁ। আমার বুধবার অফ ডে।

মেয়ের বাবা বলেছিলেন, তা হলে ওই দিন সন্ধ্যার পরে যদি আসতে পারেন...

— ঠিক আছে, তাই হবে।

কথা হয়েছিল বৃহস্পতিবার। তার পর আর কোনও কথা হয়নি। তাই মেয়ের বাবা ভেবেছিলেন, বুধবার সকালে একটা ফোন করে ছেলের মাকে মনে করিয়ে দেবেন। কিন্তু না। তার আর দরকার হয়নি। তার আগের দিনই, অর্থাৎ গত কাল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ফোন করে উনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, আজ আসছেন।

সেই কথা মতোই তিনি এসেছেন। সঙ্গে ছেলে এবং মেয়ে। তবে ছেলের বাবা আসেননি।

মৌনাকীর বাবা জানতে চাইলেন, আপনার হাজব্যান্ড আসেননি?

ছেলের মা বললেন, না। আসলে একটা জরুরি কেস এসে গেছে। ও আজ সকালে একটু দিল্লি গেছে।

— ও। কবে আসবেন?

— কাল।

— কালই?

— হ্যাঁ। আজ গিয়ে কেসটা একটু দেখে নেবো। কাল কোর্টে উঠবো। বিকেলের ফ্লাইট ধরে সন্দের মধ্যে চলে আসবো।

— ও। তা হলে উনি এখানে কবে আসবেন?

— কেন? আমি দেখে গেলে হবে না?

— কেন হবে না? তা নয়। আসলে ছেলের বাবা না দেখলে...

— ও না দেখলেও চলবে। যার দেখার দরকার তাকে নিয়ে এসেছি, এই যে আমার ছেলে। বিয়ে হলে ও ছাড়া আর যে দু'জনের সঙ্গে আপনার

মেয়েকে থাকতে হবে, সেই দু'জনও এসেছি। এই যে আমার মেয়ে আর আমি। কই? আপনার মেয়ে কোথায়? ডাকুন।

মেয়ের মা ট্রে থেকে শরবতের গ্লাস নামাতে নামাতে বললেন, ও রেডি হচ্ছে।

ছেলের মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথাও বেরোবে নাকি?

— না তো।

— তা হলে বললেন যে রেডি হচ্ছে...

— না। মানে... বিয়ের ব্যাপার তো... প্রথম দিন ছেলের বাড়ির লোকের সামনে একটু ঠিকঠাক ভাবে না এলে...

ছেলে আর মেয়ের দিকে তাকালেন ছেলের মা। তার পর বললেন, ও।

তার পর এ কথা ও কথা নানা কথা শুরু হল। পোস্ট অফিসে সামান্য টাকা মাইনে পেয়ে মেয়েকে কী ভাবে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে বড় করেছেন। এম.এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলিয়াজ ফ্রঁসেজ থেকে ফরাসি ভাষা শিখিয়েছেন। মেয়ের বিয়ের জন্য একটু একটু করে টাকাপয়সা জমিয়েছেন। একটু সোনাদানাও করেছেন।

সোনার কথা উঠতেই ছেলের মা বললেন, যথার্থ শিক্ষা দিয়ে মেয়েকেই যদি সোনা করে তোলা যায়, তা হলে মেয়ের বিয়ের জন্য আর সোনা লাগে না।

দুই বাড়ির লোকজনদের মধ্যে যখন কথা হচ্ছে, পরদা সরিয়ে ভেতরঘর থেকে খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘরে ঢুকল মৌনাকী।

মেয়েকে দেখে মৌনাকীর মায়ের চোখ একেবারে চড়কগাছ। এ কী করেছে সে! মহা বেয়াদপ তো। পইপই করে বললাম। বলল তুমি যাও, আমি ঠিক মেখে নেব। অথচ একটা কিছু মাখেনি! পাউডার তো নয়ই। সামান্য লিপস্টিকটুকুও ছোঁয়ায়নি। এ মেয়েকে কেউ পছন্দ করবে! আমার কী! নিজের ভাল নিজে না বুঝলে আমি কী করব! অত দাম দিয়ে সাজার পুরো সেটটা নিয়ে এলাম। সেটা মাখলই না! কী মেয়ে রে বাবা। আমার কোনও কথা শুনলে তো!

মেয়েকে ঢুকতে দেখে মেয়ের বাবা বলে উঠলেন, আয় মা, আয়।

ছেলে মৌনাকীর মুখের দিকে তাকাল। ছেলের বোন তাকাল মৌনাকীর হাতের দিকে আর ছেলের মা তাকালেন মৌনাকীর পায়ের দিকে। তার পর তিন জন তাকাল তিন জনের দিকে। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।

ওদের চোখাচোখি করতে দেখে মেয়ের মা কী বুঝলেন কে জানে, বলতে শুরু করলেন, আসলে আপনারা যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবেন, ও তো বুঝতে পারেনি, তার উপর আপনারা বেশিক্ষণ বসতে পারবেন না দেখে, ও শুধু শাড়িটা পাল্টেই চলে এসেছে। সাজলে-গুজলে ওকে কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দরই লাগে।

ছেলের মা বললেন, আমরা তো দেখতে সুন্দর চাই না। দেখতে সুন্দর হলে অনেক সমস্যা আছে। পাড়ার কোন ছেলে বউয়ের দিকে তাকাল, বাসে উঠলে কোন লোক বউয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, দু'দিনের জন্য অফিসের কাজে কোথাও গেলেও নিশ্চিত মনে কোনও কাজ করতে পারবে না। আমার ছেলে সারাক্ষণই টেনশনে থাকবে, বউকে কেউ ফোন করছে না তো... তার চেয়ে একটু কম সুন্দর হওয়া ভাল। অবশ্য সুন্দর বলতে আপনারা কী বোঝেন আমি জানি না। তবে সুন্দর বলতে আমি বুঝি শরীরের উপরকার নয়, ভিতরকার সৌন্দর্যটাকে।

— ভিতরের?

— হ্যাঁ, ভিতরের। ওটাই মানুষের আসল সৌন্দর্য। উপরের যে সৌন্দর্য, সেটা তো বিয়ের পরে সামান্য একটা রোগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাথার সমস্ত চুল উঠে যেতে পারে। সারা গায়ে কালশিটে পড়ে যেতে পারে। কোনও দুর্ঘটনায় পুরো মুখটাই বীভৎস কুৎসিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মনের সৌন্দর্য কেউ নষ্ট করতে পারে না। আমাদের দরকার সেই সৌন্দর্য। ওটা থাকলেই আমাদের চলবে। আর কিছু লাগবে না। এ মেয়ে আমার ছেলের পছন্দ হয়েছে। আমার মেয়েরও পছন্দ হয়েছে। আর ওদের পছন্দ মানে আমারও পছন্দ। তবে একটা কথা। এই যে, এ দিকে তাকাও, শোনো মৌনাকী, তোমাকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। তবে একটা কথা, আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি কিন্তু সকাল দশটার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারবে না। আর রাত দশটার আগে বাড়িতে ঢুকতে পারবে না...

মৌনাকী এতক্ষণ ছেলের মায়ের কথা শুনছিল। এই প্রথম মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে খুব আশ্চর্য করে বলল, কেন?

— কারণ, বিয়ে হয়ে আসার পর থেকে সকাল দশটার আগে আমি কখনও ঘুম থেকে উঠিনি। আজও উঠি না। আর রাত দশটার আগে কোনও দিনই বাড়ি ফিরি না।

— সে নয় ঠিক আছে। বেলা দশটার আগে ঘুম থেকে উঠব না। কিন্তু রাত দশটা অবধি রোজ রোজ আমি কোথায় কাটাব?

— কেন, তোমার বন্ধুবান্ধব নেই? এই বাড়ি নেই? কফি হাউস নেই? সাউথ সিটি নেই? আড্ডা নেই?

— কিন্তু রোজ রোজ ওগুলো করতে গেলে যে অনেক খরচ...

— তাতে তোমার কী? তোমার বর আছে না? ও কি কম রোজগার করে নাকি?

কোনও ছেলের মা যে এ রকম কথা বলতে পারেন, তা ঠাঁ কল্পনাও করতে পারেননি। তাই মৌনাকীর মা অবাক হয়ে বললেন, দুপুর দশটায় ঘুম থেকে উঠলে রান্নাবান্না করবে কখন?

ছেলের মা আকাশ থেকে পড়লেন। রান্নাবান্না? ও হোঃ, আমি তো বলতেই ভুলে গেছি। আর একটা কথা, মৌনাকী, তুমি কিন্তু ভুল করেও কখনও রান্নাঘরে ঢুকবে না...

মৌনাকী ফের প্রশ্ন করল, কেন?

— কারণ, তুমি যদি রান্নাঘরে ঢোকো, তা হলে আমি যা কখনও কোনও দিন করিনি, সেটাই আমাকে করতে হবে।

মেয়ের মা বিস্মিত হয়ে জিঙেস করলেন, মানে?

— মানে, বিয়ের পর থেকে সকাল দশটার আগে আমি যেমন কখনও ঘুম থেকে উঠিনি, অফ ডে থাকলেও রাত দশটার আগে যেমন কোনও দিন বাড়ি ঢুকিনি— তেমনই লোক না এলে মাঝে মাঝে এক-আধবার চা-টা করেছি ঠিকই, কিন্তু রান্না বলতে যা বোঝায়, সেটা আমি কখনও কোনও দিন করিনি।

— তা হলে রান্না করে কে?

— রান্নার লোক আছে তো।

— সে যদি কোনও কারণে না আসে?

— সেন্টার থেকে ফোন করে লোক আনিয়ে নিই।

— সেন্টার? সেটা আবার কী?

— বিভিন্ন সেন্টার হয়েছে না? তারা তো নার্স সাপ্লাই দেয়। কাজের লোক সাপ্লাই দেয়। রান্নার লোকও দেয়।

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ।



— ঝড় বৃষ্টি বা কোনও বড় রকমের দুর্ঘটনার জন্য যদি সেন্টারেও কোনও লোক না আসে, তখন?

— ছেলের বাবা আছে না? ও খুব ভাল রান্না করে।

— ছেলের বাবা রান্না করে!

— হ্যাঁ। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল রাঁধুনি তো ছেলেরাই।

— ও, আচ্ছা। আচ্ছা, ছেলের বাবা এ বার যেমন দু'দিনের জন্য দিল্লি গেলেন, সে রকম হলে?

ছেলের মা গদগদ হয়ে বললেন, তখন হোম ডেলিভারি। একটা ফোন করলেই হল।

— অন্তত সেই সময়টা তো ও রান্না করতে পারে।

মৌনাকীর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলের মা বললেন, না। একদম না। আমি চাই না, এই বয়সে এসে আমার স্বামী আমাকে কোনও কথা শোনাক। বলুক, তুমিও বউ, আর এও বউ। দেখেছ, কী সুন্দর রান্না করে। রাত দশটার আগেই কেমন বাড়ি ঢুকে যায়। সকাল দশটার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। না। একদম না। এই বয়সে এসে আমি কোনও কথা শুনতে পারব না। আমি যা বললাম, এই শর্তে যদি রাজি থাকেন, তা হলে বলুন, আমি পাকা কথা দিয়ে যাচ্ছি।

— কিন্তু... আপনাদের কী কী দাবি? মানে, বিয়েতে আমাদের কী কী দানসামগ্রী দিতে হবে, সেটা যদি আগে থেকে একটু বলেন...

এ বার আর মা নয়, মুখ খুলল ছেলে। বলল, খাট, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, সবচেয়ে নামী কোম্পানির বাহান্ন ইঞ্চি টিভি, লেটেস্ট ল্যাপটপ, অন্তত একশো ভরি সোনা, কিছু ফিক্সড ডিপোজিট, একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট...

ছেলের কথা শুনে মেয়ের মায়ের চোখ ছানাবড়া, মেয়ের বাবার মাথা ঘুরতে লাগল।

মেয়ে সরাসরি তাকাল ছেলের মুখের দিকে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ছেলে বলল— এগুলো সবই আমাদের আছে। কিছু লাগবে না। আমরা শুধু মেয়েটিকেই চাই।

ছেলের কথা শুনে শুধু মেয়ে নয়, মেয়ের বাড়ির অন্য লোকেরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হো হো করে হেসে উঠলেন।



## বালক

পাঁচটা বেজে গেছে। পুরো ডিপার্টমেন্ট ফাঁকা। যে দু’-চার জন তখনও আছে, তারাও যাই যাই করছে। এমন সময় প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল সুচিত্রা। বালকের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এই, আমার মোবাইল দুটো পাচ্ছি না। দাও।

বালক প্রফ দেখছিল। সতেরো বছর এখানে কাজ করছে। এখনও ক্যাজুয়াল। যা মাইনে পায় মাসের দশ দিনও চলে না। বাবা ছিলেন লেখক। সেই সুবাদে কলেজ স্ট্রিটের অনেক প্রকাশকের সঙ্গে ওর জানাশোনা আছে। বাবার কাছেই প্রফ দেখা শিখেছিল ও। এখন সংসার চালানোর জন্য বিভিন্ন প্রকাশনার প্রফ দেখে বেড়ায়। প্রফ মানে লেখকেরা যা লেখেন, সেটা কম্পোজ করার সময় প্রচুর ভুল থেকে যায়। সেটা সংশোধন করাটাকেই বলা হয় প্রফ দেখা। প্রফ রিডাররা শুধু বানানই ঠিক করে না, প্রয়োজনে বাক্যও বদলে দেয়। যারা বই পড়ে, তারা বুঝতেই পারে না, পাণ্ডুলিপি থেকে বই হয়ে বেরোনোর মাঝখানে কত কী বদলে যায়। সত্যি কথা বলতে কী, ভাল প্রফ রিডার তো দূরের কথা, গল্প শব্দ জ্ঞান আছে এমন প্রফ রিডার পাওয়াও এখন বড় দুষ্কর। পেলেও, তাঁরা যা কেটেকুটে ঠিক করে দেন, সেগুলি ধরে ধরে সব ক’টা সংশোধন করার মতো ধৈর্যও যেন কারও নেই। কেউ করলেও, কী করে যেন একটা-দুটো ভুল ঠিকই থেকে যায়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে নাকি এমন একটাও বই বেরোয়নি, যেখানে কোনও ভুল নেই। এমনকী, যেটা দেখে মানুষ বানান নিশ্চিত করে, খুঁজলে সেই ডিকশনারিতেও দু’-চারটে ভুল ঠিকই ধরা পড়ে যাবে। তাই বইয়ের জগতে একটা কথা চালু আছে, রাত্রিবেলায় ভূতেরা এসে ভুল করে দিয়ে যায়।

প্রফ দেখার জন্য পর্যাপ্ত আলো চাই। ওদের বাপ-ঠাকুরদার আমলের শরিকি বাড়ি। ও যে ঘরে থাকে, সে ঘরে একটা মাত্র জানালা। বাবা-মারা



যাওয়ার আগেই সেই জানালা ঘেঁষে বিশাল একটা বাড়ি উঠেছে। হাওয়া বাতাস তো নয়ই, আলোও ঢোকে না। আর আলো জ্বালিয়ে প্রফ দেখতে গেলে কস্টিংয়ে পোষাবে না। তাই অফিসে যখন কাজের চাপ কম থাকে, কিংবা ছুটির পরে ঘণ্টাখানেক থেকে ও অফিসে বসেই প্রফটা দেখে নেয়।

ও মন দিয়ে প্রফ দেখছিল। হঠাৎ সুচিত্রা এসে ও রকম কথা বলায় একটু বিরজ্জই হল সে। প্রফ থেকে মুখ তুলে বলল, দাও মানে? তুমি কি আমার কাছে রেখে গেছ নাকি?

— দ্যাখো না, দ্যাখো না কোথায় আছে। একটু খোঁজো না... বলেই, ওর ঠিক তিনটে টেবিলের পর ওর নিজের টেবিলে গিয়ে, ডাঁই করে রাখা ফাইলগুলোর ফাঁকেটাকে, এ-পাশ ও-পাশের ড্রয়ার খুলে বারবার দেখতে লাগল আর বিড়বিড় করতে লাগল, একটু আগেই একটা ফোন এসেছিল। আমি কথা বলেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, টেবিলের উপরেই রেখেছিলাম। নিশ্চয়ই কেউ নিয়েছে। বালক, একটু খোঁজো খোঁজো, তুমি খুঁজলেই পাবে।

বাবা-মারা যাওয়ার পর ওর বাবারই এক বন্ধুর বদান্যতায় ও যখন প্রথম এই অফিসে ঢোকে, তখন ও বালকই। গোঁফটাও ভাল করে ওঠেনি। বাবার নাম ছিল শুদ্ধোধন। তিনি তাঁর জগৎটাকে নিজের মতো করে সাজাতে চেয়েছিলেন। তাই বিয়ের জন্য যখন পাত্রী দেখা হচ্ছিল, উনি বলেছিলেন, দেখতে যেমনই হোক, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তার নাম যেন মায়া হয়। তাইই হয়েছিল। শুদ্ধোধন আর মায়ার ছেলে তো বুদ্ধদেবই হবে, নাকি? ওই বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। আর এই বুদ্ধদেব অতটা না-হোক, অন্তত কিছুটা তো করবে। কিন্তু না। সব সময় সব অঙ্ক মেলে না।

সেই বুদ্ধদেব যখন এই অফিসে ঢোকে, তখন তার কতই বা বয়স! তাই কে যেন তাকে প্রথম বালক বলে ডেকেছিল। কে যে ডেকেছিল, এখন আর কারওই মনে নেই। তবু সেই নামটাই, সবার মুখে মুখে এখন তার একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসল নামটা আছে শুধু সেই করার খাতায়।

— কী হল একটু দ্যাখো না, দুটো মোবাইলই একসঙ্গে ছিল!

বালক বুঝতে পারল, মুখে ওকে খুঁজতে বলছে ঠিকই, আসলে ও মনে মনে ভাবছে, মোবাইল দুটো বালকই সরিয়েছে। আসলে একই কাজ করেও অফিসিয়াল পে রোলে না থাকার জন্য সবার থেকে কম মাইনে পায় বলেই সহকর্মীরাও তাকে আর মানুষ বলে ভাবে না। তার ওপরে যদি রবীন্দ্রনাথের

সেই কবিতার বর্ণনা অনুযায়ী ‘ভূতের মতো চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর’-এর মতো আনইমপ্রেসিভ দেখতে হয়, তা হলে তো আর কথাই নেই। শুধু তার ডিপার্টমেন্ট কেন, অন্য কোনও ডিপার্টমেন্টে কিছু হারালেও সবাই তাকেই সন্দেহ করবে। করেও তাই। যেন সুন্দর দেখতে লোকেরা কখনও চুরি করতে পারে না। আর তা ছাড়া সবাই ভাবে, কম রোজগার হলেই বুঝি লোকে চুরি করে। অফিসের কে নাকি একবার বলে ওছিল, এত কম মাইনে পেয়ে ও চালায় কী করে! নিশ্চয়ই এই ভাবে এখান-ওখান থেকে ঝাড়ে।

তাই এই ডিপার্টমেন্টে যখনই কিছু হারায়, সবাই ওর দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায়। তাদের চাহনিই বলে দেয়, তাদের মনের কথা। যে মেয়েটি মাঝে মাঝেই ওদের অফিসে জ্যাম জেলি আচার কাসুন্দি বিক্রি করতে আসে, তাকে টাকা দিতে গিয়ে একবার নাকি সুচিত্রা দেখে, সাতটা একশো টাকার নোটের জায়গায় মাত্র পাঁচটা পড়ে আছে। দুশো টাকা কে নিল? বলেই, সোজাসুজি তাকিয়েছিল বালকের দিকে। বালক তখন কাজে মগ্ন। কথাটা ভাল করে শোনেওনি। তাই আরও খেপে গিয়েছিল ও। সোজা বড়বাবুর কাছে গিয়ে কমপ্লেন করেছিল, বালক আমার ব্যাগ থেকে দুশো টাকা চুরি করেছে।

— বালক!

— হ্যাঁ, আমার কাছে লোক এসেছিল, তাই একটু নীচে গিয়েছিলাম। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি, ও আমার টেবিলের সামনে কী যেন করছে। আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। আমাদের ঘর থেকে মাঝে মাঝেই এর-তার টাকা পয়সা, এটা-ওটা সেটা চুরি হয়। আমাকে ও দেখতে পায়নি। আমি ঝট করে দরজার আড়ালে সরে গেলাম। দেখলাম, ও আমার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে, তার মধ্য থেকে মানিব্যাগ বার করে সেখান থেকে দুটো একশো টাকার নোট নিয়েই আবার সব গুছিয়ে, যে রকম ছিল, সে ভাবে রেখে নিজের টেবিলে চলে গেল।

— আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

— হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি। বিশ্বাস না হলে অন্য কলিগদেরও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, ও কেমন।

— তা, আপনি যখন দেখলেন, হাতেনাতে ধরলেন না কেন?

— আরে ধরব কী, ওর কাণ্ড দেখে আমার তখন হাত-পা কাঁপছে।

— কাউকে ডাকতে পারতেন তো...

— ভয়ে তখন গলা থেকে আমার কোনও আওয়াজই বেরোচ্ছিল না।  
কী অবস্থা!

— এর আগেও কি এ রকম হয়েছে নাকি?

— হয়েছে মানে? প্রায়ই হয়। জিঙেস করে দেখুন।

— তা, এ রকম যখন হয়, তখন মানি ব্যাগটা সঙ্গে রাখেন না কেন?

বড়বাবুর কথা শুনে একটু বিরক্তই হয়েছিল সুচিত্রা। বলেছিল, চোরের ভয়ে কি সব সময় আমাকে মানি ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে নাকি? প্রচণ্ড খেপে গিয়েছিল সে।

সুচিত্রা অল্পতেই রেগে যায়। ওর বাবা-মা দু'জনেই এক সময় বাংলা সিনেমায় সাইড রোলে অভিনয় করত। সুচিত্রা সেন তখন মধ্যগগনে। তাদের মেয়েও একদিন ওর মতো নায়িকা হবে, এমন আশা করেই তার নাম রেখেছিল সুচিত্রা। সে সিনেমার নায়িকা হয়নি ঠিকই, কিন্তু অভিনয়টা ভালই জানে। যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল, বাচ্চা হওয়ার পরেই, নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে আর স্বামীর ঘরে নয়, সোজা গিয়ে উঠেছিল বয়ফ্রেন্ডের বাড়িতে। সেই বাচ্চা এ বার মাধ্যমিক দিচ্ছে। এখন তার ক'টা বয়ফ্রেন্ড ও নিজেও জানে না। নিন্দুকেরা বলে, ও নাকি ইচ্ছে করেই এখানে-সেখানে মোবাইল ফেলে রাখে, যাতে হারায়। একটা হারালেই নাকি পরদিনই দুটো পেয়ে যায়। কারা যে দেয়!

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে, ওর শরীরটা যখন বেশ ডাগরডোগর ছিল, মা হয়েছে, দু'বছরও হয়নি— তখন ওদের অফিসে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে এসেছিলেন অপূর্ব ঘোষা। তখন তাঁর বয়স আটাল্ল-উনষাট। ও রকম একটি বয়স্ক লোকের সঙ্গে কী করে যে ঝুলে পড়েছিল সুচিত্রা!

লোকচক্ষুর মাথা খেয়ে একসঙ্গে চারটে ইনক্রিমেন্ট দিয়েও তিনি যখন ওকে ওই ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারছিলেন না, অথচ আর কয়েক মাস পরেই তাঁর অবসর, তখন স্পেশাল রেকমেন্ডেশন করে তাকে এ গ্রেড অফিসারদের জন্য নির্ধারিত ঝাঁ-চকচকে একটি অফিস কোয়ার্টার পাইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আজও অনেকে সে নিয়ে কানাকানি করে। কেউ কেউ বলে, কীসের জন্য কাকে ধরতে হবে, ওর চেয়ে ভাল কেউ বোঝে না।

হয়তো বোঝে! দু'সপ্তাহও হয়নি বেঙ্গালুরুর অফিস থেকে ট্রান্সফার হয়ে

এই অফিসে জয়েন করেছে রণেন। সুচিত্রার একটু আগেই সে বেরিয়েছিল।  
খানিক বাদে ঢুকল সে। — কী? পেলে?

সুচিত্রা বলল, পেলে কি আর খুঁজতাম! অফিসটা যা হয়েছে না...  
একেবারে চোরের বাসা। একটু অন্যমনস্ক হলেই হল।

বালকের দিকে তাকিয়ে রণেন বলল, ওকে জিজ্ঞেস করেছে?

— ও এখন শুনবে না। কানে তুলো দিয়ে বসে আছে।

এতক্ষণ একটানা ফোনে কথা বলে যাচ্ছিল দিয়োত্তমা। বছর পঁয়ত্রিশ  
ছত্রিশ বয়স। দেখতে-শুনতে ভাল। প্রথম বিয়েটা ভেঙে গেছে। দ্বিতীয়  
বিয়েটাও ভাঙার মুখে। বড় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে একাই থাকে। যতক্ষণ না  
বয়ফ্রেন্ড আসে ও নামে না। হেলতে দুলতে এসে ও বলল, কী হয়েছে রে?

ঘাড় ঘুরিয়ে সুচিত্রা বলল, আর বলিস না, দুটো মোবাইলই বুঝি গেল...

— সে কী রে? দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ।

— কোথায় আর দেখব? এখানেই তো রেখেছিলাম। ওটার তো আর  
হাত-পা গজায়নি। নিশ্চয়ই কেউ নিয়েছে।

— নম্বরটা বল তো, ডায়াল করে দেখি।

সুচিত্রা নম্বরটা বলতেই, টপাটপ মোবাইলের বোতাম টিপল দিয়োত্তমা।  
আর ততক্ষণাৎ সুচিত্রার কাঁধের ব্যাগের ভেতর থেকে ভেসে এল রিং  
টোন— পাগলু খোরা সা কর লে রোম্যান্স...

— ওই তো তোর ব্যাগে বাজছে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগের এ-চেন ও-চেন সে-চেন খুলে হাতড়ে হাতড়ে সুচিত্রা  
দেখে, ব্যাগের একদম কোনায় জড়াজড়ি করে পড়ে আছে তার মোবাইল  
দুটো। ও দুটো হাতে নিয়েই সুচিত্রা গজগজ করতে লাগল, ব্যাগটা না পাল্টালে  
আর হচ্ছে না। একটা খোপের কাপড় অনেকটা ছিঁড়ে গেছে তো... সেটা দিয়ে  
মোবাইল দুটো গলে গিয়েছিল...

রণেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, ফালতু ফালতু কতটা সময় নষ্ট হল  
বলো তো, চলো, তোমাকে আজকেই একটা ব্যাগ কিনে দিই।

— না মশাই, লাগবে না। ব্যাগের দোকান থেকে একটু সেলাই করিয়ে  
নিলেই এখন অনেক দিন চলবে।

— কিন্তু আমার মন যে দিতে চাইছে...

— সে দেখা যাবেখ'ন। এখন তো চলো।

ওরা চলে গিয়েছিল। চলে গিয়েছিল ডিপার্টমেন্টের বাকিরাও। বালক ভেবেছিল, আজকেই প্রফটা শেষ করে কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছে দেবে। কিন্তু ও আর কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারল না। মনের ভিতরে শুধু খচখচ করছে একটাই প্রশ্ন, ওরা আমাকে চোর ভাবে! চোর! ছিঃ! কখন যে চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়ে প্রফের কাগজ ভিজিয়ে দিয়েছে, ও খেয়াল করেনি।

যে দিন ওর প্রথম মনে হয়েছিল, অফিসের সবাই ওকে সন্দেহ করছে। সে দিন কী এক যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল ও। ঠিক করেছিল, এই অপমানের জীবন সে আর রাখবে না। ক’দিন আগেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল প্রমোদদা। ওদের অফিসেরই একজন। খুব ভাল কবিতা লিখত সে। বিভিন্ন কাগজে ছাপাও হত সে সব। ও ঠিক করল, ও-ও ও ভাবে আত্মহত্যা করবে।

লোকে অভাবে পড়ে যত না চুরি করে, স্বভাবে পড়ে তার চেয়ে বেশি করে। ফলে আসলে যে চুরি করছে, ওর মৃত্যুর পরেও সে নিশ্চয়ই আবারও চুরি করবে। আর তখনই সবাই বুঝতে পারবে, ও চুরি করত না। ওরা ওকে ভুল বুঝেছিল। তখন হয়তো সে থাকবে না ঠিকই, কিন্তু অন্যরা তো থাকবে। তারা নিজেদের মধ্যে ঠিকই বলাবলি করবে।

সে দিন রাতে যখন সব ব্যবস্থা পাকা। কী ভাবে ফাঁস লাগাবে, তাও ছকে নিয়েছে, ঠিক তখনই ওর মনে হল, বিকাশদার কাছ থেকে কিছু দিন আগে ও যে তিনশো টাকা ধার নিয়েছে, সেটা শোধ না করে ও এ কাজ করে কী করে! ওর ধারণা, ধার করে মারা গেলে, পরজন্মে কুকুর-বেড়াল হয়ে এসে সেটা শোধ করতে হয়। তা ছাড়া শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের যে ঢাউস বইটার প্রফ ও নিয়ে এসেছে, সেটার তো মাত্র কয়েকটা পাতা দেখা হয়েছে, সোমনাথ গত কালও ফোন করে তাড়া দিয়েছে। যে দায়িত্ব ও নিয়েছে, সেটা অসমাপ্ত রেখে ওর চলে যাওয়া কি ঠিক! তা ছাড়াও ছেলেটা এখন টুয়েলভে পড়ছে। সামনেই পরীক্ষা। এ সময় ও যদি এ রকম একটা হঠকারী কাণ্ড ঘটায়, সে কি পরীক্ষায় বসতে পারবে? অত মনের জোর কি তার আছে? যদি থাকেও, সে কি ঠিক মতো পরীক্ষা দিতে পারবে! যদি টায়েটুয়েও পাশ করে, তার পরের পড়াশোনাটা ও চালাবে কী করে! কিছুই যে সঞ্চিত নেই! তা হলে ওর দশা যে তার চেয়েও খারাপ হবে! না। এটা সে হতে দিতে পারে না। কিছুতেই না। এ সব ভাবতে ভাবতেই সকাল হয়ে গিয়েছিল। সে

দিন আর আত্মহত্যা করা হয়নি তার। আর সেটা করা হয়নি বলেই ও আজও সকাল দেখে, বিকেল দেখে, রাত দেখে।

আশপাশের কাউকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখলেই বলে, মানিব্যাগ রেখে যাচ্ছ না তো?

কয়েক দিন পর পর ওকে এ কথা বলতে শুনে ও দিকের টেবিলের অঙ্গনদা ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিল, তোমার কি ক্লেপটোম্যানিয়া আছে নাকি?

বালক এর আগে এ রকম কোনও বিদঘুটে শব্দ শোনেনি। তাই বলল, সেটা আবার কী?

সে বলেছিল, এটা এক ধরনের রোগ। এটা থাকলে হাত নিশপিশ করে। অষ্টমঙ্গলার গিট খুলতে গিয়েও স্বশুরবাড়ি থেকে এটা-ওটা-সেটা চুরি করে বসে। এমনকী, সামান্য দেশলাই বাক্সও ছাড়ে না। কী নিচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, নিচ্ছে, এটাই বড় কথা। বহু কোটিপতিরও এই রোগ আছে। জানো? ফ্রান্সের এক রাজারও এই রোগ ছিল। সবাই সেটা জানত। তাই তিনি যেখানেই যেতেন, তাঁর পিছু পিছু কয়েক জন যেত। তিনি অবলীলায় একটার পর একটা চুরি করতেন আর ওই লোকগুলি তার দাম মেটাতে মেটাতে যেত। এটা বড় ভয়ানক রোগ...

— সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুমি হঠাৎ এ কথা আমাকে বলছ কেন?

— না, তোমাকে তো ক'দিন ধরে দেখছি, কেউ চেয়ার ছেড়ে উঠলেই তুমি তাকে জিজ্ঞেস করছ, মানিব্যাগ রেখে যাচ্ছ না তো, তাই।

— বলছি, কারণ অনেকেই আছে, যারা পকেটমারের ভয়ে পকেটে মানিব্যাগ রাখে না। অফিসে আসার সময় কেবল ভাড়টুকু পকেটে নিয়ে ব্যাগটা রেখে দেয় কাঁধের ঝোলায় বা হাতব্যাগে। অফিসে ঢুকেও সেটা বার করতে ভুলে যায়। আর আপনি তো জানেন, আমাদের এখানে মানিব্যাগ রেখে একটু চোখের আড়ালে যাওয়া মানেই...

— সে ঠিক আছে। তাও বলি, তুমি যদি ক্লেপটোম্যানিয়াক হয়েও থাকো, নিজেকে সংযত করার এটা কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্ট।

ওর কথা শুনে একদম থ' হয়ে গিয়েছিল বালক।

ওদের ডিপার্টমেন্টে বেশ কিছু দিন ধরে মাঝে মাঝেই চুরি হচ্ছে। এর ওর তার। বিশেষ করে সুচিত্রা আর দিয়োগ্তমার। সুচিত্রা ভীষণ কেয়ারলেস।



কোথায় কখন কী রাখে, নিজেই জানে না। কত বার যে ক্যান্টিনে মানিবাগ ফেলে চলে এসেছে, ওর মনে নেই। রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় কোনও বারই খুঁজে পায় না এল আই সি-র প্রিমিয়ামের রিসিট। বাড়ি থেকে চশমা আনতে ভুলে যায়। অফিসের লাগোয়া সমবায়িকা থেকে জিনিস কিনে আনলেও, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা মনে থাকে না। কত দিন ভুল বাসে উঠে কোথায় গিয়ে নেমেছে, অফিসেই আসতে পারেনি।

আর দিয়োন্তমা তো সারাক্ষণ মোবাইল কানে দিয়ে বসে থাকে। কথা বলতে বলতে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পায়চারি করে। করিডরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে দেখতে কী যে এত বকবক করে, কেউ বুঝতে পারে না।

ইদানীং চুরিটা খুব বেড়েছে। কে নাকি কবে পুরনো খালি একটা নসিয়ার ডিবে রেখে গিয়েছিল। ড্রয়ারের চাবি হারিয়ে গেছে। ফলে তালা দিতে পারেনি। পর দিন এসে দেখে ড্রয়ার ওলটপালট। কৌটোটাও হাওয়া। সেটা শুনে একজন বলেছিল, কৌটো কী রে? মাথার ক'টা চুল ছিঁড়ে একটা কাগজে মুড়ে রেখে যা, পরদিন এসে দেখবি উধাও।

যে যা বলে, সবাই যেন ওকে লক্ষ করেই বলে। বালক অত্যন্ত কম মাইনে পায়। সংসারের খরচ চালিয়ে এক কাপ চা কিনে খাওয়ার মতোও সব সময় পরস্যা থাকে না তার। কেউ খাওয়ালে খায়। কলেজ স্ট্রিটে যাতায়াত আছে দেখে ছেলের স্কুলের বই এনে দিতে বলে কেউ। কেউ এনে দিতে বলে দিস্তা খাতা। ও এনে দেয়। ওদের অফিসে কোনও বেয়ারা-টেয়ারা নেই। সবটাই সেল্ফ সার্ভিস। তবু একমাত্র ওকেই সবাই বলতে পারে ‘অনেকক্ষণ চায়ের ছেলেটা এ দিকে আসছে না। একটা লিকার বলে দিবি?’ কিংবা ‘দুটো উইলস ফিল্টার এনে দে তো।’ অথবা ‘এই খামটায় একটা পাঁচ টাকার স্ট্যাম্প লাগিয়ে, একটু পোস্ট করে দিয়ে আয় না...’ এই ভাবে সবার ফাইফরমাস খাটতে খাটতে ও কখন যেন একটা বেয়ারা হয়ে গেছে।

তাতে ওর দুঃখ নেই। দুঃখ চোর অপবাদে। ও তক্কে তক্কে থাকে। যদি চোরটাকে হাতেনাতে ধরা যায়! কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টে চুরি করবে কে? অন্য ডিপার্টমেন্টের লোক তো আর এখানে চুরি করতে আসবে না। কে হতে পারে! কে! ইন্দ্র? ধ্যাত, ও অত টাকা মাইনে পায়, ও করবে চুরি? তা ছাড়া ক’দিন আগে তো ওরই একটা মোবাইল চুরি হয়েছে। চার্জে দিয়েছিল। কে যে নিয়ে গেল!



সোনি টিভি-তে প্রতি শুক্র-শনিবার যে ‘সি আই ডি’ হয়, ওর ছেলে সেটা খুব মন দিয়ে দেখে। ও-ও দেখে। সেখানে ও কত বার দেখেছে, সি আই ডি-র লোকেরা নম্বর ট্রেস করে করে কী সুন্দর জানতে পেরে যায়, মোবাইলটা এখন কোথায়। সেই সূত্র ধরে ওরা অপরাধীকেও ধরে ফেলে। আর ওর তো ব্ল্যাকবেরি। দামি মোবাইল। কী সব থাকে। চেষ্টা করলে কি জানা যাবে না, ওটা এখন ঠিক কোন জায়গায়! ও বলল, কেউ যদি ওটা সরিয়েও থাকে, সদ্য সদ্য হয়েছে তো, থানায়-টানায় জানালে, ওরা যদি একটু ইনিশিয়েটিভ নেয়, আমার মনে হয়, ওটা ঠিক পাওয়া যাবে।

ইন্দ্র খুব জোরের ধাতানি দিয়েছিল ওকে। এই, বাজে কথা বোলো না তো। চূপ করো।

সুচিত্রা বলেছিল, ওইগুলো সিনেমা আর টিভি সিরিয়ালে হয়, বাস্তবে হয় না।

না। ইন্দ্র না। তা হলে কে? বিকাশ? ধ্যাত! আমার মাথাটা গেছে। অত বড় বাড়ির ছেলে। তার উপরে ব্রাহ্মণ। ওই রকম ফরসা গায়ের রং। সে কখনও চুরি করতে পারে? না। ও নয়। সুচিত্রা তো নয়ই। ওরই চুরি যায় বেশি। দিয়োভুমার কথা না হয় বাদই দিলাম। ও হচ্ছে মোবাইল মেয়ে। ও মোবাইল ছাড়া কিছু বোঝে না। আর যা বোঝে, তা হল ইমিটেশনের গয়না, লিপস্টিক আর সেন্ট। নিজের জন্য তো কেনেই, এ ডিপার্টমেন্ট, ও ডিপার্টমেন্ট, সে ডিপার্টমেন্টের মেয়েদের জন্যও নিয়ে আসে। কাকে কী মানাবে, কার কেমন পছন্দ, কী রকম রুচি, ওর নাকি নখদর্পণে। যে দামে কেনে, ও নাকি সেই দামটুকুই শুধু নেয়। তবে দু’-একজনকে এর মধোই ওর মুখের উপরে ও বলতে শুনেছে, এটাব দাম তিনশো পঁচিশ কী রে! আমাদের পাড়ার দোকানে তো ঠিক এই জিনিসই সে দিন দাম করলাম, বলল, পঁচাশি টাকা।

— সেই কোয়ালিটি আর এই কোয়ালিটি? জিনিস চিনতে শেখ। নিবি না, নিবি না। সেটা অন্য কথা। কিন্তু আমাকে কখনও এ সব কথা বলবি না, বুঝেছিস? এই জন্য না কারও ভাল করতে নেই...

দিয়োভুমা ভীষণ স্মার্ট। চোখে মুখে কথা বলে। কাউকে কেয়ার করে না। বড়বাবু পর্যন্ত ওকে সমঝে চলে। বিশাল টাকা মাইনে পায়। ওদের দিকে তাকিয়ে বালক মাঝে মাঝেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, সে কম টাকা মাইনে পেয়ে ভালই হয়েছে। বেশি পেলে ওদের মতো আবার টাক্স দিতে হত। তার

চেয়েও বড় কথা, ওদের কোম্পানি এই মুহূর্তে যে কর্মী সংকোচনের নীতি নিয়েছে, তাতে যদি ওর চাকরি চলেও যায়, ওর খুব একটা সমস্যা হবে না। ও যা মাইনে পায়, সেই মাইনের একটা চাকরি একে-ওকে ধরে ও ঠিকই একটা জুটিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ওরা কী করবে!

বালক একদিন অফিসে এসে দেখে দিয়োত্তমার সিট ফাঁকা। তার পর দিনও তাই। বাইরে গেছে, না অসুখ-বিসুখ করল! যতই তার দেমাক থাক, মাটিতে পা না পড়ুক, ওকে একদম পান্ডা না দিক, একই ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, খোঁজ না নিলে হয়! মানুষ তো! বিকাশকে জিজ্ঞেস করতেই বিকাশ বলল, ও তো চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

— সে কী! কেন?

— নিশ্চয়ই আরও বেটার অফার পেয়েছে। শুনলাম তো, গতকাল নাকি হায়াতে জয়েন করেছে।

— হায়াতে! ভালই হয়েছে, মাঝে মাঝে গিয়ে ভালমন্দ খেয়ে আসা যাবে। তা হঠাৎ কী হল?

বিকাশ বলেনি। পরে কানাঘুষোয় ও জানতে পারল, দিয়োত্তমা নাকি বিশ্বস্ত সূত্রে আগেই খবর পেয়েছিল, টার্মিনেশনের তালিকায় ওর নাম আছে। যে কোনও দিন কোম্পানি ওকে চিঠি ধরিয়ে দিতে পারে। এ নিয়ে ভীষণ টেনশনে ছিল। বিভিন্ন জায়গায় তলে তলে চেষ্টা করছিল। এক কোম্পানিতে কাজ করতে করতে অন্য কোম্পানিতে যাওয়া অনেক সহজ। কিন্তু কোনও কোম্পানি থেকে টার্মিনেট দিলে দুম করে অন্য কোথাও চাকরি পাওয়া খুব মুশকিল। তাই, কোম্পানি থেকে সরিয়ে দেওয়ার আগেই সম্মান থাকতে থাকতে ও নিজেই সরে গেল।

খবরটা পেয়ে একটু দমে গেল বালক। না। চাকরি যাওয়ার আশঙ্কা নয়। আসলে দিন কতক আগে দরজা দিয়ে ঢোকান সময় তাড়াহুড়ো করে বেরোতে যাওয়া দিয়োত্তমার সঙ্গে আর একটু হলেই ওর মুখোমুখি ধাক্কা লাগছিল আর কী। ও কোনও রকমে পাশ কাটাতে গিয়ে তার ওড়না ওর গায়ে লেগেছে কি লাগেনি, সে এমন রে রে করে উঠেছিল, যেন ইচ্ছে করেই ও তাকে ধাক্কা দিতে গিয়েছিল। একদম থতমত খেয়ে গিয়েছিল ও। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কোনও শব্দ নয়, এ-টোবিল সে-টোবিল থেকে এর-ওর কৌতুক ভরা দৃষ্টি নয়, যেন বিষ-মাখানো এক একটা তির

এসে বিদ্ব করছিল ওকে। দিয়োত্তমা বলেছিল, আর কোনও দিন যদি কোনও মেয়েকে এই ভাবে ধাক্কা দিতে দেখি, সে দিন কিন্তু আর ছাড়ব না। সোজা গিয়ে উইমেন গ্রিভান্স সেলে কমপ্লেন করব। বলেই, ফের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিল মোবাইলে।

ও একদম চুপ। অবাকও হয়েছিল একটু। ওকে ও রকম ভাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও দিকের টেবিল থেকে সুচিত্রা বলেছিল, ধাক্কা লাগলে লোকে তো ‘স্যরি’ বলে, সেটুকুও ভদ্রতা নেই!

ও বলতে পারেনি, আমি কোনও সহকর্মীকে মেয়ে হিসেবে দেখি না। দেখি মানুষ হিসেবে। আমার কাছে ইন্দ্র, বিকাশ বা অঞ্জনদা যা, সুচিত্রা আর দিয়োত্তমাও তাই। আর তা ছাড়া বাড়িতে যদি মা-বোনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, আমরা কি তাদের ‘স্যরি’ বলি? দিনের বেশির ভাগ সময় আমরা অফিসেই কাটাই। আমার কাছে এই অফিসটাও বাড়ি। একটা পরিবার। পরিবারের লোকের কাছে অত ফর্মালিটির কী আছে? যারা সামান্য হাঁচি, কাশি দিলেও ‘স্যরি’ বলে, আমি সেই কালচারে বড় হইনি। কী করব!

ও ভেবেছিল, সে দিন যদি ধাক্কা লেগেও থাকে, ও যে ইচ্ছে করে দেয়নি, ঢুকতে গিয়ে লেগে গেছে, দিয়োত্তমাকে ফাঁকা পেলে ও একদিন বুঝিয়ে বলবে। তেমন বুঝলে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কিন্তু সে তো চাকরিই ছেড়ে দিল!

এক দিন গেল। দু’দিন গেল। তিন দিন গেল। সপ্তাহ, মাস, বছর কাটতে চলল। ওদের ডিপার্টমেন্টে আর কারও কোনও কিছুই চুরি হল না। তবু একবারের জন্যও কারও মনে প্রশ্ন জাগল না, হঠাৎ করে চুরি হওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল কী করে!

শুধু বিকাশ একদিন এসে ওকে বলল, তুই যে ক্রেপটোম্যানিয়ার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিস, এটা কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। খুব মনের জোর লাগে। সবাই পারে না।

তার প্রতি বিকাশদার এই কমপ্লিমেন্ট শুনে একদম থম মেরে গেল বালক।



## চোর

তুমুল শোরগোলে ঘুম ভেঙে গেল কামিনীর, এত চিৎকার চাঁচামেচি কীসের? যারাই করুক, পরে দেখা যাবে, আগে তো ওকে ডাকি। পাশেই শুয়েছিলেন তাঁর স্বামী বিবিধান। রিটারার হতে আর বেশি দেরি নেই। এক মেয়ে ছিল। তারও বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন মাসখানেক আগে। জামাইটাও খুব ভাল পেয়েছেন। যেমন ভাল পরিবার। তেমনই দেখতে-শুনতে ভাল। তার উপর চাকরি করে আরও ভাল। দমকলের চাকরি। বেশ ভাল টাকাই মাইনেপত্র পায়। ফলে এখন তাঁদের ঝাড়া হাত-পা। বিছানায় শুলেই তাঁর স্বামী নাক ডাকতে শুরু করে দেন। অথচ তাঁর চোখে ঘুম নেই। রাত দেড়টা-দুটো অবধি একটার পর একটা সিরিয়ালের পুনঃসম্প্রচার দেখেন। টিভি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেলে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই ঘুম এত পাতলা যে, পাশের বাড়ির কোনও বেড়াল একটু ‘ম্যাঁও’ করলেও তাঁর ঘুম চটকে যায়। আর সেই ঘুম একবার ভেঙে গেলে কিছুতেই দু’চোখের পাতা এক হতে চায় না।

এই দু’দিন ধরে সেটা আরও বেড়েছে। কারণ, তিন দিন হয়ে গেল মেয়েটা স্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। তার নাকি মায়ের জন্য মন কেমন করছিল। তাই... খুব ভাল কথা। কিন্তু আসার পর থেকে তার হাবভাব চালচলন যেন কী রকম ঠেকছে। ও তো এ রকম ছিল না!

কিন্তু আজ কী হল! বাইরে এত হই-হট্টগোল কীসের! মনে হচ্ছে তাঁদের বাড়ির সামনেই হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ‘এই শুনছ, ওঠো না, বাইরে কী যেন হয়েছে, আরে উঠবে তো, কী কুস্তকর্ণের ঘুম রে বাবা!’ বলেও যখন গৃহকর্তার ঘুম ভাঙানো গেল না, তখন বাধ্য হয়েই জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ডেকে তুললেন। বললেন, বাইরে বোধহয় কিছু একটা হয়েছে। শুনতে পাচ্ছ?

তাঁরা থাকেন দোতলায়। নীচে একটা গোলমাল হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেটা যে কীসের, কে যে কী বলছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সবার কথা জড়িয়ে, তালগোল পাকিয়ে একটা হইচই ভেসে আসছে। কান পেতে তার মধ্য থেকে শুধু একটা শব্দই কোনও রকমে উদ্ধার করতে পারলেন বিবিধান, আর সেই শব্দটা হল— চোর।

গণ্ডগোলটা যখন তাঁদের বাড়ির সামনেই হচ্ছে, তা হলে কি তাঁদের বাড়িতেই চোর ঢুকেছে! উনি উঠতে যাচ্ছিলেন, কামিনী তাঁকে প্রায় জোর করে শুইয়ে দিলেন। বললেন, তোমাকে উঠতে হবে না। এত খবরের কাগজ পড়ো, টিভিতে সারান্ধণ খবর দেখো, আর এটা জানো না? চোরেরা আজকাল খালি হাতে আসে না। ওদের কাছে কত রকমের কত কী থাকে, তুমি জানো? যদি কিছু নিতে চায় তো নিক। জিনিস আগে না প্রাণ আগে? আর তা ছাড়া, আমাদের বাড়ির সামনে চৌচামেচি হচ্ছে মানেই যে আমাদের বাড়িতেই চোর ঢুকেছে, তা তো নয়; আশপাশের বা উল্টো দিকের সান্যালদের বাড়িতেও তো হতে পারে, না কি।

— সে পারে। কিন্তু...

— কোনও কিন্তু না। চুপ করে শোও তো।

— চুপ করে যখন শুতেই বলছ, তা হলে খামোকা আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙতে গেলে কেন?

— যাঃ বাব্বা... কথাটা মুখে বললেও মনে মনে বললেন, আমি মরছি আমার জ্বালায়। আর উনি আছেন... কী যে বলব! আচ্ছা, সত্যিই চোর তো! না কি... আবার ওই ছেলেটা না তো! মেয়েটা যে দিন এসেছে, সে দিনই তার মা তাঁর সঙ্গেই তাকে শুতে বলেছিলেন। কিন্তু বাধ সেধেছিল ওই। বলেছিল, না না, আমি যে ঘরে শুতাম সে ঘরেই শোব। না হলে আমার ঘুম আসবে না।

বিয়ের আগে তাঁর মেয়ে ও-দিককার ঘরটাতেই শুত। ওই ঘরের লাগোয়া একটা ঝুলবারান্দা আছে। রাস্তার দিকে। উনি প্রায়ই রাতে গিয়ে দেখে আসতেন, ঝুলবারান্দার দরজাটা ও বন্ধ করেছে কি না। এবং বেশির ভাগ দিনই দেখতেন, সেটা হাট করে খোলা। ফলে উনি সেটা ভেজিয়ে ছিটকিনি তুলে দিতেন।

শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে সে দিনও ওই ঘরে শুয়েছে দেখে উনি ভেবেছিলেন, আগের মতো আজও হয়তো ভুল করে ও ঝুলবারান্দার দরজাটা আটকায়নি।

তাই সেই দরজাটা আটকাবার জন্য মাঝরাতে ওর ঘরে ঢুকতে গিয়ে উনি দেখেন, ও যা কোনও দিনও করেনি, তা-ই করেছে। ওই ঘরে ঢোকার এ দিককার দরজাটা আটকে দিয়েছে। আটকানো মানে এমনি ভেজিয়ে রাখা নয়, রীতিমত ভেতর থেকে খিল বা ছিটকিনি তুলে দেওয়া। উনি ঠেলেই সেটা বুঝতে পেরেছেন। আর এ দিককার দরজা যখন দেওয়া, তা হলে ও কি আর ওই দিকের দরজাটা দেয়নি! নিশ্চয়ই দিয়েছে। এটা ভেবে উনি যখন ওই ঘরের দরজার সামনে থেকে ফিরে আসছেন, ঠিক তখনই হঠাৎ অত্যন্ত চাপাস্বরে একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলেন তিনি। আর সেটা শুনেই চমকে উঠলেন, এ কী! তা হলে কি... আমি যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই! তাই তো বলি, সারাক্ষণ মোবাইলে কার সঙ্গে এত গুজগুজ ফুসফুস করে। কাকে এত মেসেজ করে! কাছে গেলেই চুপ হয়ে যায় কেন।

শ্বশুরবাড়িতে এ সব করতে অসুবিধে হয় বলেই কি ও এখানে এসে আছে! ও বাড়িতে যাওয়ার নাম করছে না! না কি জামাই এটা আঁচ করেছে! করবে না! সে কি বোকা নাকি! আর সে জন্যই বোধহয় সদ্য সদ্য বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও আজ তিন দিন হতে চলল, বউ এলেও সে আসার নাম গন্ধ করছে না। সামনেই তো অফিস, অফিস ছুটির পরেও তো একবার আসতে পারত, না কি! আসেনি মানে ডাল মে কুছ কালা হয়।

কিন্তু সেটা কী? বিয়ের আগে সব মেয়েই একটু-আধটু প্রেমটেম করে বইকী! ও-ও করেছে। কানাঘুষোয় তার কিছু কিছু তিনি শুনেছেনও। কিন্তু কারও সঙ্গেই তেমন জোরালো কোনও সম্পর্ক নিশ্চয়ই সে ভাবে গড়ে ওঠেনি। তাই ওর বাবা আর উনি যখন তাকে বিয়ের কথা বলেছিলেন, প্রথম দিকে একটু গাঁইগুঁই করলেও শেষে বলেছিল, তোমরা যখন আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াবেই ঠিক করেছে। তখন দ্যাখো, ছেলে দ্যাখো...

ওঁরা ছেলে দেখেছিলেন। এবং মেয়েরও খুব পছন্দ হয়েছিল তাকে। ফলে খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মাত্র আড়াই মায়ের মাথায়।

মেয়ে জামাই যখন অষ্টমঙ্গলার গিট খুলতে এসেছিল, তখন তাঁরা বুঝেছিলেন; তাঁদের মেয়ে খুব খুশি। খুব ভাল আছে ওরা। তাই কামিনী আর বিবিধান ঠিক করেছিলেন এত দিন তো শুধু চাকরিবাকরি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তেমন ভাবে কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়নি। রিটারার হতে আর তো মাত্র বছর দেড়েক। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তার পর দু'জনে মিলে



বেরিয়ে পড়বেন। সিমলা কুলু মানালি অমৃতসর দিয়ে শুরু করবেন। তার পর পাহাড় জঙ্গল সমুদ্র। কিছুই বাদ দেবেন না।

কিন্তু এ যে নতুন ফ্যাচাং শুরু হল। তা হলে কি তাঁর মেয়ের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি! হলে কি স্বামী থাকতে কোনও মেয়ে আবার পরপুরুষের দিকে ঢলে! অষ্টমঙ্গলার গিঁট খুলতে এসে ও যেটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল। বুঝিয়েছিল, ওর সঙ্গে ওর স্বামীর দারুণ সম্পর্ক। তা হলে কি সেটা শুধু আমাদের দেখানোর জন্যই ছিল? সবটাই ভান! আমরা যাতে কষ্ট না পাই, সে জন্য?

না হলে বিয়ের মাত্র দেড় মাসের মাথায় কোনও মেয়ে এ রকম করতে পারে! ছিঃ... না কি বিয়ের আগে থেকেই এ সব ছিল! আমরা টের পাইনি! ছিল যখন, বিয়ের আগে বলিসনি কেন? আমরা তো জিজ্ঞেস করেছিলাম। এর পর কি আমরা আর কাউকে মুখ দেখাতে পারব! ছিঃ...

কিন্তু কথা হচ্ছে, রাতদুপুরে ওর ঘরে যে-ই আসুক না কেন, তাঁদের দু'জনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে এল কী করে! ওই ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে! মেন গেটের চাবি তো তাঁর কাছেই থাকে। তা হলে কি কোনও এক ফাঁকে ওই চাবিটা নিয়ে ও একটা ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে নিয়েছে! না! এখন আর কিছুই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

সে দিন মেয়ের ওই কীর্তি আঁচ করার পরে বহু বার কামিনী ভেবেছেন, ব্যাপারটা স্বামীকে জানাবেন। কিন্তু বারবার বলতে গিয়েও উনি আর শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে পারেননি, মেয়ে এমন একটা কাজ করেছে... ছিঃ...

হঠাৎ ডোরবেলের শব্দে সচকিত হলেন তিনি। এত রাতে কে বেল বাজাচ্ছে! রাত-বাতির আলোয় দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন। জ্বলজ্বল করতে থাকা ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটাগুলি দেখে তিনি বুঝতে পারলেন রাত একটা বারো।

এত রাতে কে বেল বাজাচ্ছে! তিনি ঠিক শুনেছেন তো! না কি সবটাই মনের ভুল! ক'দিন ধরে মনের উপর দিয়ে যা যাচ্ছে... মনের আর কী দোষ! বোধহয় দশ সেকেন্ডও হয়নি। আবার ডোরবেল বেজে উঠল। হ্যাঁ, ওই তো, ওই তো ডোরবেল বাজল। তিনি ঠিকই শুনেছেন। শুধু তিনি নন, তাঁর স্বামীও নিশ্চয়ই শুনেছেন। না হলে তাঁর অমন ঘুমকাতুরে স্বামী এ ভাবে বিছানার উপরে উঠে বসতেন না।



আবার ডোরবেল বেজে উঠল। এবং তার সঙ্গে তারস্বরে চিৎকার— ও বিধানবাবু, দরজাটা একটু খুলুন। আপনাদের বাড়িতে চোর ঢুকেছে। দরজাটা খুলুন।

স্বামীর নাম বিবিধান হলেও শুধু অফিসের সহকর্মীরাই নয়, পাড়ার লোকেরাও তাঁর নামের প্রথম ‘বি’টা বাদ দিয়ে বিধান বলেই তাঁকে ডাকে। ফলে তাঁর স্বামীকেই যে ডাকছে, বেশ বুঝতে পারলেন তিনি। কিন্তু কামিনী জানেন, দরজা খুললেই সর্বনাশ। কারণ, তাঁর বাড়িতে কেউ যদি এসে থাকে, তা হলে সে আর যে-ই হোক না কেন, চোর নয়। আর সে যে কে, তিনি তা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছেন। সে দিন রাতে তাঁর মেয়ের ঘরে তিনি যে ছেলেটাকে চাপাস্বরে কথা বলতে শুনেছিলেন, নিশ্চয়ই সে। আর সত্যিই যদি সে হয়, তা হলে একেবারে কেলেক্সারির একশেষ। এ পাড়ায় তাঁরা আর মুখ দেখাতে পারবেন না। রাতারাতি এ বাড়ি বেচে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। তাই তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, ডাকুক। তোমাকে যেতে হবে না...

স্বামী চোখ ডলতে ডলতে বললেন, না গো, মনে হচ্ছে পাড়ার ছেলেরা...

— হোক পাড়ার ছেলে। তোমাকে যেতে হবে না।

— কেন? ভয় পাচ্ছ কেন? আরে বাবা, ওদের কথাবার্তা শুনে আমরা যেমন বুঝতে পারছি, বাড়ির সামনে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে, তেমনই, চোর যদি সত্যি সত্যিই আমাদের বাড়িতে ঢুকে থাকে, তা হলে তো সেও টের পেয়েছে, পাড়ার লোকেরা আমাদের বাড়ি ঘিরে আছে, পালাবার আর কোনও রাস্তা নেই। তাই কোনও কিছু করার আগে সে অন্তত দশ বার ভাববে। বুঝেছ...

— না তোমাকে যেতে হবে না।

— ছাড়ো না... তোমার চিন্তা নেই। আমি দেখছি। বলেই, উনি খাট থেকে নেমে গেলেন।

এখন কী করা উচিত কামিনী কিছুই বুঝতে পারলেন না। শুধু ভয়ঙ্কর এক সত্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন।

দু’মিনিটও হল না। পাড়ার কতকগুলো ছোকরা দুন্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে দৌতলায় উঠে এল। তাদের মধ্য থেকেই কে যেন উত্তেজিত গলায় জোরে

জোরে বলতে লাগল, দাখ দাখ দাখ, ভাল করে দাখ। আমি নিজের চোখে দেখছি, ছেলেটা পাইপ বেয়ে উঠেছে।

ওরা এ ঘরে ও ঘরে ছাড়িয়ে পড়ল। কেউ খাটের ওলা দেখছে। কেউ বাথরুম। কেউ ফ্রিজের দরজা খুলে দেখছে চোরটা ওখানে লুকিয়েছে কি না। ওদের মধ্য থেকেই একজন বলে উঠল, মালটা আছে। এবার নেই আছে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। পালাবে কোথায়? একবার ধরতে পারলে দেখাচ্ছ মজা...

একজন ও দিকে গিয়ে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে চিৎকার করে উঠল, মালটা মনে হয় ভিতরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছে। তার কথা শুনে এ দিক থেকে আর একজন গলা চড়াল, ধাক্কা ধাক্কা, না খুললে দরজা ভেঙে ফাল। এত বড় সাহস, আমাদের পাড়ায় ঢুকেছে চুর করতে? ভাঙ ভাঙ, ভেঙে ফাল...

কে যেন সত্যি সত্যিই ভাঙতে যাচ্ছিল। কামিনী বললেন, না না, ও ঘরে কী করে যাবে? ও ঘরে তো আমার মেয়ে দরজা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

— ঘুমিয়ে আছে! এত চিৎকার-চোচামোচোও ঘুম ভাঙেন... তা হয় নাকি? না কি চোরটা ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আপনার মেয়ের মাথায় রিভলভার ধরে আছে? ডাকুন ডাকুন, ডাকুন তো...

কামিনী আর বিবিধান দরজার সামনে গিয়ে জোরে জোরে মেয়ের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। সঙ্গে দরজাও ধাক্কাতে লাগলেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ছেলেগুলোকে শাস্ত করার জন্য কামিনী বললেন, আসলে ও একবার ঘুমিয়ে পড়লে...

কে যেন বলল, তা বলে এ রকম ঘুম?

অন্য আর একজন বলল, আমার কেমন যেন লাগছে... আজকাল চার দিকে যা হচ্ছে... আবার অন্য কিছু ঘটেনি তো...

এ বার একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, মাসিমা, আপনারা একটু সরুন তো। আমি দেখছি। বলেই, দরজায় দড়াম দড়াম করে লাথি মারতে লাগল। আর ঠিক তখনই ভিতর থেকে ভেসে এল মেয়ের গলা— আরে বাবা, এত চোঁচাচ্ছ কেন, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি? দাঁড়াও দাঁড়াও, খুঁটিছ...

মেয়ে দরজা খুলে সামনে দাঁড়াতেই দু' তিন জন ছেলে তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকে গেল। সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকে পেল

না। একজন ও দিককার দরজা খুলে ঝুলবারান্দায় গিয়ে এ-পাশে ও-পাশে তাকাতেই দেখল, একটা ছেলে পাইপ বেয়ে নামার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল, চোর চোর চোর... পাইপ বেয়ে নামছে, ধর ধর ধর...

যারা বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিল, তারা তো বটেই, যারা দোতলায় ছিল, তারাও পড়ি কি মড়ি করে তরতর করে নামতে লাগল। ওদের পিছু পিছু নামলেন বিবিধানও।

নীচে নেমে দেখলেন চোরটাকে ওরা ধরে ফেলেছে। দু'-চার ঘা কষিয়েও দিয়েছে। বয়স্ক দু'জন তাকে আগলে পাড়ার ছেলেদের বলছে, না। একদম না। একদম গায়ে হাত দিবি না। আইন নিজের হাতে নিবি না। দরকার হলে থানায় ফোন কর। ওকে পুলিশের হাতে দে... তবু না। কেউ ওর গায়ে হাত দিবি না।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে এ সব কাণ্ড দেখে বিবিধান অবাক। তাঁর আর্থিক অবস্থা তো তেমন নয়, তবু আশপাশে এত বড় বড় বাড়ি থাকতে তাঁর বাড়িতে চুরি করতে এসেছিল কে! দেখি তো... বিবিধান গুটিগুটি পা ফেলে কাছে গিয়ে দেখেন, যে ছেলেটাকে ওরা ধরেছে, জটলার মাঝখানে দাঁড়ানো যে ছেলেটাকে ঘিরে এত হইচই, সে আর কেউ নয়, তাঁর জামাই।

শ্বশুরমশাইকে দেখেই সে মাথা নিচু করে ফেলল। যেন মুখ লুকোতে পারলে বাঁচে।

বাড়িতে এনে যখন তাকে বারবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তুমি তোমার শ্বশুরবাড়িতে আসবে, এ তো খুব ভাল কথা। তা বলে চোরের মতো পাইপ বেয়ে? তুমি হঠাৎ এ রকম করতে গেলে কেন?

একই প্রশ্ন বারংবার করতে করতে সবাই যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, তখন সে নয়, মুখ খুলল তার বউ— আসলে ও ভীষণ লাজুক। আমি ওকে বলেছিলাম, আমি তো তোমার বউ। তুমি আমার কাছে আসবে, এতে লজ্জার কী?

ও তখন বলেছিল, না, তোমার বাবা-মা কী ভাববেন! ভাববেন, আমি খুব হ্যাংলা। তাঁদের মেয়েকে আমি একদিনও ছেড়ে থাকতে পারি না। তার চেয়ে বরং তোমার বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে একটা মিস কল দিয়ো, আমি ঠিক চুপিচুপি তোমার কাছে চলে যাব।

আমি বলেছিলাম, কিন্তু কী করে? মেন গেটের চাবি তো মায়ের কাছে থাকে।

ও বলেছিল, কোনও চিন্তা নেই। জানো না-আমি কীসে কাজ করি? দমকলে। গাছের ঝুরি বেয়ে আমরা মগডালে উঠে যেতে পারি। এ-কার্নিস ও-কার্নিস ধরে একটা বাড়ি থেকে আর একটা বাড়ির ছাদে পৌঁছে যেতে পারি। আর আমি তোমার জন্য পাইপ বেয়ে সামান্য দোতলার ঝুলবারান্দায় উঠতে পারব না? কী যে বলো!

আমি বলেছিলাম, পাইপ? পাইপ কোথায়?

ও বলেছিল, অষ্টমঙ্গলার গিট খুলতে গিয়ে আমি তোমাদের বাড়ির চার পাশটা খুব ভাল করে দেখে এসেছি। দেখেছি, একটা পাইপ তোমাদের ঝুলবারান্দার পাশ দিয়ে সোজা উঠে গেছে।

আমি বলেছিলাম, তা বলে পাইপ বেয়ে?

ও বলেছিল, আরে বাবা, সামনের গেট দিয়ে তো স্বামীরা ঢোকে। আমি তো শুধু তোমার স্বামী নই, প্রেমিক। আমি প্রেমিক হয়েই তোমার কাছে বারবার যেতে চাই। আর জানোই তো, প্রেমিকার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করার ব্যাপারটাই আলাদা।

তখনই আমি বারবার করে ওকে বলেছিলাম, দেখবে, তুমি ঠিক একদিন ধরা পড়ে যাবে। কী? সেই ধরা পড়লে তো?

বউয়ের কথা শুনে লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল জামাইয়ের। কিন্তু বউয়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছেলে থেকে প্রৌঢ় যে ভাবে হেসে উঠল, বাদ গেলেন না স্বশুর-শাশুড়িও, তাতে তাঁদের সঙ্গে সায় না-দিয়ে আর কোনও উপায় ছিল না। ও-ও হেসে উঠল। স্বশুরমশাই বললেন, না, বাবা, তোমাকে আর পাইপ বেয়ে আসতে হবে না। আমাদের সামনে দিয়ে আসতে যদি তোমার লজ্জা করে, তা হলে বলো, কালকেই তোমাকে একটা ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে দিই। তা হলে তো আর কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার যখন ইচ্ছে হবে, যত বার ইচ্ছে হবে আসতে পারবে। আর চাবি নিতেও যদি তোমার লজ্জা করে, তা হলে আমি কথা দিচ্ছি, মেয়ে যখন এখানে থাকবে, তখন সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের বাড়ির সদর দরজাটা তোমার জন্য খোলাই থাকবে... তাতে যদি সত্যি সত্যিই চোর আসে, তো আসুক। যদি কিছু নিয়ে যায়, তো নিক। তবু...

সে কথা শুনে পাড়ার ছেলেদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, আর একটা কথা, আপনার যদি পাইপ বেয়েই উঠতে ইচ্ছে করে, তো উঠবেন। আমরা তো অনেক রাত অবধি পাড়ার মুখে বসেই আড্ডা মারি, ওঠার আগে শুধু আমাদের যে-কোনও একজনকে বলে যাবেন, আপনি পাইপে উঠতে যাচ্ছেন, তা হলেই হবে... বলেই, শুধু সে নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বাকিরাও আরও একবার হো হো করে হেসে উঠল।



## কালো স্ল্যাক্স আর সোনালি কাজ করা কামিজ

পাশের ঘর থেকে জোরে হাঁক দিল অদ্রিজা— কী গো, এই পাঞ্জাবিটা তুমি পরবে না? না পরলে বলো, নামিয়ে দিই। নরম কাপড় তো, ঘরমোছার জন্য খুব ভাল হবে।

— ঘরমোছা! বউয়ের কথা কানে আসতেই বিড়বিড় করল সাহেব। এমনিতেই পাঞ্জাবিটা সেই কবে থেকে পরছে। নরম হয়ে গেছে। একটু টান লাগলেই ছিঁড়ে যেতে পারে, তাই সে যত্ন করে সরিয়ে রেখেছে। আর তার বউ কিনা বলছে, ঘরমোছার জন্য বার করবে! গলার স্বর উঁচু করে ও বলল, না না, ঘরমোছার জন্য নামাবে কী? ওটা রেখে দাও। সামনের বার বড়কাছারিতে পরে যাব।

— বড়কাছারি! ওর বউ অবাক। কেন? তোমার কি আর কিছু নেই?

সাহেব প্রত্যেক বছর পয়লা বৈশাখের দু'দিন আগে, নীল পুজোর ঠিক আগের দিন বড়কাছারি যায়। গঙ্গাসাগরের পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এটাই নাকি সবচেয়ে বড় মেলা। কেউ কেউ এটাকে আবার ভূত কাছারিও বলে। এই সময় যারা ওখানে যায়, তারা ওখানকার পুজো সেরে অটো বা ট্রেকারে করে মিনিট কুড়ি-পঁচিশের রাস্তা, আমতলার একটু আগে, জয়রামপুরেও টুঁ মেরে আসে। ওখানেও শিবের মন্দির আছে। তবে এ রকম খোলামেলা নয়। মন্দির যেমন হয়, তেমন দেখতে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন প্রায় ভগ্নদশা। লোকে দূরদূরান্ত থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে আসে। শিবের মাথায় ঢালে। এই উপলক্ষে টানা তিন দিন ধরে চলে মেলা। দিনের থেকে রাতেই ভিড় হয় বেশি।

প্রতিবারের মতো অফিস ছুটির পর ধর্মতলা থেকে পাঁচাত্তর নম্বর বাসে করে ও গিয়ে নেমেছিল বাখরাহাটে। স্টপেজের উল্টো দিকেই সরু গলির



মতো রাস্তা। পিলপিল করে লোক যাচ্ছে। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। বেশির ভাগ লোকের কাঁধেই বাঁক। দু’-তিন মাইল রাস্তা। গোটা রাস্তায় বহু দূরে দূরে হাতে গোনা ক’টা ফ্লাড লাইট ছাড়া আর কিছু নেই। রাস্তার দশাও তথৈবচ। অটো ভ্যানরিকশা তো দূরের কথা, ওই গলির মধ্যে একটা সাইকেলকেও ঢুকতে দিচ্ছে না জনাকতক ছোকরা। এমন ভান করছে, যেন স্বেচ্ছাসেবী। অথচ গলির মধ্যে ঢুকেই ও দেখল, বাঁ হাতে সার সার ভ্যানরিকশা দাঁড়িয়ে আছে। আরও কয়েক পা যেতেই পর পর অটোরিকশা। তারাও হাঁক দিচ্ছে, মন্দির যাবে, মন্দির যাবে।

সাহেব একটা অটোয় উঠে পড়ল। এমনি দিনে লোক বুঝে আড়াই থেকে তিন টাকা ভাড়া। এ ক’দিনের জন্য পাঁচ টাকা।

মন্দির চত্বর জুড়ে মেলা। গ্রামগঞ্জে কোনও মেলার খোঁজ পেলেই হল, ও ঠিক খুঁজে খুঁজে চলে যায়। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে, মেলা নয়, একসঙ্গে অতগুলি লোককে দেখা রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার। আমি সেই লোক দেখতে যাই।

ও দেখেছে, সুন্দরবনের বনবিবির মেলাই হোক কিংবা পুরুলিয়ার সৃজন উৎসব, বিডন স্ট্রিটের চৈত্র সংক্রান্তির মেলাই হোক অথবা রথতলার রাসের মেলা, পশরা সব একই। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, কালীঘাটের মন্দিরের দু’ধারের দোকানগুলোই বোধহয় ঘুরে ফিরে এই মেলাগুলোতে যায়। তাই আর মেলা চত্বরে ঢোকেনি ও। একটা দোকান থেকে চিনির তৈরি নানা রঙের মঠ, খেলনা, বাতাসা আর মোমবাতি ধূপকাঠি কিনে উঠে গিয়েছিল গোল করে বাঁধানো বেদিতে। মন্দির বললেও, এখানে মন্দির তো দূরের কথা, কোনও ঘরটরও নেই। পুরোটাই উন্মুক্ত। বেদির মাঝখানে মাঝারি মাপের একটা গাছ। তার নীচে শিবলিঙ্গ। তার মাথায় সবাই জল ঢালে। দুধ ঢালে। ডাব উপড় করে দেয়। মোমবাতি জ্বালায়। ধূপকাঠি জ্বালায়।

পুজো সেরে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে বেদি থেকে নেমে কী মনে হল ওর, সাদা কাগজে লাল কালিতে ছাপা এক ধরনের ছোট ছোট কাগজের টুকরো কিনতে পাওয়া যায় ওখানে। লোকে বলে দরখাস্ত। যার যা মনস্কামনা বা আবেদন-নিবেদন কিংবা বিচারের জন্য যা মন চায় ওই কাগজে লিখে, সই করে সুতো দিয়ে ওই গাছে বেঁধে দিলেই নাকি সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। বিচার মেলে। ঈশ্বরের চেয়ে বড় বিচারক আর কে হবেন! তাই বুঝি



লোকে এর নাম দিয়েছে বড়কাছারি। এতটা এসেছে যখন, একটা দরখাস্ত লিখবে না! ও তাই একটা পাতায় দরখাস্ত লিখে গাছে বাঁধার জন্য আর বেদিতে উঠল না। ওখানে তখন তুমুল ঠেলাঠেলি। কে আগে জল ঢালবে, তার জন্য প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। বেদিটা যে রেলিং দিয়ে ঘেরা, অনেকেই সেখানে দরখাস্ত বেঁধে দিয়ে যায়। ও-ও বেঁধে দিল। তার পর এ-দিকে ও-দিকে তাকিয়ে দেখল, বেদির এ-পাশে ও-পাশে নানা মাপের গোপালের মূর্তি সাজিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে অনেকেই। সেখানে বহু লোক মোমবাতি ধরাচ্ছে। ধূপ ধরাচ্ছে। ও-ও ছেলের নামে, বউয়ের নামে, ভাগনির নামে, ভাইপোর নামে আলাদা আলাদা করে নীলের বাতি দিল।

ফেরার সময় কয়েক পা হেঁটেই একটা ফাঁকা অটো পেয়ে গেল ও। অটো করে বড় রাস্তায় চলে এল। যেখানে ও বাস থেকে নেমেছিল, সেখানে তখন প্রচুর অটো। ট্রেকার। একটা দুটো ম্যাটাডর। পয়সা কম লাগে বলে নয়, অটো বা ট্রেকারে ও যখন-তখন চড়ে, কিন্তু ম্যাটাডরে তো ওঠা হয় না। এই ম্যাটাডরগুলিতে কোনও লোক নেই। লোক না হলে নিশ্চয়ই ছাড়বে না! ও তাই কিছুটা এগিয়ে একটা ম্যাটাডরে উঠে পড়ল। ম্যাটাডরে উঠলেই ওর কেন যেন মনে হয় ভাসানে যাচ্ছে। ম্যাটাডর চললে সামনের চুলগুলো উল্টো দিকে তিরতির করে উড়তে থাকে। মাঝে মাঝে আলপিনের ডগার মতো কী যেন মুখের মধ্যে এসে ফোটো। তবু ভাল লাগে। শরীর জুড়িয়ে যায়।

পাঁচ-সাত মিনিট হয়ে গেছে, ম্যাটাডরে যে ক'জন ছিল, সে ক'জনই। আর কেউ উঠছে না। গাড়ি ছাড়তে দেরি হচ্ছে দেখে, ও ওঠার আগে যে দু'-চার জন উঠেছিল, তারা একে-একে নেমে পড়ল। দেখাদেখি ও-ও।

যারা নেমেছিল, তারা যে যার মতো সামনে দাঁড়ানো অটো আর ট্রেকারে উঠে চলে গেছে। কেবল এক বৃদ্ধা আর সম্ভবত তার এক মেয়ে, তখনও দোনোমোনো করছে, কীসে করে যাবে!

অটো ট্রেকারের লোকেরা তখন তাদের দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে চিৎকার করছে, 'জয়রামপুর যাবে, জয়রামপুর যাবে'। সাহেব সে দিকে কান না দিয়ে পাশে দাঁড়ানো বৃদ্ধাকে বলল, আপনারা জয়রামপুর যাবেন তো?

বৃদ্ধা হ্যাঁ বলতেই, ও বলল, চলুন, তা হলে ট্রেকারটায় উঠে পড়ি।

ওদের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা ট্রেকার। তাতে জনাকতক লোক। জ্বাইভারের পেছনের লম্বা সিটের একদম ও দিকে একজন ভদ্রলোক বসে

ছিলেন। তার পাশে গিয়ে বসলেন বৃদ্ধা। বৃদ্ধার পাশে ওই মেয়েটি। ড্রাইভারের পাশে, ট্রেকারের একদম সামনের সিট ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও ও গিয়ে বসল মেয়েটার পাশে। একদম এ ধারে।

রাস্তাটা খুব খারাপ। খানাখন্দে ভরা। মাঝে মাঝেই লাফাচ্ছে। ইচ্ছে করে নয়, টাল সামলাতে না পেরে একটু পরে-পরেই ও মেয়েটার গায়ে গিয়ে পড়ছিল। সামনে ধরার কিছু নেই। তাই সিটের ধারটা ধরার জন্য ডান হাতটা মেয়েটার কাঁধের পিছন দিক থেকে ও বাড়িয়ে দিল।

খানিকটা যাওয়ার পরেই রাস্তাটা বোধহয় তুলনামূলক ভাল। তাই আর আগের মতো নাচছে না। মেয়েটা হঠাৎ কেঁপে উঠতেই সাহেব সচকিত হল। সিটের ধার থেকে তার হাত কখন যেন সরে এসেছে মেয়েটার কাঁধে। মেয়েটার দিকে তাকাতেই বৃদ্ধল, মেয়েটা লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে।

হঠাৎ কী একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। ও হাতের তালু দিয়ে মেয়েটার কাঁধে চাপ দিতে লাগল। মেয়েটা কিছু বলল না। তাতে আরও উৎসাহ পেয়ে, প্রসাদ-চরণামৃত আনার জন্য সফট ড্রিংকসের পাঁচশো এম এল-এর ছোট ছোট দুটো খালি বোতল বওয়ার জন্য কাঁধের যে পুঁচকে ব্যাগটা ও নিয়ে গিয়েছিল, সেটাকে কোলের উপর রেখে তার উপর দিয়ে এমন ভাবে বাঁ হাতটা রাখল, আঙুলগুলো ছুঁতে লাগল মেয়েটার উরু।

গাড়ি যত এগোতে লাগল, শুধু আঙুল নয়, ওর হাত, হাতের তালু খেলা করতে লাগল মেয়েটার উরুর উপরে। জয়রামপুরে নেমে বৃদ্ধা যেন ঠিক করতে পারছিলেন না কোন দিকে যাবেন। বড় বড় ফ্লাড লাইট জ্বলছে। এই মধ্যরাতেও সারা রাস্তা জ্যাম। লোকে লোকারণ্য। হাঁটার উপায় নেই। সাহেবই বলল, মন্দিরে যাবেন তো? চলুন।

দু'পা এগিয়ে ডান হাতের রাস্তা ধরে ওরা এগোতে লাগল। কিছুটা যেতেই ফ্লাড লাইটের আলোর রেশ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবু বোঝা যাচ্ছে, ছায়া ছায়া হাজার-হাজার লোকের স্রোত এ দিক দিয়ে যাচ্ছে আর ও দিক থেকে আসছে। এত ভিড় যে, যে-কোনও সময় যে কোনও সঙ্গী একটু আগুপিছু হলেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে। মেয়েটার ও দিকে বৃদ্ধা। এ দিকে ও। পাশাপাশি যেতে যেতে ও হঠাৎ করে মেয়েটার কড়ে আঙুল ধরল।

অচেনা কেউ কোনও মেয়ের হাত ধরলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া

হওয়ার কথা। কিন্তু মেয়েটা ফিরেও তাকাল না। ক'পা যাওয়ার পর হাত দিয়ে মেয়েটার তালু আঁকড়ে ধরল। তবু মেয়েটার কোনও ভ্রক্ষেপ নেই। এ বার হাতের পাঁচটা আঙুল মেয়েটার পাঁচটা আঙুলের ফাঁকে গলিয়ে জাপটে ধরল ও। মেয়েটা তার দিকে তাকাল কি না অন্ধকারের মধ্যে ও বুঝতে পারল না। মুহূর্তখানেক যেতে না যেতেই মেয়েটাও তার পাঁচটা আঙুল দিয়ে সাহেবের পাঞ্জাটাকে চেপে ধরল। খানিকটা যাওয়ার পর সাহেব তার হাতটা সাহস করে মুখের কাছে এনে আলতো করে মুখ ঘষতে ঘষতে পর পর কয়েকটা চুমু খেল। তবু মেয়েটার দিক থেকে কোনও সাড়া নেই। পাথর দিয়ে তৈরি নাকি রে বাবা! মেয়েটা কি কিছুই বুঝতে পারছে না! মেয়েরা আবার এ রকম হয় নাকি! হঠাৎ ও খেয়াল করল, মেয়েটা আস্তে আস্তে তার হাতটা তুলে বুকের কাছে চেপে ধরে একটুখানি রেখেই হাতটা নামিয়ে নিল।

বাঃ! দারুণ তো! মেয়েটা তা হলে রাজি! চনমনে হয়ে উঠল সাহেব। অন্ধকারের জন্য দেখে দেখে রাস্তা চলতে হচ্ছে দেখে, তার সঙ্গে মেয়েটার কী হচ্ছে, বৃদ্ধা হয়তো এখনও কিছুই টের পাননি। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তিনি সন্দেহ করতে পারেন। তাই মেয়েটিকে নয়, সাহেব একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথেকে আসছেন?

উনি কী একটা বললেন, ও ঠিক বুঝতে পারল না। এ বার সেই বৃদ্ধা ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় থাকো?

ও বলল, আলিপুরে।

বৃদ্ধা বললেন, এই আমতলা আলিপুরে?

ও বলল, না। জজ কোর্টের কাছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি আছে না? বলার পর মুহূর্তেই ওর মনে হল, এঁদের যা চেহারা, যা পোশাক-আশাক, এঁরা নিশ্চয়ই ন্যাশনাল লাইব্রেরির নাম শোনেননি। তাই ফের বলল, ওই যে চিড়িয়াখানা, তার পাশে থাকি।

— অ। বৃদ্ধা আর কোনও কথা বললেন না। কিন্তু বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে মেয়েটার সঙ্গে যেন কথা বলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল ও। কিন্তু কী দিয়ে শুরু করবে কথা! প্রথমেই ওর মনে হল, মেয়েটার বয়স কত! কিন্তু এই সামান্য আলাপেই তো কোনও মেয়েকে আর জিজ্ঞেস করা যায় না, তোমার

বয়স কত। যদিও বয়স জানার একটা সহজ উপায় আছে। কীসে পড়ো? জিজ্ঞেস করলে যদি বলে, অনেক দিন আগেই সে পাঠ শেষ হয়ে গেছে। তা হলে কত বছর আগে শেষ করেছ, জেনে নিয়ে, কত পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে হিসেব করে, তার সঙ্গে ক্লাস ওয়ানে ওঠার আগের পাঁচ বছর যোগ করলেই একদম পাক্কা বয়স বেরিয়ে আসবে। অবশ্য ফেলটেল করে থাকলে দু’-এক বছর এ দিক ও দিক হবে, এই যা। তবু মোটামুটি একটা আন্দাজ তো পাওয়া যাবে। তাই মেয়েটাকে ও জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

মেয়েটি বলল, সেভেনে।

সেভেনে! ও আকাশ থেকে পড়ল। সে কী! এত ছোট! এ তো তার ছেলের থেকে তো বটেই, এমনকী তার বোনঝির চেয়েও ছোট! আর সে কি না— ছি ছি ছিঃ... কিন্তু মেয়েটাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না তার বয়স এত কম! তবে কি অনেক বড় হয়ে সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল! হতে পারে! তবু পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ও বলল, পড়াশোনা করো? না, সারাক্ষণ টিভি দ্যাখো?

মেয়েটি বলল, আমাদের বাড়িতে টিভি নেই। তবে ঠাম্মা যে বাড়িতে কাজ করে, সে বাড়িতে আছে। মাঝে মাঝে দেখতে যাই।

মেয়েটার ঠাকুমা লোকের বাড়িতে কাজ করে! তবু জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা কী করেন?

মেয়েটি বলল, রিকশা চালায়।

— ও। তা, উনি এলেন না?

— না। আমাদের সঙ্গে থাকে না তো...

— কোথায় থাকেন?

— জানি না। শুনেছি আবার বিয়ে করেছে।

— বিয়ে! সে কী গো... আর তোমার মা?

— মা তো ইটখোলায় কাজ করত। ওখানেই থাকত। থাকতে থাকতে ওখানকার একটা ছেলের সঙ্গে ভালবাসা করে। তার সঙ্গেই মা পালিয়ে গেছে।

সাহেব ইশারা করে বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বলল, ইনি কে?

মেয়েটি বলল, আমার ঠাম্মা। আমি ঠাম্মার কাছেই থাকি। গতবার আমার খুব অসুখ করেছিল তো। ডাক্তার দেখিয়েও সারছিল না। ঠাম্মা তখন মানত

করেছিল, আমি সেরে গেলে, আমাকে নিয়ে বড়কাছারিতে এসে পূজা দিয়ে যাবে। তাই এসেছি।

এ ধরনের উত্তরের জন্য একদম তৈরি ছিল না সাহেব। হাতটা কেমন আলগা হয়ে গেল। একটু দম নিয়ে বলল, পড়াশোনা ঠিক মতো করবে, বুঝে? মন দিয়ে পড়বে। ভাল মার্কস না পেলে... যে কথাগুলো ও ওর ছেলেকে বলে, বোনঝিকে বলে, ভাইপোকে বলে, সেই কথাগুলিই ও তাকে বলতে শুরু করল।

এতটা রাস্তা আসার পর সামনে আবার একটা ফ্লাড লাইট। তার হালকা আলোয় ও দেখল, মেয়েটা মাথা কাত করল। মাইকে তখন তারস্বরে গান বাজছে। মাঝে মাঝে হারিয়ে যাওয়া লোকের ঘোষণা। কেউ এসেছে ক্যানিং থেকে। কেউ এসেছে ডায়মন্ড হারবার থেকে। আবার কেউ এসেছে আরও দূর থেকে। একটু যেতেই জলছত্র। মেডিক্যাল ক্যাম্প। তার গা দিয়ে পর পর খেলনার দোকান। মেয়েদের ইমিটেশন গয়নার দোকান। হরের মাল সাড়ে ছ'টাকার পশরা।

ও বুঝতে পারল, কথা বলতে বলতে মেলার মুখে চলে এসেছে ওরা। ও প্রতি বছর সাধারণত সোজা গিয়ে মূল রাস্তা দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে যায়। আজ এই বৃদ্ধা যেতে যেতে হঠাৎ বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে পুকুর-পার ধরায় ও-ও সেই রাস্তা ধরল। ওর মনে হল, বৃদ্ধা নিশ্চয়ই এ দিকটা ভাল করে চেনেন। কারণ, এই রাস্তা দিয়ে কেবল দু'-চার জনই যাচ্ছে।

একটু যেতেই পর পর ডালার দোকান। একটা লম্বা মতো দোকানের সামনে হট করে বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে পড়তেই মেয়েটিও দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়ল ও-ও। এখানকার দোকানে দোকানে এত আলো, মনেই হচ্ছে না রাত। হঠাৎ করে কেউ দেখলে কী ভাববে, তাই সাহেব তার হাতটি ছেড়ে দিল। দোকানে খুব একটা ভিড় নেই। তবু মাল দেওয়ার জন্য চার-পাঁচ জন লোক। বৃদ্ধা একজনকে দশ টাকার ডালা দিতে বলতেই, সাহেব জানতে চাইল, কত করে কিলো?

অন্য একজন বিক্রেতা 'আশি টাকা' বলতেই ও বলল, আমাকে আড়াইশো দিন। আর চারটে মোমবাতি, এক প্যাকেট ধূপকাঠি। বলেই, একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিল। ততক্ষণে বৃদ্ধার দাম মেটানো হয়ে গেছে। বৃদ্ধা মন্দিরের দিকে পা বাড়াতেই মেয়েটি বলল, ওনার তো নেওয়া হয়নি। উনি নিয়ে নিক।

বৃদ্ধা বললেন, ও নিক না। নিয়ে আসুক। আমরা এগোই।

মেয়েটি আর কোনও কথা বলতে পারল না। গিজগিজ করছে লোক। বৃদ্ধার সঙ্গে এগোতে এগোতে বারবার পেছন ফিরে তার দিকে তাকাতে লাগল। দোকানদার ডাকতেই হুঁশ ফিরল ওর। ডালা ধূপকাঠি মোমবাতি আর ফিরতি পয়সা বুঝে নিয়ে ফের ও দিকে তাকাতেই দেখে, শুধু লোক আর লোক। ওরা কোথায়!

মন্দিরের প্রধান ফটক দিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালার সে কী হুড়োহুড়ি। পুকুরঘাট থেকে মন্দিরের ফটক পর্যন্ত অনেকগুলো ব্যারিকেড। কে কার আগে জল ঢালবে সে নিয়ে প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি। ধাক্কাধাক্কি। সামাল দেওয়া বড় দায়। ও দিকে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। মন্দিরের বাকি তিন দিকেও, যাঁদের মানত-টানত নেই, এমনিই পূজো দিতে এসেছেন, তাঁদের পূজো দেওয়ার ধুম। ওরা কোন দিকে গেছে, বুঝতে না পেরে, সামনেই যে দিকটা পড়ে, ও সে দিকে গেল। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে পিঠ টানটান করে মাথা তুলে তুলে ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে লাগল ওদের। কেমন যেন দেখতে ছিল মেয়েটা! কেমন যেন! কিছুতেই মুখটা মনে করতে পারল না ও। কী পরে ছিল সে! কী! ও হয়তো মনে করতে পারছে না, কিন্তু মেয়েটা তো চিনতে পারে। ডালার দোকান থেকে চলে যাওয়ার সময় সে যে-ভাবে তাকে বারবার ঘুরে ঘুরে দেখছিল, ও চিনতে না পারুক, মেয়েটা তাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে! সে চিনুক বা ও চিনুক। একজন চিনলেই হল। দেখা হওয়া নিয়ে কথা।

এ-দিকে ও-দিকে সে-দিকে, মন্দিরের যে তিন দিকে পূজো দেওয়ার তোড়জোড়, সেই তিন দিকেই ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ করে ও তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল মেয়েটাকে। হঠাৎ দেখে কালোর উপরে সোনালি জরির কাজ করা কামিজ পরা একটা মেয়ে। কামিজটা দেখেই ওর মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, এই তো সেই কামিজ! হ্যাঁ, এটাই তো! সে যখন ট্রেকারের মধ্যে প্রসাদ চরণামৃত নেওয়ার জন্য সফট্ ড্রিংকসের পাঁচশো এম এল-এর ছোট্ট ছোট্ট দুটো খালি বোতল ভরা কাঁধের পুঁচকে ব্যাগটা কোলের উপরে রেখে বাঁ হাতটা ইচ্ছে করেই বাড়িয়ে দিয়েছিল মেয়েটার উরুর ওপর, তখন তো এই কামিজটাই ও দেখেছিল। পরনে ছিল কালো স্ল্যাক্স। হ্যাঁ, এই কামিজটাই। ও এগিয়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে মেয়েটার সামনে পথ আগলে দাঁড়াল। মেয়েটার সঙ্গে



এক মুহূর্ত চোখাচেখিও হল। এবং তাতেই ও বুঝতে পারল, কামিজটা এক হলেও, এই মেয়েটা সেই মেয়েটা নয়।

ও এ বার কালো স্ল্যাক্স আর কালোর উপরে সোনালি জরির কাজ-করা কামিজ খুঁজতে লাগল। একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, ও রকম অনেকগুলো কামিজই ও দেখতে পেল। এবং কোনও কোনও কামিজের সঙ্গে একাধিকবার করে মুখোমুখিও হল। কিন্তু ও যার জন্য গোটা মন্দির চহর চষে বেড়াচ্ছে, তাকে দেখতে পেল না।

তা হলে কি ওরা চলে গেছে! কিন্তু যাবে কী করে! এখন তো মধ্যরাত। বড় রাস্তায় যত অটো, ট্রেকার বা ম্যাটাডর যাতায়াত করছে, সবই তো ওই বড়কাছারি আর জয়রামপুরের মধ্যে। তবে? তবে কি ওরা ঠাকুমা নাতনি মিলে মেলায় ঘুরছে! হতেই পারে। মাথার মধ্যে এটা ঢুকতেই ও মেলার দিকে হাঁটা দিল। আহা, তখন যদি বুদ্ধি করে মেয়েটার নামটা ও জেনে নিতে পারত! কিংবা ওর মোবাইল নম্বরটা যদি তাকে দিয়ে দিতে পারত! মেয়েটা যে ভাবে তখন দেখছিল, নম্বরটা পেলে নিশ্চয়ই তাকে ফোন করত! অবশ্যই করত। ওরা কোথায় থাকে যেন! আহা, কেন যে সে তখন ভাল করে সেটা শুনল না! আর সে যখন বললই, যদি আলিপুর, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, চিড়িয়াখানার ভ্যানতাড়া না মেরে সরাসরি স্পষ্ট করে বলত, আমি চেতলায় থাকি, তা হলেও, চালাক চতুর মেয়ে হলে হয়তো একবার খুঁজে দেখার চেষ্টা করত। সত্যি, সে না... একেবারে যা তা!

সে দিন সারা রাত মেলা চহর চষে বেড়িয়ে ভোরবেলায় বাড়ি ফিরে এসেছিল সাহেব। মেলায় গেলে, সেই জামাকাপড় না ধুয়ে ও আর পরে না। তাই তার বউ পরদিনই ওই চোস্ত পাঞ্জাবি ধুয়েটুয়ে ইস্ত্রিটিস্ত্রি করে রেখে দিয়েছিল। তাও প্রায় মাসখানেক তো হবেই।

কিন্তু অন্যান্য চোস্ত পাঞ্জাবি পরলেও ওটা আর পরছিল না ও। তাই পাশের ঘর থেকে জোরে হাঁক দিল অদ্রিজা, কী গো, এই পাঞ্জাবিটা তুমি পরবে না? না পরলে বলো, নামিয়ে দিই। নরম কাপড় তো, ঘরমোছার জন্য খুব ভাল হবে।

— ঘরমোছা! বউয়ের কথা কানে আসতেই গলার স্বর উঁচু করে ও বলল, না না। ঘরমোছার জন্য নামাবে কী? ওটা রেখে দাও। সামনের বার বড়কাছারিতে পরে যাব।



— বড়কাছারি! ওর বউ অবাক। এই তো সবে পুজো গেল। ফের পুজো আসতে এখনও এক বছরের ধাক্কা। তোমাকে এটা পরেই যেতে হবে? আর কি কোনও পাঞ্জাবি নেই?

চুপ হয়ে গেল সাহেব। সে বলতে পারল না— আছে। অনেকগুলো পাঞ্জাবিই আছে। কিন্তু ওই পাঞ্জাবি ওই একটাই। ওটা পরেই ও পরের বছর বড়কাছারিতে যেতে চায়। সে যেমন তার কালো স্ল্যাক্স আর কালোর উপর সোনালি কাজ করা কামিজ দেখে তাকে চিনতে পারবে, সেও তো তাকে এই পাঞ্জাবি দেখেই চিনতে পারে, এ-ই সে। ওটার যা অবস্থা, হয়তো আর দু’-একবারই পরা যাবে। না। ওটা সে আর মেলার আগে কিছুতেই পরবে না। কিছুতেই না।



## ছাতা

একটি তিনতলা বাড়ির ঝুলবারান্দার নীচে কোনও রকমে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। সরতে সরতে প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে লেপাটেও মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার তোড়ে ভেসে আসা ঝিরিঝিরি বৃষ্টির ছাঁট থেকে কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারছে না সে। এর মধ্যেই শাড়ির নীচের দিকটা একদম ভিজে গেছে। তাই ও এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে। কাছাকাছি এর থেকে বড় কোনও ছাউনি পাওয়া যায় কি না। পেলে এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়াবে। বলা যায় না, এই ছিটেফোঁটা বৃষ্টিই হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে মুষলধারে শুরু হয়ে যাবে।

যাদের তাড়া আছে, তাদের কেউ কেউ মাথায় রুমাল পেতে অথবা মাথার উপরে ব্যাগ কিংবা একটা ভাঁজ করা কোনও খবরের কাগজ ধরে বড় বড় পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে। আসলে বর্ষাকাল মানেই তো আর প্রতিদিন বৃষ্টি নয়। তা ছাড়া আজ যেহেতু সকাল থেকেই আকাশটা এত ঝকঝকে ছিল যে, কেউ ভাবতেই পারেনি হঠাৎ করে এমনটা হবে।

কানাই অবশ্য আর পাঁচ জনের থেকে একটু আলাদা। আকাশ যতই উজ্জ্বল থাকুক না কেন, ও ঠিক বুঝতে পারে, কখন বৃষ্টি নামবে। তাই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হওয়ার অনেক আগেই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে।

শোন দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক দেখতে দেখতে গাড়িরাস্তার প্রায় মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল সে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই মেয়েটি। গোলগাল চেহারা। হাইটটাও আর পাঁচটা গড়পড়তা বাঙালি মেয়ের মতোই। গায়ের রং ফর্সাই বলা যায়। খুব বেশি হলে বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। পরনে সিল্ক জাতীয় চকচকে শাড়ি।

এ রকম শাড়ি পরা মেয়েই তার বেশি পছন্দ। ছুঁলেই মনে হয় শাড়িটা পিছলে সরে যাবে। তাই বাসে বা ট্রেনে উঠলে, যত সুন্দরীই হোক না কেন,

সুতির শাড়ি পরা কোনও মেয়ে নয়— পাতলা, নরম শাড়ি পরা মেয়েদের দিকেই ও এগিয়ে যায়।

আরও কয়েক পা এগোতেই বুঝতে পারল, মেয়েটার সামনের চুলগুলো লক্স কাটা। কেন জানি না, তার বরাবরই মনে হয়, এই ধরনের লক্স কাটা চুলের মেয়েদের পটানো সবচেয়ে সহজ।

এমন হতেই পারে, কোনও এক সময় কোনও মেয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করার জন্য যখন সে এক পা এগিয়েছিল, তখন সেই মেয়েটাই হয়তো নিজে থেকে দু’পা এগিয়ে এসেছিল। এবং খুব সহজেই সেই আলাপটা হয়তো দানা বেঁধে উঠেছিল। খুব নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল একে অপরের সঙ্গে। হতেই পারে। আর সেই মেয়েটারই হয়তো এ রকম লক্স কাটা চুল ছিল। তাই তার মনের মধ্যে হয়তো গোঁথে গেছে, লক্স কাটা মেয়েদের তোলা খুব সহজ।

না। বেশি কাছে যেতে হল না। বিকেল ফুরোবার আগেই আজ অন্ধকার নেমে এসেছে ঠিকই। তবু কয়েক পা এগোতেই, ল্যাম্পপোস্টের তীর আলোয় ও লম্ব করল, মেয়েটি বিবাহিত।

ব্যস। হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেল কানাই। কারণ, তার বিশ্বাস— সিন্ধু শাড়ি, চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়স, লক্স কাটা চুল এবং তার উপরে সে যদি বিবাহিত হয়, তা হলে আর কোনও কথাই নেই। একেবারে ষোলোয় ষোলোআনা। সে যেন রেডি হয়েই দাঁড়িয়ে আছে কারও ইশারার জন্য।

কিন্তু এত হালকা বৃষ্টি! কী করে যে কী করবে, কানাই কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। বৃষ্টিটা একটু জোরে হলে না হয় ‘এই ছাতায় মানছে না’ ভান করে, ছাতা বন্ধ করে ওই ঝুলবারান্দার নীচে গিয়ে ওই মেয়েটির পাশে অনায়াসেই দাঁড়ানো যেত। দু’চার মিনিট পরেই, একা একাই বলা শুরু করত, ‘ইশ, কী শুরু হল না!’, ‘কখন যে থামবে!’, ‘এই রে, আরও জোরে নামল বোধহয়!...’ বলতে বলতে হঠাৎ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ফস করে বলে ফেলা যেত— দেখেছেন কী অবস্থা? একটা রিকশা পর্যন্ত নেই। বৃষ্টি নামার আর সময় পায় না। দেখবেন, রোজ ঠিক এই সময়ে...

তার পর অবস্থা বুঝে বলে ফেলা— আপনি কদুর যাবেন?

উনি যে দিকেই বলুন না কেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলা, তাই? আমিও তো ও দিকেই যাব। দাঁড়ান, বৃষ্টিটা একটু ধরুক। আমি আপনাকে এগিয়ে দেব।

আর সেটা শুনেও মেয়েটি যদি আপত্তি না করে, বাস, হয়ে গেল। তার পর একই ছাতার তলায় যেতে যেতে আরও কাছাকাছি হওয়া। কাঁধে কাঁধ লাগানো। রাস্তায় সামান্য জল জমে থাকলেও, তার থেকে বাঁচিয়ে তাকে নিয়ে হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ছাতার তলাটাকে কদম গাছের তলা ভেবে নেওয়া। তাকে রাধা আর নিজেকে কৃষ্ণ মনে করা। মনে করা কেন? সে তো আসলে কৃষ্ণই। কৃষ্ণেরই তো আরেক নাম কানাই, নাকি?

কিন্তু এই বিরিঝিরি বৃষ্টিতে ও সব কিছুই করা যাবে না। তাই মনে মনে সে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল, হে ভগবান, বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। আমি তোমাকে এগারো টাকা দিয়ে পূজো দেব।

আচ্ছা, এগারো টাকা কি খুব কম হয়ে গেল! সে যখন ছোট ছিল, পরীক্ষার রেজাল্ট আনতে যাওয়ার আগে মা কালীর সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোর করে বলত, তোমাকে পাঁচ সিকে দিয়ে পূজো দেব, তুমি আমাকে এ বারকার মতো পাশ করিয়ে দাও মা। এর পর থেকে আমি ঠিক ভাল ভাবে পড়ব, তুমি দেখে নিয়ো।

কিন্তু কোনও বারই ভাল ছাত্রদের মতো তার আর পড়া হত না। ডাংগুলি খেলে, ঘুড়ি উড়িয়ে, স্কুল কেটে বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরপাড়ে বসে বসে গল্প করে সময় কাটিয়ে দিত। আর প্রতিবারই যথারীতি রেজাল্ট বেরোবার কয়েক দিন আগে থেকে ঠাকুরকে ডাকত।

এবং অবাক কাণ্ড। ঠাকুর তার কথা শুনত। যে ভাবেই হোক, টায়টোয়, টেনেহিঁচড়ে কী করে যেন সে ঠিক পাশ করে যেত। আর পাশ করলেই যে কে সে-ই।

তখন পাঁচ সিকেয় কাজ হত। তার দামও ছিল। এখন তো সিকিই উঠে গেছে। আট আনাও উঠব উঠব করছে। সত্যি কথা বলতে কী, এখন এক টাকারও আর সে রকম কদর নেই।

এই তো সে দিন রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল। যেতে যেতে হঠাৎ দেখে, সামনের এক ভদ্রলোক প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বার করছে। রুমাল তো বেরোল, কিন্তু সেই রুমালের সঙ্গে যে পকেট থেকে এক টাকার একটা কয়েনও বেরিয়ে পড়ল এবং পড়বি তো পড় একেবারে রাস্তার মধ্যে, লোকটা সেটা খেয়ালই করল না।

পেছন থেকে ‘ও দাদা, দাদা, আপনার টাকা পড়ে গেছে’ বলতেই, লোকটা

ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝলক নীচের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কস্টিংয়ে পোষাবে না। বলেই, যে ভাবে হেঁটে গেল, কানাই অবাক। কস্টিংয়ে পোষাবে না মানে? পরে বুঝেছিল, ওই টাকা নিচু হয়ে তুলতে গেলে তার যা পরিশ্রম হবে, তার তুলনায় ওই টাকাটার মূল্য তুচ্ছ। অর্থাৎ, ওটা যদি এক টাকা না হয়ে দশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকার কয়েন হত, তা হলে হয়তো তুলত।

কিন্তু ঠাকুর দেবতারা তো এ সবে র থেকে অনেক উর্ধ্বে। তারা কি আর অত খোঁজখবর রাখে। বাসের ভাড়া দশ পয়সা থেকে কবে ছট করে পাঁচ টাকা হয়ে গেল। গ্রীষ্মকালের এক হাত লম্বা এক টাকার একদম টাটকা জবাফুলের মালা শীত পড়তেই কী ভাবে কমে এক বিঘত হয়ে যায়। অথচ দাম হয়ে যায় কম করেও তিন টাকা। পাঁচ পয়সার গুজিয়া দাম বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, মিষ্টির দোকানের মালিকরা শেষ পর্যন্ত লজ্জায় পড়ে গুজিয়া বানানোই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

না। ঠাকুরদের এ সব জানার কথা নয়। আর তারা যখন এ সব জানে না, তখন তাদের কাছে একশো টাকাও যা, এগারো টাকাও তাই। আর পাঁচ সিকেও তার ব্যতিক্রম নয়। না মা, এগারো টাকা নয়, তোমাকে আগেও যা দিতাম, এখনও তাই দেব। ওই পাঁচ সিকে দিয়েই পুজো দেব মা। একেবারে নগদা-নগদি। তুমি এই বৃষ্টিটাকে শুধু একটু জোরে করে দাও। একটু জোরে। না হলে যে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না মা। মা হয়ে তুমি সন্তানের ডাকে সাড়া দেবে না? আজ যদি তোমার নিজের ছেলে হত, তুমি কি এ ভাবে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারতে? তোমার কষ্ট হত না? একটু দয়া করো মা, একটু দয়া করো। বৃষ্টিটাকে একটু জোরে করে দাও মা।

কিন্তু দেখা গেল, এত কাকুতি-মিনতি করেও কোনও কাজ হল না। বৃষ্টির তেজ এতটুকুও বাড়ল না।

তবুও মেয়েটি যে বাড়িটির ঝুলবারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িরাস্তা থেকে কানাই উঠে গেল সেই ফুটপাথে। এবং তাজ্জব ব্যাপার, সে যখন মেয়েটিকে আড়চোখে দেখতে দেখতে তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল, দাদা, আপনি কি ওই দিকে যাচ্ছেন?

আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল কানাই। শুনেছে শুনেছে, ঠাকুর তার কথা শুনেছে। আর কোনও কথা নয়। এ বার তার কেরামতি দেখানোর পালা। তাই সে থমকে গিয়ে গদগদ হয়ে বলল, হ্যাঁ, ও দিকেই যাচ্ছি।

— আমাকে একটু বাসস্টপেজের কাছে ছেড়ে দেবেন?

— হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন না... বলেই, ছাতাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল কানাই। মেয়েটিও টুক করে ছাতার তলায় এসে তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

কানাই বুঝল, মাল ফেঁসেছে। একবার যখন মেয়েটি তার ছাতার তলায় এসেছে, তার নাইন্টি পারসেন্ট কাজ হয়ে গেছে। এই পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়সে কম মেয়েকে তো আর সে ছাতার তলায় আনেনি। কবে যে প্রথম কোন মেয়েটিকে এই ভাবে ছাতার তলায় সে এনেছিল, এখন আর মনেই পড়ে না। তবে হ্যাঁ, তার মধ্যেই বেশ কয়েক জন তার মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে গেছে। এখনও রাতে শুয়ে শুয়ে সেই সব কথা ভাবে। আহা, আরও যদি ও রকম ক'টা পাওয়া যেত...

কানাইয়ের বউ একটি রাষ্ট্রীয়ত্ব ব্যাঙ্কে খুব বড় পদে চাকরি করে। তার প্রায় দ্বিগুণ টাকা মাইনে পায়। স্বামীকে সে খুব কড়া শাসনে রাখে। এত কড়া শাসনে যে কানাই তার কাছে ঘেঁষতেই ভয় পায়। বউ স্নানে গেলে দরজার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বউয়ের স্নান করা দেখে। ঘুমের ভান করে খাটে শুয়ে শুয়ে বউয়ের শাড়ি ব্লাউজ পরা দেখে। এবং মেয়ে দেখলেই, যেখানেই হোক না কেন, সে বিয়েবাড়িই হোক কিংবা শ্রাদ্ধবাড়ি, নিকট আত্মীয়ই হোক অথবা অনাত্মীয়, পাশের বাড়ির বউদিই হোক বা বন্ধুর মেয়ে, সারাক্ষণই ছৌঁক ছৌঁক করে। তবে ওই পর্যন্তই। তার থেকে বেশি দূর সে এগোতেই পারে না।

না। শুধু যে বউকেই ভয় পায়, তা নয়। ভয় পায় একমাত্র ছেলেকেও। বউয়ের তত্ত্বাবধানেই ছেলে এখন ডাক্তারি পড়ছে। এনআরএসে। যদি কোনও ভাবে ও জানতে পারে! ছিঃ। তা হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় থাকবে না।

তার চেয়ে এই ভাল। বৃষ্টি বাদলার দিনে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়া। ছাতা তো নয়, যেন ছিপ। মাছ ধরার... থুড়ি, মেয়ে ধরার ছিপ। আর একবার যখন এই মেয়েটি তার ছিপে ধরা দিয়েছে, তখন তাকে আশ্তে আশ্তে ছিপ গোটাতে হবে। তার পর খপ্প করে...

কানাই আরও অনেক কিছু ভাবছিল। কিন্তু তার চিন্তায় হঠাৎ করে ছেদ টানল মেয়েটি। বলল, ভাগিাস আপনাকে পেলাম।

মুচকি হেসে কানাই বলল, তাই?

— না হলে কতক্ষণ দাঁড়াতে হত বলুন তো! এই বৃষ্টি কখন থামবে তার কোনও ঠিক আছে? আর এই বৃষ্টির মধ্যে এতটা পথ আসতে হলে তো হয়েই যেত। একেবারে ভিজে একশা হয়ে যেতাম।

— সেটা অবশ্য ঠিক... আপনি কোথায় যাবেন?

— ভিক্টোরিয়ার কাছে।

— ভিক্টোরিয়ার কাছে? আমিও তো ওখানেই যাব...

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, তাই নাকি? তা হলে তো ভালই হল, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

মনে মনে কানাই বলল, ভগবান যা করে, মঙ্গলের জন্যই করে।

না। বেশিক্ষণ লাগল না। কথা বলতে বলতে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল ওরা। আর দাঁড়াতেই দেখল, একটা বাস আসছে। বাসটা ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়েই যাবে। কানাই বলল, চলুন, এটা যাবে।

মেয়েটিও উঠে পড়ল। বাসটায় খুব একটা লোকজন নেই। প্রথম গেট দিয়ে উঠে সামনেই একটা সিট পেয়ে গেল কানাই। কিন্তু সামনে সিট থাকা সত্ত্বেও মেয়েটি পিছন দিকের লেডিস সিটে গিয়ে বসল।

কানাই বলল, এখানেই তো সিট ছিল। অত দূরে গেলেন কেন?

পিছন চাকার উপরে পাতা কাঠের উঁচু পাটাতনটা চোখের ইশারায় দেখিয়ে মেয়েটি বলল, এখানে পা রাখতে সুবিধে হয়।

কানাই শুধু বলল, ও... আচ্ছা আচ্ছা...

আগেই দুটো টিকিট কেটে নিয়েছিল কানাই। তাই বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম আসতেই মেয়েটির কাছে উঠে গেল সে। বলল, নামবেন না? এসে গেছে তো।

ওর কথা শুনে মেয়েটিও উঠে পড়ল।

বাস থেকে নেমে কানাই জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাবেন?

মেয়েটি বলল, ওই দিকে। আর আপনি?

— আমার পরে গেলেও চলবে। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে গাড়িরাস্তা পেরিয়ে ভিক্টোরিয়ার মূল ফটকের কাছাকাছি আসতেই কানাই বলল, এ দিকে কোথায়?

মেয়েটি বলল, এখানেই।



— এখানে! এখানে তো ভিক্টোরিয়া আর ও দিকে গড়ের মাঠ। কোথায় যাবেন?

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, কোথাও না। এখানেই দাঁড়াব।

— দাঁড়াব। মানে?

— মানে দাঁড়াব। আমি তো এখানেই দাঁড়াই।

— দাঁড়ান? কার জন্য?

মেয়েটি দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা কোণ টিপে বলল, এই ধরুন, এখন আপনার জন্য।

— মানে?

মেয়েটি আলতো করে হেসে বলল, আড়াল করার জন্য তো আপনার কাছে ছাতা আছেই। ভিক্টোরিয়ায় গেলে আশি টাকা। আর... বলেই, চোখের চাউনিতে গড়ের মাঠের দিকে ইশারা করে বলল, ও দিকে গেলে দেড়শো টাকা।

— টাকা!

মেয়েটি এ বার একটু রুদ্ধস্বরেই বলে উঠল, নয়তো কি মাগনায়?

ব্যস। মেয়েটি কী বলতে চাইছে, সেটা বুঝতে আর এক মুহূর্তও সময় লাগল না কানাইয়ের। ছিটকে ক'হাত দূরে সরে গেল। তার পর পড়ি কি মরি করে বড় বড় পা ফেলে, না কি দৌড়ে সে বাস স্টপেজে এসেছিল, বাস ধরেছিল, না কি রুদ্ধস্বাসে ছুটেই বাড়ি এসেছিল, এখন আর তা মনে পড়ে না।

তবে শুধু সে দিনই নয়, তার পর থেকে ওই দিনের কথাটা মনে পড়লেই কানাইয়ের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। হাত পা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। আর মনে মনে বলে, না। আর ছাতা নয়। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি কেন? মুষলধারে বৃষ্টি হলেও আর কক্ষনো ছাতা নয়। কক্ষনো নয়।



## মাছের চোখ

প্রতি বছরের মতো আজও সমস্ত রাস্তা গিয়ে মিশেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে। শুধু তেলিঘাটা বা জামালপুর নয়, গোটা দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগের দিন সন্দের আগেই এসে হাজির হয়েছে প্রতিযোগীরা। সকাল থেকেই খেলা শুরু হওয়ার কথা। সেই খেলা দেখার জন্য শুধু উৎসাহীরাই নয়, এমনি ছেলেমেয়েরাও ভিড় করেছে।

কালী এসে তাপসকে বলল, কী রে, যাবি না?

কোথায় যাওয়ার কথা বলছে বুঝতে পেরে তাপস বলল, বাবাকে আগে খাবারটা পৌঁছে দিয়ে আসি।

কালী জানে, ওর বাবা সকাল হলেই খেতে চলে যান। এই সময় তাপস ওর বাবার জন্য নুন, লঙ্কা, পেঁয়াজ-সমেত এক থালা পাস্তা নিয়ে যায় মাঠে। কিন্তু আজ যে খেলা আছে! তাই বলল, তোর বোন আছে না? ওকে দিয়ে পাঠিয়ে দে না। তাপসের মা উঠোনের এক ধারে মাটির পাতা উনুনে ধান সেদ্ধ করছিলেন। তিনি শুনে বললেন, কোথায় যাবি রে তোরা?

কালী বলল, আশ্রমে।

— আশ্রমে? পুরো নাম বনবাসী কল্যাণ আশ্রম হলেও স্থানীয় লোকেরা ওটাকে সংক্ষেপে শুধু আশ্রমই বলে। চারিদিকে বনবাদাড় আর জঙ্গল। দশ মাইলের মধ্যে পিচের রাস্তা নেই। এখনও বিদ্যুৎ ঢোকেনি। ফোনের লাইনের কথা না হয় বাদই দিলাম। এখানে মূলত আদিবাসীরাই থাকে। তাদের জীবন জীবিকা অত্যন্ত নিম্নমানের। ওদের স্বনির্ভর করতেই আশ্রমের লোকেরা আদিবাসী মেয়েদের নানা রকম হাতের কাজ শেখায়। বেতের কাজ, আসন বোনা, ধূপকাঠি তৈরি থেকে আচার বানানো। শেখার সময়েই ওদের কিছু কিছু হাতখরচা দেয়। আর শিখে নিজেরাই বাড়ি থেকে বানিয়ে নিয়ে এলে, সেগুলি আশ্রমই কিনে নিয়ে কলকাতায় সাপ্লাই করে। কয়েক দিন ধরে নাকি

বয়স্কদের পড়াশোনাও শেখানো হচ্ছে ওখানে। কিন্তু সে সব তো শুরু হয় দুপুরের পরে। এই সময়ে ওরা আশ্রমে যাবে শুনে ওর মা দ্রুত কোঁচকালেন।

কালী বলল, আজ খেলা আছে না...

‘খেলা’ শব্দটা ও এমন করে বলল, যেন নবান্ন, দুর্গাপূজো আর প্রতি বার শীতের শুরুতে তিন ক্রোশ দূরে বসা বারো ভূতের মেলার মতো এটাও একটা বিশাল উৎসব।

ওর মাও জানেন, এখানকার লোকেদের কাছে এটা একটা উৎসব। গোটা গ্রাম তো বটেই, আশপাশের গ্রামও ভেঙে পড়ে। তাই ভাবলেন, ও তো রোজই পড়াশোনা করে। দু’দিন ছাড়া ছাড়াই বাবার সঙ্গে খেতের টেঁড়স, বেগুন, গাছের নারকেল, এটা ওটা সেটা পেড়ে বিক্রির জন্য হাটে নিয়ে যায়। ছেলেমানুষ, একটা দিন যদি খেলা দেখতে যেতে চায় তো যাক না... আজ না হয় মেয়েই ওর বাবার জন্য খাবার নিয়ে গেল। না হলে সে নিজেই যাবে এক ফাঁকে। মাঠ তো আর বেশি দূরে নয়।

কালী বলল, তাড়াতাড়ি চল। ন’টার মধ্যে ওখানে পৌঁছতে হবে কিন্তু।

— ন’টার মধ্যে কেন? খেলা তো দশটার পরে শুরু হবে শুনলাম।

— না। ওরা তো বলল, খেলা শুরু হওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে এসে প্রতিযোগীদের রিপোর্ট করতে হবে।

— সে তো, যারা প্রতিযোগী, তাদের করতে হবে। আমাদের কী?

— আমাদের কী মানে? তোকে সে দিন বললাম না, তোর নামটা এ বার দিয়ে দেব...

— হ্যাঁ, বলেছিলি। কিন্তু আমি তো তোকে বারণ করে দিয়েছিলাম।

— বারণ করলেই হল? চল চল চল... তির-ধনুকটাও নিয়ে নে।

দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো ছিল ধনুক। আর তেলকণ্ঠি পড়া আদিকালের আলমারিটার মাথার উপরে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়ানো ছিল কতকগুলো তির। তাপস সেগুলো ঘর থেকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

কয়েক বছর আগে মা-বাবার সঙ্গে তাপস আর ওর বোন গিয়েছিল বারো ভূতের মেলায়। সেখানে ঘুরে ঘুরে ওরা নাগরদোলা চড়েছিল। ‘ইলেকট্রিক-মেয়ে’ দেখেছিল। তার গায়ে ঠেকালেই টিউবলাইট জ্বলে উঠছিল। ‘মানুষ-রাফস’ও দেখেছিল ওরা। লোকটা সব কাঁচা কাঁচা খাচ্ছিল। কুমড়ো, লাউডাটা,

কলা গাছ, বালিশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুলো, এমনকী শিশি বোতল, বাস্ণ পর্যন্ত ভেঙে ভেঙে খাচ্ছিল। ওরা পরোটা ঘুঘনি খেয়েছিল, বরফ-জল খেয়েছিল। ফুচকা খেয়েছিল। ঘুরে ঘুরে বাবা কিনেছিলেন তালপাতার পাখা, দা, ধামা। ওর মা কিনেছিলেন চিরুনি, কাচের ফ্রেমে বাঁধানো কালীঠাকুরের ছবি, ডালের কাঁটা। ওর বোন কিনেছিল চুলের ব্যান্ড, টিপের পাতা, নেলপালিশ। আর ও কিনেছিল তির-ধনুক।

তির-ধনুক দেখে ও আর ঠিক থাকতে পারেনি। তার ক’দিন আগেই দাদুর সঙ্গে ও বেলডাঙা গিয়েছিল। পিসির বাড়ি। তার কিছু দূরেই সাত দিন ধরে হচ্ছিল যাত্রা উৎসব। শেষ দিনে ওর পিসেমশাই ওদের নিয়ে গিয়েছিল যাত্রা দেখাতে— রামের বনবাস।

না। টিকিট কাটতে হয়নি। প্রথম ছ’দিন কলকাতার দল করলেও শেষ দিনেরটা করছিল উৎসব কমিটির আয়োজকরা। তাদের নাকি একটি শখের যাত্রাদল আছে। সেই দলে অভিনয় করছিল পিসেমশাইয়ের এক বন্ধু। সেই নাকি ওদের পাস দিয়েছিল।

রাম লক্ষ্মণের হাতে তির-ধনুক দেখে তাপসের খুব লোভ হয়েছিল। সোনার হরিণের রূপ ধরে আসা ভয়ঙ্কর মায়াবী মারীচকে কী ভাবে এক তিরে মেরে দিল রাম! মন্ত্র পড়ে ছাড়তেই একটা তির কী রকম দশটা হয়ে গেল! যে ছুড়ল, সে চাইতেই তির একেবারে ঐক্যবৈক্যে গিয়ে তার লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধল! কই, বন্দুকের গুলি তো এ রকম হয় না!

তাই যাত্রা ভেঙে যাওয়ার পর যখন ওর পিসেমশাই তার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করানোর জন্য সাজঘরে নিয়ে গেল, ওর দাদুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, ও কিন্তু তখন তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা তিরটাকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। কী সুন্দর রংচঙে! মনে হচ্ছে রাংতা দিয়ে মোড়া!

এই তিরের জন্য কত কী না হয়েছে! অন্ধমুনির ছেলে বাবা-মায়ের জন্য খাবার জল আনতে গিয়ে নদীতে কলসি ডোবাতেই বগবগ করে এমন শব্দ হয়েছিল যে, দশরথ ভেবেছিলেন, কোনও হরিণ বুঝি জল খাচ্ছে। তাই শিকার করার জন্য সেই শব্দ লক্ষ করে তিনি এ রকমই একটি শব্দবাণ ছুড়েছিলেন। আর তাতেই ঘটেছিল মহাবিপত্তি। আর একটু হলেই, লক্ষ্যায় যাওয়ার জন্য রাম এই তির ছুড়েই সমুদ্র শুকিয়ে দিচ্ছিলেন আর কী! এই তির

দিয়েই মাছ নয়, জলে মাছের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মাছের চোখ বিদ্ধ করেছিলেন অর্জুন! ভাবা যায়!

তির দিয়ে কী না হয়! ভাবতে ভাবতে তিরটার কাছে চলে গিয়েছিল ও। দেখার জন্য হাতে নিতেই ড্রেস ছাড়তে থাকা যাত্রার জাম্বুবান ও পাশ থেকে রে রে করে উঠেছিল। তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দু’চার ধমকও দিয়েছিল সে। বলেছিল, এখানে কী করছিস রে? যা।

তির-ধনুকটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখাও হয়নি তার। উনি বকার সঙ্গে সঙ্গে দাদুর কাছে চলে না গেলে হয়তো সাজঘর থেকে তাকে সে বেরই করে দিত। মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। তাই বারো ভূতের মেলায় তির-ধনুকটা দেখেই ও বাবার কাছে বায়না করেছিল। ওর বাবা আর আপত্তি করেননি। ওকে একটা কিনে দিয়েছিলেন।

একটা ধনুকের সঙ্গে একটাই তির। কিন্তু ওর নাছোড়বান্দা স্বভাবের কাছে হার মেনে গিয়েছিলেন দোকানদার। শেষ পর্যন্ত বাড়তি একটা তির তাপসকে দিয়েছিলেন তিনি। সেই তির-ধনুক ওর সব সময়ের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বারবার শক্ত জায়গায় মারলে যদি তিরের ছুঁচলো মাথাটা নষ্ট হয়ে যায়, তাই গাছের কাণ্ডে বেশ পুরু করে মাটির দলা লাগিয়ে ও সেটাকে তাক করে মারত। প্রথম প্রথম কাণ্ডের আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত। তার পর আস্তে আস্তে সোজা গিয়ে বিঁধতে শুরু করল কাণ্ডের গায়ে লাগানো মাটির মধ্যে। প্রথম দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাটি লাগাতে হলেও পরের দিকে আর অতটা লাগাতে হত না। ঘুঁটের মতো একটা চাপড়া লাগিয়ে নিলেই হত। তিরের ফলায় মাটি লেগে গেলে এক মুঠো ঘাস ছিঁড়ে খুব ভাল করে মুছে নিত। কিন্তু দুটো তিরে আর ক’দিনই বা চলে! তাই নিজেই বাঁশ কেটে বানিয়ে নিয়েছিল বেশ কয়েকটা।

মারতে মারতে ওর এমন টিপ হয়ে গিয়েছিল যে, পেয়ারা পাড়তে গেলে ওর কোনও বন্ধুকেই আর গাছে উঠতে হত না। ও চার-পাঁচটা তির ছুড়লেই একটা না একটা পেয়ারায় ঠিকই লাগত। কিন্তু লাগলেই যে পেয়ারা পড়ত তা নয়। তাই ওর বন্ধু কালীই ওকে বুদ্ধি দিয়েছিল, তিরের ফলাটা টিনের টুকরো দিয়ে মুড়ে পাথরে ঘষে ঘষে চোখা করে নিতে। ও তাই করেছিল।

তার পর থেকে সরাসরি আমে মারলে ধারালো ফলা আমের গায়ে গেঁথে যেত। সেটা পাড়ার জন্য সেই গাছেই উঠতে হত ওকে বা ওর কোনও

বন্ধুকে। তাই কে যেন ওকে বুদ্ধি দিয়েছিল, তিরের পেছন দিকে ফুটো করে অ... নে... ক...টা লম্বা নাইলনের সুতো বেঁধে নিতে। ও তাই করেছিল। তাতে আম বা পেয়ারার গায়ে তির গেঁথে গেলেও ধনুকের লেজে বাঁধা ওই সুতোর শেষ প্রান্তটা ধরে জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেই তির সুদ্ধ আম, পেয়ারাও চলে আসত। সব সময়ই যে তিরের সঙ্গে ফলটাও আসত তা নয়, তাই ও আর ফলে মারত না। মারত, ফল ধরে রাখা বোঁটায়। ফলে ও তির চালানো মানেই নির্ধাত ফলের পতন।

ওর ওই অব্যর্থ টিপ দেখেই ক’দিন আগে কালী বলেছিল, এত ভাল টিপ তোর, তুই নাম দিচ্ছিস না কেন? এ বার আশ্রমে যে আচারি কমপিটিশন হবে, তোর নামটা আমি দিয়ে দেব।

ও গাঁইগুঁই করলেও ওর নামটা লিখিয়ে এসেছিল কালী। সে জানে, তার বন্ধু কেমন। হয়তো মনেই নেই তার। তাই সকালেই ওকে নিতে এসেছে সে। সেই জোর করে ওকে নিয়ে গেল আশ্রমের মাঠে।

মাঠটা খুব বড়। তার এক দিকে সার সার ঘর। ঘরগুলিতে ঢালাও বিছানা পাতা। দূর দূর থেকে আসা প্রতিযোগীরা এখানে থাকছে। ঘরের সামনে দিয়ে টানা লম্বা বারান্দা। মাথার উপরে টিনের ছাউনি। সেখানে লোকে লোকারণ্য। তার এক কোণে চায়ের ব্যবস্থা। এই দাওয়ার সামনে দিয়েই শুরু হয়েছে মাঠ। মাঠের ও দিকে পর পর অনেকগুলো টার্গেট ফেস লাগানো। কয়েকটা কাছে। কয়েকটা দূরে। কয়েকটা আবার আরও দূরে। টার্গেট ফেসগুলো ভারী অদ্ভুত, একটার পর একটা বিভিন্ন রঙের বৃত্ত। ও বুঝতে পারছে, ওটার মাঝখানে মারতে হবে। কিন্তু অতগুলো রং কেন?

ওর প্রশ্নের উত্তর কালীরও জানা নেই। তাই আয়োজকদের একজনের কাছে তাপসকে নিয়ে গেল সে। সেই আয়োজকের পাশেই বসেছিল আমন্ত্রিত হয়ে আসা এক কোচ— রাজেন্দ্র গুইয়া। তখনও প্রতিযোগিতা শুরু হয়নি। ওর প্রশ্ন শুনে তিনি ওকে নিয়ে গেলেন মাঠের ও দিকে টাঙানো টার্গেট ফেসের কাছে। একটার পর একটা বিভিন্ন রঙের বৃত্ত। একদম মাঝখানে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বললেন, এই দ্যাখো, এখানে এই যে হলুদ রঙের একটা বৃত্ত দেখছ, এই বৃত্তটাকে কিন্তু কালো সফ্র লাইন দিয়ে তিনটে ভাগে ভাগ করা আছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বৃত্তের যে কোনও জায়গাতেই তির মারো না কেন, লাগলেই পুরো দশ পয়েন্ট পাবে। তৃতীয় বৃত্তে লাগলে ন’পয়েন্ট।



তাপস বলল, তাই যদি হয়, তা হলে শুধু শুধু আলাদা একটা লাইন টেনে এই দশ পয়েন্টের হলুদ বৃত্তটাকে দু'ভাগ করা হয়েছে কেন?

উনি বললেন, এই দুটো বৃত্তের যে-কোনও জায়গায় লাগলে দশ পয়েন্ট পাবে ঠিকই, কিন্তু খেলার শেষে যদি দেখা যায়, দু'জন বা তিন জনের একই স্কোর, তখন দেখা হয়, কে ক'টা এক্স-এ মেরেছে।

— এক্সে মানে?

— এই দ্যাখো, মাঝখানে এই যে চিহ্নটা আছে...

তাপস এতক্ষণ খেয়াল করেনি। উনি বলাতে ও দেখল, বৃত্তটার একদম মাঝখানে ছোট্ট একটা যোগ চিহ্ন। ও কিছু বলতে যাওয়ার আগেই তিনি বললেন, এটাকে বলে এক্স। এটাকে ঘিরে যে প্রথম হলুদ বৃত্ত, এখানে মারলে পয়েন্ট হিসেবে দশ নম্বর পেলেও এটার মূল্য কিন্তু আলাদা। একদম আলাদা। এটাকে এক্সেলেন্টও বলতে পারো।

— আর এই লালটা?

— হ্যাঁ, হলুদের পরেই যে গোলাকার লাল বৃত্তটা দেখছ, এখানে খেয়াল করে দ্যাখো, এখানে কিন্তু একটার পর একটা অনেকগুলো রঙের বৃত্ত আছে। প্রত্যেকটা রঙের বৃত্তই কিন্তু সফর একটা কালো রেখা দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা আছে। তোমাকে তো আগেই বললাম, হলুদের প্রথম দুটো বৃত্তের যে কোনও জায়গায় লাগলেই দশ পয়েন্ট। তৃতীয় বৃত্তে লাগলে ন'পয়েন্ট। এর পরেই প্রথম যে লাল বৃত্তটা দেখছ, সেটায় মারলে আট পয়েন্ট। তার পরের লালটায় মারলে সাত পয়েন্ট। ঠিক এই ভাবেই এর পরের প্রথম নীলে লাগলে ছয় পয়েন্ট। দ্বিতীয়টায় লাগলে পাঁচ পয়েন্ট। তার পরের কালোটায় লাগলে চার এবং তারও পরের কালোটায় লাগলে তিন পয়েন্ট। আর সব শেষের বৃত্ত— এই সাদাটায় লাগলে দুই আর শেষ সাদাটায় লাগলে এক পয়েন্ট। প্রত্যেকটা বৃত্তই কিন্তু আট সেন্টিমিটার করে চওড়া।

— কত পয়েন্ট হলে জিতবে?

— তোমাকে এখানে পর পর ছ'টা তির মারতে হবে। যে তির যেখানে লাগবে, সেই অনুযায়ী পয়েন্ট পাবে। তার পর সেগুলি যোগ করে যার নম্বর সবচেয়ে বেশি হবে, সে-ই ট্রফি জিতবে।

— কিন্তু আমার কাছে তো অতগুলো তির নেই।

— ক'টা আছে?



— তিনটে।

— তিনটে! কোথায়?

— ওই যে, আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে, ওর কাছে।

সার সার ঘরগুলোর সামনের দাওয়ায় প্রচুর ভিড় থাকলেও দূর থেকে তাপসের দেখিয়ে দেওয়া কালীকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হল না রাজেন্দ্রর। কালীর হাতের ধনুক দেখে তাপসের দিতে তাকালেন তিনি। বললেন, তুমি কি এই তির দিয়ে লড়বে নাকি?

ও বলল, হ্যাঁ। কেন?

রাজেন্দ্র থ' হয়ে গেল। বাঁশের তির তো কোন ছাড়, বাতাসে বাঁক খেতে খেতে যায় দেখে অ্যালুমিনিয়ামের তিরও এখন আর কেউই প্রায় ব্যবহার করে না। অনেক দিন আগেই ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে! আর এ কিনা এই তির দিয়ে লড়বে!

ও এখানে মূলত বিচারক হিসেবে এলেও ওর আসল উদ্দেশ্য সত্যিকারের প্রতিভাধর দু'-একজন তিরন্দাজকে খুঁজে বের করা। সে জন্য নিজে থেকেই বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ঘুরে বেড়ায় ও। কখনও চলে যায় পুরুলিয়ায়। কখনও বাঁকুড়ায়। আর আজ এসেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের এই তেলিঘাটায়। ও জানে, জিন একটা বড় ফ্যাক্টর। এই আদিবাসী উপজাতিদের রক্তেই মিশে আছে তির-ধনুক। তাদের যদি ঠিক মতো প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তা হলে তারা অনেক সহজেই নিজেদের একটা জায়গা করে নিতে পারবে। যে ভাবে পেরেছিল লিম্বারাম, শ্যামলালেরা।

সেই কবে কোন প্রস্তরযুগে শিকার করার জন্য পাইন গাছের ডাল কেটে তির-ধনুক বানাত লোকেরা। তাম্রযুগে তো ইজিপ্টের লোকেরা রীতিমত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত তির-ধনুক। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, চৌষটি হাজার বছর আগে পাথরের মাথা ঘষে ঘষে তিরের ফলা বানানো হত আফ্রিকায়। যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও আট ন'হাজার বছর আগে ইউরোপের অ্যাহেনসবার্গ উপত্যকার স্টেল মুর-এ প্রথম 'ডি' আকৃতির ধনুক বানাতে শুরু করে প্যালিওলিথিক ম্যাসোলিথিকরা। এই তো সে দিন, উনিশশো চল্লিশ সালে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এই ধরনের দুটো ধনুক পাওয়া গিয়েছিল ডেনমার্কের হোমগার্ডে।

তির-ধনুক কি আজকের কথা! সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে

চলে আসছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে পরেই উইল এবং মরিস থমসনকে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিতে হয়। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। অবসরের সময় তাঁদের বন্দুকগুলিও জমা দিয়ে দিতে হয়েছিল। ফলে শিকারের জন্য তাঁরা বেছে নেন তির-ধনুককেই। আর তির ছুড়তে ছুড়তে তাঁরা তির-ধনুকের এতটাই প্রেমে পড়ে যান যে, তাঁরা এটাকে খেলা হিসেবে প্রচলন করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে এসে গাঁটছড়া বাঁধেন তাঁদের এক ভৃত্যও। তিনি আবার ইংলিশ স্টাইলের তিরন্দাজি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তাঁর কাছ থেকে সে সব শুনে মরিস একটা বইই লিখে ফেললেন— দ্য উইচারি অব আর্চারি। যা অনেক দিন পর্যন্ত বেস্ট সেলারের জায়গাটা দখল করে রেখেছিল।

১৯৭২ সালে মিউনিখ গেমসে তিরন্দাজিকে খেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ দেশে উনিশশো ত্রিযাত্রের সালে তৈরি হয় আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া। তালিম দেওয়া শুরু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে। পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠে বরানগর আর্চারি ক্লাব আর কলকাতা আর্চারি ক্লাব। তার পর কত কী অদলবদল হয়েছে। কত আধুনিক হয়েছে তির-ধনুক। আর এ কিনা বলছে এই বাঁশের তির-ধনুক দিয়ে লড়বে!

রাজেন্দ্র ওকে মাঠ থেকে নিয়ে এলেন সার সার ঘরের শেষ দিকের একটা ঘরে। সেই ঘরে পর পর রাখা আছে অনেকগুলো ধনুক। ওগুলো দেখে তাপস চমকে উঠল। এগুলো ধনুক! কোনওটার দু'দিকে কী সব চাকা-টাকা লাগানো। কোনওটার সামনে দূরবিনের মতো কী সব, তো কোনওটায় আবার মিটারের মতো ছোট্ট কী একটা লাগানো। মারবে তো তির, তার জন্য আবার এত কী! ও কিছু বলতে যাওয়ার আগেই রাজেন্দ্র সেখান থেকে একটি গ্লাস ফাইবারের ধনুক ওর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তুমি যে তির-ধনুক নিয়ে এসেছ, সেটা দিয়ে এদের সঙ্গে তুমি লড়বে কী করে? তোমাকে খেলতে হবে এই তির-ধনুক নিয়ে। এ দিকে এসো... বলে, ওকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, ওই টার্গেট ফেস লক্ষ করে একটা তির ছোড়ো তো দেখি!

তাপস ধনুক তুলল ঠিকই, কিন্তু এ রকম ধনুক এর আগে ও কখনও হাতে নেয়নি। এতে হাজার রকম ফ্যাচাং। ফলে কী ভাবে তির মারতে হবে ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। তবু তাক করে মারতেই তিরটা টার্গেট ফেসের অনেক উঁচু দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাজেন্দ্র বললেন, তুমি কী ভাবে টিপ করেছ?

ও বলল, যে ভাবে করি, সেই ভাবে।

রাজেন্দ্র বললেন, এটা বাঁশের ধনুক নয় যে তিরের মাথা দিয়ে টার্গেটটাকে লক্ষ করে মারবে। ও ভাবে মারলে হবে না। এই ধনুক ব্যবহার করার একটা কৌশল আছে। আগে ধনুকটাকে ঠিক ভাবে ধরো। বলেই, উনি নিজেই দেখিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যান্ডেলটার এখানে আঙুল দিয়ে এই ভাবে ধরো। তিরের উপরের দিকটা অ্যারো রেস্টে রেখে এ বার স্ট্রিংয়ের এই নকিং পয়েন্টে তিরের পেছনটা আটকে ছিলাটাকে টেনে, যেটাকে মারতে চাও, দূরবিনের মতো এই লাল রঙের সাইট পিন দিয়ে সেটাকে তাক করে তার পর ছেড়ে দাও। তবে তার আগে এই আর্ম গার্ড আর ফিংগার ট্যাপটা পরে নাও।

পরা তো দূরের কথা। এর আগে এগুলো ও কোনও দিন চোখেই দেখেনি। নামও শোনেনি। মারবে তির, তার জন্য আবার এ সব পরা কেন? ও জিজ্ঞেস করল, এগুলো পরতে হবে?

রাজেন্দ্র বললেন, খুব জোরে ছিলাটাকে টানতে হয় তো, এগুলো না পরলে আচমকা পেশিতে লেগে যেতে পারে। আচ্ছা, নাও, চালাও দেখি...

এত দিন ধরে তির চালাচ্ছে সে, অথচ আজকে এই নতুন ধনুকটা তুলে হাতটাকে ও ঠিক মতো স্থিরই রাখতে পারছে না। থরথর করে কাঁপছে। তবু চালিয়ে দিল তাপস। কিন্তু ওর তির হলুদ, লাল, নীল, কালো, সাদা কোনও বৃত্তেই লাগল না। টার্গেট ফেসের অনেক দূর থেকে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ সব ক'টাই তাই হল। পঞ্চমটা সাদা বৃত্তের বাইরে টার্গের ফেসের চতুষ্কোণের একটা কোণে গিয়ে লাগল। তার পরেরটাও তাই। যারা ওর তির ছোড়া দেখছিল, তারা ওকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। হাসছিল বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও। একজন তো রাজেন্দ্রকে বলেই ফেলল, আগে ধনুক ধরা শেখান স্যার, তার পরে হাতে তির দেবেন।

রাজেন্দ্র বললেন, তুমি বরং নামটা তুলে নাও। এখানে কারা নাম দিয়েছে জানো?

কে নাম দিয়েছে, তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ওর। ওর মনে হল, যে লোকটা নিজে থেকে এগিয়ে এসে ওর হাতে তির-ধনুক তুলে দিয়েছেন, তিনি যখন এ কথা বলছেন, তখন নিশ্চয়ই ওকে হাস্যকর হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই বলছেন। ওনাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। তবু ও মুখে

কোনও কথা বলল না। ও তখন পালাতে পারলে বাঁচে। তাই রাজেন্দ্রর হাতে তির-ধনুকটা কোনও রকমে দিয়েই পাশে দাঁড়ানো কালীর দিকে তাকিয়ে ও বলল, না রে, আমার দ্বারা হবে না।

তাপসের থমথমে মুখ দেখে কালী ওকে আর প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে না নেওয়ার জন্য চাপ দেয়নি। শুধু বলল, ঠিক আছে, তাকে খেলতে হবে না। চল। তবে, তার আগে কথা দে, দুপুরবেলায় তুই আমাকে অনেকগুলো আম পেড়ে দিবি?

আম পাড়া আর এমনকী! একটা তির ছুড়লেই তো একটা আম। তাই বলেছিল, ঠিক আছে পেড়ে দেব।

দুপুরে কালী আসেনি। তাই আম পাড়তে যাওয়াও হয়নি তার। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হওয়ার মুখে, তখন কালী এসে হাজির। ওর পীড়াপীড়িতেই কালীর সঙ্গে ও গেল লক্ষ্মীদের আমবাগানে। যেখানে অনেকগুলো আম গাছ পর পর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কালী বলল, আমি তোকে যে আমগুলো পাড়তে বলব, তুই শুধু সেগুলোই পাড়বি। অন্য আম পাড়লে কিন্তু হবে না।

ও বলল, ঠিক আছে।

তার পর কালী যে আমটাকেই দেখিয়ে দেয়, ও সেটাকেই লক্ষ করে তির ছোড়ে। আর চোখের পলক পড়ার আগেই সেটা মাটিতে এসে পড়ে। একটা নয়, দুটো নয়, টপাটপ পড়তে লাগল একটার পর একটা আম। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ঝুড়ির উপরে হয়ে গেল।

কালী বললে হয়তো আরও পাড়ত। কিন্তু তার আগেই পিছনের একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়াল থেকে রুমা ম্যাডাম বলে উঠলেন, এক্সেলেন্ট।

পেছন ফিরে তাপস দেখল, একজন ভদ্রমহিলা। যাকে ও আজ সকালেই বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে দেখেছিল। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষেই তিনি নাকি কলকাতা থেকে এসেছেন। তিনি ওকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

তাপস বলল, কোথায়?

উনি বললেন, কলকাতায়।

সে দিন সন্ধ্যাতেই ওদের বাড়ি গিয়ে রুমা ম্যাডাম আর রাজেন্দ্র ওর বাবা-মাকে কী বুঝিয়েছেন, তাপস জানে না। শুধু জানে, তার বাবা-মা রাজি

হয়ে গেছেন। তাই পরদিন সকালে একটা কিট-ব্যাগে কয়েকটা জামা প্যান্ট নিয়ে ওদের সঙ্গেই কলকাতার পথে পা বাড়িয়েছিল তাপস। ওদের দু'জনের সঙ্গেই নাকি খুব ভাল সম্পর্ক ক্যালকাটা আর্চারি ক্লাবের। তাপসকে সেখানে ভর্তি করে দিলেন রুমা ম্যাডাম। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন রাজেন্দ্র। ওখানে যেমন ট্রেনিং হয়, হতা। ওঁরা নিজেরা গিয়েও মাঝে মাঝে তালিম দিয়ে আসতেন।

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে কুড়ি কি তিরিশ মিটার দূর থেকে তির ছুড়তে হত। এখন ও সত্তর মিটার দূর থেকে ছোড়ে। সাব জুনিয়ারে এক ফিটার রাউন্ড ওকে খেলতে হবে। এক ফিটার রাউন্ড মানে সত্তর মিটার, ষাট মিটার, পঞ্চাশ মিটার আর তিরিশ মিটার দূর থেকে পর পর ছ'টা করে ছ'বার, মানে এক-একটা দূরত্ব থেকে ছত্রিশটা করে, মোট চারটি দূরত্ব থেকে একশো চুয়াল্লিশটা তির ছুড়তে হবে।

তার বয়স যখন কুড়ি বছর পেরিয়ে যাবে, তখন সে জুনিয়র বা তারও পরে যখন সিনিয়রে যাবে, তখন তাকে তিরিশ, পঞ্চাশ, সত্তর আর নব্বই মিটার দূর থেকে তির ছুড়তে হবে। মেয়ে হলে অবশ্য একটা-দুটো ক্ষেত্রে দশ মিটার করে দূরত্ব কমে যেত। কিন্তু সে তো আর মেয়ে নয়। তাই সেটা ভেবে তার কোনও লাভ নেই।

এখন তার একটাই লক্ষ্য, ওই একশো চুয়াল্লিশটা তির ছুড়ে যত বেশি নম্বর তোলা যায় সে তুলবে। ওই একশো চুয়াল্লিশটা তির ঠিক ঠিক জায়গায় মারতে পারলে নাকি একেবারে চোদ্দোশো চল্লিশ পয়েন্ট তোলা যায়। কয়েক দিন আগে ছত্তিসগড়ের রায়পুরে সাব জুনিয়র ন্যাশনালে খেলতে গিয়ে কার কাছে যেন ও শুনেছিল, দু'হাজার দশ সালের এশিয়ান গেমসে নাকি কোরিয়ার একটি ছেলে— কিম মু জিম, তেরোশো সাতাশি পয়েন্ট করেছিল। এখন অবধি ছেলেদের মধ্যে ওটাই হায়েস্ট স্কোর। তবে এখনও পর্যন্ত সর্বকালের রেকর্ড পয়েন্টের অধিকারী কিন্তু কোরিয়ার একটি মেয়ে— পার্ক সান হুম। দু'হাজার চার সালে সে করেছিল চোদ্দোশো নয়। যেটা কল্পনা করাও মুশকিল।

তবু আজকাল তাপসের মনে হচ্ছে, ওরা যদি পারে, আমি কেন পারব না? এখন তো সাই থেকে আমাকে কোরিয়ান উইন অ্যান্ড উইন-এর ধনুক দিয়েছে। এক লাখ টাকাতো ও যা পাওয়া যাবে না। এটা দিয়ে তির ছুড়লে

যেমন সোজা যায়, তেমনই ছোটোও ভীষণ জোরে। তির ছোড়ার জন্য শক্তিও লাগে কম। ঈঙ্গিত লক্ষ্যেও পৌঁছনো যায় অনেক সহজে। তা ছাড়া মাঝে মাঝেই ধর্মেন্দ্র তেওয়ারি, পূর্ণিমা মাহাতোর মতো জগদ্বিখ্যাত কোচেরাও এখানে এসে আমাদের ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছেন। তা হলে আমরা পারব না কেন?

একেবারে জান প্রাণ লাগিয়ে দিয়েছিল তাপস। সেই গেমসে ফাটাফাটি পয়েন্ট পেয়েছিল ও। আর সেটার জন্যই আগামী অলিম্পিকের জন্য যে বত্রিশ জন ছেলেমেয়েকে বেছে নেওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় নাম উঠেছে ওর। পরে ও জেনেছে, নির্বাচন কমিটিতে নাকি সেই রুমা ম্যাডাম আর রাজেন্দ্রও ছিলেন।

এখন প্রত্যেক দিন সাইতে তার দু'বেলা অনুশীলন চলছে। সকালবেলায় জ্যাম বা মাখন দিয়ে ছ'পিস রুটি, এক গ্লাস দুধ, একটা কলা আর দুটো ডিম খেয়ে মাঠে চলে আসে। ন'টা থেকে বারোটা অবধি টানা প্র্যাক্টিস করে। তার পর ফিরে যায় ক'হাত দূরের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। গ্যালারির নীচের একটা ঘরে কয়েক জন তিরন্দাজের সঙ্গে ও থাকে। সেখানে স্নানটান সেরে হয় মাছ, নয়তো ডিম দিয়ে ডাল ভাত তরকারি খেয়ে একটু বিশ্রাম। ফের সাড়ে তিনটের মধ্যে এক গ্লাস দুধ খেয়ে মাঠে। সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা পর্যন্ত অনুশীলন। রাত হওয়ার আগেই ভাত কিংবা রুটি, হয় তরকা, নয়তো ঘুঘনি, সঙ্গে একটা ডিম, কোনও কোনও দিন অবশ্য মাংসও হয়, খেয়ে টানা ঘুমা। এটা এখন সপ্তাহের ছ'দিনের রুটিন হয়ে গেছে ওর। মাঝেমধ্যেই একঘেয়েমি লাগে। তবু আর্চারি মাঠে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ওর শরীর যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ওদের যে বত্রিশ জন অলিম্পিকের জন্য তৈরি হচ্ছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল রাখল। তাই ওকে দেখিয়ে ক'দিন আগে রুমা ম্যাডাম বলেছিলেন, ওকে দ্যাখো, একটা ছেলে কারাতে শিখতে শিখতে বারো বছরের মধ্যে আর্চারির কোন জায়গায় পৌঁছে গেছে। ওর মতো হতে পারবে?

ওকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করলে কিংবা অন্য কারও মতো হতে বললেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়। ও তো ও-ই। ও অন্যের মতো হতে যাবে কেন? তাই একটু রেগেই গিয়েছিল ও। মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, ও যা হয়েছে, ওর দিদির জন্য হয়েছে। মাথার ওপর ও রকম একটা দিদি থাকলে



বারো বছর নয়, আমি বারো মাসেই ওর জায়গায় পৌঁছে যেতাম।

রুমা ম্যাডামের হাতেই তৈরি হয়েছিল ওর দিদি দোলা ব্যানার্জি। এখন তিরন্দাজিতে এক নম্বর। ওর দোহাই দিতেই তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ওর দিদি যে-ই হোক। কম্পিটিশনের সময় কিন্তু ওর দিদি তির ছুড়তে আসবে না। মাঠে দাঁড়িয়ে ওকেই মারতে হবে। জানবে, পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই কোনও না কোনও কাজের জন্য জন্মায়। বেশির ভাগ লোক সারা জীবনেও জানতে পারে না, সে কীসের জন্য জন্মেছে। যদি জানতে পারত, আর সেটাতেই যদি মনপ্রাণ সাঁপে দিত, তা হলে প্রত্যেকেই সফল হত।

যার মূর্তি গড়ার কথা, সে টেবিল টেনিস খেলছে। যার নেতা হওয়ার কথা, সে সাঁতার শিখে সময় নষ্ট করছে। সচিন তেডুলকর যদি ক্রিকেট না খেলে ছবি আঁকতেন, তা হলে কি সফল হতেন? অভিনয়ে না এসে অমিতাভ বচ্চন যদি ওঁর বাবার মতো কবিতাই লিখতেন, তা হলে কি ওঁকে নিয়ে এই ভাবে কেউ নাচানাচি করত? আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে নিজেকে জানতে হয়, কীসের জন্য তার জন্ম। আর সেটা জানতে পারলেই, কেবলা ফতে। আমার তো মনে হয়, রাহুলের জন্মই হয়েছে তিরন্দাজ হওয়ার জন্য। সে জন্য তাক করার সময় ও অন্য কোনও রং দেখে না। শুধু হলুদটা দ্যাখে, শুধু হলুদটা।

সে দিন ঘরে ফিরে গিয়ে সারা রাত আর দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি ও। শুধু ভেবেছে, কীসের জন্য তার জন্ম! কীসের জন্য! কীসের জন্য!

অলিম্পিক গেমসের এখনও অনেক দিন বাকি। গতকাল শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সকালে চোখ খুলতেই পারছিল না। তবু প্রতিদিনকার মতো ন'টা বাজার আগেই আঁচারি গ্রাউন্ডে চলে এল ও। টার্গেট ফেসের দিকে তাকাতেই ও দেখল, কোথায় পেছনের বিশাল বিশাল সবুজ গাছপালা! কোথায় তারও পেছন থেকে উঁকি মারতে থাকা আকাশ ছুঁই ছুঁই স্টেডিয়ামের গ্যালারি! কোথায় তার উপরের আকাশ! ও কিছু দেখতে পেল না। কিছু না। সব কেমন যেন হলুদ হয়ে গেছে। আর সেই হলুদের মাঝখানে বিশাল একটা যোগচিহ্ন। যেটাকে দেখিয়ে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মাঠে রাজেন্দ্র গুইয়া তাকে বলেছিলেন, এটাকে বলে এক্স। এটাকে ঘিরে যে প্রথম হলুদ বৃত্ত, এখানে মারলে পয়েন্ট হিসেবে দশ নম্বর পেলোও এটার মূল্য কিন্তু

আলাদা। একদম আলাদা। কারও সঙ্গে ভ্রু হয়ে গেলে তখন দেখা হয়, কে ক'টা এক্স-এ মেরেছে। এটাকে এক্সেলেন্টও বলতে পারো।

ও ক'দিন ধরেই তির মারার সময় সাদা নয়, কালো নয়, নীল নয়, লাল নয়, শুধু হলুদ দেখছিল। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আর হলুদও দেখছে না। হলুদের মাঝখানে যে আকাশ জোড়া যোগচিহ্নটা জ্বলজ্বল করেছে, ও কেবল সেটাই দেখছে, শুধু সেটাই। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর মনে হল, ওটা কোনও যোগচিহ্ন নয়, ওটা একটা চোখ। মাছের চোখ। জলে যার প্রতিবিম্ব দেখে অর্জুন তির ছুড়েছিলেন, সেই চোখ।

## ৪৫ পুনর্জন্ম

সিঙ্ঘানিয়া পরিবারে আনন্দের আর সীমা নেই। তাঁদের একমাত্র মেয়ে আবার তাঁদের কাছে ফিরে এসেছে। কে বলে পুনর্জন্ম বলে কিছু হয় না? প্রায় আট বছর আগের ঘটনা। প্রিয়াক্ষর বয়স তখন খুব বেশি হলে সাত কি আট। হঠাৎ বাড়ির মধ্য থেকে উধাও। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। থানা পুলিশ করা হল। সিঙ্ঘানিয়া পরিবারের মেয়ে বলে কথা! সমস্ত মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল। নড়েচড়ে বসল পুলিশ প্রশাসন। সঙ্গে সঙ্গে জরুরি বৈঠক ডেকে উপর মহল থেকে সতর্ক করে দেওয়া হল আকাশ, রেল, জল, এমনকী সড়ক পথের সমস্ত পাহারা-চৌকিকেও।

কিন্তু না। তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। প্রতিটা মুহূর্ত তখন সিঙ্ঘানিয়া পরিবারের কাছে যেন এক-একটা যুগ। বিকেল গড়াতেই অস্থির হয়ে উঠলেন বাড়ির লোকজনেরা। কোনও উপায় না দেখে শেষমেশ বাড়ির কর্তা সংবাদ মাধ্যমের সামনে ঘোষণা করে দিলেন— যে তাঁর মেয়ের সন্ধান দিতে পারবে তাকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

সিঙ্ঘানিয়াদের বিশাল প্রতিপত্তি। চার পুরুষের ব্যবসা। শুধু কলকাতা, চেন্নাই বা বেঙ্গালুরুতেই নয়, তাঁদের ব্যবসা ছড়িয়ে আছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ফুড প্রসেসিং থেকে নার্সিংহোম, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে চা বাগান, মোটর সাইকেল থেকে সিমেন্ট কারখানা। কী নেই তাঁদের? তেমনই বিশাল বাড়ি। ছবির মতো বিশাল লন। লনের মধ্যে বসার জন্য কারুকাজ করা বড় বড় রঙিন ছাতার নীচে টি-টেবিল ঘিরে চারটে, ছ'টা চেয়ার। মর্নিংওয়াক করে এখানেই প্রাতরাশ সারেন বাড়ির কর্তা। কখনও-সখনও বিকেলেও বসেন। অফিস বা কারখানার বিশেষ কেউ এলে এখানে বসেই সেরে নেন ছোটখাটো আলোচনা। এমনিও, সময় পেলেই মাঝে মাঝে এসে বসেন। কারণ, এই তল্লাটে এত গাছগাছালিওয়ালা বাড়ি আর একটাও নেই।

থাকবেই বা কী করে! তিন পুরুষ আগে যখন এই বাড়ি তৈরি হয়, তখন এটা ছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে একটু দূরেই। যাঁরা একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাইতেন, তাঁরাই এ সব জায়গায় বাড়ি বানাতেন।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহর যত বড় হয়েছে, লোপাট হয়ে গেছে নিরিবিলি। উধাও হয়ে গেছে গাছপালা। লোকজনের ভিড় আর গাড়ির ধোঁয়া গ্রাস করেছে আশপাশের অঞ্চল। দেখতে দেখতে জমজমাট থেকে ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে তাঁদের এলাকাটাও।

আগে, বহু আগে যাঁরা বাড়ি করেছিলেন, তাঁদের বংশধরেরা প্রায় সকলেই একে একে প্রমোটারদের খপ্পরে পড়েছেন। সেখানে মাথা তুলেছে আকাশ ছোঁয়া এক-একটা বাড়ি। কেউ কেউ নিজে থেকেই বিক্রি করে চলে গেছেন শহরতলিতে। কিছু টাকা দিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই বানিয়ে, বাকি টাকাটা ফিল্ড করে দিয়েছেন ব্যাঙ্কে। তার সুদেই তাঁদের সংসার চলে।

কিন্তু সিঙ্ঘানিয়াদের ব্যাপারটা আলাদা। যত দিন গেছে তাঁদের ব্যবসাপত্র, প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা ততই বেড়েছে। আর তার জোরেই এত কিছুর মধ্যেও তাঁরা ঠিক আগলে রাখতে পেরেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষের করে যাওয়া এই বিশাল বাড়ি। আর কেউ যাতে এক বিঘত, দু'বিঘত করে ঠেলেঠেলে তাঁদের সীমানার ভিতরে থাবা বসাতে না পারে, সে জন্য এই কিছু দিন আগেই সারভেন্ট কোয়ার্টার-সহ পুরো বাড়িটাই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। বাইরে থেকে হুট করে কেউ ঢুকলে মনে হয়, এ কোথায় এলাম রে বাবা! এটা বাড়ি! না, বাগানবাড়ি! এই গাছপালার জন্যই বুঝি এত পাখি আনাগোনা করে এখানে। গাছের ডালে বসে কিচিরমিচির করে।

গান নয়, কোনও যন্ত্রসংগীত নয়, তাঁর সবচেয়ে প্রিয়— পাখিদের এই কলকাকলিই। আর এটা শোনার জন্যই, যখনই সময় পান, তিনি চলে আসেন এখানে। কান পেতে তন্ময় হয়ে শোনে সেই মধুর ধ্বনি।

এটা জানতে পেরে কে যেন তাঁকে বলেছিলেন, এতই যখন পাখির গুঞ্জন শুনতে ভালবাসেন, এত জায়গা আপনার, বিশাল বড় বড় খাঁচা বানিয়ে তার মধ্যে ইচ্ছেমতো নানান জাতের পাখি এনে পুষলেই তো পারেন। সেটা শুনে বাড়ির কর্তা তাঁকে বলেছিলেন, খাঁচার পাখির ডাক আর প্রকৃতির মধ্যে মনের আনন্দে পাখা মেলে ঘুরে বেড়ানো পাখির ডাক কি এক?

লোকটা অবাক হয়ে বলেছিলেন, আলাদা নাকি?

উনি বলেছিলেন, অবশ্যই আলাদা। সেটা বোঝার জন্য শুধু কানই নয়, একটা মনও দরকার।

এমনই কূজন-প্রেমিক তিনি। এটা ছাড়াও আর একটা বিষয়ে তার দুর্বলতা রয়েছে, সেটা হল ব্যাডমিন্টন। তাই এই লনেরই এর পাশে বানিয়েছেন ব্যাডমিন্টন কোর্ট। অন্য দিকে সুইমিং পুল। সুইমিং পুলের ও ধার দিয়ে সার সার ঝাউগাছ। সন্ধেবেলায় বাগানের আলোগুলো জ্বললে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কোথা দিয়ে যে সময় গড়িয়ে যায়, বোঝাই যায় না। এ ছাড়াও তাঁর আর একটা হবি হল— গাড়ি। নতুন কোনও মডেল বেরোলেই হল, তাঁর সেটা কেনা চাই-ই চাই। ফলে, বাড়িতে যত না লোক, তার চেয়ে বেশি গাড়ি। এবং কাজের লোক।

সেই সিঙ্ঘানিয়া পরিবারের মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়তেই ছুটে আসতে লাগলেন আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে তাঁদের কোম্পানির তাবড় তাবড় পদাধিকারীরা। আশপাশের রাস্তা ভরে যেতে লাগল সার সার গাড়িতে। তার মধ্যে কত গাড়িতে যে লালবাতি লাগানো কে জানে!

সবার মুখে তখন একটাই কথা, টাকার জন্য কেউ ওকে অপহরণ করেনি তো! ইদানীং খুব শুরু হয়েছে এটা। এখন এ রাজ্যে ব্যবসা করতে হলে সরকারকে শুধু ট্যাক্স দিলেই হবে না, রাজনৈতিক নেতাদের হাত যাদের মাথার উপরে আছে, তাদের দৌরাখ্যও সহ্য করতে হবে। একটু গাঁইগুঁই করলেই শুরু হবে হুমকি। ভয় দেখানো। তাতেও কাজ না হলে বাইকে করে এসে গুলি করে চলে যাবে। এতে ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু না দিলে তাঁদের সঙ্গেও যে এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে, এ রকম একটা আতঙ্ক অনায়াসেই ছড়িয়ে দেওয়া যায় অন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ফলে চাওয়ামাত্র ওঁরা তখন সুড়সুড় করে টাকা বার করে দেন, সেটা ওরা জানে। আর এটাও জানে, ওরা যাই করুক না কেন, থানা পুলিশ ওদের কিছু করবে না।

তবু, তার পরেও যদি কেউ বেঁকে বসেন, তখন হুমকি দেওয়া হয় তাঁর ছেলে বা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার। কিংবা খতম করে দেওয়ার।

কিন্তু এ সব তো হয় উঠতি ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে। তাঁদের সঙ্গে এ রকম হবে কেন? আর যদিও বা হয়, কত টাকা চায় ওরা? যাই চাক না কেন, মেয়েকে ফেরত পাওয়ার জন্য তাঁরা সব দিতে রাজি। দরকার হলে অপহরণকারীরা

যা চাইবে, পুলিশকে অন্ধকারে রেখেই তাঁরা তা তুলে দিয়ে আসবে ওদের হাতে।

কিন্তু কত চায় ওরা? সেটা জানার জন্য সবাই যখন ফোনের কাছে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন, এফ্ফুনি ফোন এল বলে, প্রতিটা মুহূর্ত উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছেন— ঠিক তখনই, কে যেন দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, প্রিয়াঙ্কার নিখর দেহ ভেসে উঠেছে বাড়ির সুইমিং পুলে।

গোটা পরিবার স্তব্ধ হয়ে গেল। রঙিন মাছ রাখার অ্যাকুরিয়ামের মতো বিশাল একটা পাত্র অর্ডার দিয়ে বানিয়ে, দেড়-দু'বছর বয়স থেকেই বাড়িতে দক্ষ প্রশিক্ষক আনিয়ে যে মেয়েকে নিয়মিত সাঁতার শেখানো হয়েছে, যে মাঝে মাঝেই এই সুইমিং পুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়, সে কিনা ডুবে গেল সেই সুইমিং পুলের মাত্র তিন ফুট জলে! এটা হতে পারে! না, কখনও সম্ভব! সন্দেহ হল সবার।

দেহ পাঠিয়ে দেওয়া হল মর্গে। পোস্টমর্টেমে জানা গেল, তাকে স্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। কিন্তু তার গলায় আঙুলের কোনও ছাপ পাওয়া যায়নি।

কে মারল তাকে! পরিবারের সবার চোখে মুখে তখন একটাই প্রশ্ন। কিন্তু কার দিকে আঙুল তুলবেন তাঁরা! বাড়িতে দশ-বারো জন কাজের লোক। তারাও শোকে বিহ্বল। সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়ল সেই আয়া। জন্মানোর পর থেকেই যে তাকে কোলে পিঠে করে বড় করে তুলেছে। ও তার সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে পড়েছিল যে, মেয়ে বড় হওয়ার পরে তাকে যখন ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা উঠল, সেই আয়া এতটাই ভেঙে পড়েছিল যে, নিজে থেকেই বলেছিল, আমাকে ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন না। আমাকে যেটা মাসে মাসে দেন, না হয় সেটা দেবেন না। তবু ওর কাছ থেকে আমাকে চলে যেতে বলবেন না। ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।

সে যেমন প্রিয়াঙ্কাকে ছেড়ে যেতে চায়নি, প্রিয়াঙ্কাও তাকে ছাড়তে চায়নি। তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে শুনে রীতিমত কান্না জুড়ে দিয়েছিল। ফলে মেয়ের জনাই সিঙ্ঘানিয়া পরিবারের কর্তা শেষ পর্যন্ত তাকে রেখে দিয়েছিলেন। সেই আয়া দু'দিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে তৃতীয় দিন কাঁদতে কাঁদতে জানিয়ে দিল, প্রিয়াঙ্কাই যখন নেই, তখন আমি আর থেকে কী করব?

প্রিয়াঙ্কার একমাত্র দাদা আয়ুষ তখন সবেমাত্র উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। সিঙ্ঘানিয়া পরিবারের ছেলেরা উচ্চমাধ্যমিকের পরে সাধারণত উচ্চশিক্ষার



জন্য বিদেশে পাড়ি দেয়। কিন্তু হঠাৎ অমন একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায়, বাড়ির লোকেরা তাঁদের সবেধন নীলমণি একমাত্র ছেলেকে আর বাইরে পাঠাতে চাননি। পাঠানওনি।

মামাখান থেকে পেরিয়ে গেছে আট-আটটা বছর। সিঙ্ঘানিয়া পরিবারও সামলে উঠেছে মেয়ের শোক। আয়ুষও পড়াশোনা শেষ করে শুধু বাবার ব্যবসাতেই যোগ দেয়নি, বলতে গেলে পুরো ব্যবসাই রীতিমত দেখভাল করছে। এবং বাবার ব্যবসার পাশাপাশি নিজেও খুলেছে বেশ কয়েকটি অন্য ধারার নতুন ব্যবসা। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছে যেটা, সেটা হল— সত্যসন্ধানী নামে তার বড় সাধের প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা।

না। অন্যান্য ছোটখাটো সংস্থার মতো বিয়ের আগে পাত্রীপক্ষের ফরমাল মতো তারা পাত্রপক্ষের খোঁজটোজ এনে দেয় না। বিশেষ কারও আবেদনে সাড়া দিয়ে, কারও পিছু পিছু ঘুরে তার গতিবিধির খবরাখবর সরবরাহ করে না। বউ কার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে, সে সব নিয়েও ওরা মাথা ঘামায় না।

ওদের সব কিছুই বড় বড়। মারাত্মক কোনও গলদ নজরে আসার পরে বড় কোনও কোম্পানির কর্ণধার যখন থানা-পুলিশ করার আগে, চুপিচুপি একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে নিতে চান, সত্যিই গলদ হয়েছে, না কি তাঁরই ভুল, তখন তিনি ওদের শরণাপন্ন হন। ওরাও ঠিক বার করে দেয় সেই কেলেঙ্কারির নেপথ্যে আসলে কী, সরকারি বড় কোনও ঘাপলার পিছনে কোন নেতা, মন্ত্রী বা আইএস, আইপিএসরা জড়িত। বিশাল অঙ্কের আর্থিক তহরুপের আড়ালে আসলে কাদের হাত রয়েছে। এই রকম বড় বড় কাজ ছাড়া ওরা হাতই দেয় না।

এই সব নানান কাজে জড়িয়ে পড়ায় আয়ুষ প্রায় ভুলতেই বসেছিল তার বোনের কথা। ঠিক এমন সময় এই খবর। মুখে বুলি ফোটার পর থেকেই নাকি একটি বাচ্চা মেয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলত। তখন কেউ সে ভাবে আমল দেয়নি। এখন তার বছর সাতেক বয়েস। আশপাশের লোকেরা বলছে, সে নাকি জাতিস্মর। পূর্বজন্মের কথা সব বলতে পারে। সে বলছে, সে নাকি সিঙ্ঘানিয়া পরিবারের সেই মেয়ে, যাকে তার আয়া গলা টিপে খুন করেছিল।

আয়ুষ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই খবর শুনে সে আর ঠিক

থাকতে পারল না। তার বাবা-মাও সেই মেয়েকে দেখার জন্য এতটাই উতলা হয়ে উঠলেন যে, সব কাজ ফেলে খোঁজ করে করে তাকে যেতে হল ঢাকুরিয়া স্টেশনের খুব কাছেই, রেল লাইনের ধারের একটা ছোট্ট ঝুপড়িতে। যে মেয়ে আগের জন্মে অমন একটা পরিবারে জন্মেছিল, সে মেয়ে এ জন্মে কী করে এ রকম একটা হতদরিদ্র ঘরে জন্মায়! ও কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছিল না। না। এ মেয়ে কিছুতেই তার বোন হতে পারে না। বোনের সঙ্গে এর কোনও মিলই নেই। না চেহারা। না কথাবার্তা। না আচরণে। তবু তাকে বাজিয়ে দেখার জন্য সে বলল, তুমি আমাকে চেনো?

মেয়েটি বলল, চিনি মানে? হাড়ে হাড়ে চিনি। তুই আমার হেলিকপ্টারের রিমোট লুকিয়ে রেখেছিলি। কোথায় রেখেছিস রে?

আয়ুষ অবাক হয়ে গেল। ওই মর্মান্তিক ঘটনার ক’দিন আগেই ওর বাবা ওর বোনের জন্য একটা হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছিলেন। ওটা রিমোটে চলত। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও, ও ওটা ওর পড়ার সময় ঘরের মধ্যে ওড়াচ্ছিল দেখে, বোনের হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে ও লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সে কথা এ জানল কী করে!

ফের প্রশ্ন করল ও, বলো তো আমি কী জমাতাম?

— স্ট্যাম্প। এই, তোর কাছে যে মালয়েশিয়ার তিনটে স্ট্যাম্প ছিল, তুই বলেছিলি লায়লার সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করে একটা রবীন্দ্রনাথ নিবি, নিয়েছিলি?

আয়ুষ একেবারে হাঁ। হ্যাঁ, তার কাছে একই স্ট্যাম্প দুটো হয়ে গেলে, আর কালবিলম্ব না করে, সে তড়িঘড়ি তার থেকে একটা দিয়ে, তার কাছে যে স্ট্যাম্প নেই, সেটা নিয়ে নিত ওদের স্ট্যাম্প ক্লাবের কারও না কারও কাছ থেকে। আর মালয়েশিয়ার একই স্ট্যাম্প তিনটে হয়ে যাওয়ায় সে তার বোনকে বলেছিল, এই স্ট্যাম্প তো লায়লার কাছে নেই, এর থেকে একটা দিয়ে ওর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাম্পটা নেব। কারণ, লায়লার কাছে দুটো রবীন্দ্রনাথ আছে। কিন্তু এ কথা তো সে আর তার বোন ছাড়া অন্য কারও জানার কথা নয়। তবে কি...

আবার কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল আয়ুষ, তার আগেই মেয়েটি বলল, সুচিদি কেমন আছে রে?

এ বার আর হতভম্ব নয়, আয়ুষ একেবারে বোল্ড আউট। মিডল উইকেট হিটকে গেল। কারণ, সুচির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা একমাত্র তার বোনই

জানত। তার বোনই তার লেখা প্রথম হাতচিঠি পৌঁছে দিয়েছিল সূচির কাছে।  
এই তা হলে তার সেই বোন!

আর কোনও সংশয় রইল না। আয়ুষ যখন জানতে পারল, তাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিগুষ্টি, এমনকী তাদের বাড়ির কাজের কোনও লোকের সঙ্গেও এই মেয়েটির কোনও রকম যোগাযোগ নেই— যা আছে, তা শুধু পূর্বজন্মের সূত্র ধরেই, তখন সামান্য কুয়াশাটুকুও তার মন থেকে সরে গেল।

আয়ুষের বাবা-মা উঠেপড়ে লাগলেন তাঁদের হারানো মেয়েকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসার জন্য। প্রথম প্রথম আপত্তি করলেও সিঙ্ঘানিয়া পরিবারের দেওয়া বিপুল টাকা এবং নানান লোভনীয় প্রতিশ্রুতির কাছে শেষ পর্যন্ত নত হলেন মেয়েটির বাবা-মা। ফলে এ জন্মে অন্য ঘরে জন্মালেও, ও যাঁদের মেয়ে, তাঁদের কাছেই ফিরে এল। গোটা বাড়ি আলো দিয়ে সাজানো হল। অসময়েই মহা ধুমধাম করে করা হল জয় মাতাদির পুজো। সাত দিন ধরে চলল মহোৎসব। দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করা হল বস্ত্র। পথবাসীদের হাতে হাতে তুলে দেওয়া হল কঞ্চল। সব মিলিয়ে আয়ুষদের পরিবার ভেসে যেতে লাগল আনন্দের জোয়ারে।

কোনও মাসে একবার, কোনও মাসে দু'বার, আবার কোনও মাসে তিন বার আয়ুষ ওর বোনকে নিয়ে যেত ঢাকুরিয়ার রেল লাইনের ধারের ওই ঝুপড়িতে। ওর মা-বাবার কাছে। না। ওর মা-বাবার এ বাড়িতে ঢোকান কোনও অনুমতি ছিল না। কারণ সিঙ্ঘানিয়া পরিবারের ধারণা ছিল, যে যেখানে যে ভাবে বড় হয়েছে, তাকে সেখান থেকে একদম আলাদা করে তুলে এনে যদি নতুন কোনও জায়গায় রাখা যায়, তা হলে সেখানে থাকতে থাকতে সেও একদিন নতুন জায়গার আদব-কায়দা শিখে পুরোপুরি সেই জায়গার মতো হয়ে ওঠে।

কিন্তু তার শিকড়বাকড় সুদূর তাকে নিয়ে এলে, সেই শিকড়বাকড়ই তাকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে যে, সে ইচ্ছে করলেও তার থেকে আর বাইরে বেরোতে পারে না। তাই ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা।

কিন্তু মা-বাবা বলে কথা! তাঁরাই বা সন্তানকে না দেখে থাকেন কী করে! তা ছাড়া, মুখে কিছু না বললেও, যাঁদের সঙ্গে ও এত দিন কাটিয়েছে, সেই বাবা-মাকে দেখার জন্য তার মনপ্রাণও তো ছটফট করতে পারে! গুমরে

গুমরে কাঁদতে পারে! না। তাকে আমরা আমাদের কাছে রাখতে চাই বলে, তাকে কষ্ট দেওয়ার কোনও অধিকার আমাদের নেই। পরিবারের কর্তা এ কথা বলতেই, সবাই মিলে ঠিক করেছিলেন, আয়ুষ তার বোনকে মাঝে মাঝেই তার এ জন্মের বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে যাবে। দেখা করিয়ে আনবে।

সেই মতো একদিন প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই ঝুপড়ি থেকে এক মহিলাকে বেরোতে দেখে আয়ুষ একেবারে চমকে ওঠে। হ্যাঁ, চেহারায়ে অনেক বদল ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু চিনতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি। এই মহিলাটি আর কেউ নয়, তার বোনের নৃশংস হত্যাকারী, সেই আয়াই।

এ এখানে কী করতে এসেছে! ও-জন্মে মেরে আশ মেটেনি, তাই এ-জন্মেও কি সে তার বোনকে শেষ করতে চায়? কী তার উদ্দেশ্য? খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আয়ুষ তার গোয়েন্দা সংস্থা ‘সত্যসন্ধানী’ থেকে বাছাই করা কয়েক জন দক্ষ কর্মচারীকে নিয়ে পুরোদস্তুর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যদি তেমন কোনও তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করা যায়, তা হলে মাঝখান থেকে আট-আটটা বছর পার হয়ে গেলেও, সেই অপকর্মের জন্য ও এই আয়ার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে। করবেই।

আঁটঘাট বেঁধে, সব খবরাখবর জোগাড় করে, যাদবপুর থানা থেকে তার এক পুলিশ অফিসার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সে একদিন হানা দিল ওই মহিলাটির ডেরায়। পুলিশ আর আয়ুষকে দেখে সে যেন ভূত দেখল। ভয়ে একদম জড়সড় হয়ে গেল। একটা চড়াপড়ও মারতে হল না। দু’-চারটে ধমক দিয়ে জেরা করতেই সে গড়গড় করে বলে গেল— ওই বাড়িতে কাজ করতে করতেই আমার সঙ্গে রজনীশের আলাপ হয়। ও ছিল ওই বাড়ির গাড়ির চালক। বাড়ির বললে ভুল হবে। ও ছিল প্রিয়াঙ্কার গাড়ির চালক। প্রিয়াঙ্কাকে স্কুলে নিয়ে যেত। নিয়ে আসত। আর আমি যেহেতু প্রিয়াঙ্কার দেখভাল করতাম, তাই ওকে ঠিক মতো স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে কি না, মনে করে ও ওয়াটার বোতলটা নিয়েছে কি না, কিংবা ফিরে এসে কী খাবে, কিছু বলেছে কি না, এ সব ওর কাছেই জিজ্ঞেস করতাম। ফলে সেই সূত্র ধরেই ওই আলাপটা কয়েক দিনের মধ্যেই নিবিড় একটা সম্পর্কে পরিণত হয়। আমরা তখন একে অপরকে না দেখে দু’দণ্ডও থাকতে পারতাম না। দু’জনে একটু একসঙ্গে থাকার জন্য পাগল হয়ে উঠতাম। সুযোগ পেলেই বাড়ির মধ্যে কোনও ফাঁকা জায়গায় চলে যেতাম। একসঙ্গে নিভতে কাটাতাম। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়

আর নিরাপদ জায়গা ছিল, সুইমিং পুলের পিছনে, ঝাউগাছগুলোর ও দিকের ঝোপের আড়ালটা। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা দু'জনে কাছাকাছি হলেই যেন আগুনে ঘি পড়ত। না। আদর তো নয়ই, চুমুটুমুও নয়। এমনকী জড়াজড়ি করেও সময় নষ্ট করার ছেলে ছিল না ও। প্রথমেই আমার শরীর-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাবুডুবু খাওয়া শুরু করত। সাঁতার কাটত।

সে দিন দু'জন মালিই ছুটি নিয়েছিল। তাই আমরা সেই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইনি। সকাল থেকেই তক্কে তক্কে ছিলাম। কখন সুযোগ পাব। বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ সবার নজর এড়িয়ে অবশেষে ওখানে গিয়ে আমরা যখন ভালবাসায় মেতে উঠেছি, এতটাই মেতে উঠেছি যে, কোনও দিকে তাকাবার ফুরসতই নেই। ভুলে গেছি, অন্যান্য দিনের মতো মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখে নেওয়া, এ দিকে কেউ আসছে কি না।

ঠিক তখনই, সুইমিং পুলে নামার জন্য আসতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা বোধহয় কোনও রঙিন প্রজাপতি দেখেছিল। আর সেটা ধরার জন্য পিছু পিছু ধাওয়া করে ও বুঝি ও দিকে চলে এসেছিল। এবং কী করে যেন আমাদের দেখেও ফেলেছিল। বয়সে ছোট হলেও ও বুঝতে পারত সব। আমাদের দেখেই ও বলল, তোমরা এখানে কী করছ? আমি পাপাকে সব বলে দেব।

ওর গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিলাম। আমি শাড়িটাড়ি পরেই ছিলাম। তাই আমিই প্রথমে ওর কাছে ছুটে গিয়ে এটা-ওটা বলে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলাম। তাতেও কাজ না হওয়ায় নানা রকম কথা বলে ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ও যাতে ওর বাবাকে না বলে, সে জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করতে লাগলাম। কিন্তু ও শুনল না। ওর সেই একই কথা, আমি পাপাকে সব বলে দেব।

ও যদি সত্যিই ওর বাবাকে বলে দেয়, তা হলে তো একেবারে সাড়ে সর্বনাশ। এ বার কী হবে! আমরা যখন এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি, রজনীশ বলল, নাঃ, আর কোনও উপায় নেই। বলেই, আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই, আচমকা ও প্রিয়াঙ্কার গলা টিপে ধরল। ও রকম কোনও ঘটনা যে ঘটতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি! আমি একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। যখন সংবিৎ ফিরল, আমি ওর হাত ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওর গায়ের জোরের সঙ্গে কি আমি পারি!

— কিন্তু পোস্টমর্টেমে তো আঙুলের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি...



আয়ুষের কথা শেষ হওয়ার আগেই সেই পুলিশ অফিসারটির দিকে তাকিয়ে আয়া বলল, পাবে কী করে? ও বাড়ির লোকেরা খাবার সার্ভ করার সময় যেমন মাথায় টুপি পরে নেয়, রান্নার সময় রাঁধুনিরা অ্যাপ্রন পরে রান্না করে, ঠিক তেমনই ড্রাইভাররাও সব সময় টিপটপ থাকে। মাথায় হ্যাট, পায়ে শ্যু, হাতে গ্লাভস।

— আপনি যে বললেন...

— হ্যাঁ, আমরা ঝাউগাছের আড়ালেই ছিলাম। কিন্তু প্রিয়াঙ্কার গলা শুনেই আমি কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ও আমাদের ওই অবস্থায় দেখে ফেলেনি তো! কী করব, কী বলব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। রজনীশের কিন্তু ও সব কিছু হয়নি। ও ধীরে সুস্থে জামা প্যান্ট, টুপিফুপি পরে নিয়েছিল। ওর হাতে গ্লাভস পরা ছিল বলেই প্রিয়াঙ্কার গলায় আঙুলের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

আয়ুষ বলল, যদি আপনার কথাই বিশ্বাস করতে হয়, “তা হলে তো প্রিয়াঙ্কাকে মেরেছে রজনীশ। তা, আপনি সে কথা কাউকে বলেননি কেন?

— কী করে বলব? আমি যে ওকে ভালবাসতাম।

— প্রিয়াঙ্কাকেও তো আপনি ভালবাসতেন। কী? বাসতেন না? আপনি তো ছোট থেকে ওকে বড় করেছেন...

— হ্যাঁ, বাসতাম। ভীষণ ভালবাসতাম। সে জনাই তো রজনীশকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি। ওকে ছেড়ে বিহারে চলে গিয়েছিলাম। ও বলেছিল, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। তুমি যেও না, প্লিজ। তুমি চলে গেলে আমি আর বাঁচব না। দেখবে, হয় বিষ খাব, নয়তো গলায় দড়ি দিয়ে বুলে পড়ব। কিন্তু ও যে সত্যি সত্যিই এ রকম একটা কাণ্ড ঘটাবে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

পুলিশ অফিসারটি জিজ্ঞেস করল, কেন, কী হয়েছিল?

— ও ট্রেনের তলায় গলা দিয়েছিল। তাই ওর মৃত্যুর খবর পেয়ে, যাদবপুরের দিক থেকে ঢাকুরিয়া স্টেশনে ঢোকান আগেই, বাঁ হাতে, রেল লাইনের যেখানটায় ও আত্মহত্যা করেছিল, তারই সামনের এই ঝুপড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে আমি থাকতে শুরু করি...

— অদ্ভুত কাকতালীয় তো! আপনি যেখানে থাকতে শুরু করলেন, সেখানেই প্রিয়াঙ্কা জন্মাল!



— ও প্রিয়াঙ্কা নয়।

চমকে উঠল আয়ুষ, তা হলে?

— ও আমার মেয়ে।

আয়ুষ অবাক, আপনার মেয়ে!

— হ্যাঁ, ও আমার আর রজনীশের মেয়ে।

আয়ুষ বলল, সে কী করে হয়? আমি তো ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও আমাকে এমন এমন সব কথা বলেছিল, যা আমি আর আমার বোন ছাড়া অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

— এটা আপনার ভুল ধারণা। যখন যা হত, প্রিয়াঙ্কা এসে আমাকে সব বলত। আর সেগুলিই খুব ছোটবেলা থেকে আমি আমার মেয়ের মাথায় এমন ভাবে গোঁথে দিয়েছিলাম, ওই বাড়ির ছবি এমন নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছিলাম যে, ও নিজেকে প্রিয়াঙ্কা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারত না। কিন্তু আমার তো বিয়ে হয়নি, একজন অবিবাহিতা মেয়ের বাচ্চাকে এ সমাজ কিছুতেই ভাল চোখে দেখবে না। আমাকে যেমন নানা লোকে নানা কথা বলবে, ওর জন্মরহস্য নিয়েও সারা জীবন ওর দিকে আঙুল তুলবে। তাই, কী করব যখন ভাবছি, ঠিক তখনই পাশের ঘরের ওরা বলল, বাচ্চাটা আমাদের দিয়ে দাও। আমরা মানুষ করব। ওরা ছিল নিঃসন্তান। ফলে সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজি হয়ে গেলাম। আর সেই থেকেই ও ওদের বাবা-মা বলে ডাকতে শুরু করল। ও এখনও জানে না আমি ওর কে...

পুলিশ অফিসারটি জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আপনি এটা করলেন কেন? নিজের মেয়েকে ও বাড়িতে ঢুকিয়ে সম্পত্তি হাতানোর জন্য? না কি হতদরিদ্র ঘরে জন্মালেও আপনার মেয়ে যাতে রাজার হালে থাকতে পারে, সে জন্য?

চোখের জল আর ধরে রাখতে পারল না আয়া। সে বলল, এ সব কী বলছেন আপনারা? আসলে আমাদের জন্যই তো বড়মা-র কোল খালি হয়েছিল, সেই মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন ভেবে তার দুঃখ যদি কিছুটা লাঘব হয়, সে জন্যই এ সব করেছি।

— সে নয় আপনার কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু ওর আয়া মানে তো আপনি। আপনি ওকে গলা টিপে খুন করেছেন, এটা ওকে কে বলল?

— আমি।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আয়ুষ। দ্রঃ কুঁচকে তাকাল পুলিশ অফিসারটি— কেন?

— কারণ, ওর মৃত্যুর পরে যে দু'দিন আমি ও বাড়িতে ছিলাম, তখনই পুলিশের নানান প্রশ্ন এবং ও বাড়ির বিভিন্ন লোকজনের কথাবার্তা, আমার আড়ালে ওদের ফিসফাস, তির্যক চাহনি দেখে বুঝেছিলাম, হাতেনাতে কোনও প্রমাণ না পেলেও, কেন জানি না, ওরা আমাকে সন্দেহ করছে। তাই এত দিন পরে সেই সন্দেহটাকেই ওর মুখ দিয়ে বলিয়ে আমি রাস্তা পরিষ্কার করতে চেয়েছিলাম। কারণ, আমার মনে হয়েছিল, একমাত্র এটা বললেই ও-বাড়ির লোকেরা সহজে বিশ্বাস করবে যে, ও-ই ও বাড়ির মেয়ে।

আয়ুষের দিকে তাকাল পুলিশ অফিসার।— তা হলে আমরা এ বার থানার দিকে যাই, না কি?

আয়ুষ বলল, থাক। বোনের শোক বাবা-মা একবার সহ্য করেছেন। তাকে ফিরে পেয়েছেন ভেবে এখন তাঁরা খুব আনন্দে আছেন। আজ এটা শুনলে তাঁরা নিশ্চয়ই খুব ভেঙে পড়বেন। আমি চাই না, তাঁরা আর একবার মেয়েকে হারান। তার চেয়ে বরং এই-ই ভাল, যেমন চলছে, চলুক। আর ওই মেয়েটিও যখন মনে করে ও সিঙ্ঘানিয়া পরিবারেরই একজন, তখন অসুবিধে কোথায়?

বলতে বলতে আয়ার দিকে ফিরে তাকাল আয়ুষ। বলল, আপনার সব অপরাধ আমি মাপ করে দিতে পারি, শুধু একটা শর্তে। আপনি কখনও ওর আসল পরিচয়টা ওকে জানাবেন না, কেমন?

মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না আয়ার। ছলছল চোখে কেবল মাথা কাত করল, আর তাতেই বুঝিয়ে দিল, ঠিক আছে।



## নয়তো

মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে প্রথম গ্রাস মুখে দিয়েই থালার পাশে থু থু করে সবটা ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল অরণ্য, এটা কী করেছ? মাছের ঝোল? না, আমার গুস্তির পিণ্ডি? এত ঝাল কেউ দেয়? মনে হচ্ছে বাজারের সব লস্কা বেটে এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছ। এখনও বলছি, ঠিক মতো রান্না করা শেখো। নয়তো...

অরণ্যর সঙ্গে মাত্র কিছু দিন আগে বিয়ে হয়েছে অম্বেষার। অম্বেষাকে দেখতে তার স্বশুর শাশুড়ি যখন তাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, তখন তার শাশুড়ি বলেছিলেন, আমার ছেলে একদম মাটির মানুষ। ছোটবেলায় একটু দূরন্ত ছিল ঠিকই, কিন্তু যত বড় হয়েছে, ততই যেন বিশাল দিঘির শান্ত জলের মতোই ধীরস্থির হয়েছে সে। পড়াশোনাতেও মনোযোগী হয়েছে তত।

স্বশুর বলেছিলেন, শুধু নিজের সাবজেক্টেই নয়, অন্যান্য বিষয়েও ওর ছিল সমান আগ্রহ। তাই যে বিষয় নিয়ে ও ডক্টরেট করেছিল, সেই বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে কলেজে জয়েন করলেও, অন্য কোনও বিষয়ের অধ্যাপক কোনও কারণে না এলে, ওই সময় ওর অফ থাকলে সেই ক্লাসে পড়ানোর জন্য ও নিজে থেকেই চলে যেত। এবং এমন ভাবে পড়াত যে, কেউ টেরই পেত না, ওটা ওর বিষয় নয়।

তার থেকেও বড় কথা, ও কলেজে ঢোকার কয়েক দিনের মধ্যেই ওর পড়ানোর স্টাইলটা ছাত্রদের মধ্যে এমন ভাবে সাড়া ফেলেছিল, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ও এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, ওর ক্লাস আছে শুনলে, অন্য ক্লাসের ছাত্ররা পর্যন্ত ওর ক্লাসে এসে ভিড় করত। মস্তমুগ্ধের মতো হাঁ করে গিলত।

আসলে পড়ানোটা ছিল ওর নেশা। আর সে জন্যই তো এই বয়সেই দু’-দু’বার রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়ে গেছে ও।

শাশুড়ি বলেছিলেন, ওকে আমি অনেক বার বলেছিলাম, তুই ও চল না। মেয়েটাকে অন্তত একবার চোখের দেখা দেখে আসবি। বিয়ে বলে কথা... তা, ও বলল, তোমাদের পছন্দ হলেই হবে। আমি আর কতক্ষণ বাঁড়তে থাকব, তার থেকে বেশিক্ষণ তো তোমরাই ওর সঙ্গে থাকবে। ফলে, তোমাদের আগে পছন্দ হোক, তার পর নাই আমি একদিন গিয়ে দেখে আসবখ’ন।

কিন্তু না। অরণ্য আর আসেনি। তার মা-বাবাই পাকা কথা দিয়ে গিয়েছিলেন। আশীর্বাদও করে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, তোমরা সুখী হও।

একে কি সুখ বলে! সে সুখে আছে কি না জানি না। তবে আমি যে নেই, এ কথা হলপ করে দশ তলার ছাদে উঠে চিৎকার করে বলতে পারি। আরে বাবা, প্রতি পদক্ষেপে এ রকম আতঙ্ক নিয়ে কেউ কি সুখে থাকতে পারে! না থাকা যায়!

তারা একে অপরকে প্রথম দেখেছিল ওই শুভদৃষ্টির সময়ই। অরণ্য দেখতে শুনতে বেশ ভালই। বাবা-মায়ের কাছে ওর যে ছবি অশ্বেষা দেখেছিল, দেখে মাথা কাত করে সম্মতি জানিয়েছিল, এ যে তার থেকেও অনেক অনেক অনেক হ্যান্ডসাম। অনেক সুন্দর। সে দিন রাতেই ওর বন্ধুরা ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপিচুপি বলে গিয়েছিল, তাদের দু’জনকে খুব মানিয়েছে রে। ভাগ্য করে এমন একটা স্বামী পেয়েছিস। এ রকম একজন শিক্ষিত মানুষ যে এত মজাদার আর প্রাণখোলা হতে পারে, না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না।

সে দিন অশ্বেষা নিজেই দেখেছিল, গোটা বাসরটা কেমন করে ও একাই মাতিয়ে রেখেছিল। মজার মজার গল্প, জোকস, গান, কুইজ, অন্ত্যক্ষরী, আবৃত্তি— কী করেছিল, আর কী যে না করেছিল, বলা মুশকিল।

ও সব দেখে ওর বেশ ভালই লেগেছিল। মনে মনে বলেছিল, যাক বাবা, যে অচেনা, অজানা লোকটার সঙ্গে সারা জীবন থাকতে হবে, সে কেমন মানুষ, কী রকম তার স্বভাব চরিত্র, এ নিয়ে তো কম ভয় ছিল না। যাক, আর যাই হোক, এ রকম লোক নিশ্চয়ই খুব একটা খারাপ হবে না।

কিন্তু তার সমস্ত ভাবনা একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল তার

একদিন পরেই। ফুলশয্যার রাতে। দরজা আটকে অরণ্য যখন তার খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে তখন লজ্জায় রাঙা হয়ে থরথর করে কাঁপছিল। ভেবেছিল, এ বার তার সামনে এসে এক হাত নামানো ঘোমটাটা ও আস্তে আস্তে করে তুলবে। তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবে। তার পর আদরে আদরে ভরিয়ে দেবে তাকে। সারা রাত ধরে বলবে মিষ্টি মিষ্টি কথা। দু'জনে ভেসে যাবে অন্য একটা জগতে। সময় যে কোথা দিয়ে বয়ে যাবে, টেরই পাবে না কেউ।

এ সব ভেবে নিজেকে একদম তৈরি করে ফুলে ফুলে ঢাকা বিছানার উপরে সে যখন চোখ বুজে অপেক্ষা করছে, ঠিক তখনই কানে আছড়ে পড়ল একটা বাঁজখাই গলা, এ কী! এর মধ্যেই ঘুম?

গলার স্বরটা এত কর্কশ ছিল যে, হকচকিয়ে গিয়েছিল অশ্বেষা। ভুলেই গিয়েছিল, সে আজ বিয়ের কনে। ফলে নিজেই এক হাত বুলিয়ে রাখা ঘোমটাটা মুহূর্তের মধ্যে তুলে বলেছিল, না না, আমি ঘুমোইনি।

— ঘুমোইনি মানে? আমি তো নিজের চোখে দেখলাম। তা হলে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি?

স্বামীর রুদ্রমূর্তি দেখে একেবারে থ' হয়ে গেল অশ্বেষা। এমনটা যে হতে পারে, সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। বুকের ধুকপুকুনি এত বেড়ে গেল যে, শুধু সে নয়, মনে হল, আশপাশের, এমনকী এর উপর এবং নীচতলার ঘরে যারা আছে, তাদের কানে গিয়েও বোধহয় হাতুড়ি পেটাবে এই ধুকপুকুনি। তাই ওকে চুপ করানোর জন্য অশ্বেষা বলল, আপনি বিশ্বাস করুন...

অরণ্য চুপ করবে কী, আরও তারস্বরে চৈঁচিয়ে উঠল, আবার মুখে মুখে কথা?

— না মানে...

— না মানে? তোমার সাহস তো কম নয়। আজকে একটা কথা তোমাকে বলে রাখছি, কান খুলে শুনে রাখো। আমার সঙ্গে থাকতে হলে তোমাকে কিন্তু আমার মতো করে থাকতে হবে। বুঝেছ? নয়তো...

‘নয়তো কী?’ প্রশ্নটা আর একটু হলেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল আর কী। কোনও রকমে ঠোঁট দুটোকে সামলে নিয়েছিল অশ্বেষা।

শুধু ফুলশয্যার রাতেই নয়, তার দিন দশেক পরে ওরা যখন মধুচন্দ্রিমায়

আর পাঁচটা ছাপোষা বাঙালির মতো পুরীতে গিয়েছিল, অন্ধকার অন্ধকার সকালে স্টেশনে নামার পর থেকেই তার খুব ভাল লাগছিল। কাটছিল ও দারুণ ভাবে। ভেবেছিল, ওর বরের মেজাজটা একটু চড়া ঠিকই, কিন্তু মানুষটা খুব ভাল। খুব কেয়ারিং। সব সময় তার খেয়াল রাখছে। কীসে সে ভাল থাকবে, সে দিকে তার সব সময় নজর। নাঃ। তার ভয়ের কোনও কারণ নেই। লোকটাকে চিনতে তারই ভুল হয়েছিল। একটা মানুষ কেমন, সেটা জানতে হলে তার সঙ্গে ক'টা দিন নিবিড় ভাবে মিশতে হয়। একটু বেশিক্ষণ তার সঙ্গে কাটাতে হয়। ভাগ্যিস সে হানিমুনে এসেছিল। হ্যাঁ, বিয়ের রাতে বন্ধুরা তাকে ঠিকই বলেছিল, ভাগ্য করে এমন একটা স্বামী পেয়েছে সে।

অশ্বেষা যখন এ সব ভাবতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই ঘটল আবার একটা অঘটন। আসলে সারা দিন হইহই করে কাটিয়ে অরুণা ভেবেছিল, সকালে যদি ঘুম না-ভাঙে! তাই রাত্রিবেলাতেই বউকে বলে রেখেছিল, খুব ভোরবেলায় তাকে ডেকে দেওয়ার জন্য। ঠিক করেছিল, সন্ধ্যাবেলায় দু'জনে মিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবে। সব ঠিকঠাক থাকলেও, দু'জনে মিলে অনেক রাত অবধি গল্প করায় ভোরের দিকে তারা দু'জনেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছিল। ফলে অরুণার তো নয়ই, তারও ঘুম ভাঙেনি।

অশ্বেষা যখন ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল, ঘড়ির কাঁটায় তখন সাতটা আঠেরো। এত বেলায় গিয়ে তো আর সানরাইজ দেখা যাবে না। অরুণা যখন ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। না হয় কাল সকাল সকাল উঠে সূর্যোদয় দেখবখ'ন। এই ভেবে অশ্বেষা আর ওকে ডাকেনি।

ভেবেছিল, ওর তো মজির কোনও ঠিক নেই! ঘুম থেকে উঠেই হয়তো বলবে, চলো। তাই আর দেরি না করে স্নানটান করে সে রেডি হয়ে নিয়েছিল। সে যখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির কুঁচি ঠিক করছে, ঠিক তখনই যেন আকাশ বিদীর্ণ করে বাজ পড়ল, এ কী! ক'টা বাজে?

অশ্বেষা ভেবেছিল, ও তো মাঝে মাঝেই জোরে কথা বলে। ঘুম থেকে উঠেছে বলে হয়তো বুঝতে পারেনি, তার গলার স্বর কতটা চড়ে গেছে। ও হয়তো জানতে চাইছে, ক'টা বাজে। তাই এক ঝলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল, ন'টা বাজতে বারো।

— মানে?

মুখ বিকৃত করে অরুণা এমন ভাবে 'মানে'টা বলেছিল, ঘাবড়ে গিয়েছিল



অশ্বেষা। বুঝতে পেরেছিল, আবার কোনও একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। কিন্তু কী ভুল করেছে, সেটা বুঝতে পারছিল না। তাই চুপচাপ গুটিগুটি পায়ে অরণ্যর কাছে এগিয়ে এসে ‘কী হয়েছে?’ যেই জিজ্ঞেস করতে যাবে, অমনি আকাশ কাঁপিয়ে আর একটা বাজ পড়ল, তোমাকে আমি কাল রাতে কী বলেছিলাম?

মিনমিন করে অশ্বেষা বলল, কী?

— কী মানে? এর মধ্যেই ভুলে গেলে? তোমার মাথায় কি কিছু থাকে না, নাকি? কাল বললাম না, সন্ধ্যাবেলায় ডেকে দিও। সূর্যোদয় দেখতে যাব।

— আসলে আমার যখন ঘুম ভাঙল, তার অনেক আগেই সূর্য উঠে গিয়েছিল।

— উঠুক। তাতে তোমার কী। আমি যখন তোমাকে বলেছি ডেকে দিতে, ডাকোনি কেন?

— না, মানে... তুমি ঘুমোচ্ছিলে...

— ভারী অদ্ভুত মেয়ে তো। ঘুমিয়ে ছিলাম বলেই তো ডাকবে। জেগে থাকলে কি ডাকার দরকার হয়?

— আসলে কাল অনেক রাত অবধি জেগেছিলাম তো...

— কে তোমাকে অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে বলেছিল? আমি বলেছিলাম? তবে?

অরণ্যর কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল অশ্বেষা। ভারী অদ্ভুত লোক তো! নিজেই কাল অত রাত অবধি গল্প করল, আর এখন বলছে কিনা, কে তোমাকে অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে বলেছিল!

নাঃ। লোকটাকে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সকালে এক রকম তো দুপুরে আরেক রকম। বিকেলে যে কী রকম থাকবে, দশ মিনিট আগেও বোঝার কোনও জো নেই। আবার রাত্রিবেলায় কখন যে একদম একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে তার মেজাজ কী রকম হবে, কে জানে! কী যে করি!

অশ্বেষা যখন নিজেই নিজের সঙ্গে এই সব নিয়ে কথা বলছে, তখন হঠাৎ করেই তার স্বামী ফের বজ্রগর্ভ গলায় বলে উঠল, আমি কখনও কাউকে এক কথা দু’বার বলি না। প্রথম দিনই তোমাকে বলে দিয়েছি। শুধু তুমি আমার

বউ বলে আরও একবার বলছি। ভাল করে শুনে রাখো। যা বলব, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কেমন? নয়তো...

চমকে উঠল অশ্বেষা। আবার ‘নয়তো...’ নয়তো কী? সে যদি তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন না করে, তা হলে ও কী করবে! তাকে মারবে! বকবে! না কি খেতে দেবে না! না কি কোনও অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাকে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা আটকে দেবে! না কি বাড়ি থেকে বার করে দেবে! না কি তার বাপের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলবে, অনেক হয়েছে। এ বার আমাকে রেহাই দিন। এই রইল আপনাদের মেয়ে! আমি চললাম। কী করবে ও! কী করবে!

হানিমুন থেকে ফিরে আসার পরেও খুব ভয়ে ভয়ে আছে অশ্বেষা। এই বুঝি পান থেকে চুন খসল। এই বুঝি ও আবার চিৎকার করে উঠল, ‘নয়তো...’

‘নয়তো’র পরিণামটা যে কী সে জানে না। অথচ সেই ‘নয়তো’র ঠেলায় তার জীবন একেবারে ওষ্ঠাগত। এত ভয় নিয়ে, এত সংশয় নিয়ে কোনও বউ কি সংসার করতে পারে! না, নিশ্চিত্তে একটু বসতে পারে! নাঃ। আর এত টেনশন নেওয়া যাচ্ছে না। হয় এসপার, নয় ওসপার। যা হয় একটা হবে। তাই সে দিনই সে ঠিক করে রেখেছিল, এর পরে যদি ও আবার কখনও কোনও দিন ওকে হুমকি দেয়, বলে— ‘নয়তো...’, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ও-ও মুখ খুলবে। জিজ্ঞেস করবে, নয়তো কী?

এই ‘নয়তো কী’ জিজ্ঞেস করার জন্যই ক’দিন ধরে অশ্বেষা খুব উসখুস করছে। অরণ্য যা বলে যাচ্ছে, ইচ্ছে করেই, তা করছে না। বরং এমন উল্টোপাল্টা কাজ করছে, যাতে অরণ্যর চোখে পড়ে। পড়ছেও চোখে। আর সেটা যে পড়ছে, তা ওর দ্রুত কোঁচকানো দেখেই সে তা টের পাচ্ছে। অথচ অরণ্য কিছুই বলছে না।

অশ্বেষা একেবারে অবাক। সে যখন না জেনে, না বুঝে এটা ওটা করত, সেটার জন্য ওকে প্রায় প্রতি পদে পদে অপদস্ত হতে হত। কথা শুনতে হত। স্বামী রেগেমেগে শেষ পর্যন্ত বলত, ‘নয়তো...’

অথচ এখন ইচ্ছে করে ও যখন ভুলভাল কাজ করছে, অরণ্যর মুখ থেকে শুনতে চাইছে, ‘নয়তো...’, তখন কিনা তার স্বামী একেবারে নিশুচুপ। ব্যাপারটা কী! ও যদি এই ভাবে চুপচাপ থাকে, তা হলে যে তার জানাই হবে না, নয়তো কী করবে ও। তাই আজ মাছ রান্না করার পরে বাটিতে বাটিতে আলাদা করে

সরিয়ে রেখেছে সে। শুধুমাত্র স্বামীর মাছের বাটিতে এত লঙ্কার গুঁড়ো আর কাঁচালঙ্কা মিহি করে বেটে মিশিয়ে দিয়েছে যে, শত চেষ্টা করলেও তার স্বামী যাতে আর চুপ করে থাকতে না পারে, ঝালের চোটে মুখে যা আসবে, যেন বলে ফেলে। আর তার সঙ্গে যেন বলে ওঠে— নয়তো...

অম্বেষা যা চেয়েছিল, তাই হল। প্রথম গ্রাস মুখে দিয়েই থালার পাশে থু থু করে সবটা ফেলে দিয়ে চিৎকার করে অরণ্য বলে উঠল, এটা কী করেছ? মাছের ঝোল? না, আমার গুষ্টির পিণ্ডি? এত ঝাল কেউ দেয়? মনে হচ্ছে, বাজারের সব লঙ্কা বেটে এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছ। এখনও বলছি, ঠিক মতো রান্না করা শেখো। নয়তো...

ব্যসা। এই একটা শব্দের জন্যই এতক্ষণ ধরে যেন অপেক্ষা করছিল অম্বেষা। যেই অরণ্য বলল, ‘নয়তো...’, অমনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চড়া গলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অম্বেষা বলে উঠল, নয়তো কী? কী করবে?

এ রকম একটা প্রশ্ন শোনার জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না অরণ্য। শুধু প্রশ্ন নয়, এত দিন ধরে তার স্ত্রী যে টিউন-এ তার সঙ্গে কথা বলত, তাতে তার মনে হয়েছিল, সে আর কোনও দিনই ওর সামনে গলা তুলে কথা বলতে পারবে না। কিন্তু আজ সে-ই এ ভাবে প্রশ্ন করায় অরণ্য একেবারে থতমত খেয়ে গেল। এ রকম পরিস্থিতিতে কী বলবে বুঝতে পারল না। গলার স্বর একদম খাদে নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, নয়তো... নয়তো... নয়তো... বলে, যে ভাবে কথা হাতড়াতে লাগল, মনে হল, ও নিজেও জানে না, নয়তো কী করবে ও। তাই ফট করে বলে ফেলল, নয়তো... যা দিয়েছ, চুপচাপ খেয়ে নেব।

থমকে গেল অম্বেষা। যে শব্দটাকে এত ভয় পেত সে, যার পরিণাম নিয়ে মনে মনে এত কিছু ভেবেছে, দিনের পর দিন সংশয়ে কাটিয়েছে, রাতে ঠিক মতো ঘুমোতে পারেনি, সেটা আসলে এই!

হাসি পেয়ে গেল তার। মুখে বলল, থাক। ওটা আর খেতে হবে না। পাশে সরিয়ে রাখো। আমি অন্য বাটি নিয়ে আসছি। বলেই, রান্নাঘরের দিকে চলে গেল অম্বেষা। দরজার কাছে বাঁক নেওয়ার আগে স্বামীর অসহায় মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল।



## কোণের ঘরের ভাড়াটে

বিশু তদ্বিককে দিয়ে তার ঘরমুঠে এক কক্ষের ভাড়াটে কক্ষের ঘর, একটি নিজের চোখে পরপর কক্ষের জন্য ঘরমুঠে তার কক্ষের ভাড়াটে কক্ষের ঘর এক অনুষ্ঠী। শুয়ে থাকতে থাকতে কক্ষের ঘর ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর ও টের পায়নি। ঘরমুঠে ঘরমুঠে হাতের পক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর খটকা লাগল। মনে হল, তার পক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর সক্ষে খাটের ও দিকে বসতে যায়, হাতের কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর হাতের কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর। তার ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর অনান্য দিনের মতোই তাকে কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর গেছে— অমন তড়াক করে তার মস্তক মস্তক ঘর এক কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল সে।

মাত্র কয়েক মুহূর্তে তার পক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর দরজা খুলে বাইরে গেছে। কিন্তু কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর করতে লাগল। পাঁচ সেকেন্ড, দশ সেকেন্ড, পঁচাত্তর সেকেন্ড কিন্তু কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর সেকেন্ড বা মিনিট নয়, এর মধ্যেই ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর কক্ষের ঘর আর স্থির থাকতে না পারে। কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর দিকে ও দিকে উকি মেরে দেখল, না, কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর অন্ধকার। কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর কক্ষের ঘর

এ বাড়িতে অনেকগুলো ভাড়াটে কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর করে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে, বলা যায়।

এখানে আসার পর থেকেই ও সক্ষে কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর মেয়েটার সঙ্গে পিয়াসের কেমন ঘর এক কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর

মেয়েটা একই থাকে। মা বাবা কেউই কক্ষের ঘরমুঠে কক্ষের ঘর এক কক্ষের ঘর

অবধি ঘটর ঘটর করে সেলাই মেশিন চালিয়ে বাচ্চাদের ফ্রক সেলাই করে। সেই ফ্রক সপ্তাহে এক দিন কি দু'দিন করে পাইকারি দোকানে দিয়ে আসে। অল্প হলে, ঢাউস ঢাউস দু'ব্যাগ ঠেসে ভরে কোনও রকমে নিজেই কষ্ট করে হেলতে দুলতে নিয়ে যায়। আর তার থেকেও বেশি হলে একটা রিকশা ডেকে নেয়। আবার কখনও-সখনও সেই দোকানের কর্মচারীরা এসেও নিয়ে যায়।

সে নিয়েও কম কানাঘুষো হয় না। এ বাড়ির মেয়ে-বউরা ওর সঙ্গে পারতপক্ষে কেউ কথা বলে না। মেয়েটার স্বভাব চরিত্র নাকি খুব একটা ভাল না। আগে নাকি সিরিনের সঙ্গে ওর একটা গভীর সম্পর্ক ছিল।

সিরিন এই বাড়িরই ভাড়াটে। তবে ওর ঘরটা এই বাড়িতে হলেও, দরজাটা বাইরের দিকে। যেন এই বাড়ির সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। শুধু সকালবেলায় স্নানটান করা আর জল নেওয়ার সময় আসে। আসতে হলে ঘর থেকে বেরিয়ে, রাস্তা দিয়ে কয়েক পা এসে মেন গেটের ভিতর দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়। অন্য কেউ দেখলে ভাববে, ও বুঝি বাইরের লোক।

যেহেতু এ বাড়িতে অনেক ভাড়াটে, অথচ একটাই টাইমের কল, আর সেই কলে জল আসতে আসতে সকাল পৌনে সাতটা-সাতটা হয়ে যায়। তাই ভাড়াটেরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সময় ভাগ করে নিয়েছিল। প্রত্যেকে পাঁচশ মিনিট করে জল নিত। তার পরেও যদি থাকত, নল লাগিয়ে মুখ দিয়ে টেনে টেনে যেটুকু পাওয়া যেত, সেটাও পালা করে এ ঘর একদিন নিত তো, ও ঘর একদিন।

এ বাড়ির লোকের কাছে এটা শুনলেও অনুশ্রীরা আসার পর থেকে দেখছে, শেষে যার পালা থাকে, তার দুর্ভোগের শেষ থাকে না। আসলে প্রত্যেকের জন্য পাঁচশ মিনিট করে বরাদ্দ হলেও দেখা যায়, প্রতিদিনই 'চালটা একটু ধুয়ে নিই', 'হাঁড়িটা ভরে নিই', 'ঘরমোছার ন্যাতিটা একটু ধুতে দেবে গো', 'টাইম হয়ে গেছে জানি, কিন্তু বাচ্চাটার স্নান হয়নি, দু'মগ ঢেলে নেব?'— বলে, প্রায় সবাই-ই তিরিশ-পঁয়তেরিশ মিনিট করে কল আটকে রাখে। ফলে এই নিয়ে প্রায় রোজই এর সঙ্গে ওর, ওর সঙ্গে তার লেগে যায়।

কিন্তু না। সিরিনের পর ওই মেয়েটার পালা থাকলেও ওদের দু'জনের মধ্যে কখনও কোনও গণ্ডগোল তো নয়ই, সামান্য কথা-কাটাকাটিও হয় না। তাই বাড়ির লোকেরা বলাবলি শুরু করল, তার মানে ডাল মে কুছ

কাল হায়া। প্রথম কে যেন এসে বলেছিল, ‘আমি ওদের দু’জনকে একসঙ্গে সিনেমা হলে ঢুকতে দেখেছি।’ তার দু’দিন পরেই আরও একজন নানান কথা বলতে বলতে বলেছিল, ‘সিরিন তো ওর জন্য বাজারও করে নিয়ে আসে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।’ তার থেকেও আরও এক ধাপ এগিয়ে বাড়িরই কে যেন বলেছিল, ‘শুধু তা-ই নয়, বাড়ির ছেলেরা যে যার মতো কাজে বেরিয়ে গেলে, মাঝেমধ্যেই দুপুরবেলা চুপিচুপি সিরিন এসে ওর ঘরে ঢোকে।

ট্রেন লেট করেছিল বলে সে নাকি একদিন মধ্যরাতে বাড়ি ফিরেছিল। তখন দেখেছিল, দরজাটা আলতো করে ভেজানো। সেটা বলতেই বাড়ির অনেকে সন্দেহ করেছিল, তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মেয়েটা নিশ্চয়ই চুপিচুপি মেন গেটের খিল খুলে দেয়। সিরিনকে সুযোগ করে দেয় বাড়িতে ঢোকার। আবার সকাল হওয়ার অনেক আগেই বেড়ালের মতো নিঃশব্দে সিরিন যখন নিজের ঘরে ফিরে যায়, মেয়েটা তখন ফের দরজায় খিল তুলে দেয়, যাতে কেউ কিছু টের না পায়।

সন্দেহটা সত্যি কি না, তা যাচাই করার জন্য তাই কেউ কেউ বেশি রাতের দিকে পা টিপে টিপে মেয়েটার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারত, দেখার চেষ্টা করত, ওর ঘরে সিরিন আছে কি না। এবং একবার কে নাকি ওই মেয়েটার হাতে ধরা পড়তে পড়তেও কোনও রকমে বেঁচে গিয়েছিল।

কে উঁকি মেরেছিল, দেখতে না পেলেও, সে দিন সকালে উঠে অত্যন্ত মুখ খারাপ করে মেয়েটা যা যা বলেছিল, তা নাকি কানে তোলা যায় না। তবু কেউ নাকি কোনও টুঁ শব্দটি করেনি। চুপচাপ হজম করেছিল। তাই তার পর থেকে মেয়েটার ঘরে নয়, সিরিন সত্যিই ওর ঘরে ঢুকেছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কেউ কেউ উঁকি মারা শুরু করেছিল সিরিনের ঘরে।

সিরিনও ছিল একদম একা। ওই মেয়েটার মতোই। ওর মা বাবা ভাইবোন থাকে পশ্চিম মেদিনীপুরের পাঁচবেড়িয়ায়। সপ্তাহ বা দু’সপ্তাহ অন্তর ও একবার করে যায়। টাকা পয়সা, এটা ওটা সেটা দিয়ে আসে। কাজ করে একটা বাল্ব কারখানায়।

ওর ঘরের জানালাটা ছিল বাইরের দিকে। আর সেই জানালার কাঠের পাল্লার জোরের ফাঁকগুলো এত বড় বড় ছিল যে, তাতে চোখ রাখলেই সরাসরি ওর ঘরের খাটটা দেখা যেত। তাকে শুয়ে থাকতে দেখলেই ওরা



বুঝতে পারত, না। সব ঠিক আছে। মেয়েটির ঘরে সিরিন যায়নি।

সিরিন নাকি বিয়েও করতে চেয়েছিল মেয়েটাকে। সেটা শুনে ঘোর আপত্তি করেছিলেন তাদের বাড়ির বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা। তিনি বলেছিলেন, এটা কি কন? ওরে বিয়া করবেন? কান, দেশে কি আর মাইয়া নাই? জানেন না, এই বাড়িতে হগল ঘরেই বাচ্চা বাচ্চা পোলাপানরা আছে, তারা আপনারে দেইখা কী শিখব? না। এতে আমার মত নাই। মত দেওয়া তো দূরের কথা, এই বাড়িতে থাকতে আপনারে আমি ওরে বিয়া করতে দিমু না। কিছুতেই দিমু না।

বাড়িওয়ালার ওই আপত্তির পরেই নাকি ওদের মেলামেশাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় অনুশ্রীদের বাড়িতেও অশান্তি শুরু হয়েছিল। পিয়াসের বাবা-মারা যাওয়ার পর পরই সেটা চরমে ওঠে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে একাল্লবতী পরিবারটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। টেকা দায় হয়ে দাঁড়ায় পিয়াসদের।

পিয়াসের খুব ভাল বন্ধু ছিল সিরিন। সিরিনই তখন ওদের এই বাড়ির খোঁজ দেয়। পিয়াসরা সামান্য কিছু টাকা নিয়ে ওই পৈতৃক ভিটে ছেড়ে উঠে আসে এই ভাড়াবাড়িতে।

সিরিনই এ বাড়ির প্রতিটি ভাড়াটের সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দেয়। আলাপ করিয়ে দেয় কোণের ঘরের ওই ভাড়াটে মেয়েটার সঙ্গেও। এবং অবাক কাণ্ড। আলাপ হওয়ার পর থেকেই পিয়াসের কী যে হল কে জানে, নতুন একটা রোগ শুরু হল ওর। যাকে পাতি বাংলায় বলে— ছুঁকছুঁকুনি বাই। পিয়াস নাহয় ছেলে, ওরটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু মেয়েটা! সেও তো ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য যেন সারাক্ষণই ছুঁক ছুঁক করছে। শুধু মুখে নয়, অনুশ্রী ফলো করে দেখেছে, ওদের দু'জনের দেখা হলে দু'জনেই ঠোঁট টিপে হাসে। চোখে চোখে কী সব কথা বলে।

ওদের এই চালচলনের মধ্যে বাড়ির অনেকেই সিরিন আর ওই মেয়েটির সেই পুরনো সম্পর্কেরই পুনরাবৃত্তি দেখতে পেয়েছিল যেন। তারা তাই ঠারে ঠোরে অনুশ্রীকে বুঝিয়েওছিল, তোমার কপাল পুড়ল বলে।

অনুশ্রীদের বিয়ে হয়েছে প্রায় তেরো-চোদ্দো বছর। কিন্তু কোনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। তা নিয়ে তাদের মনে কষ্ট থাকলেও ওদের সম্পর্কের মধ্যে তার জন্য কোনও আঁচ পড়েনি।

দু'জনেই ডাক্তার বদ্যি করেছে। কিন্তু ভুল করেও কখনও কোনও ঠাকুর দেবতার থানে গিয়ে হতে দেয়নি। কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর দোরগোড়ায় যায়নি। অথচ সেই অনুশ্রীই যখন দেখল, আর কোনও উপায় নেই, তখন স্বামীকে ফেরানোর জন্য সমস্ত বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে, যেগুলোকে ও কোনও দিন বিশ্বাস করত না, সেগুলোর উপরই ভরসা করতে শুরু করেছিল। এই বাড়িরই বাড়িউলির যেচে দেওয়া পরামর্শ মতো শেষ পর্যন্ত অনুশ্রী গিয়ে হাজির হয়েছিল বিশু তান্ত্রিকের কাছে।

ওরা নাকি সাত পুরুষের তন্ত্রসাধক। শুধু ভূতে ধরা নয়, পরিতে পাওয়া নয়, যে কোনও সমস্যার সমাধানই নাকি উনি চটজলদি করে দিতে পারেন। তাঁর কারসাজিতে নাকি ডাক্তার ফেল-পড়া রোগী আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। নির্ঘাত হারা মামলা কী করে যেন জিতে যায় হাল ছেড়ে দেওয়া বিবাদী পক্ষ। পরীক্ষার হলে একদম ধবধবে সাদা খাতা জমা দিয়ে এলেও অত্যন্ত ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করে যায় পরীক্ষার্থী। তাঁর করুণাতেই নাকি বাঁজা-মায়ের কোল আলো করে খিলখিল করে হেসে ওঠে ফুটফুটে শিশু। তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই নাকি ভাঙা সংসার ফের জোড়া লেগে যায় আগের মতোই।

চোখ বুজে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে বলে দিতে পারেন হারানো জিনিস আদৌ আছে, না কি বেহাত হয়ে গেছে। কিংবা পাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা আছে কি না। যিনি এত কিছু পারেন, তিনি কি তার স্বামীকে ফের ঘরমুখো করে দিতে পারবেন না! নিশ্চয়ই পারবেন।

সব শুনে বিশু তান্ত্রিক বলেছিলেন, শোন, তোকে একটা বশীকরণ করতে হবে। না, সাধারণ বশীকরণ বা বিশেষ বশীকরণ করলে হবে না। তোকে একেবারে পুরস্চরণসিদ্ধ বশীকরণ করতে হবে। আট হাজার টাকার মতো খরচা আছে, করতে পারবি?

চোখ কপালে তুলে অনুশ্রী বলেছিল, আট হাজার টাকা...

উনি বলেছিলেন, দিতে পারবি না তো? ঠিক আছে, কিছু পরোয়া নেই। তা হলে একটু সময় লাগবে। এই নে, বলেই, তাঁর পঞ্চমুণ্ডির আসন থেকে ফুল আর বেলপাতা একটা কাগজে মুড়ে এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, এটা তোর খাটের পায়ার নীচে তিন দিন তিন রাত গুঁজে রাখবি। দেখবি, তোর স্বামী ঠিক তোর কাছে ফিরে আসবে। তখন এই ফুল বেলপাতা কোনও

পুকুরে কিংবা কোনও বেলগাছের তলায় ফেলে দিবি। বুঝেছিস?

কিন্তু ও কিছুতেই বুঝতে পারল না, তিন দিন কেন, ন’দিনের মাথাতেও তার স্বামীর মতিগতির কোনও অদল-বদল হল না কেন। নিরাশ হয়ে ও যখন ফের গেল, তখন বিশু তান্ত্রিক তাকে যে মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ও তো সেই ‘ওঁ ঝাং ঝাং ঝাং হাং হাং হাং হেং হেং’ মন্ত্রটা তাঁর কথা মতোই পাঁচশো বার গুনে গুনে জপ করেছিল। উনি বলেছিলেন, এই মন্ত্র জপ করলে শুধু মানুষ নয়— অসুর, দেবতা, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, স্থাবর এবং জঙ্গম— সবাই, সবাই তোর বশীভূত হয়ে যাবে।

কিন্তু কোথায়, অত নিষ্ঠা ভরে মন্ত্র পড়েও অসুর, দেবতা, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, স্থাবর, জঙ্গম কিংবা অন্য মানুষ তো দূরের কথা, তার স্বামীই তার বশীভূত হল না। ও তাকে তাকে থেকে দেখেছে, ওই মন্ত্র পড়ার পরেও, ওই মেয়েটার সঙ্গে যত বার পিয়াসের মুখোমুখি দেখা হয়েছে, তত বারই চোখে চোখে কথা বলেছে। তার মানে, হয় মন্ত্রটায় কোনও খুঁত আছে কিংবা পিয়াসের ক্ষেত্রে এই মন্ত্রটা ঠিক মতো কাজ করছে না। কিংবা এটাও হতে পারে, কোণের ঘরের ওই ভাড়াটে মেয়েটা এমন কোনও তাবিজ বা মাদুলি তার স্বামীকে দিয়েছে, যেটা তাকে এই অমোঘ মন্ত্র থেকে আগলে রেখেছে।

নাঃ! এই মন্ত্রেও কোনও কাজ হয়নি। বিশু তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে এ কথা বলতেই উনি গলা চড়িয়ে বলেছিলেন, শোন, বশীকরণ করা অত সহজ কাজ না। তা হলে সবাই করত। আমার মতো লোকের দরকার হত না। বুঝেছিস? তুই টাকার কথা শুনে আঁতকে উঠেছিলি বলে, তোকে বশীকরণের মন্ত্রটা বলে দিয়েছিলাম। যা। একবার বাজার ঘুরে আয়। বহু লোক তো বশীকরণ করে। ক’জনেরটায় কাজ হয় বল তো। অত সহজ না। তিথি, নক্ষত্র, বার, সময়, সব হিসেব কষে কাজ করতে হয়। শনিবার সূর্য ওঠার আগে সপ্তমী কিংবা তৃতীয়া অথবা ত্রয়োদশী, আর তা না হলে অষ্টমী বা নবমী, তবে সব চেয়ে ভাল হয়, যদি মাহেন্দ্র মণ্ডল আর বারুণী মণ্ডলের মধ্যবর্তী সময়ে করা যায়।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে, শুধু দিনক্ষণ দেখলেই হবে না। দেখতে হবে, যা যা লাগার, সব কিছু ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করা হচ্ছে কি না। একেবারে নিখুঁত ভাবে গুনে গুনে সঠিক বার জপ করা হচ্ছে কি না। আনুষঙ্গিক সমস্ত

ক্রিয়াকলাপ নিপুণ ভাবে করা হচ্ছে কি না। শুধু তা-ই নয়, এর পাশাপাশি দেখতে হবে, কাজটা যে করছে, সে কোন পদ্ধতিতে করছে। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠিক ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করছে কি না। তার থেকেও বড় কথা, কাজটা কে করছে। কারণ, অনেকে জানেই না, মন্ত্রের সংখ্যা গোনার জন্য সোনা, রূপো, মণি, মুক্তো, পলা, রুদ্রাক্ষ বা স্ফটিক নয়, সবথেকে ভাল হল আঙুলের কড়। তবে পর পর কড় গুনে গেলেই হবে না। তারও আবার অনেক নিয়ম আছে। সব সময় মাঝের দুই কড়ই গুনে হবে। গোনার জন্য নীচের কড় কিংবা আঙুলের ডগা ধরলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্র নিষ্ফলা হয়ে যাবে। অনেকে তো এটাও জানে না যে, মন্ত্রের সেতু হচ্ছে— ওঁ। জপের সময় প্রতিবার মন্ত্র উচ্চারণের আগে এটা বলে নিতে হয়। না-হলে সারা রাত ধরে মন্ত্র জপ করে গেলেও সেটা আর মালার মতো গাঁথা হয়ে ওঠে না। প্রত্যেকটা মন্ত্রই উপ উপ করে পড়ে যায়। ফলে ওটা কোনও কাজেই আসে না। বলেই, উনি বলেছিলেন, ঠিক আছে, তোকে অন্য আর একটা সহজ মন্ত্র দিচ্ছি। নে, লিখে নে, ‘ওঁ নমঃ কটবিকট— ঘোররূপিণী স্বাহা।’ পর পর সাত গ্রাস ভাত এই মন্ত্র জপ করে যার নাম উল্লেখ করে খাবি, সেই তোর বশে চলে আসবে।

কিন্তু না। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। তার স্বামীর সেই ছুকছুকুনি বাই এতটুকুও কমেনি। তাই আবার যখন বিশু তান্ত্রিকের কাছে ছুটে গিয়েছিল অনুশ্রী, তিনি বলেছিলেন, নাঃ। ওই মন্ত্রেও যখন কাজ হয়নি, তখন একটা কাজ কর, ‘ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব সত্ত্বান নমঃ স্বাহা।’ এই মন্ত্রটা ফুলে পড়ে ছলে বলে কৌশলে কিংবা যে ভাবে পারিস, ওর হাতে দিয়ে দে। বাস, তা হলে আর দেখতে হবে না। এটাই সবচেয়ে মোক্ষম-মন্ত্র।

কিন্তু তার স্বামী তার বশে আসা তো দূরের কথা, ওই মন্ত্র ফুলে পড়ে তার হাতে দেওয়ার পর তার স্বামীর ছুকছুকুনি যেন আরও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। সেটা গিয়ে আবার বলতেই, কয়েক মুহূর্ত কী একটা ভেবে নিয়ে বিশু তান্ত্রিক বলেছিলেন, তা হলে একটা কাজ কর। এই তিনটে মন্ত্রেও যখন তোর মনোমত কাজ হল না, তখন তোকে আর মন্ত্র পড়তে হবে না। তুই বরং বটগাছ বেয়ে ওঠা যে কোনও একটা পরগাছা রোহিণী নক্ষত্রে ছিঁড়ে হাতের তালুতে পেয। তার পর সেই গন্ধ তোর স্বামীর নাকের কাছে ধর। তা হলেই

হবে। আর যদি পরগাছাওয়ালা কোনও বটগাছ না পাস, তা হলে মৃগশিরা নক্ষত্রে যজ্ঞডুমুরের মূল তুলে হাতে বেঁধে নে। তা হলে দেখবি, যাকে ছুঁচ্ছিস, সে-ই তোর বশীভূত হয়ে যাচ্ছে। যদি যজ্ঞডুমুরের গাছ না পাস, তা হলে অশ্বিনী নক্ষত্রে পলাশ গাছের মূল তুলে ডান হাতের কড়েয় বেঁধে নিলেও হবে। বুঝেছিস?

উনি যা বলছেন, ও তা-ই করছে। তবু বারবার কাজ না হওয়ায় তন্ত্রমন্ত্রের উপর থেকে আবার বিশ্বাস হারাতে বসেছিল ও। তাই মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, এতে কাজ হবে!

উনি বলেছিলেন, হবে রে বাবা, হবে। আলবাত হবে। তবে শুধু ওগুলো করলেই তো হবে না। অনেক নিয়মকানুন, পদ্ধতি আছে। সেগুলো ঠিকঠাক মতো মেনে করতে হবে।

আবার আশার আলো দেখে অধীর আগ্রহে অনুশ্রী জানতে চেয়েছিল, কী সেই নিয়মকানুন?

উনি বলেছিলেন, যেমন ধর, শিকড়বাকড়ের জন্য আগে গাছটাকে ভাল করে চিনতে হবে। তার পর সেটা তোলার ক্ষেত্রে সব সময় গোটা গাছটাকে এক টানে উপড়ে নিতে হবে। তাই কাজের জন্য বড় গাছ নয়, সব সময় চারা গাছ বাছাই বাঞ্ছনীয়। তার আগে মন্ত্র পড়ে গাছটাকে কিন্তু বন্দনা করে নিতে হবে।

ও জানতে চেয়েছিল, সেটা আবার কী?

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিশু তান্ত্রিক বলেছিলেন, সব কিছু কি এক দিনেই শিখে নিবি রে বেটি? এটা শিখতে আমার সারা জীবন লেগে গেছে।

মিনমিন করে অনুশ্রী বলেছিল, আসলে, আমার পক্ষে আট হাজার টাকা দেওয়া...

— তা হলে যেখানে কমে হয়, সেখানে যা।

— না বাবা, না। আমি অন্য কোথাও যাব না। আপনার কাছে যখন একবার এসে পড়েছি, আপনিই করে দেবেন। শুধু টাকাটা যদি একটু কম করেন...

— তুই কি ভাবছিস এই সব করে আমি টাকা নিই? একদম না। এই সব কাজ করতে গেলে অনেক কিছু লাগে। সোনাভস্ম যেমন লাগে, তেমনই তামা, পেতল, কাঁসাও লাগে। লাগে পেরেক। সজারুর কাঁটা থেকে নানান



গাছের কাঁটা। আলতা কুমকুমও। বাসনই লাগে একগাদা। কত রকমের পদ রান্না করতে হয় জানিস? ভূত পেতনি, দৈত্য দানো সবাইকে খাইয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়। ওরা সন্তুষ্ট না হলে... ঠিক আছে, তোকে টাকা দিতে হবে না। তুই বরং একটা কাজ কর, আমি ফর্দ লিখে দিচ্ছি, তুই শুধু সেগুলো এনে দে। ব্যস। তা হলেই হবে।

— তাতে কত পড়বে? তাও... আন্দাজ...

বিশু তান্ত্রিক বলেছিলেন, ওই যে বললাম আট হাজার টাকা... তবে তোরা কিনতে গেলে কিঞ্চিৎ বেশিই পড়বে। তার থেকেও বড় কথা, টাকা হলেই হবে না। সব ক'টা জিনিস খুঁজে খুঁজে জোগাড় করাই মুশকিল। দাখ কী করবি। তোর ব্যাপার। ভেবে দ্যাখ।

— না বাবা, ভাবার কিছু নেই। আপনি করুন। যত কষ্টই হোক, আমি ওই আট হাজারই দেব। তবে একটা কথা, একটু দেখবেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার স্বামী যেন আমার কাছে ফিরে আসে।

— আসবে রে বাবা, আসবে। দে, টাকাটা দে।

কাঁচুমাচু মুখ করে অনুশ্রী বলেছিল, আমার সঙ্গে তো এই মুহূর্তে অত টাকা নেই। আপনি কাজটা শুরু করে দিন। আমি নিয়ে আসছি।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ও টাকা দিয়ে এসেছিল। সেই টাকায় বিশু তান্ত্রিক আজ সকালেই কাজটা করেছেন। ফলে ওর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু নিজে অত বার অকৃতকার্য হওয়ার পর তুকতাক-ফুঁকফাকের উপর থেকে ওর যেন বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। বারবার মনে প্রশ্ন জাগছে, তার স্বামী তার কাছে সত্যিই আবার ফিরে আসবে তো! যতই বশীকরণ-টশিকরণ করুক, সংশয়টা যেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছে ও। আগে অ্যালজোলাম পয়েন্ট টু ফাইভ খেয়ে ঘুমোত। এখন পয়েন্ট ফাইভ খায়। না হলে ঘুমই আসতে চায় না।

কিন্তু আজ ও ঘুমের ওষুধ খায়নি। খাওয়ার ভান করেছে শুধু। আর তাতেই পিয়াস বুঝি ভেবে নিয়েছে, যাক্, বাঁচা গেল। কেব্লা ফতে। তাই তাকে ঘুমোতে দেখেই দরজার খিল খুলে সে বেরিয়ে পড়েছে।

ঠিক আছে, আজকে দেখাচ্ছি মজা। একেবারে হাতেনাতে ধরব। ভেবেছে, ডুবে ডুবে জল খাবে, কেউ টেরটি পাবে না, না? ভাবতে ভাবতে আরও



একবার উঠোনের চার দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে অনুশ্রী যখন নিঃসন্দেহ হল, কেউ কোথাও নেই, তখন পা টিপে টিপে নিজের নিজের ঘরের সামনে উঠোনের উপর ধার ঘেঁষে রাখা ভাড়াটেদের বালতি, ড্রাম, মাটির জালা, বড় বড় গামলা, জ্যারিকেনের পাশ দিয়ে অতি সন্তর্পণে উঠোন পেরিয়ে ওই কোণের ঘরের সামনে চলে গেল ও।

জানালায় কাছে গিয়ে দেখল, জানালাটা বন্ধ। তারের বড় বড় বরফি খোপের ভিতর দিয়ে একটা আঙুল ঢুকিয়ে কাঠের পাল্লাটা ঠেলে সরানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারল, ভিতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া।

ওর জানালায় উঁকি দেওয়ার ঘটনাটা জেনে যাওয়ার পর থেকেই ও বোধহয় ভিতর থেকে জানালা আটকে শোয়। হতেই পারে। ও কেন, এমন ঘটনা হলে যে কোনও মেয়েই তাই করত।

কিন্তু জানালা খোলা না থাকলে ও দেখবে কী করে! দরজায় কান পাতলে কি টের পাওয়া যাবে, ভিতরে কেউ আছে কি না!

ও দরজায় কান পাততেই শিউরে উঠল। শুনতে পেল, খুব চাপা গলায় একজন পুরুষ কী যেন বলছে। এত ফিসফিস করে বলছে, কার গলা বোঝাই যাচ্ছে না। না যাক। এ ঘরে তো কোনও ছেলে থাকে না। তার মানে ও যা সন্দেহ করছে, সেটাই ঠিক। তার স্বামীই তার পাশ থেকে চুপিচুপি উঠে এসে এ ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু কী বলছে সে!

এক দিকে ঘরের ভিতরে সিলিং ফ্যানের শোঁ শোঁ শব্দ। অন্য দিকে, কখন কোন ভাড়াটে ছুট করে দরজা খুলে বেরিয়ে তাকে দেখে ফেলে, এই ভয়ে তার বুকের টিপ টিপ শব্দটা এত বেড়ে গেছে যে, ওর মনে হচ্ছে, কেউ বুঝি ওর কানের পাশে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। তাই দরজার গায়ে কান ঠেকিয়েও ভাল করে কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। ফলে দরজার পাল্লা দুটোর জোরের ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে লাগল, কিছু দেখা যায় কি না।

না। কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাই ফাঁকের মধ্যে চোখ রেখেই ক্রমশ নীচের দিকে নামতে নামতে একসময় বসে পড়ল অনুশ্রী। আর তখনই পাখার হাওয়ায় ভিতরের পর্দাটা এক ঝলক সরতেই, ও চমকে উঠল, হ্যাঁ, ওই তো, ওই তো!

আরও ভাল করে দেখার জন্য ওই ভাবেই বসে রইল ও। চোখ সরাল না। পাখার হাওয়ায় বার বার পর্দাটা দুলে দুলে উঠলেও, কারও শরীর দেখা যাচ্ছে

না ঠিকই, তবে তারই মধ্যে ঘরের আবছা আলো আঁধারিতে ও ঠিক দেখতে পেল, ওরা দুটিতে জড়াজড়ি করে পাশাপাশি শুয়ে আছে। চারটে পা নড়ছে চড়ছে। যেন খেলা করছে।

ও চিৎকার করবে, না কি বাড়ির লোকজনকে চুপিচুপি ডেকে জড়ো করবে, না কি দু'জনকেই হাতেনাতে ধরে একেবারে বেইজ্জত করবে— যখন এই সব ভাবছে, ঠিক তখনই নিজের ঘরের দরজার দিকে চোখ পড়তেই ও চমকে উঠল। দেখল, অন্ধকারের মধ্যে ছায়া ছায়া মতো কী যেন একটা সরে গেল।

কে! কে ওটা! অনুশ্রীর চোখ তখন অন্ধকারে অনেকটাই সরে গেছে। তাই আসার সময় যতটা দেখে দেখে পা ফেলতে হয়েছিল, এখন আর অতটা সতর্ক হতে হল না। তবুও যতটা পারা যায়, সাবধানে প্রায় লাফ মেরে মেরে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল ও। রাত-বাতির আবছা আলোয় দেখল, তার স্বামী বোতল উপড় করে ঢকঢক করে জল খাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো গলায় ও বলে উঠল, কোথায় গিয়েছিলে?

পিয়াস বলল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

অনুশ্রী বলল, প্রশ্নটা আমি আগে করেছি। সুতরাং উত্তরটা তুমিই আগে দেবে।

— আমি সিরিনের ঘরে গিয়েছিলাম।

— সিরিনের ঘরে! এত রাতে! কী করতে?

— শুতে।

— শুতে! মানে?

আমতা আমতা করে পিয়াস বলল, মানে... আসলে... লোকজনের সামনে ওরা কথা বলে না ঠিকই, তবু কোণের ঘরের মেয়েটার সঙ্গে সিরিনের সম্পর্কটা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ করে তো... তাই কেউ কেউ রাতবিরেতে উঠে মেয়েটার জানালায় উঁকিঝুঁকিও মারত। একবার এই নিয়ে ঝামেলাও হয়েছিল। তাই মেয়েটার ঘরে এখন আর কেউ উঁকি মারে না। তবে সিরিনের ঘরে উঁকি মারতেও ছাড়ে না। সেটা সিরিন খুব ভাল করেই জানে। তাই সিরিন বলেছিল, আমি তো আজ রাত্রিবেলায় ওর কাছে যাব, তুই কি তখন কিছুক্ষণের জন্য আমার ঘরে এসে ও দিকের দেওয়ালের দিকে মুখ করে একটু শুতে পারবি? তা হলে খুব ভাল হয়। কেউ যদি উঁকিও মারে, ভাববে, আমি শুয়ে আছি। তাই ওর ঘরে গিয়ে একটু শুয়েছিলাম...

অবাক হয়ে অনুশ্রী বলল, সেটা তো আমাকে বলতে পারতে...

— বলিনি। কারণ... তার আগে তুমি বলো তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

— আমি ওই কোণের ঘরের দিকে গিয়েছিলাম।

— কেন?

— তোমাকে খুঁজতে।

বিস্ময় ভরা চোখে পিয়াস বলল, আমাকে খুঁজতে! সে কী! তা, গিয়ে কী দেখলে?

ঠোট টিপে কোনও রকমে হাসি চেপে একেবারে গদগদ হয়ে অনুশ্রী বলল, দেখলাম, চারটে পা।

— চারটে পা!

— হ্যাঁ। দু'জন পাশাপাশি শুয়ে থাকলে তো চারটে পা-ই থাকবে, না কি?

বউয়ের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল পিয়াস। অনুশ্রী সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মুখ চেপে ধরল। বলল, একদম না! তুমি কি বাড়ির লোকজনদের ঘুম থেকে তুলে দেবে, নাকি? বেচারিরা একটু নিভুতে আছে, সত্যিই তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি না... একেবারে যা-তা... বলেই, দরজায় খিল তুলে বিছানায় ওঠার আগে ভগবানের উদ্দেশে উপর দিকে মুখ করে প্রণাম করল অনুশ্রী— যাক বাবা, তার স্বামী তা হলে শেষ অবধি তার কাছেই ফিরে এল। ফিরে এল! না কি, ছিলই! সে নিজে নিজেই এটা ওটা সাত-পাঁচ ভেবে ভেবে শুধু বোকার মতো ছুটে বেরিয়েছে। না কি বিশু তান্ত্রিকের বশীকরণই তাকে ফিরিয়ে এনেছে! অনুশ্রী ঠিক বুঝতে পারল না। তবু বিছানায় ওঠার পরও, ফের, বারবার তিন বার ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করেই ধপাস করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তার পর আড়াআড়ি ভাবে অর্ধেক শরীর তুলে দিল পিয়াসের উপর। মুখ গুঁজে দিল ওর বুকো। মুখে কোনও কথা বলল না ঠিকই, তবু তার বুকোর গভীর থেকে যেন বেরিয়ে এল ক'টা শব্দ— আঃ, কী শান্তি... কী শান্তি...

## ৪৮ ঘটকালি

শান্তাপ্রসাদ ফোন ধরতেই ও প্রান্ত থেকে রিচার গলা ভেসে এল, তুমি আজ বাড়িতে থাকবে গো?

গলাটা শুনেই খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, তুমি বললেই থাকব। চাইলে আমি গিয়ে তোমাকে নিয়েও আসতে পারি।

— না না, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি তা হলে কলেজ থেকে বেরিয়ে তোমার কাছে যাব।

— তাও ক’টা নাগাদ?

— কেন? বেরোবে নাকি?

— না না। তুমি আসবে বলছ, আমি বেরোতে পারি? যত কাজই থাক, আজ তোমার অনারে সব ক্যানসেল।

ও প্রান্তে রিচার হি-হি হাসি শোনা গেল।

শান্তাপ্রসাদ নাটকের লোক। তাঁর কাকাও নাটক করতেন। সেই কাকাই একদিন তাঁকে বলেছিলেন, আমাদের নতুন নাটকে একটা বাচ্চা লাগবে, তুই করবি?

তিনি বলেছিলেন, আমি তো করতেই চাই। কিন্তু বাবা?

— সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি তোর বাবাকে বলে নেব। তার আগে বল, তুই রাজি কি না?

এক গাল হেসে তিনি মাথা কাত করেছিলেন। মরা সৈনিকের মতো ছোট রোল। দু’-তিনটে মাত্র ডায়ালগ। তবু চার-পাঁচ দিন তাঁকে রিহার্সালে যেতে হয়েছিল। রাসবিহারী মোড়ের মুক্তাঙ্গনে ‘মরা চাঁদ’ নাটকটি শেষ হওয়ার পরে তিনি জেনেছিলেন, তাঁদের থিটখিটে বুড়ো পরিচালকের নাম— বিজন ভট্টাচার্য। তখন বুঝতে পারেননি, উনি কে। পরে জানতে পেরে নিজেকে

সৌভাগ্যবান মনে করতেন। তাই কোথাও সুযোগ পেলে এখনও বড় মুখ করে বলেন, আমার নাটকে হাতেখড়ি হয়েছে বিজন ভট্টাচার্যের হাতে। তাঁর কানে নাকি এখনও ভেসে আসে প্রত্যেক দিন রিহাসালে এক অভিনেতাকে গেয়ে গেয়ে দেখিয়ে দেওয়া বিজনবাবুর সেই বিখ্যাত গান— ‘তুমি তো নও অরুণপরতন, রূপ সনাতন, আমি তোমায় চিনি গো, জানি গো...’

সেই শুরু। তার পর কত নাটক যে তিনি করেছেন, বিজনবাবু মারা যাওয়ার পর কত নামকরা দলে অভিনয় করেছেন, বনিবনা না হওয়ায় দল থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই দল তৈরি করেছেন। আবার মনোমালিন্য হওয়ায় সেই দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে আর একটা দল গড়েছেন। ঘরে ঘরে টিভি আসার পর নাট্যশিল্প যখন একেবারে কোণঠাসা, নাটকের দিকে কেউ আর সে ভাবে ঝুঁকছে না। সবাই সিরিয়াল করার জন্য ছুটছে। তখনও উনি স্থির থেকেছেন। নাটককে ধরে রাখার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছেন।

তাঁর দলে অভিনয় করতেন রিচার মা রত্নদীপা। বিশাল বাড়ি তাঁদের। অনেকগুলো ঘর। রিহাসালের জন্য ঘর পাওয়া যাচ্ছে না শুনে উনি নিজেই তাঁর একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানেই রিচাকে প্রথম দেখেন শান্তাপ্রসাদ। সে তখন সেভেন কি এইটে পড়ে।

মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে কী যে হল, কে জানে। শান্তাপ্রসাদ তার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। শুধু তাকে দেখার জন্যই রিহাসালের দিন ছাড়াও যখন-তখন চলে যেতেন ওদের বাড়ি। রিচাও লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে ফোন করত।— ‘কী করছ তুমি?’ ‘কেমন আছ?’ ‘কবে আসবে?’, দু’-চারটে কথা। ব্যস। তার পরেই হঠাৎ ‘এইরে মা আসছে’ বলেই লাইনটা কেটে দিত।

যে দিন শো থাকত, শুধু ওকে এক ঝলক চোখের দেখা দেখার জন্যই তাঁর বাড়ির একদম উল্টো দিকে হলেও, তিনি রত্নদীপাকে ট্যান্সি করে বাড়ির দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিয়ে, উঁকিঝুঁকি মারতেন, যদি কলিংবেলের শব্দ শুনে ও দরজা খুলে বেরিয়ে আসে!

শান্তাপ্রসাদের ছেলে ঋত্বিক। রিচারই বয়সি। খুব বেশি হলে দু’-তিন বছরের বড় হবে। নাট্যদলের লোকেরা যে যার মতো গিয়ে বইমেলায় মাঠে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় জড়ো হতেন। শনি-রবিবার এবং মেলা চলাকালীন সাধারণত ছাব্বিশে জানুয়ারি পড়ে, আর ওই দিন তো স্কুল কলেজ, অফিস কাছারি সব ছুটি। ফলে ওই দিন আর বইমেলায় শেষ দিন, সবাই তাঁদের

ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতেন। তাঁর ছেলেকে নিয়ে গেলেও শান্তাপ্রসাদ কিন্তু ছেলের হাত ধরে নয়, রিচার হাত ধরেই ঘুরতেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই দল ছুট হয়ে যেতেন।

তিনি নিজেই প্রকাশ্যে বলতেন, মেয়েদের আমি ভীষণ ভালবাসি। আসলে আমাদের বংশে কোনও মেয়ে নেই। আমাদের সব ভাইবোনেরই ছেলে। এমনকী, আমারও। একমাত্র আমার ছোট বোনেরই একটা মেয়ে। কিন্তু ওরা তো থাকে জামশেদপুরে। ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধ বার ছাড়া ওকে কাছেই পাই না। আমাদের দু'জনেরই মেয়ের খুব শখ ছিল। কিন্তু কী করব! আহা, রিচার মতো যদি আমাদের একটা মেয়ে থাকত!

রিচাও সে রকম। সে তার মায়ের সামনেই একদিন তাঁকে বলেছিল, আমার না তোমাকে ভীষণ ভাল লাগে গো। আমি তোমাকে এ বার থেকে 'বাবা' বলে ডাকব।

রত্নদীপা চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকাতেই, নিজে কী বলে ফেলেছে বুঝতে পেরে ও বলেছিল, না না, আমি তা বলিনি। বলছি, পাতানো বাবা। পাতানো ছেলে, পাতানো ভাই হয় না? সে রকম।

ওর কথা শুনে তিনি মনে মনে বলেছিলেন, পাতানো নয়, জন্মদাতা বাবা ছাড়াও মেয়েরা আর একজনকেও বাবা ডাকে। আমি সেই বাবা হতে চাই।

মাঝে মাঝেই ওঁরা দল বেঁধে কাছেপিঠে ঘুরতে যেতেন। বছরে অন্তত একবার সপরিবার। তেমন বেড়ানো বহু দিন হয়নি। এর পরে আর কোথাও যাওয়া যাবে না। সামনেই রিচার মাধ্যমিক পরীক্ষা। ঋত্বিকেরও হায়ার সেকেন্ডারি। অন্যদের ছেলেমেয়েদেরও তাই। ফলে নাটাদলের সবাই মিলে ঠিক করলেন, এ বার মুর্শিদাবাদে বেড়াতে যাবেন। সব ঠিকই ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে, একেবারে বেরোবার দিন গোছগাছ করার সময় হঠাৎ মায়ের শরীর খারাপ দেখে শান্তাপ্রসাদ যখন বেঁকে বসলেন, মাকে এ ভাবে রেখে তিনি যাবেন না। তখন তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, সেটা ঠিক হবে না। তুমি এর উদ্যোক্তা। তুমিই যদি না যাও, সেটা ভাল দেখাবে না। তুমি বরং ছেলেকে নিয়ে ঘুরে এসো। বাচ্চা তো, সব ঠিক হয়ে যাওয়ার পর যদি যাওয়া না হয়, ওর আবার মন খারাপ হবে। আমার শরীরটাও তো ঠিক নেই। তুমি জোর করেছিলে বলেই যাচ্ছিলাম। আমি বরং থেকে যাই। মাকে দেখাশোনা করতে পারব। তোমরা যাও। ঘুরে এসো।



নাট্যদলের লোকেরা যেন একই পরিবারের সদস্য। তাই পৃথক ঘর নয়। স্টেশনের কাছেই ওঁরা একটা ডর্মেটরি নিয়েছিল। তাতে যেন সবার আনন্দটা আরও দশ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। মধ্যরাত অবধি গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, আড্ডা। ভোরবেলায় রিচা আর ছেলেকে নিয়ে মর্নিংওয়াক করতে বেরিয়ে পড়তেন শান্তাপ্রসাদ। এবং ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে ওদের থেকে একটু পিছিয়ে পড়তেন। বুঝতে পারতেন, তিনি মনে মনে যা চাইছেন, তাই ঘটতে চলেছে। আর সেটা টের পেয়ে তিনি নিজেই মনে মনে হাসতেন, ছেলের হয়ে বাবা ঘটকালি করছে!

ওঁদের ফেরার রিজার্ভেশন ছিল না। এতটা পথ যাবেন! এখান থেকে আদৌ সিট পাওয়া যাবে কি! তাই মুর্শিদাবাদ কোর্ট স্টেশন থেকে উল্টো দিকের ট্রেন ধরে ওঁরা সোজা লালগোলা চলে গিয়েছিলেন। একটা খোপেই গাদাগাদি করে বসেছিলেন। জানালার পাশে বসেছিল রিচা। তার পাশেই ঋত্বিক। গল্প করতে করতে এক সময় ঋত্বিকের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল রিচা। উল্টো দিকে বসা রত্নদীপাকে জিজ্ঞেস করেছিল ঋত্বিক, এর পরে কোথায় বেড়াতে যাবে?

রত্নদীপা বলেছিলেন, তোর চেহারাটা দেখেছিস? আগে দশ কিলো ওজন কমা। তার পর যাব।

ফিরে এসে মিরাকুল ঘটে গেল। যে ছেলেকে মা-বাবা ভোরবেলায় ঠেলে তুলেও কোনও দিন দু'পা হাঁটাতে পারেননি, সেই ছেলেই কিনা পরদিন বাবাকে বলল, বাবা, আমি জিমে ভর্তি হব। হাজার বলেও কেউ যার ছুটহাট ফাস্টফুড খাওয়া কমাতে পারেনি, সেই ছেলেই আচমকা ও সব ছেড়েছুড়ে ডায়েট করা শুরু করে দিল। মুখ ফসকে একদিন বলেও ফেলল, যে ভাবে হোক, আমি দু'মাসের মধ্যে দশ কিলো ওজন কমিয়ে ফেলব।

স্ত্রী এসে শান্তাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে গো? উনি শুধু বললেন, আমি কী জানি।

রিহাসাল শেষ হওয়ার পর রিচা ঘরে ঢুকতেই শান্তাপ্রসাদ বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এসো এসো। কত দিন তোমাকে দেখিনি। রত্নদীপা বলে উঠলেন, কী ব্যাপার বলুন তো আপনাদের? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে। ওখান থেকে ঘুরে আসার পর থেকেই ও শুধু বলছে, আংকল কবে আসবে,

আংকল কবে আসবে। বারবার জিজ্ঞেস করছে, মা, আমাকে কি কেউ ফোন করেছিল? তোমার মোবাইলটা দাও তো। দেখি আমার কোনও মেসেজ এসেছে কি না। আপনি কি ওকে কোনও গুণতুক করলেন নাকি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

— আপনাকে কিছু বুঝতে হবে না। এটা আমার আর ওর ব্যাপার। আচ্ছা মা, তোমার ভাল নামটা যেন কী?

রিচা বলেছিল, সায়ন্তনী।

— সায়ন্তনী চ্যাটার্জি?

— না না। চ্যাটার্জি না। দে।

— ওঃ হো। হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমরা তো দে। ‘দে’ পদবি ভাল লাগে?

নাকি কুঁচকে রিচা বলল, না। একদম না। খালি মনে হয় হাত পেতে আছি, দে। যা পারিস দে।

— চ্যাটার্জি পদবিটা ভাল লাগে না?

— ওটা তো তোমার পদবি।

— যারই হোক। ভাল লাগে কি না বলো।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসি হাসি মুখ করে চোখের ইশারায় ও বোঝাল, দারুণ।

ট্রে-তে চায়ের কাপ তুলতে তুলতে রত্নদীপা মজা করে বললেন, কী হচ্ছে এ সব? উঁ?

তার পর যখনই শান্তাপ্রসাদ রিহাসালে যেতেন, রিচাকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই না দেখার ভান করতেন। এ পকেট ও পকেট হাতড়ে বলতেন, এই রে, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। বলেই, রিচাকে যেন আচমকা দেখেছেন, এমন ভান করে বলতেন, চল তো মা, সামনের দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে আসি।

বাইরে বেরিয়েই পকেট থেকে মোবাইল বার করে টপাটপ বোতাম টিপতেন ছেলের নম্বরে। বলতেন, দ্যাখ, আমার সঙ্গে কে আছে, কথা বল। বলেই, রিচার হাতে মোবাইলটা দিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যেতেন এবং যতক্ষণ পারা যায়, ছেলের সঙ্গে ওকে কথা বলতে দিতেন।

আবার কোনও দিন রিহাসাল দিতে দিতে রিচাকে দেখলেই বলতেন, আমি তো রিহাসাল করাচ্ছি, দ্যাখ তো মা, ও কোচিংয়ে গেছে কি না। বলেই,

ওর দিকে বাড়িয়ে দিতেন মোবাইল। আর মনে মনে বলতেন, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের মেয়ে দাওনি, ঠিক আছে। একে যাতে মেয়ের মতোই আমরা আমাদের কাছে রাখতে পারি, তার ব্যবস্থা করে দাও। এত মিষ্টি মেয়ে এই পৃথিবীতে যে আমরা আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাব না।

তিনি কী চান, সরাসরি নয়— রত্নদীপাকে সেটা তিনি বারবার আকার-ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। একবার বলেছিলেন, ওর মা তো সে দিন বলছিল, তা হলে ওদের একদিন আসতে বলা।

সঙ্গে সঙ্গে ‘তা হলে’ শব্দটার উপর জোর দিয়ে রিচার মা বলেছিলেন, ‘তা হলে’ মানে? তার আগে নিশ্চয়ই কোনও কথা হয়েছে?

রিচাও তাল দিয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কোনও কথা হয়েছে। কী কথা গো?

একটু লজ্জা পেয়ে তিনি বলেছিলেন, না না, কিছু না।

মুখ গোমড়া করে রিচা বলেছিল, তুমি আমাকেও বলবে না?

শান্তাপ্রসাদ ইশারায় রিচাকে বলেছিলেন, পরে বলব। কিন্তু ওর মা সারাক্ষণ মুখের সামনে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকায় সে দিন আর ওই কথাটা বলা হয়ে ওঠেনি তাঁর। তা হলে কি ওই কথাটা শোনার জন্যই ও আজ আসতে চাইছে! মনে মনে বললেন, আসুক। যেটা তিনি ওকে বলতে চান, গত সাত-আট বছর ধরে যেটা ঘটাবার জন্য তিনি প্রস্তুতি চালাচ্ছেন, সেটা আজ সরাসরি না বললেও, অন্তত তার একটু আভাস দেবেন তিনি। বলবেন, আমি চাই, এ ভাবে মাঝে মাঝে নয়, তুমি আমাদের কাছে চিরজীবনের জন্য থাকো। এ ঘরেরই একজন হয়ে। এতেও কি ও বুঝতে পারবে না, আমি কী বলতে চাইছি? এত বোকা ও!

ছেলে কি জানে ও আসছে? গলা তুলে ডাকতে গিয়েও চুপ করে গেলেন তিনি। বউ শুনলে আবার খঁক খঁক করে উঠবে। তিনি চান না, তাঁর ছেলের মাথায় এখনই এ সব ঢোকাতে। যখন যা হওয়ার হবে। এখন তো পড়াশোনা করুক। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াক।

বউ খুব একটা ভুল বলছেন না বুঝতে পেরেও নিজের মনকে কিছুতেই বেশে রাখতে পারছিলেন না তিনি। দেরি হয়ে গেলে এই দু’জনের কোনও একজনের চোখ যদি অন্য কারও দিকে চলে যায়! তখন! এ বয়সটা তো খুব মারাত্মক। তাই তিনি কোনও রিস্ক নিতে চান না। তাদের সম্পর্কটা যাতে

আরও গভীর হয়, তার জন্যই তিনি পাশের ঘরে গিয়ে ছেলেকে বললেন,  
তুই বিকেলের দিকে আছিস তো?

ঋত্বিক বলল, কেন?

উনি বললেন, রিচা আসছে।

— তা আমি কী করব?

— থাকবি।

— আমার কোচিং আছে।

— একদিন না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

— না না। স্যার আজকে পরীক্ষা নেবে বলেছেন।

— না গেলে হবে না?

— না।

এ বার তিনি বুঝতে পারলেন, হঠাৎ করে রিচা কেন আসতে চেয়েছে।  
মনে মনে বললেন, ও, বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয়ই ওদের দু'জনের মধ্যে কিছু  
একটা হয়েছে। তাই নালিশ জানাতে ও তাঁর কাছে আসছে। আর রিচার  
উপরে তাঁর ছেলে এতটাই খেপে আছে যে, ও আসছে শুনে সে বাড়ি থেকেই  
কেটে পড়তে চাইছে। ভাল ভাল। খুব ভাল। একটু-আধটু মান অভিমান থাকা  
ভাল। এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এ সব না হলে কি প্রেম জমে... বিড়বিড় করতে  
করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বিকেলবেলায় রিচা আসতেই শান্তাপ্রসাদ বললেন, কী হল? দু'জনের ঝগড়া  
হয়েছে নাকি?

ও বলল, কই, না তো।

— আবার মিথ্যে কথা?

— না গো। সত্যিই কিছু হয়নি।

— তা হলে?

— তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।

এর মধ্যেই উনি আন্দাজ করে ফেলেছেন, ও কী বলতে পারে। এবং  
এটাও অনুমান করেছেন, তাঁর ছেলে তাঁর কাছে যে কথাটা সংকোচে বলতে  
পারছে না, আর যেহেতু সে জানে, বাবা-মায়ের কাছেও মন খুলে রিচা যে  
কথা বলতে পারে না, সেটাও তাঁর বাবার কাছে ও অনায়াসে বলতে পারে,

তাই ওর ওপর দায়িত্ব দিয়ে ও সরে পড়েছে। সেই কথাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শোনার জন্য তিনি বললেন, কী? বলো না...

এত দিন পর এই প্রথম বার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রিচা আমতা আমতা করতে লাগল। তার পর বলল, আসলে ও না একজনকে ভালবাসে।

— কে?

— ঋত্বিক।

— জানি তো।

— আপনি জানেন!

— হ্যাঁ।

— কে বলুন তো?

— নামটা তুমিই বলো না...

— অর্চনা।

— অর্চনা! এ রকম কোনও নাম শোনার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। নামটা শোনার পর যেন আকাশ থেকে পড়লেন। রিচা বলল, খুব ভাল মেয়ে। আমারও খুব বন্ধু। ঋত্বিকই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওর মা নেই। ক’দিন আগে বাবাও মারা গেছেন। আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। কী করবে, কোথায় থাকবে ও জানে না। তুমি যদি এ সময় ওর পাশে এসে দাঁড়াও...

— অর্চনা! কী একটা ভাবতে ভাবতে শান্তাপ্রসাদের মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল নামটা।

রিচা বলল, আমি তো নিজেকে দিয়ে দেখেছি। তোমরা মানুষকে কত ভালবাসো। কত সহজে সবাইকে আপন করে নাও। আমি জানি না, আমি কিন্তু অর্চনাকে কথা দিয়ে দিয়েছি। তুমি না করতে পারবে না...

যাকে তিনি ছেলের বউ হিসেবে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, সেই কিনা তাঁর ছেলের ঘটকালি করতে এসেছে! রিচার কথা শুনে শান্তাপ্রসাদ একেবারে থ’ হয়ে গেলেন।



## প্রেম

এত দিন বিয়ে হয়েছে। আজ পর্যন্ত এমন হয়নি। কোথায় গেল ও! অনুত্তমা যত বার ফোন করে, সুইচ অফ। তা হলে কি কোনও বিপদ-আপদ হল! রাত তখন অনেক। একে ফোন করল, তাকে ফোন করল, ওর অফিসের যে দু'চার জন সহকর্মীর নম্বর ছিল, তাদের ফোন করল। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারল না। তাদের কেউ বলল, থানায় মিসিং ডায়েরি করতে। কেউ বলল, আশপাশের হাসপাতাল-টাসপাতালগুলোতে খোঁজ করতে। কেউ বলল, এখন যা দিনকাল পড়েছে। কী থেকে যে কী হয়! কেউ বলল, ওকে আবার কেউ অপহরণ-টপহরণ করেনি তো!

অপহরণ! শব্দটা শুনেই আঁতকে উঠল অনুত্তমা। সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। খবর পেয়ে সকাল থেকেই খোঁজ নিতে লাগল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা। ছুটে এল বাপের বাড়ির লোক। সবাই উদ্বিগ্ন। বারবার ফোন বাজছে। বেলা যখন সওয়া দশটা, তখন জানা গেল, ও অফিসে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে সুচয়ন এমন ভান করল যেন কিছুই হয়নি। রোজকার মতো ঘরে ঢুকেই বউকে বলল, অনু, চা বসাও।

— কাল কোথায় গিয়েছিলে? ফেরোনি কেন? ফোনটাকে অফ করে রাখার মানে কী? একের পর এক প্রশ্ন। কিন্তু কোনও কথারই কোনও উত্তর দিল না ও। ফের অনুত্তমা কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সে বলল, তুমি কি চা করবে, না জেরা করবে?

অনুত্তমা অবাধ। হঠাৎ কী হল ওর? ও তো এ ভাবে কথা বলে না। কেমন যেন একটা সন্দেহ হল তার।

আর সন্দেহটা শুধু তারই নয়, যারা শুনল, তারাই বলল, ও নিশ্চয়ই কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়েছে। একটু খোঁজখবর নাও।



খোঁজ নিতে হল না। পরপর বেশ কয়েক দিনের ব্যবহারেই অনুত্তমা বুঝতে পারল, তার কপাল পুড়েছে।

কোনও মানুষ এ ভাবে বদলে যেতে পারে! ক’দিন আগে আনাজ কাটতে কাটতে একটু আঙুল কেটে গিয়েছিল দেখে যে অ্যান্থ্রাক্সের জন্য ফোন করতে যাচ্ছিল, মাঝরাতে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গিয়েছিল বলে ঘুমন্ত বউকে যে সারা রাত হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করে গিয়েছিল, বউ বাপের বাড়ি গেলে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে যে প্রতিদিন একেবারে হ্যাংলার মতো শ্বশুরবাড়ি ছুটত, সে কিনা আজকাল তার দিকে ফিরেও তাকায় না! মধ্যরাতের আগে বাড়ি ফেরে না! কোনও কথা বলতে গেলেই ঝাঁঝিয়ে ওঠে! সে যে কোনও দিন এ রকম করতে পারে, অনুত্তমা তা কল্পনাও করতে পারেনি। একই খাটে পাশাপাশি শুয়েও যেন হাজার মাইল দূরে থাকে সে।

সব বুঝতে পারছিল অনুত্তমা। তবু দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করছিল। কিন্তু দিনকে দিন তার মাত্রা এমন লাগামছাড়া হয়ে পড়ছিল যে, অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সে। গায়ে হাত না তুলেও যে প্রতিটা মুহূর্তে চাবকানো যায়, শিল নোড়ায় থেঁতলানো যায়, ওর ব্যবহার না দেখলে সে কোনও দিন জানতেও পারত না। বাচ্চাটা আছে, না হলে যে দিকে দু’চোখ যায়, ও চলে যেত। আর পারছে না।

হঠাৎ ওর মনে হল, আচ্ছা, প্রথম যে দিন অফিস থেকে ও বাড়ি ফিরল না, সে দিন কোথায় ছিল? কার সঙ্গে? মেয়েটা কে? তলে তলে খোঁজ নিতে লাগল অনুত্তমা। জানতে পারল, সে দিন অফিস থেকে আকর্ষির সঙ্গে ও বেরিয়েছিল। তার মানে আকর্ষি সব জানে! সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে পরদিনই আকর্ষির সঙ্গে দেখা করল সে। সব শুনে আকাশ থেকে পড়ল ও। মনে পড়ে গেল সে দিনের কথা।

একটু দেরি করেই অফিসে এসেছিল সুচয়ন। কেমন যেন যন্ত্রের মতো কাজ করে যাচ্ছিল। ওকে কখনও কেউ এমন গোমড়া মুখ করে থাকতে দেখেনি। সারাক্ষণ হইহই করে কাটায়। কখনও এর পিছনে লাগে কখনও তার পিছনে। ও বলে, কাজ করতে হয় আনন্দে। মন ফুর্তিতে থাকলে কাজটাকে আর কাজ বলে মনে হয় না। সেই সুচয়নকেই ও রকম দেখে হাতের কাজ ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল সে।— কী হয়েছে রে?

থতমত খেয়ে ও বলেছিল, কই, কিছু না তো...

— কিছু না বললে হবে?

— না রে কিছু হয়নি। কেমন আছিস?

— আমার তো এখন পনেরোই আগস্ট চলছে?

— মানে?

— মানে আমি এখন পুরো স্বাধীন। বাড়িতে বউ নেই। এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে বল? রোজ একটা করে নিপ নিয়ে যাচ্ছি। সারা রাত মস্তি। যাবি নাকি? চল। দু'জনে মিলে আজ...

— বাড়িতে অনু আছে...

— ধ্যাত, অনু আছে। যত্ন সব মিডল ক্লাস কালচার। শোন, কোনও ভদ্রলোক রোজ রোজ বাড়ি ফেরে না। গিয়ে কী হবে বল, সেই একই বউ, একই ছেলে, একই বাড়ি। আমাদের জীবনে কিছু হল না কেন জানিস? এই জন্য। চল চল। তুই গেলে একটা বড় বোতল নিয়ে নেব, চল।

— তোর বউ?

— তোকে বললাম না, ওর মায়ের শরীরটা খারাপ। বাপের

বাড়ি গেছে। আজ সকালে ফোন করেছিল। বলল, কাল রাত থেকে নাকি আবার ডিটোরিয়েট করেছে। ফলে কবে যে ফিরবে... তুই বরং তোর বউকে একটা ফোন করে দে। বল, আমার সঙ্গে যাচ্ছিস। নে নে, ফোন কর।

ও বলেছিল, করছি।

আকর্ষি তাই বলল, কেন, ও সে দিন আপনাকে ফোন করেনি? ও তো আমার বাড়িতে ছিল।

ও বলল ঠিকই, কিন্তু অনুত্তমার চাহনি দেখে বুঝতে পারল, সে তার কথা বিশ্বাস করছে না। ভাবছে, বন্ধুকে আড়াল করতেই সে মিথো বলছে। নিজেই বড় অপরাধী মনে হল তার। কোন কুক্ষণেই যে তাকে সে দিন বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সে। না নিলে, আজ নিশ্চয়ই তাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত না। আর সুচয়নকেও এই সন্দেহের জালে ফাঁসতে হত না। সে বুঝতে পারল, অনুত্তমা কী সন্দেহ করছে। তাই বলল, ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, আমি দেখছি।

বিকেলবেলায় অফিস থেকে বেরিয়ে আকর্ষি আর সুচয়ন পাশাপাশি হাঁটছিল। কী ভাবে কথাটা বলবে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না আকর্ষি। শেষে

‘যা ভাবার ভাবুক’ ভেবে নিয়ে বলেই ফেলল, সত্যি কথা বল তো, তুই কি কোনও মেয়ের চক্রে পড়েছিস?

— মেয়ে! সুচয়ন থমকে দাঁড়াল। অনুত্তমা এসেছিল, না?

— সেটা পরের কথা। তার আগে বল তো, তুই ওর সঙ্গে এ রকম করছিস কেন?

— কী করছি?

— একদম এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবি না। আমি সব জানি।

মুহূর্তে গলার স্বর পাল্টে গেল সুচয়নের। বলল, আমি ওকে ভীষণ ভালবাসি।

— ভালবাসি মানে?

— আমি ওকে সত্যিই খুব ভালবাসি রে।

— ভালবাসিস বলে খারাপ ব্যবহার করছিস? এটা তোর ভালবাসা?

— বিশ্বাস কর, আমি ওর সঙ্গে যা করছি, সেটার জন্য ও যতটা না কষ্ট পাচ্ছে, তার চেয়ে অনেক অনেক অনেক গুণ বেশি কষ্ট পাচ্ছি আমি।

— তা হলে এ রকম করছিস কেন?

— কোনও উপায় নেই। ডাক্তার বলে দিয়েছে।

— ডাক্তার বলে দিয়েছে, মানে? ডাক্তার তোকে ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে বলেছে?

— না না, সে কথা বলিনি।

— তা হলে?

— যে দিন রাতে তোর বাড়িতে ছিলাম, সে দিন সকালে আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। রিপোর্ট-টিপোর্ট দেখে তিনি বললেন, আমার ব্রেন টিউমার। লাস্ট স্টেজ।

— সে কী রে!

— হ্যাঁ, আমি জানি, আমার হাতে আর সময় নেই। হয়তো টেনেটুনে আর মাস ছয়েক। আমার কিছু হয়ে গেলে অনু পাগল হয়ে যাবে। আমি তাই ইচ্ছে করেই এমন খারাপ ব্যবহার করছি, আমার মৃত্যুর পরে ও যাতে আমার জন্য এক ফোঁটাও চোখের জল না ফেলে। আমি ওর চোখের জল সহ্য করতে পারি না।

— তা হলে এখন কাঁদাচ্ছিস কেন?

— এখন কাঁদুক। এখন তো আমি আছি। আমি থাকতে থাকতে যতটা পারে কেঁদে হালকা হয়ে নিক। ক’টা দিন আর কাঁদবে! খুব বেশি হলে ছ’মাস। তার বেশি তো নয়। আমি ঠিক সামলে নেব। আমি তখনকার কথা ভাবছি, যখন আমি থাকব না।

কথাগুলো সুচয়ন বলে যাচ্ছিল। আর হাঁ করে শুনছিল আকর্ষি। বুঝতে পারছিল না, একটু পরে অনুভূমা যখন ওকে ফোন করবে, তখন তাকে কী বলবে ও! এ সব কথা কি সে বলতে পারবে!



## অপারেশন নিশাচর

সবার মুখে একটাই কথা, কে করছে এ সব?

রাত্রে নয়, যে সব বাড়ির কর্তা-গিন্নি উভয়েই চাকরি করেন, দুপুরে কেউ বাড়ি থাকেন না— তাঁদের বাড়িতে এই কিছু দিন আগে পর্যন্ত, ভরদুপুরে ঢুকে মাস্টার-কি দিয়ে দরজা খুলে শুধু লুঠপাটই নয়, রীতিমত আলমারির গোপন দেরাজ থেকে সোনাদানা, গয়নাগাঁটি, নগদ টাকা যেখানে যা পেত, একেবারে সাপটে নিয়ে যেত। বোঝা যেত, একজন নয়, এটা অন্তত চার-পাঁচ জনের কোনও একটা দলের কাজ।

কিন্তু কাদের কাজ? অধিকাংশ ফ্ল্যাটবাড়িতেই এখন সর্বক্ষণ পাহারায় থাকেন সিকিউরিটির কোনও না-কোনও লোক। থাকেন লিফ্টম্যান। অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকজন। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারা ঢুকছে কী করে? কোনও কোনও বহুতল আবাসনের প্রবেশপথেই গোপন ক্যামেরা লাগানো থাকে। কে ঢুকছে কে বেরোচ্ছে, তাদের ছবি উঠে যায়। সে সব বাড়িতে রহস্যজনক ডাকাতি হওয়ার পরে ওই সব ক্যামেরার ফুটেজ তন্নতন্ন করে দেখেও সন্দেহজনক কাউকে তো নয়ই, কোনও আদলও পাওয়া যায়নি। যারা ডাকাতি করছে, তারা তবে কে! যাদের দেখাও যায় না! ছবিও ওঠে না!

না। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ধরা পড়ে গিয়েছিল সোনারপুরের এক যুবক। সনৎ সাঁপুই। তার বাবা নাকি আগে বাঁদরের খেলা দেখাত। বাবা-মারা যেতেই, তার মাথায় এক বুদ্ধি আসে। সে ভাবে, বাঁদরের খেলা দেখিয়ে আর ক'পরসা পাব! তার চে' খেলা দেখানোর জন্য যে তালিম দিয়ে বাঁদরদের তৈরি করতে হয়, সেই তালিমটা যদি একটু অন্য ভাবে দেওয়া যায়, তা হলেই তো কেব্লা ফতে।

ও তাই আট-দশটা বাঁদরকে নিয়ে তৈরি করেছিল তার বাহিনী। ও যে

ভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে দিত, ওরা সে ভাবেই ডাকাতি করত।

পুলিশের জালে ধরা পরার পর, সনৎকে পুলিশ বলেছিল, আপনার এই বুদ্ধিটা যদি খারাপ কাজে না লাগিয়ে একটু ভাল কাজে লাগাতেন, তা হলে শুধু এর থেকে বেশি টাকাই নয়, সুনামও অর্জন করতে পারতেন। জেলের ঘানিও আর টানতে হত না আপনাকে।

কিন্তু ও তো এখন জেলে! তা ছাড়া ওর কাজ-কারবার ছিল দিনে। আর এর কাজ তো রাতে! তা হলে কি ওর মতো অন্য কেউ ফের নতুন কোনও পদ্ধতিতে শুরু করেছে এই কাজ? হতেই পারে!

অভিযোগের পর অভিযোগ জমা হচ্ছিল। অভিযোগগুলি খুঁটিয়ে দেখে থানার বড়কর্তারা অবাক, অপারেশন দেখে তো মনে হচ্ছে একই লোক বা একই দলের কাজ। কিন্তু একই রাতে গড়িয়া, কসবা, গার্ডেনরিচ, শ্যামবাজার, দমদম এবং সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের পিছনে, মহিষবাথানে ডাকাতি হয় কী করে! কাছাকাছি হলেও নাহয় বোঝা যেত, একটা বাড়ির ডাকাতি সেরে পরের বাড়িতে হানা দিয়েছে। কিন্তু এ তো এক-আধ মাইল নয়, শহরের এ প্রান্ত আর ও প্রান্ত! কারও একার পক্ষে বা একটা কোনও দলের পক্ষে গাড়ি নিয়ে গেলেও, রাস্তা যতই ফাঁকা হোক, এক রাতের মধ্যে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে অ্যাটেন্ড করা সম্ভব নয়। তবে! তবে কি বড় কোনও দল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে এই কাজ করেছে! পুলিশ প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে গোটা রাজ্যকে। প্রত্যেকটি মোড়ে মোড়ে নিশ্চিহ্ন প্রহরায় রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। মধ্যরাতে সন্দেহজনক কোনও গাড়িকে দেখলেই তাঁরা তল্লাশি চালাচ্ছেন। সারা শহর, শহরতলি জুড়ে টহল দিচ্ছে পুলিশ ভ্যান। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে অনেককে। কোনও তথ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় শুধুমাত্র জেরা করেই ছেড়ে দিতে হয়েছে তাদের। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে, যতক্ষণ না তাকে বা তাদের দলকে ধরা যাচ্ছে, অন্তত সে ক'টা দিনের জন্য নিজেরা যেন পালা করে জেগে থাকেন। তেমন কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে যেন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে জানিয়ে দেন। যিনি বা যাঁরা, এই চোরদের সম্পর্কে কোনও সূত্র দিতে পারবেন, তাঁদের জন্য ইতিমধ্যেই বিশাল অঙ্কের পৃথক পৃথক পুরস্কার ঘোষণা করেছে রাজা এবং কেন্দ্র সরকার।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তো নয়ই, ইংরেজ আমলেও নাকি এ রকমের



কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়নি কলকাতা পুলিশ। এই রহস্যের দেখভাল যাঁরা করছেন, সব দেখেশুনে তাঁদের নাকি মনে হয়েছে, এই কাজে অন্য কোনও গ্রহবাসীর হাত থাকলেও থাকতে পারে। সাধারণত এ সব ক্ষেত্রে যে কোনও দেশকেই নিজে থেকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ। তেমন কাউকে আসতে না দেখে প্রথমেই সব রকম সহযোগিতা চেয়ে খবর পাঠানো হল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তারাও মুখ ঘুরিয়ে নিল! সেটা দেখে উচ্চপদস্থদের ঞ্চ কুঁচকে গেল। তবে কি ওরা কিছু টের পেয়েছে! না কি এর মধ্যে আন্তর্জাতিক কোনও চক্র জড়িত! কিছুই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই, এটা যে বা যারা করছে, তাদের ধরার জন্য প্রত্যেক এলাকায়, পাড়ায় পাড়ায়, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে, এমনকী ঘরে ঘরে রাত জাগার পালা চলছিল। রাত জাগা মানেই উৎসব। ফিস্ট। হই-হুল্লোড়। নিদেনপক্ষে ভাল কোনও সিনেমা চালিয়ে ডিভিডি দেখা। নয়তো টিভির একটা পর একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে যাওয়া।

এ রকমই একটি পরিবারের এক কিশোর নাকি জানালা দিয়ে দেখেছে, কালো ডানাওয়ালা কী একটা উড়ে যেতে। কিন্তু সেটা কী?

তা আর জানা গেল না। তবে জানা গেল, তাদের পাশের পাড়াতেই একটা বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। যদিও সোনাদানা, গয়নাগাঁটি নয়, কোনও মূল্যবান জিনিসও নয়, কে যেন তিন তলার জানালা দিয়ে লোমশ হাত বাড়িয়ে রান্নাঘরের তাক থেকে তুলে নিয়েছে টম্যাটো সসের বোতল। পাশেই রাখা ছিল কাচের বাটি। তাতে ছিল পনির তরকারি। ঠান্ডা হলে ফ্রিজে রাখবেন। কিন্তু তালেগোলে ভুলে গিয়েছিলেন ওর মা। ওটাও নাকি তাকে তুলে নিতে দেখেছে সে। ভয়ে মুখ দিয়ে একটাও শব্দ বেরোয়নি। যখন বেরোল, এ-ঘর ও-ঘর থেকে ছুটে এল তার বাবা, মা, বড়দা।

ও বললেও, কেউ ওর কথা বিশ্বাস করলেন না। কারণ, এই তিন তলার রান্নাঘরের জানালা দিয়ে হাত বাড়াতে যাবে কে! ও পাশে তো খাড়া দেয়াল। উঠতে গেলে জানালার আশপাশে অন্তত একটা পাইপ দরকার। কিন্তু ও দিকে তো বাইরে থেকে কোনও পাইপটাইপ নেই। নিশ্চয়ই ও ভুল দেখেছে। সবাই হাসাহাসি করলেন। বাবা বললেন, যদি তেমন কেউ সত্যিই এসে থাকে, তা হলে সে আর যাই হোক, মানুষ নয়।

পরদিন এ খবর রটে যেতেই, তেঘরিয়া থেকে এক কিশোরী বলল,

চোখে না দেখলে তো কিছু নিতে পারবে না। সে দিন বাবা-মা'ও বাড়িতে ছিলেন না। আমি একা। তাই সন্ধ্যার পরেই গোটা বাড়ির সমস্ত লাইট নিভিয়ে দিয়েছিলাম। এত অন্ধকার যে নিজেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে হল ঘরের মধ্যে কে যেন হাঁটাচলা করছে। কিন্তু তাকে ধরব কী, আমার শরীর তখন অবশ হয়ে গেছে। ভয়ে কাঁঠ। চোখ বন্ধ করে মরার মতো পড়ে রইলাম। কয়েক মিনিট মাত্র। তার পরেই বুঝতে পারলাম, কেউ কোথাও নেই। সকালে উঠে দেখি, সব ঠিকঠাক আছে। শুধু লাইট নেভাবার আগে পড়তে পড়তে যে বইটা টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিলাম, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সেই বইটা নেই। তার কথা শুনে সবাই বললেন, এত কিছু থাকতে, যে কেবল বই নিয়ে যায়, সে মানুষ ছাড়া আর কী?

চারিদিকে আরও নানা রকম কথা উঠল। কেউ বললেন, মানুষটানুষ নয়, এ নিশ্চয়ই কোনও অতৃপ্ত অশরীরী। কেউ বললেন, এটা অনেক বড় লেবেলের খেলা। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বোঝা যাবে না। কেউ বললেন, এটা মনে হয় কোনও অদৃশ্য মানুষের কাজ!

যিনি যা বলছিলেন, যাঁর যা খোয়া যাচ্ছিল, সব লিপিবদ্ধ হচ্ছিল শুধুমাত্র এই ঘটনার নিষ্পত্তি করার জন্য গঠিত বিশেষ সেল-এ। বাছাই করা দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ প্রশাসনিক লোক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, মনস্তত্ত্ববিদ থেকে শুরু করে জগদ্বিখ্যাত দু'জন ম্যাজিশিয়ানও ছিলেন সেই সেল-এ। ছিল কম্যান্ডো বাহিনী। তাঁরা সব কিছু বিশ্লেষণ করে, বিচার-বিবেচনা করে, আলোচনা করে ঠিক করলেন, এ বার তাঁরা কী করবেন।

সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হল। খোলা হল বিশেষ কন্ট্রোল রুম। যেহেতু রাতেই তার কাণ্ডকারখানা, তাই এই অপারেশনের নাম দেওয়া হল— 'অপারেশন নিশাচর'। কেউ কোথাও তার সামান্যতম উপস্থিতি টের পেলেই যেন ফোন করেন।

সে দিন সকাল থেকেই হাসপাতাল, রেল, কারাগারের মতো কয়েকটি জায়গা ছাড়া গোটা রাজ্যই বিদ্যাহীন। সূর্য ডুবে গেছে বহুক্ষণ। কিন্তু একটাও স্ট্রিট লাইট জ্বলল না। অন্ধকারের মধ্যেই রাত ঘনিয়ে এল। এমন সময় ক্রিং ক্রিং। কন্ট্রোল রুমে ফোন বেজে উঠল।— হ্যালো।

— আমি সালাউদ্দিন বলছি। আমাদের বাড়িতে মনে হয়...

— ঠিকানা কী?

— নয় বাই ছয় ওলটপালট লেন, সেভেনথ ফ্লোর, কলকাতা আট।

— ও কে।

সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারলেসে ওয়ারলেসে কথা হয়ে গেল। গোটা রাজ্য অন্ধকার। অথচ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেহালার সেই নয় বাই ছয় অ্যাপার্টমেন্টে চার দিক থেকে ঠিকরে পড়ল প্রায় শ'খানেক ফ্লাড লাইট।

এলাকার লোকেরা জানতেন, বিশেষ ভাবে গঠিত ওই সেল সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে নির্দেশ দিয়েছিল আজ সকাল থেকেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে। যাতে দরকারের সময় পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন তাঁরা। প্রতিটি এলাকার আলো সরবরাহকারীদের বলা হয়েছিল প্রস্তুত থাকতে। কখন কোথায় দরকার হবে, আগে থেকে কিছু বলা যায় না। লোকজনকেও বলে দেওয়া হয়েছিল, সব রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু সেটা যে তাঁদের এলাকাতেই হবে, সেটা ওই পাড়ার লোকেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

কয়েক পলকের মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদে, কার্নিশে কার্নিশে আগে থেকে ফিট করে রাখা ফ্লাড লাইটগুলোর মুখ ঘুরে গেল ওই বাড়িটির দিকে। গোটা তল্লাট আলোয় ভেসে যেতে লাগল। মধ্যদুপুর নয়, তারও চেয়ে বেশি আলোয় ঝলসে উঠল যেন। কম্যান্ডো বাহিনী ঘিরে ফেলল গোটা বাড়ি। তাদের রাইফেলের নল সেভেনথ ফ্লোরের জানালার দিকে তাক করা।

হঠাৎ আট তলার জানালা দিয়ে কে যেন মুখ বাড়াল। মানুষ না ভালুক বোঝা গেল না। প্রচণ্ড আলোয় সে তার বিশাল বিশাল দুটো পাখনা দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল। তার পর গোটা শরীরটা বার করে উড়তে যেতেই— ধপাস। ভাগ্যিস, শেষ মুহূর্তে কোনও রকমে ডানাটা খুলতে পেরেছিল, না হলে এতক্ষণে তার ইহলীলা সাক্ষ হয়ে যেত।

খবর পেয়ে ততক্ষণে ও বি ভ্যান-ট্যান নিয়ে ছুটে এসেছে দেশ বিদেশের অন্তত খানচল্লিশেক টিভি চ্যানেল। তারা ক্যামেরা তাক করে লাইভ টেলিকাস্ট শুরু করে দিল। দেখা গেল, এ এক ভারী অদ্ভুত জীব। কালো কুচকুচে। খানিকটা মানুষের মতো আদল। কিন্তু হাত দুটো হাত নয়। ক্রুশ বিদ্ধ যিশুখ্রিস্টের মতো দু'দিকে হাত মেলে দিলে হাতের তালু থেকে হাঁটু

পর্যন্ত বাদুড়ের মতো ডানা। পায়ের চেটো দুটোও কেমন যেন। হাঁসের মতো। অনেকটা ছড়ানো।

আগে থেকেই সব রেডি ছিল। প্রচণ্ড আলোয় সে কুঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে যেতেই এক প্রকাণ্ড জাল ফেলে তাকে ধরা হল। পোরা হল বিশেষ ভাবে নির্মিত এক লোহার খাঁচায়। তার পর গাড়িতে তুলে যখন তাকে সশস্ত্র প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সকালের আলো ফুটতে শুরু করেছে। গন্তব্যে এসে গাড়ির দরজা খুলতেই সবাই অবাক। দেখল, যাকে রাতে ওরা ধরেছিল, সে কোথায়! খাঁচার মধ্যে পড়ে আছে অতি সাধারণ গোবেচারা গোছের একটি বালক। তবে কি ও চেহারাও পাল্টাতে পারে! গিরগিটির মতো! না কি সে উবে গিয়ে, যাতে কেউ সন্দেহ না করে, তাই, তার জায়গায় কোনও এক মন্ত্রবলে একটা বালককে রেখে গেছে।

নিশ্চিহ্ন প্রহরায় অত্যন্ত সতর্ক হয়ে, যাতে কোনও সংক্রমণ না ঘটে, নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রেখে কোনও রকমে তাকে নিয়ে আসা হল ‘অপারেশন নিশাচর’ কন্ট্রোল রুমে। তার পর বন্ধ ঘরে শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ।

— তোমার নাম কী?

— নিশিকান্ত পাড়ুই।

— কোথায় থাকো?

— বাইপাসের ধারে পঞ্চগন্না গ্রামের উল্টো দিকে একটা ছোট গ্রামে।

— ওখানে আবার গ্রাম কোথায়?

— না। গ্রাম না। বাইপাস হওয়ার পর ওটা এখন কলকাতা হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু কিছুই বদলায়নি। সেই গ্রামই রয়ে গেছে।

— ও। সে ঠিক আছে। কিন্তু গতকাল আমরা যাকে ধরেছিলাম, তার সঙ্গে তো তোমার কোনও মিল দেখছি না।

— দেখবেন কী করে? ওই আমি আর এই আমি যে আলাদা।

— তার মানে?

— দিনের বেলায় গ্রামের আর পাঁচটা বালকের মতোই আমি একজন অতি সাধারণ ছেলে। কিন্তু রাত্রি হলেই...

— রাত্রি হলেই?

— আমি অন্য রকম হয়ে যাই।

— কী রকম?

— তখন দিনের চেয়ে অন্ধকারে বেশি দেখতে পাই। আমার হাত দুটো আস্তে আস্তে কেমন যেন ডানার মতো হয়ে যায়। আমি উড়তে পারি। শরীরটাকে সঙ্কুচিত করে ছোট করতে পারি। যে কোনও গাছের ডাল পা দিয়ে আঁকড়ে মাথাটা নীচে ঝুলিয়ে দোল খেতে পারি। ও ভাবেই ঘুমোতে পারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

— সে কী! এটা কি তোমার ছোটবেলা থেকেই হচ্ছে?

— না।

— তা হলে?

— আমাদের তো কোনও জমিজমা নেই। আমার বাবা-মা রাতদুপুরে আশপাশের খेत থেকে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ভুট্টা, লাউ— এ সব তুলে এনে দিনের বেলায় বাইপাসের ধারে বসে বিক্রি করত। আমিও মাঝে মাঝে মা-বাবার সঙ্গে যেতাম। বসে বসে দেখতাম, সার সার গাড়ি হুসহাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে আমাদের মতো লোকদের কাছ থেকে এটা-ওটা কিনছে। ও পারে বড় বড় বাড়ি। হোটেল। অফিস। সন্কেবেলায় আলোয় আলোময়। আমি কত বার বাবাকে বলেছি, বাবা আমাকে শহরে নিয়ে চলো। আমি ট্রাম দেখব। মেট্রো চড়ব। ডাবল ডেকার বাসে উঠব। কিন্তু বাবা আমাকে কোনও দিন নিয়ে যায়নি। তাই...

— তাই কী?

— আমি একদিন রাত্রিবেলায় চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ জমি ও জমির পাশ দিয়ে, এ গাছ সে গাছের তলা দিয়ে যখন গাড়িরাস্তার কাছাকাছি এসে গেছি, হঠাৎ একটা বাঁকড়া মাথাওয়ালা প্রকাণ্ড গাছ থেকে কতগুলো কালো কালো পাখি আমাকে ঘিরে ধরল। তারা ডানা ঝাপটাতে লাগল। আঁচড়াতে লাগল। কামড়াতে লাগল। যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করতে লাগলাম। কিন্তু কেউই ছুটে এল না। রক্তে ভেসে যেতে লাগল আমার সারা শরীর। দু'চোখে অন্ধকার নেমে এল। গায়ে আর শক্তি নেই। আমি পড়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, কিছুতেই আর উঠতে পারছি না। কোনও রকমে মুখ তুলে দেখি, আমার সামনে বিশাল বিশাল দুটো ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে

এক-মানুষ সমান একটা বাদুড়। সে বলল, রাতে বেড়াবার খুব শখ, না? নিশাচর হবি? ঠিক আছে, আজ থেকে পৃথিবীতে অন্ধকার নামলেই তুই আমাদের মতো হয়ে যাবি।

যাঁরা অপারেশন নিশাচর কন্ট্রোল রুমের বন্ধ ঘরে ওর সামনের চেয়ারে বসে একের পর এক প্রশ্ন করছিলেন, তাঁরা অবাক। কারও মুখে কোনও রা নেই। তবু একজন কোনও রকমে বললেন, তার পর?

— তার পরদিন সন্ধ্যাবেলা থেকেই বুঝতে পারলাম, আমার শরীরে কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। দিনে যা দেখি, রাতের অন্ধকারে তার চেয়ে বেশি দেখি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে হাঁটা নয়, মনে হয় উড়ে যাই। ইচ্ছে করে বাদুড়দের মতো গাছের ডাল পায়ে আঁকড়ে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলে থাকি।

— তুমি তাই করতে?

— প্রথম প্রথম করতাম। তার পর মনে হল, বাবাকে তো বহু বার বলেছি, তবু বাবা আমাকে কোনও দিন শহরে নিয়ে যায়নি। এ বার আমি একাই যাব। যাওয়ার তো আর কোনও সমস্যা নেই...

— তাই শহরে যাওয়া শুরু করলে? তাই তো? ঠিক আছে সে নয় হল, কিন্তু তুমি ডাকাতি করতে শুরু করলে কেন?

— ডাকাতি? না। আমি কোনও দিন ডাকাতি করিনি। বিশ্বাস করুন, আমি হয়তো কারও জেলির শিশি নিয়েছি। কারও খেলনা নিয়েছি। একজনের বইও নিয়েছি...

— তুমি পড়তে জানো?

— না।

— তা হলে!

— পড়ার জন্য নয়। বইয়ের মলাটে খুব সুন্দর একটা ছবি ছিল। সেটা খুলতে গিয়ে দেখি আঠা দিয়ে পিসবোর্ডের সঙ্গে আটকানো। টানাটানি করলে যদি ছিঁড়ে যায়! তাই পুরো বইটাই নিয়ে নিয়েছিলাম।

— কিন্তু লোকে যে বলে তুমি ডাকাতি করো।

— না। আমি করি না। ওটা হয়তো অন্য কেউ করে। আপনারা চাইলে আমি তাকে ধরে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারি।



অপারেশন নিশাচর কন্ট্রোল রুমে যাঁরা ওর চেয়ারের উল্টো দিকে বসেছিলেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন, বুঝতে পারলেন না, এই নিশাচরকে নিয়ে কী করবেন! ডাকাত ধরার জন্য কাজে লাগাবেন, না কি চিকিৎসার জন্য সেরা ডাক্তারদের নিয়ে যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে, তার হাতে তুলে দেবেন। না কি আমেরিকার যে সংস্থা ওকে নিয়ে গবেষণার জন্য এর মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তার হাতে তুলে দেবেন! ওঁরা ভাবতে লাগলেন, ভাবতেই লাগলেন।



## আমাদের মাইকেল জর্ডন

ব্রিজের উপর দিয়ে চেতলার দিকে যেতে যেতে রোজকার মতো বাঁ দিকে কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে চেয়ে প্রণাম করল মিঠুন। তার পর ডান দিকে কালীঘাট মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে তাকাতেই দেখল, সামনেই রানাদা আর প্রীতিশেখরদা। রানাদা জিজ্ঞেস করল, কী রে, কোথায় যাচ্ছিস?

মিঠুন বলল, ক্লাবে।

— আমাদের ক্লাব ছাড়িয়ে তো তোকে ওই ক্লাবে যেতে হয়। সামনে আমাদের ক্লাব থাকতে অত দূরে যাস কেন?

— দূরে কোথায়? রাস্তার এ পার আর ও পার তো!

প্রীতিশেখর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, রাস্তাটা তো পেরোতে হয়। ওখান দিয়ে যে ভাবে গাড়ি যায়... বলা যায় না, যদি কোনও দিন কিছু একটা ঘটে যায়...

— ক্লাব ও পারে হলে আর কী করব বলো?

রানাদা বলল, কেন, এ পারের ক্লাবে চলে আয়।

— ছোটবেলা থেকে ওই ক্লাবে খেলছি।

রানাদা বলল, তাতে কী হয়েছে?

প্রীতিশেখর বলল, ওই ক্লাব তোকে কী দিয়েছে বল?

মিঠুন চুপ করে গেল। রানাদা বলল, আমাদের ক্লাবে এলে তুই যে টিমে খেলবি, তোকে সেই টিমের ক্যাপ্টেন করে দেব।

— আমি কিন্তু ওখানে আমার দলের ক্যাপ্টেন না হলেও ক্যাপ্টেনের মতোই।

মুখ বিকৃত করে প্রীতিশেখর বলল, রাখ তো। ক্যাপ্টেনের মতো। ক্যাপ্টেনের মতো আর ক্যাপ্টেনের মধ্যে অনেক তফাত...

রানাদা বলল, তা ছাড়া, তুই আমাদের ক্লাবে এলে তোকে আমরা জার্সি দেব।

— জার্সি তো এরাও দিয়েছে।

— শুধু কি জার্সি? আমরা তোকে জুতোও দেব।

জুতোর কথা শুনে মিঠুনের চোখ চকচক করে উঠল। বেশ কিছু দিন ধরেই ও ওর বাবার কাছে জুতোর কথা বলছিল। কিন্তু ওর বাবার ইচ্ছে থাকলেও সাধ্যে কুলোচ্ছিল না। শেষে হাজরা পার্কের ফুটপাথ থেকে পুরনো এক জোড়া জুতো কিনে দিয়েছিল। ওই জুতোগুলো নাকি ছিঁচকে চোর আর পাতাখোররা কালীঘাট মন্দির চত্বর থেকে চুরি করে ওদের কাছে পাঁচ-সাত টাকা যা পায়, বিক্রি করে দেয়। ওরা সেগুলো সারিয়েটারিয়ে, পালিশ-টালিশ করে খদ্দের বুঝে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ফাট, এমনকী সত্তর-আশি টাকাও হাঁকে। তো, সেই জুতো ল্যাম্পপোস্টের তলায় নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখেটেখে পাঁচশ টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছিল। কিন্তু আট দিনও পরতে পারেনি। নীচ থেকে পুরো সোলটাই খুলে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেটাই এখন আঠা লাগিয়ে, পেরেক মেরে পরছে। তবু ও বলল, আমার জুতো আছে।

প্রীতিশেখর বলল, আরে, এ জুতো সে জুতো নয়। এ হচ্ছে এ এস ই জুতো। শুধু বাল্কেটবল খেলার জন্যই তৈরি হয়, বুঝেছিস?

ও প্রীতিশেখরের দিকে তাকাল।

কালীঘাট পার্কের পিছনে যে বিশাল কবরখানাটা ছিল, সেটা দখল করে যে যেমন ভাবে পেরেছে ঘর তুলে নিয়েছে। সেখানে মিঠুনের টালির চালের একটাই ছোট্ট ঘর। ঘরে ছোট্ট একটা রঙিন টিভি। এই টিভিগুলো সাধারণত গাড়িতে লাগানো থাকে। ওর বাবা খুব কম দামে কার কাছ থেকে যেন কিনেছিলেন। সেটার সামনে বসে বাবার সঙ্গে ও একদিন সিনেমা দেখছিল। টিভি আসার পর থেকে ও প্রায় সারাক্ষণই টিভি দেখে। এমনকী পড়তে বসলেও টিভির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ওর মা পড়ার কথা বললেই ও বলে, দাঁড়াও না। এফুনি বিজ্ঞাপন শুরু হবে। সত্যিই তাই। টিভিতে বিজ্ঞাপন শুরু হলেই সাউন্ডটা মিউট করে দিয়ে ও বইয়ের দিকে তাকায়। পড়তে শুরু করে। এবং অবাক কাণ্ড, টিভি দেখে দেখে ওর এমন সময় জ্ঞান হয়ে গেছে যে, ও যখন চোখ তোলে ঠিক তখনই প্রোগ্রাম শুরু হয়।

ওর প্রিয় ফিল্মস্টার শাহরুখ খান হলেও ওর বাবা কিন্তু অমিতাভ বচ্চনের অন্ধ ভক্ত। চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে কোনও চ্যানেলে অমিতাভের সিনেমা দেখতে পেলেই হল, সেই যে বসেন, ওঠার আর নাম-গন্ধ করেন না। বাজার আনতে ভুলে যান। সপ্তাহের শেষ দিনেও কেরোসিন তোলা হয় না। খেতে খেতে বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়।

সে দিন টিভিতে ‘দিওয়ার’ হচ্ছিল। বাবার পাশে বসে ও-ও দেখছিল। এক মিনিটের ব্রেক দিয়ে ‘পিকচার আভি বাকি হ্যায়’ বলতেই রিমোট তুলে নিয়েছিল মিঠুন। ওর বাবা তখন বলেছিলেন, জানিস, এই সিনেমাটা যখন প্রথম কালিকায় আসে, আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। আমরা তিন বন্ধু মিলে স্কুল কেটে সিনেমায় গিয়েছিলাম। তখন টিকিটের দাম ছিল এক টাকা চার আনা।

বাবার কথা শুনছে আর টপাটপ রিমোটের বোতাম টিপছে মিঠুন। হঠাৎ একটা চ্যানেলে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। দেখল, সেখানে এশিয়ান বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ দেখাচ্ছে। এত ছোট স্ক্রিন যে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। প্লেয়ারগুলো যেন পিঁপড়াদের থেকেও ছোট। ও মনে মনে বলল, আমি যখন চাকরি করব, প্রথম মাসের মাইনে পেলেই বড়লোকদের মতো দেওয়াল জোড়া একটা টিভি কিনব। কিনবই।

ওর বাবা বললেন, কী রে, কী হল? সিনেমাটায় দে। শুরু হয়ে গেছে বোধহয়। মিঠুন ফের আগের চ্যানেলে ঘুরিয়ে দিল। আর অমিতাভকে দেখেই ওর মনে পড়ে গেল, কিছু দিন আগের বইমেলায় কথা।

বই কিনতে নয়, ক’জনের পাল্লায় পড়ে, বিকেলে তেমন কিছু কাজ না থাকায়, এমনিই বইমেলায় ঘুরতে গিয়েছিল। এখন তো আর টিকিট কাটতে হয় না। শুধু বাসভাড়াটুকু জোগাড় করতে পারলেই হল। সেটাও ওর এক বন্ধু দিয়ে দিয়েছিল।

বইমেলায় এ স্টলে ও স্টলে ঘুরতে ঘুরতে কখনও জি বাংলার স্টলে, কখনও স্টার জলসার স্টলে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। দেখছিল, নানা রকম খেলা। প্রতিযোগিতা। কুইজ। কিন্তু আর প্লাসের স্টলের সামনে যাওয়ার পর ও আর নড়তেই পারল না। কারণ, ফরসা মতো ওই লোকটা, যাকে ও এর আগেও অনেক বার টিভিতে দেখেছে, সে এক-একটা প্রশ্ন করছে আর তার উত্তর দিতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে নগদ পুরস্কার। কোনওটা একশো টাকা, তো কোনওটা দুশো টাকা। আবার কোনও কোনওটা পাঁচশো টাকা। প্রশ্ন উত্তরের

মাঝে মাঝেই উনি ঘোষণা করছিলেন, আর একটু পরেই শুরু হবে আজকের দ্বিতীয় বাম্পার কুইজ। একই বিষয়-সম্পর্কিত একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার।

মিঠুন দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা বললেন, কী থেকে প্রশ্ন করব বলুন? শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, স্থাপত্য— যা ইচ্ছে, আপনারা যা বলবেন, সেটা থেকেই প্রশ্ন করব।

জটলা থেকে একজন বলে উঠল, ইতিহাস।

— ইতিহাস? ঠিক আছে। বলুন তো ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল?

আগে যেমন প্রচুর হাত উঠছিল, এ বার মাত্র দু’-তিনটে হাত উঠল। এবং প্রথম দু’জন ভুল বলল। তৃতীয় জনকে প্রশ্ন করতেই, তিনি বললেন, ১৯২২ সালের ১৩ মার্চ।

— এগজ্যাক্টলি। আপনি কি জানেন সে দিনের পত্রিকাটা কী রঙে ছাপা হয়েছিল?

লোকটা বলল, লাল রঙে।

— একদম ঠিক। আপনি এগিয়ে আসুন। সে দিনের কাগজটার দাম কত ছিল?

কাঁধের সাইড ব্যাগ সামলাতে সামলাতে লোকটা বলল, দু’পয়সা।

— বাঃ। আপনি তো দেখছি প্রচুর খবর রাখেন। জানেন কি, সে দিনটা বিশেষ কী দিন ছিল?

চোস্তুপাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা এগোতে এগোতে বলল, হ্যাঁ। দোল।

— অ্যাবসলিউটলি রাইট। উঠে আসুন, উঠে আসুন। আপনি কী করেন?

কিন্তু মিঠুনের কানে তখন সে সব কথা ঢুকছে না। ও চাইছে, এই বাম্পার কুইজের পরে আবার যখন নতুন করে কুইজ শুরু হবে, লোকটা যেন এমন একটা প্রশ্ন করে, যেটার সঠিক উত্তর শুধু ও-ই জানে। কিন্তু কী জানে ও! যা অন্যরা জানে না। ইতিহাস? ভূগোল? বিজ্ঞান?

ততক্ষণে দর্শকদের মধ্য থেকে চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলছে, ও জয়ন্তদা, খেলা খেলা খেলা।

লোকটা বললেন, ঠিক আছে, খেলা থেকেই করছি। বলেই, প্রশ্ন ছুড়ে

ছিলেন, অমিতাভ বচ্চন কলকাতার কোন ক্লাবে বাস্কেটবল খেলতেন?

মিঠুন আকাশ থেকে পড়ল। অমিতাভ বচ্চন বাস্কেটবল খেলতেন!

পাশ থেকে কে যেন চাপা গলায় বলল, স্পোর্টস রিপোর্টার ছিল তো... স্পোর্টস পেলেই হল! এমন এমন প্রশ্ন করে...

— তাই নাকি? জটিলার মধ্য থেকেই কে যেন বলল।

আগের লোকটাই আবার বলল, হ্যাঁ, ইনি তো জয়ন্ত চক্রবর্তী। আগে যুগান্তর-এ কাজ করতেন। তার পর প্রতিদিন-এ। এখন কোথায় কাজ করেন, জানি না।

আশপাশে আরও কত কী বলাবলি হচ্ছে। কিছু কে যে কী বলছে, কেউই বোধহয় শুনছে না। মিঠুনও শুনছে না। জটিলার পিছন দিকে দাঁড়িয়ে শুধু এ দিকে ও দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ দেখল, অনেকেই হাত তুলেছে। একজনের দিকে আঙুল তুলে জয়ন্ত বললেন, আপনি এগিয়ে আসুন, বলুন।

সে বলল, রাখি সংঘে। চেতলার রাখি সংঘে।

— একদম ঠিক। হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট...

তার ক’দিন পরেই রাখি সংঘের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বাসরাস্তার দিকের গলা-সমান পাঁচিলের ও পার দিয়ে ও দেখল, বাস্কেটবল খেলা হচ্ছে। একটু দেখি তো... ভেবে, সেই যে দাঁড়িয়ে পড়ল, পড়ল তো পড়লই। যে কথা মাসিকে বলার জন্য ওর মা ওকে পীতাম্বর ঘটক লেনে পাঠিয়েছিল, সেটা বেমালুম ভুলে গেল। খেলা দেখতে দেখতে ওর মনে হল, ইস্, ওই ছেলেটার জায়গায় যদি আমি হতাম! ঠিক চুক্কি দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতাম।

মাসিকে ঠিক সময়ে খবর পৌঁছে না দেওয়ায় মায়ের হাতে সে দিন উত্তম মধ্যম খাওয়ার পরেও, ও যত বারই মাসির বাড়ি গেছে, কোন এক অদম্য আকর্ষণে ঠিক ওখানেই থমকে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, তারই বয়সি ছেলেমেয়েরা কী রকম দৌড়ঝাঁপ করছে।

ওর বাবা আর ও পাশাপাশি বসে টিভিতে ‘দিওয়ার’ দেখছে। ফের এক মিনিটের বিজ্ঞাপন-বিরতি হতেই যে চ্যানেলে বাস্কেটবল খেলা হচ্ছিল, ঝপ করে সেই চ্যানেলে ঘুরিয়ে দিল মিঠুন। ওর বাবা বললেন, কী হল, আবার ঘোরালি কেন?

মিঠুন বলল, বাবা, তুমি আমাকে বাস্কেটবলে ভর্তি করে দেবে?



— বাস্কেটবলে?

ও বলল, হ্যাঁ, বাস্কেটবলে।

— কেন?

ও বলল, আমি খেলব।

— খেলবি তো ফুটবল খেল। ক্রিকেট খেল। হঠাৎ বাস্কেটবল কেন?

মিঠুন বলল, না। আমি বাস্কেটবলেই ভর্তি হব। জানো, অমিতাভ বচ্চনও বাস্কেটবল খেলত। আর সেটা কোথায় জানো? রাখি সংঘে।

ওর বাবা অবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, যাঃ।

— যাঃ নয়, যারা খোঁজখবর রাখে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো, তারা কী বলে...

ওর বাবা অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি?

মিঠুন বলল, হ্যাঁ, তাই।

পরদিন মিঠুনকে নিয়ে ওর বাবা গেলেন রাখি সংঘে। সেখানকার কোচ বনি। তিনি তাকে বললেন, আমার ছেলেকে এখানে ভর্তি করতে চাই।

বনি বলল, ওকে পাঠান। ছ'দিন প্র্যাক্টিস করুক। যদি দেখি ওর ইচ্ছে আছে, তবেই ভর্তি নেব।

মিঠুন যাওয়া শুরু করল। না। কোনও খেলা নয়। বনি প্রথমেই ওকে রাখি সংঘের মাঠটা চক্কর দিতে বলল। দশ মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে বনির সামনে আসতেই অন্যদের দেখিয়ে বনি বলল, ওরা যে ভাবে পিটি করছে, দেখে দেখে সেই ভাবে করো। ও করল।

পরদিন সবার আগে গিয়ে সবার পরে ক্লাব ছাড়ল মিঠুন। তার পরদিনও তাই। তার পরের দিনও। সাত দিনের মাথায় বনি ওকে বলল, তোর বাবাকে দুশো কুড়ি টাকা নিয়ে আসতে বলবি।

মিঠুন জিজ্ঞেস করল, কেন?

ও বলল, তোর ভর্তি-ফি।

— মাসে দুশো টাকা করে মাইনে?

— না না। মাসে না। মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে। ওটা ভর্তি ফি। ওই একবারই লাগবে।

— ঠিক আছে।

পরদিনই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল ও। সে দিন থেকেই দৌড় আর পিটি-র সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বাল্কেটবল ড্রিবল। মানে হাতের চাপড়ে বাল্কেটবল নাচানো। ডান হাতে দুশো বার। বাঁ হাতে দুশো বার। হয়ে গেলেই দু'হাতে ড্রিবল। ডান হাতে বল মেরে মেঝেতে গোঁড়া খেয়ে উঠে এলেই বাঁ হাত দিয়ে বলটাকে মেরে আবার নীচে পাঠিয়ে দেওয়া। পাঁচ ছ'ফুট দূরে মুখোমুখি দু'জন দাঁড়িয়ে চেস্ট পাস। বুক দিয়ে একবার ও দিকে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার বুক পাঠানো। আবার সে বুক দিয়ে ঠেলে দিলে সেই বলটাকে আবার বুক দিয়ে মেরে পাঠানো।

সপ্তাহে ছ'দিনই প্র্যাক্টিস। রবিবার ছুটি। প্রথম প্রথম ভুল করে নেশার বেশে ও রবিবারেও চলে যেত। এক মাস পর আর দুশো করে নয়, শুরু হল পাঁচশো করে ড্রিবল। তার সঙ্গে চেয়ারে বসার মতো করে অর্ধেক বসে ড্রিবল। তার পরে বসে ড্রিবল। দু'হাতে চেঞ্জিং ড্রিবল। দু'হাতে দুটো বল নিয়ে ড্রিবল। দু'রিংয়ের দু'দিকে ক্লাবের কুড়ি জন দু'ভাগে ভাগ হয়ে, ছোট থেকে বড় পর পর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্তত পঞ্চাশ বার করে রিংয়ে বল ফেলা।

ওদের কোচ বলত, বাল্কেটবলের এটাই আসল। যে এটা ঠিকঠাক মতো প্র্যাক্টিস করবে, তাকে আর কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

মিঠুনকেও আটকে রাখা গেল না। এক-একটা টিমে বারো জন করে থাকে। খেলে পাঁচ জন। সাধারণত চার জনের হাইট ছ'ফুটের বেশি হলে বাল্কেটবলের ক্ষেত্রে সুবিধে হয়। কিন্তু ওই পাঁচ জনের মধ্যে একজনের উচ্চতা ওদের তুলনায় একটু খাটো হলে, তবেই সেটা আদর্শ দল হিসেবে গড়ে ওঠে। কারণ, যাদের হাইট ছোট হয়, দেখা গেছে, তাদেরই শাটিং, ড্রিবলিং, স্পিড, পাসিং সেন্স এবং সর্বোপরি রিংয়ে বল ফেলার দক্ষতাটা লম্বাদের চেয়ে একটু বেশিই হয়। যারা লম্বা, তারা ড্রিবল করার সময়, যেহেতু বলটা নীচ থেকে তাদের হাতের তালু পর্যন্ত উঠতে যতটা সময় নেয়, সেটা অন্য দলের খাটো খেলোয়াড়দের পক্ষে বল কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া, লম্বারা বড় বড় পা ফেলে আগে যেতে পারে অনেকে মনে করলেও, এই খেলায় দেখা গেছে, খাটোরাই পাশ কাটিয়ে পাইপাই করে বল নিয়ে অন্যায়সেই বিপক্ষ দলের বিপদসীমার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ফলে বাল্কেটবলের বোদ্ধারা মনে করেন, খাটো খেলোয়াড়দের হাতেই থাকে দলকে জেতানোর আসল কারিকুরি।

মিঠুনের হাইটটা অন্যদের থেকে একটু কম হওয়ায় ও খুব সহজেই ক্লাবের মিনি টিমে জায়গা পেয়ে গেল। মিনি টিমে ঢুকেই ওর কেন যেন মনে হল, এই বিশ্বটা ওর পৃথিবী নয়, ওর জগৎ শুধু পনেরো মিটার বাই আঠাশ মিটারের এই মাঠটা। আর লক্ষ্য শুধু দশ ফুট উপরের বোর্ডে লাগানো থ্রি পয়েন্ট টু ডায়ামিটারের ওই রিংটা।

প্র্যাক্টিসের কোনও বিকল্প নেই। সাত মাসের মাথায় ও ঢুকে পড়ল আন্ডার ফর্টিন টিমে। তার পরের মাসেই রাজ্য টুর্নামেন্ট। সেই খেলার দায়িত্ব পেল রাখি সংঘ। খেলতে এল বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট, বড়বাজার যুবক সংঘ, বড়িশা অ্যাথলেটিক ক্লাব, বড়িশা আসর, কালীঘাটের বয়েজ ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশন, অনীক গোষ্ঠী, উনিশশো তেইশ ছাত্র সমিতি, চেতলা পার্ক অ্যাথলেটিক ক্লাব।

দূর দূর থেকে আসা খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থা হল কাছেই, চেতলা বয়েজ হাই স্কুলে। হোম গ্রাউন্ডে খেলা হলে, আয়োজক দলের একটু সুবিধেই হয়। নানা সুযোগ-সুবিধেও পাওয়া যায়। রাখি সংঘও পেল।

সন্ধ্যার পরে খেলা। চার দিকে হ্যালোজেনে-হ্যালোজেনে ছয়লাপ। আশপাশের দোতলা, তিন তলার বুলবারান্দায় চেয়ার নিয়ে সব বসে পড়েছে। এ-বাড়ি ও-বাড়ির জানালায় শুধু মুখ আর মুখ। বাস-রাস্তার দিকের দেওয়াল বরাবর গিজগিজ করছে লোকের কালো মাথা। উপচে পড়া সেই ভিড় সামাল দিতে প্রতি বছরের মতো ক্লাবের মূল প্রবেশপথের সামনের ফুটপাথের উপরে দর্শকদের জন্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে কাঠের অস্থায়ী একটা গ্যালারি।

দশ মিনিট করে চার বার অর্থাৎ চল্লিশ মিনিটের খেলা। তার মধ্যে প্রতি দল প্রতি দশ মিনিটে চল্লিশ সেকেন্ড করে, খুব বেশি হলে তিন বার টাইম আউট নিতে পারে। সেই সময় কোচ তার দলের খেলোয়াড়দের নানা রকম টিপস দিয়ে দেয়। যদিও সেই সময়টা আলাদা করে হিসেব করে ওই চল্লিশ মিনিটের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়।

তখন রাখি সংঘের বিরুদ্ধে ফুল ফর্মে খেলছে বর্ধমান। এক-একজন বল নিয়ে পঞ্চাশ সেকেন্ড, বাহান্ন সেকেন্ড আটকে রাখছে। রাখি সংঘের ছেলেরা কিছুই করতে পারছে না। দর্শকদের মধ্যে তখন বর্ধমানকে নিয়ে সে কী উল্লাস। ওরা রিংয়ের দিকে এগোলেই চিংকারে চার দিক ফেটে পড়ছে। আর

রাখি সংঘের সমর্থকেরা একেবারে চুপচাপ। শুধু ড্যাভড্যাভ করে তাকিয়ে আছে। আর কী করা যায় সেটা নিয়ে শলাপারামর্শ করছে। ওদের কোচ ততক্ষণে ওই খেলায় দশটা টাইম আউট নিয়ে নিয়েছে। টাইম কিল করে ওদের স্পিডটাকে নষ্ট করে দিতে চাইছে। নানা রকম ফন্দি করে, কন্ডা করার চেষ্টা করছে। অথচ প্রতি বারই নতুন নতুন ছকে খেলে রাখি সংঘকে ক্রমশই কোণঠাসা করে দিচ্ছে ওরা। শেষ দশ মিনিটে রাখি সংঘ এতটাই পিছিয়ে গেল যে বুঝতে পারল— হাতে যা সময়, তাতে আর কিছুতেই ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবে না। তখন ওদের ক্লাবেরই কে যেন হঠাৎ মেন সুইচ অফ করে, ঝপ করে নিভিয়ে দিল সব ক’টা ফ্লাড লাইট।

কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ। কিন্তু তার পরেই যখন বুঝতে পারল, ব্যাপারটা কী, তখন শুধু বর্ধমানের সাপোর্টাররাই নয়, অন্যান্য দলের সমর্থকেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাতাহাতি শুরু করে দিল চেতলা পার্ক অ্যাথলেটিকের ছেলেরা। কারণ, চেতলা পার্ক আর রাখি সংঘ প্রায় মুখোমুখি। ফলে প্লেয়ারে প্লেয়ারে মুখে বন্ধুত্ব থাকলেও খেলার ব্যাপারে একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। তা ছাড়া, রাখি সংঘ প্রতি বছর রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে, সেই অনুষ্ঠানে শুধু রবিবারের সকালটা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেও, বাকি তিন দিনের মূল অনুষ্ঠানে টিকিট ছাড়া কাউকেই ঢুকতে দেয় না। সে নিয়েও স্থানীয় ছেলেদের মনে একটা চাপা ক্ষোভ আছে। এই সুযোগে সেই ক্ষোভটাও উগরে দেওয়ার চেষ্টা করছিল কেউ কেউ। ঠিক তখনই কে যেন হঠাৎই লাইট জ্বালিয়ে দিল। সে বার বর্ধমান রানার্স হয়েছিল। বড়বাজার যুবক সংঘ হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন।

পরে সিনিয়রদের কানাঘুষোয় মিঠুন জেনেছিল, বর্ধমানকে হারানোর জন্য সে দিন নাকি ওদেরই ক্লাবের তাপসদা, বর্ধমানের খাবার পরিবেশন করার দায়িত্বে থাকা লোকটাকে কী করে যেন ফিট করেছিল খাবারে জোলাপ মিশিয়ে দেওয়ার জন্য। দিয়েও ছিল নাকি।

কিন্তু সে দিন দুপুরেই বর্ধমানের ছেলেরা ঠিক করে, তারা শুধু ফল খাবে। কারণ, প্রতিদিনই খেতে খেতে তাদের বেলা হয়ে যাচ্ছে। যদি তাদের খেলা প্রথমেই পড়ে, তা হলে ভীষণ অসুবিধে হবে। তাই ওই সিদ্ধান্ত। ওদের সেই সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছিল ওদের কোচও।

সেটা শুনে মিঠুন মনে মনে বলেছিল, ভাগ্যিস সায় দিয়েছিল। না হলে কী

যে হত! এটা অন্যায়। এ ভাবে জোচ্ছুরি করে জেতা অন্যায়। হোক নিজের ক্লাব, তবু এটা ঠিক নয়। জিততে হলে খেলে জিতব। কৌশল করে নয়।

এই সব নানান ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে ক্লাবের উপরে একটু বিরক্তই ছিল মিঠুন। তাই চেতলা ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে প্রীতিশেখর যখন বলল, আরে, এ জুতো সে জুতো নয়। এ হচ্ছে এ এস ই জুতো। শুধু বাস্কেটবল খেলার জন্যই তৈরি হয়, বুঝেছিস? তখন মিঠুন একেবারে বোল্ড আউট হয়ে গেল।

শুধু বিকেল নয়, চেতলা পার্ক অ্যাথলেটিক ক্লাবে আসার পর সকাল বিকেল মিলিয়ে চার ঘণ্টা করে মোট আট ঘণ্টা প্র্যাক্টিস শুরু করে দিল ও। ওদের কোচ সুভাষদা ওকে আলাদা করে খাবার চাট করে দিল। সকালে ছ'পিস স্লাইসড্ ব্রেড। পাঁচশো এম এল দুধ। একটা কলা। দুটো ডিম। তিরিশ গ্রাম মাখন। তিরিশ গ্রাম জ্যাম। আর ছোট বাটির এক বাটি ডালিয়া।

দুপুরে ভাত। ছোলার ডাল আর সয়াবিন বা ক্যাপসিকাম জাতীয় কোনও আনাজের একটা তরকারি।

বিকেলে এক প্যাকেট বিস্কুট, একটা কলা।

এবং রাতে হাতে বানানো আটার রুটি। সঙ্গে সপ্তাহে চার দিন মাংস। দু'দিন ডিম। একদিন পনির।

চাট দেখে মিঠুন বলেছিল, এ তো অনেক খরচ। রানা বলেছিল, খরচের কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না। তুই শুধু প্র্যাক্টিস কর। কাল কিন্তু রেড রোডে যেতে হবে।

— রেড রোডে? কেন?

— ওখানে যে মহামেডান ক্লাবটা আছে, তার উল্টো দিকেই ওয়েস্টবেঙ্গল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন। পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টা ক্লাবের ছেলেমেয়েরা জাতীয় দলে খেলার জন্য ওখানে সিলেকশন দিতে যাচ্ছে। কাল আমাদের ক্লাবের ডেটা। ওখানে সিলেকশন হলেই ন্যাশনালে খেলতে পারবি। খুব কঠিন ব্যাপার। একশো সন্তর-আশি জনের মধ্যে মাত্র চোদ্দো জনকে বাছা হয়। খেলে বারো জন। স্ট্যান্ড বাই থাকে দু'জন। ওখানে অনেক ল্যাং মারামারির ব্যাপার আছে। তুই কিন্তু আমাদের মুখটা রাখিস।

ও মুখ রেখেছিল। আর তার জেরেই এই প্রথম ওর বাইরে যাওয়া। আন্ডার

ফটিন ন্যাশনালে খেলার জন্য লখনউ। থ্রি স্টার হোটেল খাওয়া থাকা।  
ওখানেই ওর সঙ্গে আলাপ হল পঞ্জাব থেকে আসা সুরিন্দর সিংহের সঙ্গে।  
সে-ই বলল, রাজ্যের খেলায় বেস্ট প্লেয়ার যেখানে সামান্য একটা টাইটান  
ঘড়ি পায়, নগদ পায় মাত্র তিন-চার হাজার টাকা, সেখানে এই ন্যাশনালে  
বেস্ট প্লেয়ার হলে অন্যান্য দামি দামি জিনিস তো পায়ই, সঙ্গে পায় তার দশ  
গুণ টাকা, মানে তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা।

মিঠুন অবাক। এত টাকা পাওয়া যায়! আচ্ছা, বেস্ট প্লেয়ার হতে গেলে  
কত পয়েন্ট পেতে হবে?

সুরিন্দর বলল, গত বছর ইনদওরে দিল্লি ভার্সাস এম পি-র খেলায় একশো  
কুড়ি পয়েন্ট পেয়েছিল দিল্লি।

— এ...ক..শো. কু...ড়ি..!

— আরে, একশো কুড়ি-টুড়ি বলে নয়, যে সবচেয়ে ভাল খেলবে, সবচেয়ে  
বেশি পয়েন্ট পাবে, সে-ই পাবে। যদি দেখা যায়, বাকিরা সবাই পনেরো-ষোলো  
করে পয়েন্ট পেল আর তুই পেলি সতেরো পয়েন্ট, তা হলে তুই-ই পারি।

মিঠুনের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, আমি পার!

— আরে, শুধু এটা কেন? তুই কি জানিস, ভাল খেলার জন্য বাস্কেটবল  
ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া প্রতি মাসে কত জনকে কত টাকা করে দেয়?

— কত করে?

— কুড়ি হাজার করে।

— প্রতি মাসে?

— হ্যাঁ, প্রতি মাসে।

— কারা পায়?

সুরিন্দর বলল, কত প্লেয়ার আছে! শ্যামসুন্দর, অজয়প্রতাপ সিং, সাগর  
যোশী, কুসমিত সিং, নভনীত সিং— কত নাম বলব?

— ওখানে সিলেকশন পেতে গেলে কী করতে হয়?

— কিছু করতে হবে না। শুধু ভাল খেলতে হবে।

— ভাল খেললেই হবে?

— হ্যাঁ, হবে। এখানে তো পৃথ্বীনাথ বাস্কেটবল আকাদেমি মানে পি এন  
বি-র লোকেরাও আসছে।

মিঠুন জিজ্ঞেস করল, তারা কী করবে?



— এখানে যারা ভাল খেলবে, তাদের বেছে নিয়ে যাবে।

— কোথায়?

সুরিন্দর বলল, দিল্লিতে।

— কেন?

— আরও ভাল ভাবে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য।

— আর পড়াশোনা?

— সব ওরা করাবে। কারণ, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশ ওয়ার্ল্ড কাপেই কোয়ালিফাই করতে পারেনি। ফলে অলিম্পিকে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওরা চাইছে, ভারতীয় বাস্কেটবল টিম অলিম্পিকে যেতে না পারুক, অন্তত একবার ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ালিফাই করুক।

মিঠুন জিজ্ঞেস করল, কিন্তু... এখানে আবার দলবাজি হবে না তো?

— না। এখানে ও সব হয় না। ওগুলো ক্লাব স্তরে হয়। রাজ্য স্তরে হয়। যোগ্য হলেও, নিজের পছন্দের প্লেয়ারকে ঢোকানোর জন্য কাউকে ‘ইনডিসিপ্লিন্ড প্লেয়ার’ অথবা ‘আনফিট প্লেয়ার’ কিংবা ‘বয়সে কারচুপি আছে’ বলে বাতিল করে দেয় না। এখানে সব ফ্রেশ।

— তাই?

সুরিন্দর বলল, হ্যাঁ। যাবি? গ্রাউন্ড দেখতে যাবি?

মিঠুন বলল, চল।

হোটেলের খুব কাছেই স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামে ঢুকেই ও অবাক। এত বড় স্টেডিয়াম! এত আলো! এত জৌলুস! চার দিকে তাকাতে তাকাতে সুরিন্দরের সঙ্গে ও কোর্টের ভিতরে ঢুকে পড়ল। আর কোর্টে পা রাখার আগেই ওর ভ্রু কুঁচকে গেল। ওদের ওখানকার কোর্ট তো সিমেন্টের। এখানে কাঠের কেন?

সুরিন্দর বলল, বাস্কেটবল উডেন কোর্টেই খেলার নিয়ম। যে-কোনও বড় ম্যাচ তো উডেন কোর্টেই হয়।

— কেন?

— সিমেন্টের কোর্টে খেললে পায়ের কাফগুলো শক্ত হয়ে যায়। হাঁটুর মালাইচাকি ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। লিগামেন্টে সমস্যা দেখা দেয়।

মিঠুন জানতে চাইল, তা হলে আমাদের ক্লাবগুলো কাঠের কোর্ট করে না কেন?

— করে না, তার কারণ, খরচ। একটা উডেন কোর্ট বানাতে খরচ পড়ে যায় প্রায় দশ কোটি টাকা।

— দশ কোটি! এই, চল না, কোর্টে তো কেউ নেই, একটু যাই।

— চল।

দু'জনে কোর্টের ভিতরে ঢুকে দেখল, ও পাশে অনেকগুলো বাস্কেটবল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ওরা আর লোভ সামলাতে পারল না। সেখান থেকে একটা করে বল নিয়ে একবার এ রিং থেকে ও রিং আর ও রিং থেকে এ রিং ছুটতে লাগল। ও দিকের ঢাউস ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মিঠুন চেষ্টা করতে লাগল, একটা রিং থেকে ড্রিবল করতে করতে চব্বিশ সেকেন্ডের মধ্যে অন্য রিংয়ে বল গলিয়ে দেওয়ার। কারণ, আসার সময় প্রীতিশেখরদা ওকে পইপই করে বলে দিয়েছিল, বাস্কেটবলে একটা রুল আছে, যাকে বলে টোয়েন্টিফোর সেকেন্ড রুল।

এমনিতে একজন প্লেয়ার ড্রিবল করে করে নিজের কাছে অনেকক্ষণ বল আটকে রাখতে পারে। কিন্তু যদি কোনও দল দেখে, তার বিরোধী দলের কোনও প্লেয়ার অনেকক্ষণ বল ধরে রাখছে, তারা কিছুতেই ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না, তখন সেই দল চাইতেই পারে— চব্বিশ সেকেন্ড রুল।

আর সেটা চাইলেই, শুধু বিপক্ষ নয়, তাদের দলেরও কোনও প্লেয়ার চব্বিশ সেকেন্ডের বেশি বল ধরে রাখতে পারবে না। অর্থাৎ ও যদি এক রিং থেকে মনে মনে একে ওকে তাকে পাশ কাটিয়ে, বল ছিনিয়ে নেওয়ার লম্বা লম্বা হাত এড়িয়ে, চব্বিশ সেকেন্ডের মধ্যে অন্য রিংয়ে বল ফেলে দিতে পারে, তা হলেই কেবলা ফতে। কিন্তু যেতে যেতে চব্বিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেলেই মহাবিপদ। তখন ওদের সাইড।

মিঠুন বল নিয়ে বারবার এ রিং আর ও রিং করতে লাগল। ক্লাবের সিমেন্টের কোর্টে প্র্যাক্টিস করার সময় যত দম লাগে, যত পরিশ্রম হয়, এই কাঠের কোর্টে তার সিকিভাগও লাগছে না। সেটা কি এই কাঠের কোর্টের জন্য, না কি এ রকম একটা আন্তর্জাতিক মানের কোর্টে প্র্যাক্টিস করার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়ার আনন্দে, না কি কোনও ভাবে ও যদি সিলেক্টেড হয়ে যায়, সেই উত্তেজনায়— ও নিজেও সেটা বুঝতে পারল না।

হঠাৎ ফাঁকা গ্যালারির একদম উপরে বসা সুট বুট পরা একটা লোক ধীরে

ধীরে কোর্টের ধারে এসে মিঠুনকে ডাকল, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?

মিঠুন বলল, মিঠুন সিংহ।

— তুমি বাঙালি?

— হ্যাঁ।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, কোথায় থাকো?

— কলকাতায়।

— কলকাতার কোথায়?

মিঠুন বলল, কালীঘাটে। কালীঘাট পার্কের পিছন দিকে।

— ও... যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমির পিছনে?

— আপনি চেনেন?

লোকটা বলল, আমার বাড়িও ওখানে। প্রতাপাদিত্য রোডে। তুমি তো খুব ভাল ড্রিবল করো দেখছি। আমি তোমার মধ্যে মাইকেল জর্ডনের স্কিল দেখতে পাচ্ছি। তুমিই আমাদের মাইকেল জর্ডন। তোমাকে আমার খুব দরকার।

— আপনার কোন টিম?

— সব ক'টাই আমার টিম।

মিঠুন অবাক। মানে?

— আমি পি এন বি অ্যাকাডেমির।

— পি এন বি অ্যাকাডেমি! মিঠুনের মুখে যেন একরাশ উজ্জ্বল আলো আছড়ে পড়ল।

সে রাতে জান-প্রাণ লাগিয়ে খেলল মিঠুন। খেলল, বর্ধমান, বড়বাজার যুবক সংঘ, বড়িশা আসর আর রাখি সংঘ থেকে যাওয়া রাজ্যের বাছাই করা এক-একটা হীরক খণ্ড। প্রত্যেকেই যেন এক-একটা ছুটন্ত ঘোড়া। এত ঘন ঘন গোল দিতে লাগল ওরা যে, দর্শকরা চোখ ফেরাবারই ফুরসত পেল না।

পরদিন মিঠুনরা যখন তল্লিতল্লা গোটাচ্ছে, তখন ওই লোকটি আরও দু'জনকে সঙ্গে করে নিয়ে এল ওদের হোটেলের ঘরে। বলল, আমরা চার জনকে পেয়ে গেছি। তুমি আমাদের পাঁচ নম্বর টার্গেট। আর দু'জনকে কোনও রকমে জোগাড় করতে পারলেই শুধু ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ালিফাই-ই নয়,

আমরাই ওয়ার্ল্ড কাপ জিতব। অলিম্পিকে যাব। তোমার বাবার ফোন নম্বরটা দাও...

লোকটা আরও কী সব বলে যাচ্ছে, কিন্তু মিঠুনের কানে কিছুই ঢুকছে না। ওর চোখে তখন দেওয়াল জোড়া বাহান্ন ইঞ্চি ফ্ল্যাট টিভির স্ক্রিন জুড়ে চলছে অলিম্পিকের ধুমুকার বাস্কেটবল যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধের সফল সেনাপতি সে-ই। শুধু সেনাপতি নয়, প্রধান সৈনিকও সে। ওই তো, ওই তো, ওই তো আবার গোল করল সে। আবার... আবার... আবার...



## স্বর্গের সিঁড়ি

সমতল থেকে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে এসে, চোপতা থেকে পাহাড়ের এই খাড়া পথ বেয়ে সেই যে হাঁটা শুরু হয়েছে, রোহিতাশ্ব শুধু হেঁটেই যাচ্ছে। এত হেঁটেছে যে, পা আর চলছে না। পাঁচ কিলোমিটার হাঁটতেই যেন জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে। গায়েও আর এতটুকু জোর নেই। এই দিনের বেলাতেও চোখের সামনে হঠাৎ হঠাৎ নেমে আসছে অন্ধকার। মাথাটাও টিপ টিপ করছে। মনে হচ্ছে, ও আর এক পা-ও হাঁটতে পারবে না। যে কোনও সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

না। এ বার একটু না বসলেই নয়। গাইড এবং সঙ্গীরা কে কোথায় আছে ও জানে না। জানতেও চায় না। পরবর্তী ক্যাম্পে পৌঁছতে আরও কতক্ষণ লাগবে, তার কোনও ধারণাও নেই ওর। ও নিশ্চয়ই অন্যদের থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে, তার পরেও যদি এখানে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামে, তা হলে পরবর্তী ক্যাম্পে পৌঁছানোর অনেক আগেই হয়তো অন্ধকার নেমে আসবে।

নামলে নামুক। কী আর করা যাবে! ও আর পারছে না। এ বার একটু বসতেই হবে। কিন্তু কোথায় বসবে? বসার জন্য যেই এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে, ঠিক তখনই ও দেখল, একটা ষোলো-সতেরো বছরের তম্বী মেয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে।

পথের মধ্যে ভিনরাজ্যের অচেনা অজানা একটা লোককে ও রকম ক্লান্ত অবসন্ন দেখেই বুঝি মেয়েটি তার কাছে এগিয়ে এল। কাঁচড় থেকে চেরিফলের মতো দেখতে এক মুঠো রা' ফল তার দিকে বাড়িয়ে দিল। ও জানে, এগুলোকে কেউ কেউ পার্বতী ফলও বলে। কিন্তু জানে না, এগুলো খায়, না গায়ে মাখে। তাই মেয়েটির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কারণ ও জানে, মেয়েটিকে কিছু জিজ্ঞেস করলেও মেয়েটি তার ভাষা বুঝতে

পারবে না। যদি বোঝেও, তার জবাবে সে যা বলবে, ও সেটা বুঝতে পারবে না।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। মেয়েটি বোধহয় তার চাহনি দেখেই বুঝতে পেরেছে রোহিতাশ্বর মনের কথা। তাই সে আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, ওটা চুষে চুষে খাও।

বলেই, মেয়েটি হঠাৎ পাহাড়ের কোন বাঁকে যেন মিলিয়ে গেল। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওই ফলগুলো মুখে দিয়ে একটু চুষতেই গোটা শরীরটা যেন চান্দা হয়ে উঠল। মনে হল, রওনা হওয়ার সময় শরীরে এবং মনে যতটা জোর ছিল, এখন যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

শুধু চন্দ্রশিলা কেন, ও এখন ইচ্ছে করলে অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্টের চূড়াতেও উঠে যেতে পারে।

আসলে এর আগে ও কখনও পাহাড়ে ওঠেনি। আজ থেকে বহু বছর আগে, ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে একবার পুরুলিয়ায় গিয়েছিল। খড়িদুয়ারায়। মুকুটমণিপুর থেকে একটুখানি। সেটাও ছিল পাঁচ মাথাওয়ালা পাহাড়। একেবারে দুধের মতো সাদা ধবধবে। পরে জেনেছিল, ওটা ছিল খড়ি, মানে চকের পাহাড়। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে রাস পূর্ণিমায় তিন দিন ধরে সেখানে উৎসব হয়— সৃজন উৎসব।

সেখানেই সে প্রথম দেখেছিল কত দেরি করে ওখানে রাত নামে। অথচ রাত নামলেও অন্ধকার নামে না। জোৎস্নার ফটফটে আলোয় চারিদিক ভেসে যেতে থাকে। মনে হয়, লক্ষ লক্ষ টিউব লাইট জ্বলছে। সেই আলোয় পাহাড়ের গায়ে খড়ি বিছিয়ে আর মাথার উপরে ত্রিপল টাঙিয়ে দূরদূরান্ত থেকে আসা যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল আয়োজকেরা। সারা রাত ধরে অনুষ্ঠান। পাহাড়ের এ চূড়া, ও চূড়া, সে চূড়ায় ম্যারাপ বাঁধা হয়েছিল। ছৌ-নৃত্য আর আদিবাসী চটুল গানে সবাই যখন মেতে উঠেছে, তখন তার মা তাকে নিয়ে ইচ্ছে করেই দলছুট হয়ে একটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মাইকের আওয়াজ যেখানে একদম ক্ষীণ, সে রকম একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওর মা-ই ওকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, সেই বিশাল রূপোর থালার মতো চাঁদটা কেমন হামাগুড়ি দিয়ে একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে আরেকটা পাহাড়ের চূড়ায় যাচ্ছে।

ও মুগ্ধ হয়ে দেখেছিল। বেলার দিকে দেখেছিল, পাহাড়ের গায়ে



এক-একটা মুরগির লড়াই ঘিরে কেমন ছোট ছোট জটলা তৈরি হয়েছে। মেলা হচ্ছে শুনে পাহাড়ের ঢালে গিয়ে ও একটু হতাশই হয়েছিল। না। সেখানে কোনও নাগরদোলা ছিল না। ছিল না রঙিন মাছ। খাঁচায় ভরা বদ্রি বা টিয়াপাখির ঝাঁক। ছিল না ফিশফ্রাই, চিকেন রোল কিংবা দই ফুচকার দোকান। তার বদলে ছিল পাতি লোহার হাতা খুস্তি, দা কোদাল। বেতের ঝুড়ি, অ্যালুমিনিয়ামের থালা বাটি। রঙিন রাংতায় মোড়া তির-ধনুক। ছৌ মুখোশ। প্লেটটেট তো নয়ই, শালপাতাও নয়, লুচি, ঘুঘনি আর ঘরে বানানো মারবেলের মতো ছোট ছোট রসগোল্লা বিক্রি হচ্ছিল বটপাতা বা ডুমুরপাতায় করে।

আশপাশের গ্রাম দেখার জন্য পরদিন সকালে ওখান থেকে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে নেমে এসেছিল ওরা। কিন্তু গ্রাম নয়, সামনেই সরু গাড়িরাস্তার গা বেয়ে ওঠা পাহাড় দেখে ওরা আর লোভ সামলাতে পারেনি। উঠে পড়েছিল। বলতে গেলে খানিকটা খাবি খেতে খেতে। পাহাড়ের গায়ে গজিয়ে থাকা ছোট ছোট আগাছা ধরে। সমতলের গাছ হলে হয়তো তাদের টানে উপড়ে যেত। কিন্তু ওগুলো তো পাহাড়ের গাছ। লড়াই করে শিকড় চালাতে হয় নীচে। তাই বুঝি প্রাণপণে ভূমি আঁকড়ে ছিল।

সাত-আট তলা বাড়ির সমান উঠে শৃঙ্গজয়ের আনন্দে ও যখন গায়ের জামা খুলে ওড়াচ্ছে, নিজেকে মনে করছে লর্ডসের মাঠে সৌরভ গাঙ্গুলি, ঠিক তখনই কয়েকটা বাচ্চার কলকল হাসি শুনে ও পিছন ফিরে দেখে, চোখের সামনে কী বিশাল একটা আকাশ ছোঁয়া পাহাড়।

যে কোনও সময় পড়ে যাওয়ার ভয় নিয়ে দুরুদুরু বুকে তারা এতক্ষণ ধরে যেখানে উঠে এসেছে, এর তুলনায় সেটা কিছু না। নিছকই একটা চড়াই পথমাত্র। আর ওই খাড়া পাহাড় বেয়ে তার চেয়েও ছোট কতগুলো বাচ্চা কিনা মাথায় লকড়ির বোঝা নিয়ে নাচতে নাচতে নেমে আসছে!

ফিরে এসে সবাইকেই এই গল্পটা ও বলেছিল। তখন ওরই এক বন্ধু, স্বপন বলেছিল, খড়িদুয়ারা? ওটা কোনও পাহাড়ই নয়। ওটা তো একটা টিলা। মাটির একটা বড় ঢেলাও বলতে পারিস। পাহাড় হচ্ছে অন্য জিনিস। যে একবার ভালবেসে পাহাড়ের কাছে যায়, পাহাড় তাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে।

স্বপনই ওকে বলেছিল, তুই যদি সত্যিই পাহাড়ে যেতে চাস, তা হলে

আমাদের সঙ্গে যেতে পারিস। তবে তার জন্য তোকে কিন্তু ট্রেনিং নিতে হবে।

ও বলেছিল, কোথায়?

স্বপন বলেছিল, এন আই এম-এ।

— সেটা আবার কী?

— এন আই এম মানে নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং।

রোহিতাশ্ব জানতে চেয়েছিল, ওটা কোথায়?

ও বলেছিল, উত্তরকাশীতে।

— বাব্বাঃ, অত দূরে।

— দার্জিলিংয়েও আছে। এইচ এম আই। মানে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট।

— কাছাকাছি কিছু নেই?

স্বপন বলেছিল, থাকবে না কেন? সর্বত্রই আছে। আমাদের এই কৃষ্ণগরেও আছে।

— তাই নাকি? কোথায়?

— গভর্নমেন্ট কলেজে ঢোকার মুখেই। দেখবি গেটের সামনে বড় বড় করে লেখা আছে—মাউন্টেনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব কৃষ্ণগর।

আগ্রহের সঙ্গে রোহিতাশ্ব জানতে চেয়েছিল, ওখানে কত দিনের কোর্স?

স্বপন বলেছিল, বিভিন্ন রকমের কোর্স আছে। কোনওটা পনেরো দিনের, কোনওটা এক মাসের, তো কোনওটা আবার পাঁচ দিনের। যেমন আমি একবার রক ক্লাইম্বিংয়ের কোর্স করেছিলাম শুশুনিয়া পাহাড়ে। ওটা ছিল পাঁচ দিনের কোর্স।

— তাই নাকি? আচ্ছা, ওখানে ভর্তি হতে গেলে কী করতে হয়?

— দ্যাখ, ওই সব ইনস্টিটিউটগুলোয় গেলেই যে তোকে সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবে, তা কিন্তু নয়। ওরা কিছু পরীক্ষা নেয়। তবে ক্লাব ভিত্তিক লোকাল ইনস্টিটিউটগুলোয় অত কড়াকড়ি নেই।

অধীর আগ্রহে রোহিতাশ্ব জিজ্ঞেস করেছিল, ওখানে কী কী শেখায়?

— অনেকগুলো ধাপ আছে। যেমন প্রথমেই শেখানো হয় ফ্রি হ্যান্ড ক্লাইম্বিং। আর তার সঙ্গে চেনানো হয় পাহাড়ের চরিত্র। সে সব হয়ে গেলে

র্যাপলিং। মানে দড়ির সাহায্যে পাহাড়ের গা বেয়ে নামা। তার পর ন্যাচারাল ক্লাইমিং, সেখানে খালি হাতে খাড়া পাহাড়ে ওঠা শেখানো হয়।

— খালি হাতে খাড়া পাহাড়ে।

স্বপন বলেছিল, হ্যাঁ, খালি হাতে। অনেক সময় দেখবি, একদম দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড় বেয়ে অনেকে তরতর করে উঠে যাচ্ছে। নীচ থেকে দেখলে কিছুই বুঝতে পারবি না। আসলে পাহাড়ের গায়ে প্রচুর প্রাকৃতিক খাঁজখোঁজ থাকে। সেগুলোই ধরে ধরে ওঠে। সেই ওঠাটাই শেখানো হয়।

রোহিতাশ্ব জানতে চেয়েছিল, কত করে নেয়?

— সেটা খুব একটা খরচসাপেক্ষ নয়। তবে ক্লাইমিং শেখার সময় একটু খরচ হয় বইকী... অবশ্য একটু করিৎকর্মা হলে অভিযানে যাওয়ার সময় সরকারি সাহায্য মিললেও মিলতে পারে। আবার ঠিকঠাক লোককে ধরতে পারলে অনেক সময় স্পনসরশিপও জোগাড় হয়ে যায়।

— তাই নাকি? ও। এ ধরনের ট্রেকিং করতে গেলে কী রকম খরচ-খরচা পড়ে?

— সেটা নির্ভর করে কোথায় যাচ্ছিস, কত দিনের জন্য যাচ্ছিস, কত জন মিলে যাচ্ছিস তার উপরে।

— কত জন মানে।

স্বপন বলেছিল, সচরাচর কেউ তো একা একা পাহাড়ে যায় না। সব থেকে ভাল হয়, যদি চার-পাঁচ জন মিলে যাওয়া যায়। আর সব সময় এমন লোকের সঙ্গেই যাওয়া উচিত, যারা পাহাড়কে ভালবাসে। যারা মনে করে পাহাড়ে গিয়েও বাড়ির যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাব, কিংবা বাড়ির মতোই খাওয়াদাওয়া পাব, তাদের সঙ্গে না যাওয়াই ভাল।

— কেন?

— সেটা না গেলে বুঝবি না। আমরা যেমন কয়েক জন মিলে একবার এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে ট্রেকিংয়ের জন্য কাঠমাণ্ডু থেকে প্লেনে লুকলা গিয়েছিলাম। লুকলা থেকে পায়ে হেঁটেই রওনা হয়েছিলাম প্রায় একশো কিলোমিটার দূরের কালা পাথরের উদ্দেশ্যে। পথটা ছিল ছ'-সাত দিনের। অথচ দু'দিন হাঁটার পরে আমাদের মধ্য থেকেই একজন ফস করে বলে ফেলেছিল, এত খরচ করে শুধু শুধু এখানে এলাম! এর থেকে অনেক ভাল

হত, যদি গোয়ায় যেতাম। সমুদ্রের পাড়ে শুয়ে থাকতাম। মদ খেতাম। আর সারাক্ষণ সাগর-সুন্দরীদের দেখতাম।

সে হয়তো কথাটা এমনিই বলেছিল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, তার ওই কথাটা আমাদের পুরো জার্নটাকেই তেতো করে দিয়েছিল।

— তাই! কিন্তু এটা তো খারাপ অভিজ্ঞতা। ভাল কোনও অভিজ্ঞতা নেই?

— থাকবে না কেন? প্রচুর আছে। তবে আমার টেকিং জীবনের সেরা মুহূর্তটা আমি কখনওই ভুলতে পারব না। সে বার আমরা দশ-বারো জন মিলে নীলকণ্ঠ পাহাড়ে গিয়েছিলাম। কিছুটা ওঠার পরেই তাঁবু ফেলা হয়েছিল। ভারী সুন্দর জায়গা। যে দিকেই তাকাই, দেখি, বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে সার সার চুড়ো। তাদের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে মেঘ। চারিদিকে কনকনে ঠান্ডা। হাওয়ার সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক আলপিন যেন ছুটে এসে মুখে বিঁধছে, গলায় বিঁধছে। টিম লিডার বলেছিলেন, কেউ যেন রাত্রে একা একা না বেরোই। কিন্তু আমাদের তো ঘন ঘন বাথরুমে যেতে হয়। বারবার কাকে ডাকব! তাই শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেয়ে মাঝরাতে যখন তাঁবুর ভিতর থেকে চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে এলাম, আমি তো একেবারে হতবাক। সে দিনটা ছিল অমাবস্যা। ভেবেছিলাম বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে। তাই বেরোবার সময় টর্চটা সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু এ কী! কোথায় অন্ধকার! সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গোটা আকাশটা যেন রূপোলি রাংতা দিয়ে মোড়া। বিকমিক বিকমিক করছে। এক ফোঁটা জায়গা নেই, যেখানে পিন ফোঁটানো যায়।

হঠাৎ মনে হল, অনেক দিন কোনও লোক দেখেনি ওরা, তাই এত তারা একসঙ্গে দল বেঁধে আমাদের দেখতে এসেছে। ওরা তারা! না, তারা মা! জয় তারা। জয় দুর্গা! জয় বাবা ভোলেনাথ!

তখন আমার মনে হয়েছিল, আমরা বুঝি স্বর্গে পৌঁছে গেছি! তখনই ঠিক করেছিলাম, লাগুক ঠান্ডা, তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আমি এখন দু'চোখ ভরে দেখব।

সত্যিই সে রাতে আমি আর তাঁবুর ভিতরে ঢুকিনি। সারা রাত শুধু ওদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। যারা এ রকম দৃশ্য দেখেনি, তাদের জীবনটাই বৃথা।

স্বপনের কথা শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে রোহিতাশ্ব বলেছিল, এত সুন্দর!

স্বপন বলেছিল, শুধু প্রকৃতি নয়, ওই রকম প্রকৃতির মধ্যে থাকে বলে ওখানকার মানুষের মনগুলোও খুব সুন্দর। আমি তো বহু জায়গায় গিয়েছি। হিমাচল বা কুমায়ুনেও দেখেছি, যেহেতু ওখানে বিদেশিরাই বেশির ভাগ ট্রেকিং করে, ফলে সাহেব-সুবোদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ওখানকার গাইডরাও একটু সাহেবি গোছের হয়ে গেছে। তারা মাল বয়ে নিয়ে যায়। ঠিকঠাক পথ চিনিয়ে নিয়ে যায়। সারাক্ষণ পাশে পাশেই থাকে। বিপদে আপদে পড়লে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। ভীষণ মেপেজুপে কথা বলে। সাধারণত, যত দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল পথ হয়, গাইডদের দৈনিক মজুরিও তত বেশি হয়। কিন্তু যা নেওয়ার, তা ওরা আগেই দর কষাকষি করে চুক্তি করে নেয়। পরে তা নিয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য করে না। এক কথায় বলতে গেলে, ওরা খুব প্রফেশনাল হয়। কিন্তু ওদের মধ্যে কী যেন একটা নেই। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। ফলে কাজে পটু হলেও, যত দিনই থাকুক না কেন, পর্বতারোহীদের সঙ্গে ওদের কোনও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না।

কিন্তু গাড়োয়াল অঞ্চলটা একটু অন্য রকমের। ওখানকার গাইড ও মালবাহকদের সঙ্গে অনেক সময়ই পর্বতাভিযাত্রীদের কথা কাটাকাটি হয়। মন কষাকষি হয়। মুখ ফসকে খারাপ কথাও বলে ফেলে কেউ কেউ। কিন্তু অভিযান শেষ করে ফিরে আসার সময় দেখেছি, ওদের মনটা কত নরম। কত শিশুর মতো। কিছুতেই ভোলা যায় না তাদের সেই থমথমে মুখ। চোখের কোণে চিকচিক করা জলের কণা।

একবার রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একেবারে হতদরিদ্র একটা চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলাম। খানিক পরেই এক দম্পতি গাড়ি থামিয়ে ডিমটোস্ট আর চায়ের অর্ডার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কোলের বাচ্চার জন্য এক গ্লাস দুধও চেয়েছিলেন।

দোকানি ভদ্রমহিলা তাদের চা ডিমটোস্ট দেওয়ার আগেই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে দুধ গরম করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দাম নেওয়ার সময় বাকি সব কিছুই দাম নিলেও, ওই দুধের দাম তিনি কিছুতেই নেননি। বলেছিলেন, দুধের দাম? বাচ্চার জন্য দুধ নিয়েছেন, তার জন্য পয়সা নেব, ছিঃ!

শুধু ওই দোকানিই নয়, পরে দেখেছি, ওখানকার মানুষগুলোই ওই রকম।

— এখনও এ রকম লোকজন আছে! রোহিতাশ্ব বলেছিল, আমিও ওখানে যাব। মাউন্টেনিয়ারিং করব।

স্বপন বলেছিল, আগে ট্রেকিং কর। তার পর তো মাউন্টেনিয়ারিং বা ক্লাইমিং।

বুঝতে না পেরে ও বলেছিল, দুটো আলাদা নাকি?

স্বপন বলেছিল, মোটামুটি পনেরো হাজার ফুট অবধি হেঁটে ওঠাটাকে বলা যেতে পারে ট্রেকিং। কিন্তু সেটা ছাড়া লেই ক্লাইমিং বা মাউন্টেনিয়ারিংয়ের মধ্যে পড়ে যায়। তখন শুধু গাইড বা মালবাহকে কাজ চলে না। শেরপা নিতে হয়। তবে আমি বলি, পুণ্য অর্জনের জন্য তীর্থযাত্রীরা যত দূর পর্যন্ত উঠতে পারে, ততটুকুই ট্রেকিং।

কিন্তু না। তখন ওর আর পাহাড়ে চড়া হয়নি। পরে, অনেক পরে, পাশটাস করে ও যখন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে চাকরি পেল, তখন প্রথম পোস্টিং হল মধ্য কলকাতার টি বোর্ডের পাশেই সার্কল অফিসের মার্কেটিং বিভাগে।

সেখানেই চাকরি করেন মাউন্টেনিয়ার বসন্ত সিংহরায়। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হতেই ওর ভিতরে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠল পর্বত-প্রেম। ফলে কারণে অকারণে, নানান খুঁটিনাটি জিনিস জানার জন্য ও যখনই সুযোগ পেত, অমনি চলে যেত বসন্তদার পাশের চেয়ারে। তাঁর কমপিউটারের সামনে বসে পাহাড়ে ওঠার নানান ছবি দেখত। ভিডিও দেখত। পাহাড়ের নানা গল্প শুনত তন্ময় হয়ে।

তাঁর মুখেই ও শুনেছিল, সাল্টিমেন্টারি অক্সিজেন ফুরিয়ে যাওয়ায় একবার তাঁর কী দশা হয়েছিল। নেপালের সমতল থেকে পঁচিশ হাজার ফুট উপরে, ধওলাগিরিতে কী ভাবে সারা রাত বরফের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে আটকে পড়ে ছিলেন উনি। পরদিন যখন তাঁকে হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার করা হয়, তাঁর শরীর তখন প্রায় জমে গেছে। পা দুটো এতটাই অসাড় হয়ে গিয়েছিল যে, অপারেশন করে বাদ দিতে হয় তিনটে আঙুল।

হোক। তারও যদি সে রকম হয়, তো হোক। তবু সে পাহাড়ে যাবে। যাবেই।



তাই বসন্তদার কাছ থেকে খবর নিয়ে সে যোগাযোগ করেছিল কুড়ি নম্বর পদ্মপুকুর রোডের সাউথ ক্যালকাটা ট্রেকার অ্যাসোসিয়েশনের দীপেন সামন্তর সঙ্গে। তাঁদের ওখানে কয়েক দিন যাতায়াত করতেই আলাপ হয়ে গিয়েছিল আরও অনেক পর্বতারোহীর সঙ্গে। বয়সে তার থেকে অনেকটা বড় হলেও খুব ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল অরুণিয়ার সঙ্গে। পাহাড় নিয়ে তাঁরও অভিজ্ঞতা কম নয়। তাই তাঁর কাছ থেকেও নানান টিপস নিয়ে রাখল, শ্রাবণ আর কারুকৃতির সঙ্গে ও একদিন পাড়ি দিয়ে দিল পঞ্চকেদারের উদ্দেশে।

সে আগেই জেনে গিয়েছিল পাহাড়ে কখনও তাড়াহুড়ো করে উঠতে নেই। দ্রুত উঠতে গেলেই পালমোনারি ইডিমায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। মানে ফুসফুসে জল জমে যায়। আর সেরিব্রাল ইডিমা হলে তো কথাই নেই। অসহ্য যন্ত্রণায় মনে হয় গোটা মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। তখন নীচে নেমে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। তাই হযীকেশ, রুদ্রপ্রয়াগে ওঠার সময় দ্রুত পা চালালেও, পঞ্চকেদারের প্রধান দ্রষ্টব্য— গৌরীকুণ্ড থেকে প্রায় চোদ্দো কিলোমিটার দূরের ‘কেদার’-এ যাওয়ার পুরো পথটা সে ধীরে ধীরেই উঠেছিল।

তার পরে আবার এই চন্দ্রশিলা অভিযান। তবে না। তার ভয়ের কোনও কারণ নেই। যা যা নেওয়ার সবই সে গুছিয়ে এনেছে। পায়ে একটা পরা থাকলেও, রবার সোলের খুব ভাল আরও এক জোড়া জুতো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এই আবহাওয়ায় চাল ডাল সেদ্ধ হতে প্রচুর সময় লাগে বলে খাবার হিসেবে এনেছে ছাতু, চিড়ে, নুডলস। বড় ফ্রেমের কালো চশমা। রাতে শোওয়ার সময় পরার জন্য গরম মোজা। এনেছে জ্যাকেট, স্লিপিং ব্যাগ, টর্চ, দড়ি, মোমবাতি, যাবতীয় ওষুধপত্র ছাড়াও অরুণিয়ার পরামর্শ মতো কোকা থাটি। এটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ। একটু বেশি উপরে উঠে গেলে, যেখানে গাছপালা নেই, অক্সিজেনের মাত্রাও কম, বাতাসও ভারী, সেখানে তো নানা রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তখন নাকি এটা খুব ভাল কাজ করে। আর সব থেকে যেটা জরুরি, সেই জলও নিয়ে এসেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। কিন্তু সেটাও তো এখন শেষের দিকে।

অরুণিা বারবার করে বলে দিয়েছেন, যাচ্ছিস যা। তবে খেয়াল রাখবি, ডি-হাইড্রেশন যেন না হয়। সব সময় লিকুইড খাবি। বেশি করে জল খাবি।

আর মনে রাখবি, যেটা সঙ্গে করে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে, তা হল, কষ্ট করার মানসিকতা।

কষ্ট তো সে করছেই। চেষ্টা করছে বাকি তিন সঙ্গীর থেকে অন্তত কিছুটা হলেও, একটু এগিয়ে থাকতে। কারণ, ও শুনেছে, যতই বন্ধু হোক, আগে যত লোকই সেই শিখরে পা রেখে থাকুক না কেন, প্রতিবারই, প্রতি দলের প্রত্যেকটা সদস্যই চায় এক মিনিট আগে হলেও, সবার চেয়ে আগে চূড়ায় পৌঁছতে। এবং মজার কথা হল, চূড়ায় উঠে, চূড়া ছোঁওয়ার আনন্দে অনেকেই বেমালুম ভুলে যায়, আগে থেকে ঠিক করে রাখা— উঠেই, পটাপট ছবি তোলার কথা। কারণ, ক্যামেরায় ধরা সময়টাই বলে দেয় সে ঠিক কখন, ক’টায়, কত মিনিট, কত সেকেন্ডে, পারলে সেকেন্ডটাকে ঘাট দিয়ে ভাগ করে, ঠিক কোন মুহুর্তে সে পৌঁছেছে।

পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ওই তরী মেয়েটি তাকে যে’ রা ফল দিয়েছিল, সেটা খেয়ে সে বেশ ঝরঝরে তরতাজা হয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু বাকি সঙ্গীদের পিছনে ফেলে ছটোপাটি করে এগোতে গিয়ে তার শরীর আবার বিগড়োতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝেই গা গুলিয়ে উঠছে। গলার কাছে উঠে আসছে টকটক বিচ্ছিরি একটা জল। মুখ ভরে যাচ্ছে তাতে। ইতিমধ্যেই বার কতক বমিও করেছে সে।

মুখ ধুতে ধুতে আর অরগিদার কথা মতো বারবার খেতে খেতে সঙ্গে আনা জলের স্টক এর মধ্যেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। যেটুকু আছে তাতে আর কতক্ষণ চলবে কে জানে! সামনে ঝরনা-টরনা না পেলে মহা মুশকিল! তবে হ্যাঁ, তার এখন আর বমিটমি হচ্ছে না। বমি বমি ভাবটাও নেই। ভাগিস খানিক আগে সাধু গোছের ওই লোকটা মাঝপথে হঠাৎ উদয় হয়ে তাকে একটা পোড়া জাম্বুরা লেবু দিয়ে বলেছিল, এটা খেয়ে নে বেটা। উলটি নহি হোগা।

সত্যিই তাই। ওটা খাওয়ার পর তার আর বমি তো হয়ইনি, বমি বমি ভাবটাও চলে গেছে। তবে শরীরটা একটু কাহিল হয়ে পড়েছে। আরও কতটা হাঁটতে হবে কে জানে! যত দূর চোখ যাচ্ছে, গাইডকে দেখা যাচ্ছে না। প্রথম প্রথম তার সঙ্গ ছেড়ে গাইড যখন এগিয়ে যেত, ওর রাগ হত। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পরেই ও দেখত, গাইড তাদের চার জনের জন্য কাঠকুটো জ্বেলে গরম গরম নিষু পানি রেডি করে রেখেছে। বিশ্রাম করার জন্য টাঙিয়ে

ফেলেছে তাঁবু। তাই গাইডকে দেখতে না পেয়ে ওর মনে হল, নিশ্চয়ই সামনে কোথাও তাঁবু ফেলেছে সে। এবং সেটা খুব একটা দূরেও নয়। তাই সে ফের আগের চেয়ে একটু দ্রুতই পা চালাতে লাগল।

তুঙ্গনাথ হয়ে সে যখন চন্দ্রশিলায় উঠছে, তার তখন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এই কষ্টটা দশ-এগারো হাজার ফুট ওঠার পরেই সাধারণত হয়। কারও কারও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী ছ’-সাত হাজার ফুট উঠলেও হয়। আর সে তো বারো ছাড়িয়ে তেরো হাজার ফুটের দিকে এগোচ্ছে। তার তো এ সব হওয়ারই কথা। এতক্ষণ যে হয়নি, সেটাই অনেক। তার মনের জোর আছে বলতে হবে। তবে না। মনের জোরে সব কিছু হয় না। শরীরটাও একটা বড় ফ্যাক্টর। তার শরীর আর চলছে না। টলে টলে পড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, শরীরটাকে ব্যালেন্স করার জন্য শুধু হাত আর পা-ই যথেষ্ট নয়, একটা লেজ থাকলেও ভাল হত।

অরুণিমা তাকে পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, মনে রাখবি, পাহাড়ে উঠতে হলে শুধু শরীর ফিট রাখলেই হবে না। মনে রাখতে হবে, নিজেকে নিজেরই দেখতে হবে। অসুস্থ হয়ে পড়া মানেই অন্য সঙ্গীদের বিব্রত করা।

তাই কাবু হয়ে পড়লেও সে কাউকেই কিছু জানাবে না। আর জানাবেই বা কাকে! তার তিন সঙ্গীর কেউ তরতর করে এগিয়ে গেছে, তো কেউ আবার পিছিয়ে পড়েছে তার চেয়ে অনেকটা পথ। এই মে মাসেও চার দিকে বরফে বরফ। শুধু পাহাড়ি পথ হলে হত, কিন্তু এই পথটা পুরু বরফে মোড়া বলে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। গোড়ালির কল-কবজা যেন লক হয়ে যাচ্ছে। তবে এখানে যে খুব একটা ঠান্ডা আছে, তা নয়। সামনে দিয়ে বাতাস এসে যখন বুকের উপরে আছড়ে পড়ছে, তখন শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পিঠে রোদ পড়লেই এত জ্বালা করছে যে, মনে হচ্ছে, কে যেন বিছুটি পাতা ঘষে দিচ্ছে।

সত্যিই কি রোদের জন্য এটা হচ্ছে, না কি পাহাড়েরই কারসাজি ওটা! হতে পারে। হতেই পারে। এত লোক এখানে আসে, ব্যবহারের পরে এখানেই ফেলে দিয়ে যায় জলের বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট, বড় বড় পলিপ্যাক। পাহাড় রাগ করবে না?

খাওয়ার পরে কেউ যদি কলার খোসা আমাদের গায়ে ছুড়ে ফেলে, যেতে

যেতে জুতো দিয়ে পা মাড়িয়ে দেয়, কাঁধের উপরে উঠে বসতে চায়, আমরা রাগ করব না! তবে?

এই তো একটু আগেই, সে নিজেই আরও অনেক পর্বতারোহীর মতো এইটুকু পথ আসতে গিয়েই পথের মধ্যে দু'-দুটো খালি বোতল ছুড়ে ফেলেছে। তা হলে কি এই জন্যই পাহাড়টা তার উপরে রেগে গেছে! তাকে এতটাই কাহিল করে দিচ্ছে যাতে সে আর এক পা-ও এগোতে না পারে। হতে পারে। হতেই পারে। এগুলি তো সহজে নষ্ট হওয়ার নয়। সবাই যদি এই ভাবে দুটো করেও বোতল ফেলে যায়, তা হলে আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছরের মধ্যে এখানে যে কী পরিমাণে দূষণ হবে, সেটা কল্পনা করতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল রোহিতাশ্বর। মুখ দিয়ে শুধু একটাই শব্দ বেরিয়ে এল— ছিঃ।

এই জন্যই পাহাড় এত বিরক্ত হয়। থাকতে না পেরে উসখুস করে। হয়তো চেষ্টা করে এই পর্বতারোহীদের নাগাল থেকে আর একটু দূরে সরে যেতে। আর তার ফলেই নেমে আসে ধস। শুরু হয় প্লাবন। আমরা তো নিজেরাই দেখলাম, এই তো গত বছর, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ করেই উত্তরাখণ্ডের উপরে কী ভাবে আছড়ে পড়ল ভয়ঙ্কর দুর্যোগ।

হবে না? পাহাড় ফুঁড়ে পাঁচ তলা ছ'তলা বাড়ি বানাবে। গাছপালা কেটে সাফ করবে। তারস্বরে মাইক বাজিয়ে শান্ত পরিবেশ নষ্ট করবে। হাজার হাজার গাড়ির কালো ধোঁয়ায় চারিদিক ঢেকে দেবে, আর সে চুপচাপ সহ্য করবে!

রোহিতাশ্বরের মনে হল, সেই দিন আর বেশি দূরে নেই, যে দিন দা-কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটতে গেলে গাছেরাও রুখে দাঁড়াবে। প্রতিবাদ করবে। কিংবা প্রাণপণে ছুটে পালাবে। আর গাছ যদি সতি সতিই শিকড়বাকড় নিয়ে ছুটে পালায়, তা হলে তার পরিণাম যে কী হবে, তা একবারও কেউ কি ভেবে দেখেছে!

না। আর নয়। ওরা বলে— আমরা এই শৃঙ্গ জয় করেছি, ওই শৃঙ্গ জয় করেছি, সেই শৃঙ্গ জয় করেছি। আরে বাবা, কারও মাথার উপরে পা রাখা মানেই কি তাকে জয় করা? পাহাড়কে কি কখনও জয় করা যায়? না, কখনও সম্ভব? পাহাড়ের তুলনায় আমরা এত তুচ্ছ, এত নগণ্য যে, ওটা ভাবাটাও অপরাধ। হ্যাঁ, তার কাছে যেতে পারি। তার পায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে মাথা তুলে তাকে দেখতে পারি, সে কত বড়। তার কোলে দু'দণ্ড

জিরিয়ে শীতল শান্ত হতে পারি। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারি। তাকে ভালবাসতে পারি। কিন্তু জয়? কখনওই নয়।

জয় যদি করতেই হয়, পাহাড়ের শরীর নয়, সবার আগে পাহাড়ের মনটাকে জয় করতে হবে। আর সেটা করতে হলে সবার আগে পাহাড়কে পাহাড়ের মতো থাকতে দিতে হবে।

যেই ওর এটা মনে হল, অমনি পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল রোহিতাশ্ব। না। যত কাছেই এসে থাকুক, সে আর চন্দ্রশিলায় উঠবে না। যে ভাবে এসেছে, সে ভাবেই ফিরে যাবে সমতলে। তবে যাওয়ার সময় এই পাহাড়ের বুকে সে যা যা ফেলে এসেছে, শুধু সেগুলোই নয়, অন্যরাও যা ফেলে গেছে, সেগুলোও সে খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে যাবে। সে যতই ভারী হোক না কেন।

এটা ভাবমাত্রই শেষ বারের মতো পিছন দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে টা টা করল সে। কিন্তু কাকে? রাহুল, শ্রাবণ আর কারুকৃতকে, না কি গাইডকে, না কি পাহাড়ের ওই চূড়াটাকে, সে নিজেও বুঝতে পারল না।



## কালো পিঁপড়ে

চমকে উঠল তিতলু। কী বলছেন কী?

পড়ার টেবিলের ও পাশের চেয়ারে বসে মধ্যরাতে হঠাৎ করে আসা আগন্তুকটি বলল, যা বলছি, একদম ঠিক বলছি।

— কিন্তু আমাদের বইতে যে আছে, গোয়ালঘরে যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার পরে আকাশের একটা উজ্জ্বল তারা কয়েক জন সন্ন্যাসীকে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল।

— না। ওটা তারা নয়। তারা কি কাউকে পথ দেখিয়ে কোথাও নিয়ে যেতে পারে?

— তা হলে?

আগন্তুকটি বলল, ওটা ছিল স্পেসশিপ।

— স্পেসশিপ!

— হ্যাঁ। স্পেসশিপ।

সন্দেহ ভরা চোখে তিতলু বলল, আড়াই হাজার বছরেরও আগে কি ও সব তৈরি হয়েছিল নাকি?

— এখানে হয়নি। কিন্তু আমাদের ওখানে তার থেকেও বহু আগে তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

— আমাদের ওখানে মানে? কোথায়?

আগন্তুকটি বলল, রড়ড়তে।

— রড়ড়? ওটা আবার কোন দেশ?

— না। ওটা কোনও দেশ নয়। একটা গ্রহ।

কথাটা শুনে হতবাক হয়ে গেল তিতলু। মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, গ্রহ!

— হ্যাঁ। গ্রহ। এই মহাশূন্যে যে কোটি কোটি গ্রহ আছে, তার একটা।



তিতলু মনে মনে ভাবল, লোকটা পাগল, না ও স্বপ্ন দেখছে!

ও অবশ্য এ রকম ভুলভাল স্বপ্ন প্রচুর দেখে। আনতাবড়ি অনেক কিছুই শোনে। আসলে সামনেই ওর ক্লাস ফোরের পরীক্ষা। ওর বাবা ওকে বলেছেন, এ বারও যদি ক্লাসে ও ফাস্ট হয়, তা হলে ওকে একটা সাইকেল কিনে দেবেন। ওর প্রায় সব বন্ধুরই সাইকেল আছে। বিকেল হলে তারা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তাদের সাইকেলেই ও প্যাডেল করা শিখে নিয়েছে। কিন্তু যতই বন্ধু হোক, তবু তো তারা পরই। পরের সাইকেল কি আর সব সময় হ্যাংলার মতো চাওয়া যায়! না, ইচ্ছেমতো যখন-তখন চড়া যায়!

সম্ভবত ওর এই মনোকষ্ট ওর বাবা-মাও বোঝেন। তাই বুঝি সে দিন ওর বাবা ওকে ওই কথা বলেছেন। আর ও জানে, বাবা যখন একবার মুখ ফুটে বলেছেন, এ বারও ফাস্ট হলে একটা সাইকেল কিনে দেবেন, তখন দেবেনই।

আগের বার বলেছিলেন, ফাস্ট হলে ক্যারাম বোর্ড কিনে দেবেন। না। গত বার একটুর জন্য ও প্রথম হতে পারেনি। দ্বিতীয় হয়েছিল। তবু ওর বাবা ওকে ক্যারাম বোর্ড কিনে দিয়েছিলেন। ওর ধারণা, এ বারও সামান্য ভুলের জন্য যদি ও দ্বিতীয় বা তৃতীয় হয়, তবুও ওর বাবা তাঁর কথা রাখবেন। তাই তৃতীয় বা দ্বিতীয় নয়, বাবার মুখরক্ষার জন্যই ক্লাসে প্রথম হওয়ার জন্য ও আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে। রাত জেগে পড়ছে।

এতক্ষণ পড়ছে! ঘড়ি দেখলে যদি নিজেই চমকে ওঠে কিংবা এত রাতে ও একা একটা ঘরে, এখন যদি কোনও ভূত পেতনি এসে ওর ঘাড় মটকে দেয়, অথবা যদি ওর উপরে ভর করে, তবে আর রক্ষে নেই। ও পাড়ার যে কালু ওঝা ভূত তাড়াতে, তিনি তো মারা গেছেন প্রায় পাঁচ-ছ'মাস হয়ে গেছে। তা হলে! আর এই সময় যদি সে রকম কিছু হয়, তা হলে তো লেখাপড়া একেবারে ডকে উঠবে। তাই এ ঘরে ও কোনও ঘড়ি রাখতে চায় না। এমনকী পড়ার টেবিলে যে টেবিল ক্লকটা থাকে, প্রতিদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পরে এ ঘরে পড়তে ঢোকার সময় সেটাকে পর্যন্ত একেবারে নিয়ম করে মায়ের ঘরে রেখে আসে।

আজও রেখে এসেছে। তাই বুঝতে পারছে না এখন ঠিক ক'টা বাজে। প্রথম প্রথম পিছন ফিরে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় দেওয়ালে নিজের

ছায়া দেখেই ও আঁতকে উঠত। মাঝে মাঝেই ঘরের ভিতরে কাদের যেন হাঁটাচলা টের পেত। সামনের খোলা জানালা দিয়ে দমকা বাতাসে ভর করে আসা চাপা স্বরের কী সব ফিসফিসানি ওর কানের লতির পাশে ঘুরঘুর করত।

কিন্তু না। ওর পড়ার টেবিলের ও পাশের চেয়ারে, যেখানে কেবল ওর মাস্টারমশাই এসে বসেন, পড়া দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে বাবা, সেখানে এ রকম ভাবে কাউকে ও কোনও দিন বসতে দেখেনি।

যে আগন্তুক ওর সামনে এখন গোবেচারার মতো বসে আছে, সে নিশ্চয়ই কিছু জানে। হয় তুকতাক, নয়তো হিপনোটিজম। না হলে ও যা ভিত্তি, এত রাতে পড়ার টেবিলের ও পাশে আচমকা কাউকে দেখে তো ওর একেবারে ভিরমি খাওয়ার কথা। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কথা। দাঁতকপাটি লেগে গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু কোথায়, ওর তো সে রকম কিছু হয়নি।

রোজকার মতো এমনিই পড়তে পড়তে হঠাৎ সামনে চোখ চলে যেতেই ও এই আগন্তুককে দেখেছিল। তার দিকে তাকাতে দেখেই আগন্তুকটি জিজ্ঞেস করেছিল, কী? পড়ছ?

তাকে সে এর আগে কখনও দেখেনি। কে সে? কী করে? কোথা থেকে এসেছে? ওদের ফ্ল্যাটের দরজা তো রাতে লক করা থাকে। তা হলে সে ঢুকল কী করে? তার থেকেও বড় কথা, সে এখানে এল কেন?

কিন্তু না। এ সব প্রশ্ন ওর মাথায় একবারও আসেনি। বরং ও খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলেছিল, হ্যাঁ, পড়ছি। সামনে পরীক্ষা তো, তাই।

সে বলেছিল, না পড়লে বুঝি পরীক্ষা দেওয়া যায় না, না?

তিতলু মজা করে বলেছিল, দেওয়া যাবে না কেন? দেওয়া তো যায়ই। তবে ফার্স্ট হওয়া তো দূরের কথা, পাশও করা যায় না। সাদা খাতা জমা দিয়ে আসতে হয়।

— কেন?

— না পড়লে লিখব কী করে?

আগন্তুকটি ঋ কুঁচকে বলেছিল, এ তো বড় অদ্ভুত কথা। পড়বে তো মুখ দিয়ে কিংবা মনে মনে, কিন্তু লিখবে তো হাত দিয়ে। হাতের সঙ্গে মুখের কী সম্পর্ক?

অবাক হয়ে গিয়েছিল তিতলু। ও মা! এ আবার কী ধরনের কথা! না পড়লে বুঝব কী করে? না বুঝলে মনে রাখব কী করে? মনে না রাখলে পরীক্ষার খাতায় মনে করে করে লিখব কী করে?

— তা, এত দিন কী করেছ? এইটুকু তো একটা বই। এটা পড়তে আর কতক্ষণই বা লাগে! তবু পড়োনি?

— পড়ব না কেন? অনেক বার পড়েছি। তবুও পড়ছি। সামনে পরীক্ষা না?

মিটমিট করে তাকিয়ে আগন্তুকটি বলল, একটা জিনিস কত বার পড়তে হয়?

— বার বার পড়তে হয়। যত পড়বে, ততই তো মনের মধ্যে ভাল করে পড়াটা গেঁথে যাবে, তাই নয় কি?

তিতলুর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আগন্তুকটি জানতে চাইল, মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার জন্য বার বার পড়তে হয়?

— হ্যাঁ, তাই তো।

— সে কী!

— সে কী মানে? কেন, ছোটবেলায় তোমরা কি স্কুলের বই একবার পড়েই মনে রাখতে নাকি?

আগন্তুক বলল, হ্যাঁ। ইন ফ্যাক্ট এখন তো পড়ার চলই উঠে গেছে। সব বিষয়েরই ক্যাপসুল বেরিয়ে গেছে। যেটা যে বিষয়ের, সেটার এ থেকে জেড সেই ক্যাপসুলে নিখুঁত ভাবে ভরা থাকে। যেটা খাবে, যতক্ষণ না সেটার অ্যান্টি ডোজ নিষ্পত্তি কিংবা ইরেজার ইনজেক্ট করছ, ততক্ষণ হাজার চেষ্টা করলেও মন থেকে সেটা মুছে ফেলতে পারবে না।

— অ্যাঁ! তিতলুর মুখ দিয়ে শুধু এই একটা শব্দই বেরিয়ে এল। আগন্তুক যা বলছে, তাতেই ও আকাশ থেকে পড়ছে। কিন্তু সে যখন বলল, সে রড়ঢ় গ্রহে থাকে— তখন আর আকাশ থেকে নয়, ও যেন একেবারে অন্য গ্রহ থেকে আছড়ে পড়ল। অবাক চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে আগন্তুককে বলল, ওটা কত দূরে?

— আমাদের হিসেব তো বুঝবে না। তোমাদের হিসেব অনুযায়ী এক লক্ষ ন'হাজার পাঁচশো তেষটি আলোকবর্ষ দূরে।

— আলোকবর্ষ মানে?

— আলোকবর্ষ মানে, তুমি তো নিশ্চয়ই জানো, সূর্যের আলো মাত্র আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ডে ১৪৯৬০০০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। সেই গতিতে এক বছরে সূর্যের আলো যত দূরে যায়, সেটাকেই বলে এক আলোকবর্ষ।

মনে মনে হিসেব কষে তিতলু বলল, তার মানে এখন এখানে আলো জ্বালালে, সেই আলো এক লক্ষ ন'হাজার পাঁচশো তেষটি বছর পরে গিয়ে যেখানে পৌঁছবে, সেখান থেকে তুমি এসেছ! অত দূর থেকে! কত দিন লাগল এখানে আসতে?

— সময় তো দেখিনি। তবে মনে হয় চার সেকেন্ড লেগেছে।

— চার সেকেন্ড! কী বলছ?

খুব শান্ত গলায় আগন্তুকটি বলল, হ্যাঁ, ওই রকমই লেগেছে।

— তুমি যেটায় করে এসেছ, সেটার গতিবেগ তা হলে ঘণ্টায় কত?

— না। আমি তো সে রকম কোনও কিছু করে আসিনি।

অবাক হয়ে তিতলু বলল, তা হলে কীসে করে এসেছ?

— তোমাদের ড্রেসিং টেবিলের মতো খানিকটা দেখতে এক ধরনের ফ্রেম আছে আমাদের ওখানে। তার নীচে মহাশূন্যের একটা মানচিত্র থাকে। সেটা দেখে কোন দিকে, কত দূরে, ঠিক কোন জায়গাটায় যেতে চাও, সেটা সেট করে দিয়ে ওই ফ্রেমের মধ্য দিয়ে জাস্ট পা বাড়ালেই, সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় গিয়ে পা-টা পড়বে।

— এ রকম আবার হয় নাকি?

আগন্তুক বলল, তোমাদের এখানে হয় কি না জানি না। তবে আমাদের ওখানে হয়। তবে ওটাও এখন ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে।

— এ রকম একটা জিনিস এর মধ্যেই ব্যাকডেটেড! কত দিন আগে আবিষ্কার হয়েছিল ওটা?

— তাও তো বহু দিন হয়ে গেল। তা, পাঁচ ছ'বছর তো হবেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিতলু বলল, ও। তার মানে তার আগে তোমরা এখানে এ ভাবে এত তাড়াতাড়ি আসতে পারতে না, না?

— না না, তা কেন? তখন আমাদের ফাস্টশিপ ছিল। তারও আগে ছিল স্পেসশিপ। সে সময় তো ওই সবে চেপেই আমরা এ গ্রহে ও গ্রহে ঘুরে বেড়াতাম।

— তখন কি তোমরা এই পৃথিবীতেও এসেছিলে?

আগন্তুক বলল, এসেছিলাম মানে? মাঝে মাঝেই আসতাম।

— আসতে! কোথায়, তোমাদের কথা তো কেউ কখনও বলেনি...

— বলেছে। বলেছে। তোমরা বুঝতে পারোনি।

— তাই?

— হ্যাঁ। পাহাড়ের গায়ে তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদাই করে যাওয়া মূর্তি কি তোমরা দেখোনি?

তিতলু বলল, হ্যাঁ দেখেছি। সেগুলো তো বেশির ভাগই দেবদেবীর।

— তোমরা যাদের দেবদেবী ভাবো, তারা কিন্তু আসলে সকলেই আমাদের মতো ভিনগ্রহবাসী। আবার সবাই যে এক গ্রহ থেকেই আসে, তা কিন্তু নয়। কেউ আসে এ গ্রহ থেকে তো কেউ আসে ও গ্রহ থেকে।

— কিন্তু তাদের তো কারও চারটে মাথা। দশটা হাত। তিনটে চোখ...

তিতলুর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল আগন্তুক। বলল, সে তো অনেক দিন আগের কথা। তখনও আমরা এখনকার মতো এতটা ডেভেলপ হইনি। এখন আমরা না চাইলে কারও সাধ্য নেই আমাদের দেখে। কিন্তু সে সময় এটা করার কোনও প্রভিশন ছিল না। তাই আমরা এলেই সবাই আমাদের দেখতে পেত। এখন যেমন সরষে দানার মতো ছোট্ট একটা চিপের মধ্যে এক হাজার মাথার জ্ঞান পুরে মাথার ভিতরে বসিয়ে নিলেই হয়ে গেল। তখন এ সব ছিল না। একজনের মস্তিষ্ক কেবল একটা প্রমাণ সাইজের মাথাতেই পোরা যেত। তাই যার যেমন দরকার সেই মতো ততগুলো মাথা বানিয়ে আসল মাথার পাশে পরপর বসিয়ে নিত। দুটো-চারটে নয়, একজন তো এক্সট্রা ন'টা মাথা পরেই ঘুরে বেড়াত। তার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? রাবণ। এখন যেমন এক আঙুলের ছোঁয়াতেই আমরা সহস্র হাতের কাজ অনায়াসে করে ফেলতে পারি। তখন এ রকম ছিল না। আসল হাতের মতোই নকল হাত বানিয়ে আসল হাতের পাশে জুড়ে নেওয়া হত। চারটে-ছ'টা তো বটেই, কেউ কেউ একসঙ্গে অতিরিক্ত আটটা হাতও লাগিয়ে নিত। দুর্গার ছবি নিশ্চয়ই তুমি দেখেছ? এখন যেমন পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে তোমরা অন্য প্রান্তের কারও সঙ্গে কথা বলার সময় স্কাইপ অন করলেই তাকে দেখতে পাও, এখন তার চেয়ে আরও হাজার গুণ ক্ষমতা সম্পন্ন 'অন্তর্দৃষ্টি' থাকলেও, আমাদের গ্রহে তখনও ও রকম কোনও কিছুর প্রচলন ছিল না। তাই অন্য

যে কোনও গ্রহে বেড়াতে গেলে নিজের গ্রহের কোনও আপন জনকে দেখার জন্য অত্যন্ত পাওয়াফুল একটা এক্সট্রা চোখ আমাদের পরতে হত। সেই চোখ দিয়েই বহু বহু দূর থেকে আমরা তাদের দেখতাম। যে চোখকে তোমরা বলো— তৃতীয় চোখ।

তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যাদের দেখেছিল, তাদের মাথায় তখন হয়তো এরকম এক্সট্রা তিনটে মাথা বসানো ছিল। যা থাকে, তার চেয়ে দুটো হাত বেশি লাগানো ছিল। ওই তৃতীয় চোখটা পরা ছিল। হতে পারে। হতেই পারে। না হলে তারা ওই মূর্তি খোদাই করল কী করে?

কথাটা শুনে তিতলুর কেমন যেন একটা খটকা লাগল। বলল, আচ্ছা, একটা কথা বলি। অত যুগ আগে নিশ্চয়ই তোমাদের ওখানে স্পেসশিপ বা ফাস্টশিপ তৈরি হয়নি। তা হলে তোমরা তখন এখানে আসতে কীসে করে?

প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গেল আগন্তুক। তার পর এক মুহূর্ত কী যেন একটা ভেবে নিয়ে বলল, কেন? তোমরা পুষ্পরথের কথা পড়েনি?

— পড়েছি।

— উড়ন্ত চাকির কথা শোনেনি?

— শুনেছি।

— হিমালয়ের গায়ে বড় বড় পায়ের ছাপের কথা কেউ বলেনি?

— বলেছে।

— তা হলে?

তখন সন্দেহ ভরা চোখে তিতলু বলল, সে তো বিশাল বিশাল পায়ের ছাপ। কিন্তু তোমার পা তো...

— আমরা ইচ্ছে করলেই আমাদের শরীরটাকে যেমন এই এন্ট্রুকু করে ফেলতে পারি। একটা ছোট ছিদ্র দিয়ে গলে যেতে পারি। ঠিক তেমনই প্রয়োজন হলে আকাশ ছোঁয়া মহীরুহর মাথা ছাপিয়ে প্রকাণ্ড হয়ে উঠতে পারি।

— রামায়ণের সেই হনুমানটার মতো? তাড়কা রাক্ষসীর সামনে যে চোখের নিমেঘে তরতর করে বিশাল হয়ে উঠেছিল? আমি তো টিভিতে দেখেছি।

— হ্যাঁ, একদম সে রকম।



— ও! তা হলে তোমাদেরই আমরা ভগবান বলে মনে করি! পূজো করি!

— শুধু তোমরা নও, গোটা মহাশূন্যে যত গ্রহ আছে, তার মধ্যে যারা সব দিক থেকেই অনেক অনেক অনেক গুণ এগিয়ে আছে, তাদের সব সময়ই পিছিয়ে থাকা গ্রহের বাসিন্দারা ভয় পায়। ভক্তি করে। পূজো করে। যাতে ক্ষতি না করে। যাতে একটু করুণা করে। এটাই নিয়ম।

— তা হলে তোমাদের গ্রহের লোকেরা কোন গ্রহের লোকেদের সব চেয়ে বেশি ভয় পায়?

— পেত। এক সময় পেত। কিন্তু তারা আর এখন নেই।

— কোথায় গেছে?

— তারা এগোতে এগোতে এত বেশি এগিয়ে গেছে যে এই মহাশূন্যের গণ্ডির বাইরে চলে গেছে। তারা আর কোনও দিনও ফিরে আসতে পারবে না।

— সে কী? কেন?

— এটাই নিয়ম। উন্নতি করতে করতে চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পর তো আর কিছুই করার থাকে না। তখন একটাই পথ খোলা থাকে। আর সেটা হল— আত্মহনন। ওরা সেটাই বেছে নিয়েছে।

— কিন্তু খানিক আগে তুমি যে বলেছিলে যিশুখ্রিস্টের কথা... স্পেসশিপের কথা...

— সে তো বহু যুগ আগের কথা। আসলে তোমাদের এখানে আমাদের গ্রহ থেকে যে প্রথম এসেছিল, সে এখানে গরু দেখে এতটাই মোহিত হয়ে গিয়েছিল যে, সে তার স্পেসশিপে করে একটা গরু নিয়ে গিয়েছিল। সেই গরুর সূত্রেই পৃথিবীর যাবতীয় গরুর খবরাখবর পেত সে। সে খবরে চোখ রাখতে গিয়েই সে একদিন দেখেছিল, একটা গোয়ালের মধ্যে মানুষের একটা ফুটফুটে বাচ্চা। সে হয়তো ভেবেছিল, ওই গরুগুলোই ওই বাচ্চাটির বাবা-মা। হয়তো ভেবেছিল, এখানে এ রকমই হয়। ইঁদুরের ঘরে পাখির জন্ম হয়। শেয়ালের বাচ্চা মাছ হয়ে জলে সাঁতার কাটে। সাপের বাচ্চা ক্যাঙারু হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। তার ফলে তার মনের মধ্যে হয়তো সংশয় হয়েছিল, ওই গরু দুটো হয়তো মানব প্রজাতির মতো দেখতে একটা বাচ্চাকে জন্ম দিয়ে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু তারা কি তাকে ঠিকমতো বড় করে তুলতে পারবে! তাই সঙ্গে সঙ্গে সে বেছে নিয়েছিল এমন কয়েক জনকে, যাদের কোনও

বাচ্চাকাচ্চা তো দূরের কথা, ঘর-সংসারও নেই। তোমরা যাদের সাধু বলো। সন্ন্যাসী বলো।

মুহূর্তের মধ্যে গুঁদেরকে সে এমন ভাবে বশ করে ফেলেছিল, যাতে স্পেসশিপ থেকে ফেলা আলোকে গুঁরা আকাশের উজ্জ্বল তারা ভেবে ভুল করেন। ভাবেন, এটা হয়তো কোনও অলৌকিক কাণ্ড। ঈশ্বর বুঝি তাঁদের পথ দেখিয়ে কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন।

পরে অবশ্য তার ভুলটা সে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল, বাচ্চাটির প্রকৃত বাবা-মা কে। আর সেটা বুঝতে পেরেই নিজের বোকামির জন্য নিজেই হো হো করে হেসে উঠেছিল। যদিও বাচ্চাটির উপর ততক্ষণে তার একটা টান তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মায়া পড়ে গিয়েছিল। সেই মায়াই ওই বাচ্চাটির মধ্যে এমন এক শক্তি সঞ্চারিত করেছিল, যার জন্য অমন নির্মম ভাবে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তিন দিন পরেও তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন। আর সেই যে ফিরে এসেছিলেন, তিনি আর যাননি। চিরদিনের জন্য মানুষের মনের মণিকোঠায় নিজের একটা স্থায়ী জায়গা তৈরি করে নিয়েছিলেন।

— তা হলে সমস্ত অবতারই কি...

তিতলুর কথা শেষ হওয়ার আগেই ও দিক থেকে ভেসে এল তিতলুর মায়ের গলা— অদ্ভুত ছেলে হয়েছে একটা। লাইটটা পর্যন্ত নেভায়নি।

মায়ের গলা শুনে চমকে উঠল তিতলু। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল, কখন সকালের আলো ফুটে গেছে। ও খেয়াল করেনি। কিন্তু এ কী! সে কোথায় গেল! এই তো একটু আগেই তার উল্টো দিকের চেয়ারে বসে ছিল। তা হলে!

হঠাৎ তিতলুর মনে কেমন যেন একটা ধন্দ দেখা দিল। সত্যিই এখানে কেউ ছিল তো! না কি সবটাই ওর কল্পনা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে চেয়ারের সিঁটটা ভাল করে দেখতে লাগল সে। কারও বসার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কি না। হঠাৎ দেখল, একটা ছোট্ট কালো পিঁপড়ে তরতর করে চেয়ারের পিছনের পায়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ও বুঝতে পারল না, ওটা সত্যিই কোনও পিঁপড়ে, না কি নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে শরীরটাকে ছোট্ট করে সে এই পিঁপড়ের আকার নিয়েছে।

না। তিতলু কিছু বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু পিঁপড়েটাকে

দেখে যেতে লাগল। দেখেই যেতে লাগল। আর দেখেই যেতে লাগল। হঠাৎ দেখল, একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, আরও অনেক অনেক অনেক কালো পিঁপড়ে চেয়ারের পা বেয়ে তরতর করে নামছে। কিন্তু তার মধ্যে ওই পিঁপড়েটা যে কোনটা, অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে ও আর শনাক্ত করতে পারল না। শরীরের মধ্যে কী রকম যেন একটা হতে লাগল ওর। তার পর আচমকাই একতাল ঐটেল মাটির মতো ধপাস করে মেঝের মধ্যে বসে পড়ল সে।



## এর পরে কী

পুকুরঘাটে সবিতাকে কাপড় কাচতে দেখে রুক্মিণীর মাথার মধ্যে কী যেন একটা খেলে গেল। একটু আগেই ও দেখেছে, সবিতার স্বামীকে বেরিয়ে যেতে। ওদের সংসার বলতে তো টোনা আর টুনি। তার মানে ওদের বাচ্চাটা এখন একা। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে ঝট করে ওদের বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল রুক্মিণী। এ দিকটা কেউ খুব একটা আসে না। আগাছায় ভরে আছে। একটু হলেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা বাঁশের মইটাতে হেঁচট খাচ্ছিল সে। আগে এটা একতলা বাড়ি ছিল। ঢালাই ছাদ। পরে সেই ছাদ জুড়ে একটা বিশাল ঘর বানিয়েছে ওরা। সেই ঘর এখনও প্লাস্টার হয়নি। জানালাগুলোয় কপাট লাগানো হয়নি। কোনও রকমে আসবেস্টাস চাপানো হয়েছে উপরে। সেখানে এই মই বেয়ে উঠে শুধু ওর স্বামীই নয়, সবিতাও মাঝে মাঝে মাখম শিম, কুমড়া, এটা ওটা সেটা পাড়ত দেখে গা জ্বলে যেত রুক্মিণীর। তাই একদিন এ ভাবেই চুপিচুপি এসে কুমড়া আর শিম গাছের কাণ্ডটা ধরে এক হাঁচকায় টান মেরে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলেছিল সে। তিন দিন পর টের পেয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল সবিতা— এমন ফলন্ত গাছ তুলে ফেলল কে?

তার পর থেকে ওরা আর এখানে কিছুই লাগায়নি। তবু মইখানাও সরায়নি। এফুনি পায়ে বেঁধে পড়ছিল আর কী। গজগজ করতে করতে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে সে দেখল, ওদের বছর তিনেকের ছেলেটা মেঝেতে বসে খেলা করছে। সামনে কতকগুলো খেলনা ছড়ানো ছোটানো। ওর বরের স্টেশনারির দোকান। প্রতিদিনই এই সময়ে যায়। ও চলে গেলে সবিতা রোজই ছেলেকে কয়েকটা খেলনা দিয়ে বসিয়ে এটা-ওটা করে। ঘরটার এক কোণে রান্না হয়। রুক্মিণী হঠাৎ দেখল, উনুনের উপরে একটা হাঁড়ি বসানো। ও আগেও তাই করত। যখন তাদের হাঁড়ি আলাদা হয়নি, শ্বশুরের দোকান মাঝ-বরাবর ভাগ

করে ওরা স্টেশনারি আর তারা মুদিখানা দোকান করেনি, শ্বশুরের কিনে রাখা এই জমি ভাগ হয়নি। ভাগ হওয়ার পরেও দুই ভাইয়ের মধ্যে এমন রেষারেষি শুরু হয়নি। তাদের সেই রেষারেষির জের ছড়িয়ে পড়েনি তাদের দুই বউয়ের মধ্যে। কেউ কারও ক্ষতি করার জন্য এমন উঠেপড়ে লাগেনি। সেই সময় তারা একসঙ্গেই ছিল। রুক্মিণী জানে, এই ভাবে হাঁড়িতে জল চাপিয়ে ঘরের অন্যান্য কাজ করতে চলে যায় ও। তার পর যখন খেয়াল হয়, তখন এসে চাল দেয়। সেই জল নিশ্চয়ই টগবগ করে ফুটছে। না-হলে হাঁড়ির ঢাকনাটা মাঝে মাঝেই ও ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠত না।

এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে ময়লা ফেলার পেছন-দরজা দিয়ে ওদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল রুক্মিণী। কাপড়ের আঁচল দিয়ে হাঁড়ির দু'কাঁধ ধরে কোনও রকমে বাচ্চাটার সামনে নামিয়েই, যে খেলনাটা নিয়ে ও খেলছিল, সেটা হাত থেকে কেড়ে ফুটন্ত হাঁড়িতে ফেলেই নিমেষের মধ্যে উধাও।

খেলনা নেওয়ার জন্য বাচ্চাটা হামাগুড়ি দিয়ে কাছে গিয়ে হাঁড়িটার কাঁধ ধরে উঠতে যেতেই গোটা হাঁড়িটা কাত হয়ে তার গায়ে পড়ে গেল। ছেলেটা চিৎকার করে উঠল।

ওর মা পুকুরঘাট থেকে সেই চিৎকার শুনে ছুটে এল। ওই দৃশ্য দেখে সে একেবারে আতঁনাদ করে উঠল। কে করল এমন সর্বনাশ! দৌড়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিতে গিয়ে ছেলের গায়ে জবজব করা ফুটন্ত জলের ছেঁকায় তার হাতেও ফোসকা পড়ে গেল। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ততক্ষণে আশপাশের লোকেরা ছুটে এসেছে। এ বউ বলছে, বড়দের সঙ্গে বড়দের ঝগড়া, সেই ঝাল কেউ বাচ্চাদের উপর দিয়ে মেটায়? এটা নিশ্চয় ওদের কাজ। ও বউ বলছে, যত শত্রুই হোক, এটা কোনও মানুষ করতে পারে! সে বউ বলছে, আগে ওদের হাসপাতালে নিয়ে চলো।

ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাচ্চাটির মাকে নিয়ে। তার হাতে অনেকটা ফোসকা পড়ে গেছে। সবিতা যত বলছে, আমার তো শুধু হাত পুড়েছে, আমাকে পরে দেখলেও হবে। আগে বাচ্চাটিকে দেখুন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বাচ্চাটিকে নার্সদের কাছে দিয়ে উনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাকে নিয়ে। খবর পেয়ে দোকান থেকে ছুটে এল বাচ্চাটির বাবা। তারও সেই এক কথা, বাচ্চাটা কেমন আছে?

ওর মায়ের শুশ্রূষা করে বাচ্চাটিকে যখন ভিতর থেকে ডাক্তারবাবু নিয়ে

এলেন, বাচ্চাটি তখন ঘুমোচ্ছে। তার গায়ে ফুটন্ত জল পড়া তো দূরের কথা, উষ্ণ জল পড়ারও কোনও চিহ্ন নেই। ওর মা অবাক। বাবাও অবাক। সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, ওইটুকু বাচ্চার গায়ে যদি ফুটন্ত জল পড়ত, তা হলে ওকে আর দেখতে হত না।

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে সবিতার স্বামীও বলল, সত্যিই তো, ওর গায়ে পড়া গরম জল লেগে তোমার হাতের যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে সেই জলে ওর কী হওয়ার কথা একবার ভাবো তো? কিন্তু সে রকম কিছু হয়েছে কী? আমার তো মনে হয়, তুমি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ।

সবিতা ওর বরকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না, ও ভুল দেখেনি। সে না পারুক, সেটা নিয়ে ও অত চিন্তিত নয়। ও চিন্তিত, এটা কে করল, সেটা নিয়ে! তার স্পষ্ট মনে আছে, হাঁড়িটা সে উনুনে চাপিয়ে গিয়েছিল। তা হলে নামাল কে? তা হলে কি কেউ তক্কতক্ক ছিল! না। একবার যখন এই কাণ্ড হয়েছে, ছেলেকে আর একতলায় রাখা যাবে না। আশপাশে প্রচুর শত্রু তার। বাইরের শত্রু হলে লড়া যায়, কিন্তু ঘরের শত্রুর সঙ্গে সে লড়বে কেমন করে? যে দেড় হাত জমি নিয়ে দেওরের সঙ্গে তাদের ডিসপুট, যা নিয়ে পঞ্চায়েত বসেছিল, থানা-পুলিশ হয়েছিল, সেটা কি তবে সে তার স্বামীকে ছেড়ে দিতে বলবে!

এই সব সাতপাঁচ যেমন ও ভাবছে, তেমনই এই ঘটনার পর যথেষ্ট সতর্ক হয়েছে সে। বাচ্চাকে সে আর একতলায় রাখে না। এমন ম্যানিয়া হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রী দু'জনে বাড়ি থাকলেও দোতলার ঘরের খাটের উপরে ছেলেকে খেলনা দিয়ে বসিয়ে রাখে। দেওয়াল থেকে খাটটা হাতখানেক দূরে। ফলে একদম খোলা হলেও জানালা দিয়ে পড়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সবিতা নিশ্চিন্ত।

সে দিন রান্না করছিল সবিতা। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে রুক্মিণী তাকে আনাজ কাটতে দেখে দোতলার যে ঘরে বাচ্চাটা থাকে, ওদের বাড়ির পেছন দিকে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা মইটাকে সেই ঘরের জানালা বরাবর লাগিয়ে, পা টিপে টিপে উঠে পড়ল সে। তার পর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ইশারা করে ডাকতেই, খেলনাটেলনা ফেলে বাচ্চাটা একেবারে খাটের ধারে চলে এল। খাটটাকে যে কেন এরা দেওয়াল থেকে এতটা দূরে পেতেছে, কে জানে! ঝুঁকটুকু কোনও রকমে ছেলেটাকে নাগালে পেয়েই হাত ধরে



এক হ্যাঁচকা টান মারল সে। বাচ্চাটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই টাল সামলাতে না পেরে নিজেও পড়ে গেল মই সুদ্ধ।

ধপ্পাস করে কী একটা পড়ার শব্দ শুনে ময়লা ফেলার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সবিতা দেখে, তার ছেলে মাটিতে বসে ঘাস ছিঁড়ছে। আশপাশে কেউ নেই। রুক্মিণী ততক্ষণে পড়ি কি মড়ি করে উঠে পালিয়েছে। সবিতা বুঝতে পারল না, তার ছেলেকে দোতলার ঘর থেকে কোলে করে এনে কে এখানে বসিয়ে গেল!

রুক্মিণীর কোমরে মলম মালিশ করতে করতে রুক্মিণীর বর বলল, তোমাকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। ওইটুকু একটা বাচ্চা, তাকে শায়েস্তা করতে পারো না?

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল রুক্মিণী। আমাকে কি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে? আমি যে আর পারছি না।

দুপুরে যখন বর খেতে এল, তাকে বলতে যেতেই সে বলল, রাখো তো তোমার যত আজগুবি কথা। ওই ঘটনার পর থেকে তো ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে রাখো। বাইরে থেকে ছিটকিনি খুলে কে তোমার বাচ্চাকে কোলে করে ওখানে রাখতে যাবে, শুনি?

কথাটা শুনে সচকিত হল সে। সত্যিই তো, তখনই বাচ্চাকে নিয়ে ও দিক দিয়ে ঘুরে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দেখেছিল, সদর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। আর পিছন দিকের দরজাটা তো সে নিজেই খুলেছিল। তা হলে! ও বাইরে গেল কী করে! তবে কি... ও যেখানে বসে ঘাস ছিঁড়ছিল, তার ঠিক উপরেই ছিল দোতলার ওই জানালাটা। তা হলে কি ওই জানালা দিয়েই ও পড়ে গিয়েছিল... তা হলে টাইলে নয়, ও নিশ্চয়ই ওই ভাবে পড়েছিল। কিন্তু সেটা ও আর ওর বরকে বলতে পারল না। ওর বর তখনও বলে যাচ্ছে— ওদের ওপরে তোমার রাগ আছে জানি। রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু ওদের উপরে তোমার রাগ আছে বলে বানিয়ে বানিয়ে এ সব আজগুবি কথা বলতে হবে? যার কোনও মাথা নেই, মুণ্ডু নেই...

সবিতা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বরকে দিয়ে ইতিমধ্যেই দোতলার জানালায় গ্রিল লাগিয়ে নিয়েছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, বেশির ভাগ সময়

ছেলেকে চোখে চোখেই রাখে। সে দিন বারসুঁই দিয়ে কাঁথা সেলাই করতে করতে একটু উঠেছে, এসে দেখে, সেই সুঁই নিয়ে তার ছেলে নিজের দুই আঙুলের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে এর মধ্যেই দু'-দুটো ফোঁড় দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কোনও রক্ত বেরোচ্ছে না।

ছেলের কাণ্ড দেখে আঁতকে উঠল সে। কিন্তু ছেলে তার মাকে দেখে ফিক করে হেসে উঠল। সে হাসলেও, সে যা ঘটিয়েছে, তাকে এফুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু সে একা যাবে কী করে! তাই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কোলে তুলে দরজায় তালা লাগিয়ে সে দৌড়তে লাগল বরের দোকানের দিকে।

দোকানটা খুব একটা দূরে নয়। ছেলের অবস্থা দেখে সবিতার স্বামী একেবারে বাকরুদ্ধ। যে দু'-চার জন খরিদদার ছিল, তারা কিনবে কী? ভিড় করে দেখতে লাগল বাচ্চাটাকে। তাদের মুখে মুখেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। গ্রাম থেকে গ্রামের বাইরে। বাজারে। হাটে। বাসে। ধাবায়। চটিতে। সেখান থেকে শহরে। খবরের কাগজে। টিভি চ্যানেলের দফতরে দফতরে।

সবাই এক্সক্লুসিভ খবর দেখাতে লাগল। ছুটে গেল বিজ্ঞানমঞ্চের ছেলেরা। ছুটে গেল চিকিৎসকের দল। একটি চ্যানেল তার বাবা-মাকে বিপুল টাকা দিয়ে বাচ্চা-সহ তাদের নিয়ে এল সোজা স্টুডিওয়। সরাসরি সম্প্রচার করতে লাগল সেই অলৌকিক কাণ্ড। ফোন ইন প্রোগ্রাম।

লোকেরা হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগল সেই খবর। হু হু করে বাড়তে লাগল সেই চ্যানেলের টি আর পি। সঞ্চালক মেয়েটি সবিতাকে বললেন, বাচ্চাটির আঙুলে পিন ফুটিয়ে তাদের দর্শকদের দেখানোর জন্য। সঙ্গে সঙ্গে সবিতা তার ব্লাউজের ভেতর থেকে একটি সেফটি পিন বার করে বাচ্চাটির আঙুলে ফোটাতে না ফোটাতেই বাচ্চাটি চিৎকার করে উঠল।

বোঝা গেল, বাচ্চাটির লাগছে। সবাই অবাক। এই সেফটি পিনের সামান্য খোঁচায় যদি তার এত লাগে, তা হলে সে অত বড় সুচ দিয়ে নিজের আঙুলে দু'-দুটো ফোঁড় দিয়ে হাসছিল কী করে!

সঞ্চালিকা বললেন, আপনি তো বলেছিলেন কে বা কারা ওকে দোতলার খোলা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল, আপনি ওকে টেবিলে বসিয়ে একটু ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেখান তো...

সবিতা তার বাচ্চাকে একটু ঠেলা দিতেই সে পড়ে গেল। আর এমন বেকায়দায় পড়ল যে, কপাল ফুলে আলু। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন এক টুকরো বরফ নিয়ে এসে বাচ্চাটির কপালে ঘষতে লাগল। বাচ্চাটিকে ঘিরে অলৌকিকতার যে তিনটি গল্প শোনা গিয়েছিল, পরীক্ষা করতে গিয়ে তার দুটোই ডাহা মিথ্যা প্রমাণিত হল। বাকি রইল গরম জলের গল্প।

অভিভাবকদের সামনে ছিল জলের গ্লাস। এগিয়ে দেওয়া হল চায়ের কাপও। সেখান থেকে ধুয়ো উঠছে। সঞ্চালিকা বললেন, ফুটন্ত নয়, তবু ওই চা বাচ্চাটির গায়ে একটু ফেলে দেখান তো, ওর গরম লাগে কি না।

ঢালাঢালা নয়, বাচ্চাটির হাত ধরে সবিতা সোজা ডুবিয়ে দিল চায়ের কাপে। বাচ্চাটি তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। হাত বার করতেই দেখা গেল কচি চামড়ায় ফোসকা পড়ে গেছে।

বাইরে থেকে দর্শকদের ঘনঘন ফোন আসছে। দিল্লি থেকে, দার্জিলিং থেকে, সুন্দরবন থেকে। কেউ বলছেন, বুজরুকি। কেউ বলছেন, টাকা রোজগারের এটা একটা সহজ রাস্তা। আবার কেউ বলছেন, আমার বউ তো বলছিল, ওর মধ্যে নাকি ঈশ্বরপ্রদত্ত কিছু একটা আছে। না হলে এমনটা হয় নাকি! কিছুক্ষণ আগেও বলছিল, যে ভাবে পারো, বাচ্চাটা কোথায় থাকে, ঠিকানাটা জোগাড় করো না... দর্শন করে আসি। ভাগ্যিস আপনারা ওকে স্টুডিওয় নিয়ে এসেছিলেন। না হলে লোকের কাছে ভুল বার্তা গিয়ে পৌঁছত।

যখন এই লাইভ প্রোগ্রামটি শেষের মুখে, তখন এল আর একটি ফোন। ফোনটা করেছেন কামরূপ কামাখ্যার সিদ্ধ সাধক— ভটচাখ্যি মশাই। তিনি খুব শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বললেন, অলৌকিক কোনও কিছু যাচাই করতে যাওয়া ঠিক নয় গো, তা হলে তার সব গুণ নষ্ট হয়ে যায়। মনে নেই? সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিতে গিয়ে আমরা কী ভাবে সীতাকে হারিয়েছিলাম? বিশ্বাস করতে শেখো। বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল।

তার কথা কারও মনঃপূত হল। কারও হল না। তবু লোকে টিভির সামনে বসে রইল। তারা উন্মুখ হয়ে আছে, এর পরে কী! এর পরে কী! এর পরে কী!

## ৪৫ মুক্তিপণ

— হ্যালো?

— আপনার বউ এখন আমাদের কবজায়। সাহি সালামত যদি ফেরত পেতে চান, তা হলে পাঁচ লাখ টাকা রেডি রাখুন। আমরা দু'ঘণ্টা পর আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেব, কখন কোথায় আপনি টাকাটা নিয়ে আসবেন। আর হ্যাঁ, ভুল করেও কিন্তু থানা পুলিশ করতে যাবেন না। তা হলে বউ নয়, বউয়ের লাশ পাবেন। মনে থাকবে?

— আপনি কে?

— আপনাকে ওটা জানতে হবে না। আপনি শুধু পাঁচ লাখ টাকা রেডি রাখুন।

লাইনটা কেটে গেল। দেবানিক থ'। লোকটা বলল, আপনার বউ এখন আমাদের হেফাজতে। তার মানে মিমিকে ওরা কিডন্যাপ করেছে! কিন্তু মিমি তো সাউথ সিটি মলে গেছে। বলেছিল, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরবে। অবশ্য ও একবার কেনাকাটা করতে শুরু করলে কখন যে থামবে, তার কোনও ঠিক থাকে না। ঘণ্টা দেড়েক মানে সেটা তিন ঘণ্টাও হতে পারে। চার ঘণ্টাও হতে পারে, আবার ছ'ঘণ্টা হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু দেবানিকের তো কাজকর্ম আছে। বাড়িতে অতক্ষণ নাও থাকতে পারে। তাই যখনই ও বেরোয়, কাউকে মনে করাতে হয় না। ও নিজেই মনে করে ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা সঙ্গে নিয়ে নেয়। সে সব তো ঠিকই আছে। কিন্তু ওরা যে বলল, থানা পুলিশ না করতে! কিন্তু আমি যদি করি, ওরা কি সেটা জানতে পারবে! পারলেই বা! আমার বউকে ওরা কিডন্যাপ করেছে, ওটা জেনেও একজন স্বামী হয়ে আমি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকি কী করে! নাঃ, আমি থানাতেই যাব।

বাড়ি থেকে থানা খুব একটা বেশি দূরে নয়। ও.সিকেও ও খুব ভাল করে

চেনে। বউয়ের অপহরণের কথা তাঁকে বলতেই, মন দিয়ে তিনি সব শুনলেন। তার পর বললেন, ল্যান্ড ফোনে করেছিল? আপনার ফোনে নিশ্চয়ই সি এল আই নেই, না? তার মানে যারা করেছে, তারা রীতিমত খোঁজখবর নিয়েই করেছে। ঠিক আছে, দু'ঘণ্টা পর ফোন করবে বলেছে তো? তার মানে... বলেই, দেওয়াল ঘড়ির দিকে এক বলক তাকিয়ে বললেন, হাতে আর বেশি সময় নেই। চলুন তো...

ঝটপট দু'জন কনস্টেবল আর দেবানিককে জিপে চাপিয়ে রুদ্ধশ্বাসে দেবানিকের বাড়ির একেবারে গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন ও.সি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন। দেবানিককে বললেন, ফোন করলেই, যে ভাবেই হোক, অন্তত তিন মিনিট কথা চালিয়ে যাবেন, তার আগেই ওরা লাইন কেটে দিলে, আর কিছুতেই কিন্তু ট্রেস করা যাবে না ওরা কোথা থেকে ফোন করেছে।

টি-টেবিলের উপর ফোন। ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে হাঁটছে! আজ যেন ঘড়ির কাঁটাগুলো কিছুতেই এগোতে চাইছে না। হ্যাঁ, ওরা ফোন করার পর এক ঘণ্টা সাতান্ন মিনিট হয়ে গেছে। আটান্ন মিনিট, উনষাট... এই তো পুরো দু'ঘণ্টা...

দু'ঘণ্টা পাঁচ মিনিট। আট মিনিট। বারো মিনিট। উনিশ মিনিট। আধ ঘণ্টাও পেরিয়ে গেল। কী হল! ওরা ফোন করল না কেন! তা হলে ওদের ঘড়িতে কি এখনও দু'ঘণ্টা হয়নি! দু', পাঁচ, দশ, মিনিট এ দিক ও দিক হতে পারে, তা বলে আধ ঘণ্টা!

তা হলে কি ওরা টের পেয়ে গেছে, ও পুলিশে গেছে! পেতেই পারে! যারা এ সব করে, তারা সব আটঘাট বেঁধেই করে। দূর থেকে নজর রাখে। যে ভাবেই হোক, ওরা নিশ্চয়ই জেনেছে, আমার সঙ্গে পুলিশ আছে। আর পুলিশ আছে দেখেই বুঝি ওরা ফোন করেছে না। হতে পারে! হতেই পারে।

দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। কোনও ফোন এল না। ও.সি বললেন, চিন্তা করবেন না। আমরা লোক লাগিয়ে দিয়েছি। দেখছি কী করা যায়। কিন্তু তার আগে আর একবার মনে করে দেখুন তো, আপনার কাউকে সন্দেহ হয় কি না, পুরনো কোনও শত্রুতা? গুপ্ত শত্রু? সম্প্রতি কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলা হয়েছিল কি? তাও না? তা হলেও

একবার মনে করে দেখার চেষ্টা করবেন, আর তেমন কিছু মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটু ফোন করে জানিয়ে দেবেন, কেমন?

দেবানিক বলল, ঠিক আছে।

পুলিশ চলে যেতেই এতক্ষণ ধরে চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকা ল্যান্ড ফোনটা আবার বেজে উঠল, কী, সেই পুলিশেই গেলেন তো? আপনাকে বারণ করেছিলাম না? কথা যখন শোনেননি, এ বার আর পাঁচ লাখ নয়, আপনাকে দশ লাখ দিতে হবে।

— দশ লাখ!

— হ্যাঁ, দশ লাখ। কখন কোথায় টাকা নিয়ে আসতে হবে, আপনাকে পরে ফোনে জানাচ্ছি।

— কখন?

— ফোনের কাছে থাকুন। বলেই, লাইনটা কেটে দিল।

এই কন্ট্রোল রুমের মধ্যেই ওর নিকট আত্মীয়স্বজন, খুব কাছেই লোকজন, বন্ধুবান্ধব, অফিসের সহকর্মীরা ওর কাছ থেকে সরাসরি, কেউ কেউ আবার এর তার কাছ থেকে মুখে মুখে, ফোনে ফোনে জেনে গেছে ওর বউয়ের অপহরণ হওয়ার কথা। এবং মুক্তিপণ বাবদ প্রথমে পাঁচ লাখ, পরে দশ লাখ টাকা চাওয়ার কথা।

তারা সবাই জানে, দেবানিকের কাছে এই মুহূর্তে দশ লাখ টাকা দেওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়। কারণ, ও এখন ভবানীপুরে ফ্ল্যাট কেনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আওতার মধ্যে দাম থাকতে থাকতেই ও নাকি ফ্ল্যাটটা কিনে রাখতে চায়। এখনও বহু বছর চাকরি আছে ওর। এর পরে বয়স বাড়লে চেতলা থেকে রোজ রোজ ধর্মতলায় যেতে পারবে বলে ওর মনে হয় না। তাই আপাতত বাবা-মায়ের সঙ্গে এই বাড়িতে থাকলেও, সময় থাকতে থাকতে ভবিষ্যতের জন্য ওই ফ্ল্যাটটা ও কিনে রাখতে চায়। আর ভবানীপুরে ফ্ল্যাট কেনা মানে, সেটা যত ছোটই হোক না কেন, তা নিশ্চয়ই চিল্লিশ লাখের নীচে নয়। আর ও যখন নিজেই বলছে, ও কোনও ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক থেকে লোন নেবে না। তার মানে ওই টাকাটা ওর কাছে আছে। আর থাকবেই না বা কেন? ও তো কোনও হাভাতে ঘরের ছেলে নয়। ওর বাবা অত বড় একটা চাকরি করতেন। রিটায়ারমেন্টের সময় কি কম টাকা পেয়েছেন? তার ওপর ওর মা এত দিন কলেজে পড়িয়েছেন। বলতে গেলে ওর তো কোনও খরচাই



নেই। আর টাকা যখন আছে, তখন বউয়ের জন্য ও কেন, যে কেউই দশ লাখ বার করে দেবে।

দেবানিক যে দেবে, সেটা অপহরণকারীরাও জানে। আর এও জানে যে, এখন যা দিনকাল, তাতে কেউ বা কারা কাউকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ চাইলে, তার বাড়ির লোকেরা একটু দর কষাকষি করতে পারে ঠিকই, কিন্তু কেউ ভুল করেও থানা-পুলিশ করার কথা ভাবে না। কারণ, তাতে ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এই তো কিছু দিন আগে এক দল কিডন্যাপার একটি বাচ্চা মেয়েকে অপহরণ করেছিল। তার বাবা-কাকারা থানা পুলিশ করার পরদিনই, তার গলা কাটা দেহ বস্তাবন্দি অবস্থায় পাওয়া যায় তাদের বাড়ির কাছেই একটি ময়লা ফেলার ভ্যাটে। ফলে যাদের টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তারা পর্যন্ত কাউকে কিছু না-জানিয়ে, সোনাদানা বেচে, ধারদেনা করে, চুপিচুপি মুক্তিপণ দিয়ে নিজের লোককে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। আর দেবানিকের তো টাকা আছে। ও কি দেবে না!

যারা ওকে ফোন করেছে, সবাইকেই ও বলে দিয়েছে, কেউ যেন ল্যান্ড ফোনে ফোন না করে। কারণ, কিডন্যাপাররা কখন ফোন করবে, কিছু বলা যায় না।

একটু আগেই দেবানিকের মোবাইলে ফোন করেছিল ওর অফিসের কলিগ পিনাকপাণি সান্যাল। পিনাক ভারী অদ্ভুত ছেলে। যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিকে একটা-দুটো কথা বলে ও একেবারে হালকা করে দিতে পারে। গভীর শোকের সময়ও ওর কথা শুনে লোকে না হেসে পারে না। সেই পিনাক ফোন করে এমন সিচুয়েশনেও সান্ত্বনা দেওয়া তো দূরের কথা, ওর বউয়ের কোনও খবরটবর না নিয়ে প্রথমেই দেবানিককে বলল, কী কপাল রে তোর, ইচ্ছে করছে, তোর কপালে গিয়ে কপাল ঘষি।

দেবানিক জিঙেস করল, কেন?

পিনাক বলল, কেন কী রে? আমাদের যা বয়স, বউয়ের সঙ্গে তো আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নেই। মাসের পর মাস ভাইবোনের মতো পাশাপাশি শুয়ে থাকি। সেই থাকার কোনও মানে হয়? এই থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

— সে তো ঠিকই। আমার মনে হয় কী জানিস, একটা বয়সের পর বোধহয় এ রকমই হয়। এই দ্যাখ না, তুইও তো জানিস, ডবল ডিমের

পোচ আমি কত ভালবাসি। বিয়ের পরে প্রথম প্রথম যখন ওকে পোচের কথা বলতাম, রাত দুপুরে উঠেও ঠিক বানিয়ে দিত। আর এখন? দশ বার বললেও, ডবল ডিমের পোচ তো দূর অস্ত, অর্ধেক ডিমের পোচও বানিয়ে দেয় না। আমারও তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, বউ একটু কাছে আসুক। এই বুকের উপরে মাথা রাখুক। কিন্তু সে সব অনুভূতি ওর থাকলে তো! এই জনাই না মাঝবয়সি পুরুষরা, খেঁদি হোক আর পেঁচি হোক, মেয়ে দেখলেই ছোঁক ছোঁক করে।

— সে তো তুইও করিস। শুধু ছোঁক ছোঁক কেন? একটু বেশিই করিস। ছুটির পর বেশির ভাগ দিনই তো রুচিকে নিয়ে এ-দিক ও-দিক ঘাস। আমি কি জানি না? তবু রাত হলেই সেই বউয়ের আঁচলের তলায়।

— কী করব বল? মহাপুরুষরা যে বলে গেছেন, বউকে ভালবাসবি!

— বউকে ভালবাসবি বলেছেন, কিন্তু নিজের বউকেই যে ভালবাসতে হবে, এ কথা তো বলেননি। আহা রে, তোর বউটাকে না করে যদি আমার বউটাকে কেউ কিডন্যাপ করত! রুচিকে বলেছিল?

রুচিও ওর সহকর্মী। যেমন চটকদার দেখতে। তেমনই তার কথাবার্তা। লোকে বলে, ওকে দেখলে আট থেকে আশি, যে কোনও ছেলেই নাকি ওর প্রেমে পড়ে যাবে। পাড়ার মেয়ে বউরা নাকি বলাবলি করে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের মাথা ও নাকি চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। প্রেম করে বিয়ে করেছে বছর তিনেক আগে। সল্টলেকের শাখা থেকে বদলি হয়ে এই ব্রাঞ্চে আসার পর দু'দিনের মধ্যেই দেবানিকের সঙ্গে ওর এত বন্ধুত্ব হয়ে যায় যে, সেটা প্রেমে পরিণত হতে সাত দিনও লাগেনি। অফিসের সহকর্মীরা ছাড়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দু'—একজন বন্ধু শুধু সেটা জানে। তবু কী করে যেন মিমিও টের পেয়ে গেছে। দেবানিকের সন্দেহ, তার অফিসেরই কেউ তার বউকে সেটা জানিয়েছে।

এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি থেকে শুরু করে তর্কাতর্কি, এমনকী, দু'—একদিন কথাবার্তাও বন্ধ ছিল। তার ভেতরেই ঘটে গেল এই অঘটন।

এর মধ্যে আরও তিন বার ফোন করেছে কিডন্যাপাররা। বলেছে, ঠিক ক'টার সময় টাকা নিয়ে কোথায় যেতে হবে। আর তার খানিক পরেই ফের ফোন করে জানিয়েছে, না। ওখানে অতটার সময় নয়। আপনি এই সময়ে এখানে আসুন। ওরা কেন বারবার সময় আর জায়গা বদলাচ্ছে, দেবানিক

ঠিক বুঝতে পারছে না। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, এ বারও ওরা ফোন করে বলবে, ওখানে নয়, এখানে। অতটার সময় নয়, এতটার সময়।

এরই এক ফাঁকে ওর মোবাইলে ফোন করেছিল থানার ও.সি। কথা ছিল, অপহরণকারীরা ফোন করলেই দেবানিক সঙ্গে সঙ্গে সেটা জানিয়ে দেবে ও.সিকে। কিন্তু এতক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরেও কোনও ফোন পাননি দেখে তিনি নিজে থেকেই ফোন করে জানতে চাইলেন, ওরা কি আর ফোন করেছিল?

দেবানিক কোনও আমতা আমতা করেনি। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে— না।

ও.সি বললেন, তবু আপনি ফোনের কাছাকাছি থাকুন। যে কোনও সময় ওরা ফোন করতে পারে।

ফোনের কাছেই বসে ছিল দেবানিক। মনে মনে ভাবছিল, ভাগ্যিস এই সময় বাবা-মা এক মাসের জন্য বোনের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। না হলে এই খবর শুনে তাঁরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি জুড়ে দিতেন। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিতেন।

এর মধ্যে খবর পেয়ে যে তিন জন বন্ধু আজ ওর কাছে ছুটে এসেছিল, তারাও একে একে চলে গেছে। বাড়িতে ও এখন একা। এমন সময় ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

— আপনি টাকাটা নিয়ে লেকের রোয়িং ক্লাবের পাশে ঝুলন্ত ব্রিজের সামনে চলে আসুন। ঠিক আটটা দশে। আর নোটগুলো যেন আনকোরা সিরিয়াল নম্বরের না হয়, কেমন?

— হলে?

— তার মানে?

— মানে, আমি যদি না যাই?

— না এলে কী হবে বুঝতে পারছেন না?

— কী হবে?

— আপনার বউয়ের ধড় পাবেন এক জায়গায় আর মুণ্ডু পাবেন আর এক জায়গায়।

— তা হলে ফোন করছেন কেন? সেটাই করুন।

— হোয়াট?

কোনও উত্তর দিল না দেবানিক। রিসিভার নামিয়ে রাখল। বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াবার আগেই আবার ফোন বেজে উঠল, হ্যালো, কী হল, আপনি আসবেন না?

— না।

— কেন?

— আরে মশাই, কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে একটা বউকে নিয়ে বছরের পর বছর থাকা সম্ভব? এই একঘেয়েমি আর ভাল লাগে না। এটা গেলে তো আমি মুক্ত। মুক্ত বিহঙ্গ। যাই করি না কেন, আমাকে বলার কেউ থাকবে না, ‘ওই ভাবে হাত দিয়ে রিসিভার চেপে কার সঙ্গে কথা বলছ? দেখি ফোনটা।’ কিংবা ‘কুঁচকে বলবে না, ‘তোমার রুমাল কোথায়?’ অথবা জানতে চাইবে না, ‘এত রাত হল কেন? কোথায় ছিলে?’ তখন বানিয়ে বানিয়ে আমাকে আর বলতে হবে না, ‘আসার সময় দেখি, ওই পাড়ায় একটা জলসা হচ্ছে। এমন জলসা আমি বাপের জন্মে দেখিনি। শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কোনও দিন দেখেছ, যে তবলা বাজাচ্ছে, সে-ই তবলার তালে তালে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গান গাইছে। আর অন্য একটা লোক তার পাশে বসে নির্বিকার ভাবে চুপচাপ হারমোনিয়াম বাজিয়ে যাচ্ছে। এ রকম বিরল দৃশ্য দেখে না দাঁড়িয়ে পারা যায় বলো? শুনছি তো শুনছি। কতগুলো গান শুনেছি, মনে নেই। হয়তো একটু বেশিই শুনেছি। তাই এত রাত হয়ে গেল।’ না না। রোজ রোজ এত বানাতে পারব না। তার চেয়ে বরং কিডন্যাপ করেছেন। কিডন্যাপ করেই রাখুন। ওকে ছাড়তে হবে না।

— ছাড়তে হবে না মানে? এ কী বলছেন?

— কেন? অসুবিধে কোথায়?

— কত টাকা ইনভেস্ট হয়ে গেছে জানেন?

— ইনভেস্ট?

— হবে না? যে গাড়ি করে আপনার বউকে কিডন্যাপ করেছে, সে গাড়ি তো ভাড়া করেইছি, ড্রাইভারকে এই কাজের জন্য আলাদা করে দিতে হয়েছে পাঁচ হাজার। তার পর আপনার বউ তো এক শাড়ি ব্লাউজ পরে ছিলেন। তাঁর জন্য দু’-দুটো শাড়ি কিনতে হয়েছে। উনি নাকি আবার যে-সে শাড়ি পরেন না। এক কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকতেও পারেন না! বুঝুন ঠেলা। ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হয়ে যাওয়ার জোগাড়। শুধু তাঁর জন্যই নয়, আমরা চার জন

লোক, হোটেল থেকে দু'বেলা খাবার আনতে হচ্ছে। তার খরচা নেই? তার উপর ঘনঘন ফোন করতে হচ্ছে। কে দেবে এত খরচ?

— ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সে সব খরচা নাহয় আমিই দিয়ে দেব। আপনারা ওকে খালাস করে দিন।

— মানে?

— ওই যে বলেছিলেন, এক জায়গায় দেহ আর এক জায়গায় মুণ্ড পাওয়া যাবে।

— এ কী বলছেন? আপনি না ওর স্বামী?

— আমি কি কখনও সেটা অস্বীকার করেছি? কিন্তু আমি যতটা স্বামী, তার থেকে বেশি আসামি। মেরে ফেলুন।

— মেরে ফেলুন বললেই হল? আমরা কি খুনি নাকি?

— তা হলে কী?

— কিডন্যাপার।

— আমি তো যত দূর জানি, কিডন্যাপাররা তাদের চাহিদা মতো টাকা না পেলে যাকে অপহরণ করে, তাকে মেরে ফেলে।

— যারা মারে, তারা মারে। আমরা তো এ কাজে এখনও সড়গড় হয়ে উঠতে পারিনি। এটাই আমাদের প্রথম কাজ। আমরা মারতে পারব না।

— তা, মারতে যখন পারবেন না, তখন খামোকা এত লোক থাকতে আমার বউটাকে কিডন্যাপ করতে গেলেন কেন?

— কারণ, আমরা জানি, বাড়ি কেনার জন্য এই মুহূর্তে আপনার কাছে অনেকগুলো টাকা আছে। আপনার কোনও ছেলেমেয়ে থাকলে, তাকেই হয়তো কিডন্যাপ করতাম। কিন্তু আপনার তো কোনও ছেলেপুলে নেই। তাই বাধ্য হয়ে...

— তা হলে এখন কী করবেন?

— কী আবার করব? এত দিন ধরে আমাদের যা খরচ হয়েছে, দিয়ে দিন। আপনার বউকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি।

— না না না। একদম না। আমার বউকে ভুল করেও ছাড়বেন না। না ছাড়তে কত নেবেন বলুন।

— না ছাড়তে?

— হ্যাঁ, না ছাড়তে।

— তা হলে একটু দাঁড়ান। আমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নিই, তার পর আপনাকে ফোন করছি।

মিনিট পনেরোও কাটল না। আবার ফোন। এ বার অন্য লোকের গলা। এবং অত্যন্ত মোলায়েম, দাদা, বলছিলাম কী, আমরা তো খুনি নই। তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, যদি কোনও কন্ট্রাস্ট কিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারি, নিশ্চয়ই আপনার বউকে খুন করে দেব। ওটা আমাদের দায়িত্ব। আপনি আপাতত আমাদের যা খরচাপাতি হয়েছে, সেটা দিয়ে দিন।

— এত তাড়া কীসের?

— দু’দিন বাড়ি যাইনি দাদা। আরও দেরি করলে বাড়িতে মা ঢুকতে দেবে না।

— সে কী?

— আর বলবেন না, কাদের নিয়ে কাজ করছি, সেটা কেবল আমিই জানি। আমাদের দলের একজন, ও বাড়ি ফিরছে না দেখে ওর বউ ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করছে। সদ্য বিয়ে হয়েছে তো! ও-ও বউয়ের কাছে যাওয়ার জন্য ছটফট ছটফট করছে। আর এক মুহূর্ত থাকতে চাইছে না। আমাদের দলের আর একজনের বউ তো একেবারে রাম দজ্জাল। একটু আগে ফোন করে ওকে রীতিমত ধমকেছে। বারবার জানতে চেয়েছে, তুমি কোথায় আছ বলো। আমি এফুনি সেখানে যাব। মনে হয়, ওর বউ বুঝি সন্দেহ করছে, অন্য কোনও মহিলাকে নিয়ে ও ডায়মন্ড হারবার বা মন্দারমণি গেছে। তাই ও-ও বলছে, চলে যাবো। আমার মনে হয়, ওর কপালে আজ উত্তম-মধ্যম আছে। দলের আর একজন তো বাড়ি যাওয়ার জন্য রীতিমত কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে।

দেবানিক বলল, কেন? তার বউ আবার কী বলল?

— বউ নয়। তার সাত-আট বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে আছে। সে নাকি বাবার জন্য খুব কাঁদছে। তার হাতে ওর মা ফোন দিতেই সে নাকি কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে, বাবা, তুমি কোথায়? এফুনি চলে এসো।

তাই বলছিলাম কী, প্রচুর টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কেউই আর এই মিশনে বেশিক্ষণ থাকতে চাইছে না। আপনার যা দেওয়ার হয়, দিয়ে দিন। না হলে এত টাকা ইনভেস্ট করে আমাদের পথে বসে যেতে হবে।

— কেন?



— কারণ, আমার হাতে আর টাকা নেই। তার উপর আপনার বউয়ের যা বায়নাক্স! সকাল হলেই তার জেলি-টোস্ট চাই। দুপুরে মুরগির মাংস। বিকেলে পিৎজা। সন্ধ্যা হলেই স্টার জলসা দেখা চাই। সঙ্গে ফুচকা। না হলে আলুকাবলি। রাতের খাবারে এটা নয়, সেটা। সারাক্ষণ চাকুম-চুকুম... মুখ নড়ছেই। কে বলবে কিডন্যাপ হয়েছে! মনে হয় যেন ফিস্ট করতে এসেছে। আমি আর পেরে উঠছি না। লোকে বলে, আজকালকার মেয়েরা নাকি খুব শরীর সচেতন। মোটা হওয়ার ভয়ে কিছুই খেতে চায় না। এ হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। আপনি যে কী ভাবে সামলান...

— সামলাতে পারি না দেখেই তো বলছি, আর যাই করুন, ওকে ছাড়বেন না।

— না ছাড়তে তো খরচা আছে।

— কত?

— ছাড়ার জন্য আপনার কাছে দশ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছিল তো?

— প্রথমে পাঁচ চেয়েছিলেন।

— প্রথমটা ছেড়ে দিন। শেষ পর্যন্ত দশ লাখই কথা হয়েছিল তো?

— হ্যাঁ।

— ওটা হচ্ছে ছাড়ার জন্য। মানে মুক্তিপণ। আর আপনি যখন বলছেন না ছাড়ার জন্য। তখন কিন্তু একটু বেশিই পড়বে।

— কত?

— পনেরো লাখ

— পনেরো লাখ!

— তার কমে পারব না দাদা।

— সে আবার হয় নাকি? এটা কি ফিক্সড প্রাইজের দোকান? যা বলবেন, সেটাই দিতে হবে। শুনুন, আপনাদের সঙ্গে যা কথা হয়েছিল। আমি তাই দেব। ওই পুরো দশ।

— আরে, দশ দিলে কী করে হবে? খরচা আছে না?

— কীসের খরচা?

— কন্ট্রাস্ট কিলারের টাকা।

— ওরা কত নেবে?

— সে কি আমি জানি নাকি?

— আপনাদের কোনও আইডিয়া নেই, কত নিতে পারে?

— দেখুন, সিনেমা-টিনেমায যা দেখি, লোক অনুযায়ী টাকার অ্যামাউন্ট কমে বাড়ে। যদি কোনও ব্যবসায়ী হয়, তার রেট একটা। যদি কোনও বিরোধী নেতা হয়, তার রেট একটা। আর সে যদি কোনও মন্ত্রী হয়, মন্ত্রীর তারতম্য অনুযায়ী সেটাও আবার কম বেশি হয়। তার উপর হচ্ছে, কী সিনেমা? হিন্দি হলে কোটিতে খেলে। বাংলা হলে লাখে। এ ক্ষেত্রে কোনটা ধরব? আমরা অনেক আলাপ-আলোচনা করেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

— ও যখন বাঙালি, তখন বাংলা সিনেমার হিসেবেই ধরুন। আর ও তো কোনও ব্যবসায়ী নয়, মন্ত্রীও নয়। অত্যন্ত সাধারণ, ছাপোষা একজন গৃহবধু। সেই মতো একটা বিবেচনা করে হিসেব করুন না...

— ঠিক আছে, তেরো লাখ।

— না। এগারো লাখ।

— ঠিক আছে, দু'জনের কথাই থাক। বারো লাখ।

— ও.কে।

— কখন দেবেন?

— সেটা আপনারা বলুন।

— যত তাড়াতাড়ি পারেন।

— কোথায়?

— দেখুন, বলছিলাম কী, আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে যখন একটা সমঝোতা হয়েই গেল, তখন আর লুকোছাপা করার কোনও মানেই হয় না। আপনি তো চেতলায় থাকেন। গাড়িও নিতে হবে না। হিজড়া মোড় থেকে একটা অটো ধরে রাসবিহারী মোড়ে চলে আসুন। বচ্চন সিংয়ের সামনে। ওখান থেকেই আমরা টাকাটা নিয়ে নেব।

দেবানিক বলল, ঠিক আছে।

টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, আপনি আবার পুলিশ-টুলিশ নিয়ে আসবেন না তো?

দেবানিক বলল, আমি তো ভাবছিলাম, এই প্রশ্নটা আমিই আপনাকে করব।

ফোনের দু'প্রান্তেই হো হো হাসির রব উঠল।

বচ্চন সিংয়ের ধাবার ভিতরে তখন বেশ ভিড়। তাই উভয় পক্ষই এ ওর

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, ওখানে না ঢুকে, তার পাশেই ঝা-চকচকে সাথী রেস্টোরাঁয় ঢুকে পড়ল। একদম শেষের দিকে চলে গেল ওরা। সামনেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আলাদা কক্ষ। খাবারদাবারের যা দাম, এয়ারকন্ডিশনের জন্য তার থেকে টেন পারসেন্ট বেশি নেয় বলে, এখানে তুলনামূলক ভাবে লোকজন কম ঢোকে। কাচের বড় দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পিছন দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। চিকেন হরিয়ালি কাবাব খেতে খেতে টাকা ভরা বাস্কেট হাত বদল হয়ে গেল।

কিডন্যাপারটা বেরিয়ে যাওয়ার খানিক বাদে বিল মিটিয়ে দেবানিকও বাড়ির রাস্তা ধরল।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেবানিক একেবারে থ'। দরজার সামনেই মিমির চটি। তার মানে মিমি এসে গেছে এবং রোজকার মতো ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছে। ডাইনিং স্পেসে গিয়ে দেখল, তার বউ কিচেনে একমনে কী যেন বানাচ্ছে। কিন্তু কী? নিঃশব্দে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে মিমির পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখল, ননস্টিক সসপ্যানের পাশেই দুটো ডিমের খোসা পড়ে আছে। তার মানে ডবল ডিমের পোচ বানাচ্ছে সে। যা তার সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু এ বাড়িতে তো সে ছাড়া ডবল ডিমের পোচ আর কেউ খায় না। তা হলে কি তার জন্যই ও এটা বানাচ্ছে! সে বানাক। কিন্তু কথা হচ্ছে, ও জানল কী করে, সে এখনই আসবে!

পোচ বানাতে বানাতে মিমি হঠাৎ দেখল, সামনে কার যেন একটা ছায়া। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরতেই দেবানিককে দেখে, সব ফেলে দেবানিকের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, তুমি আমাকে এত ভালবাসো! এত! তুমি আমার জন্য জীবন বাজি রেখে এতটা করবে, আমি ভাবতেই পারিনি। আমি যত দূর জানি, তোমার কাছে তো পঁয়ত্রিশ লাখ ছিল। এ-দিক ও-দিক থেকে নাইয় কুড়িয়ে কাচিয়ে আরও পাঁচ লাখ জোগাড় করেছে। কিন্তু বাকি দশ লাখ তুমি কোথায় পেলে? ওরা বলল, আমার মুক্তিপণ বাবদ তুমি নাকি ওদের পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়েছ!

পঞ্চাশ লাখ! দেবানিক আকাশ থেকে পড়ল। দু'হাত দিয়ে মিমির দু'কাঁধ ধরে বুকের ওপর থেকে তুলল। ওর অশ্রুসজল মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে হল, এ এক অন্য মিমি। আর ঠিক তখনই মনে পড়ল ওই কিডন্যাপারদের কথা! তারা কন্ট্রাস্ট কিলার পেয়েছে কি না, ও

জানে না। তবে ওর মনে হল, মিমিকে ওরা সত্যিই খুন করেছে। খুন করেছে তার একটু একটু করে অসহ্য লাগতে থাকা মিমিকে। যাকে সে মারতে চেয়েছিল। চিরতরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল এই পৃথিবী থেকে।

দেবানিক আর থাকতে পারল না। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল মিমিকে। মিমিও আঁকড়ে ধরল দেবানিককে। ছোট্ট একটা পাখির মতো তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে দেবানিকের বুকের ভিতরে মিলিয়ে যেতে লাগল সে।

## ৪৯

### ঘাসফুল

অহিতাগ্নির ফোন পেয়ে নড়েচড়ে বসল তিয়াস। — সে কী রে, ছত্তীসগড়ে? সেটা তো মাওবাদীদের আঁতুড়ঘর। ওখানে গেলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব তো?

— পারবি, পারবি। কবি সম্মেলনটা কে করাচ্ছে দ্যাখ।

— কে?

— আরে, বিশ্বরঞ্জন। ওখানকার ডি জি পি।

অহিতাগ্নির কথায় চমকে উঠল তিয়াস, ডি জি পি?

— এক সময় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই বি-র বিহার ঝাড়খণ্ড শাখার প্রধান ছিলেন। কিছু দিন মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার এস পি ছিলেন। মাওবাদীদের পিটিয়ে এমন ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন যে, এখন যেটা আমাদের দেশের সবচেয়ে খতরনাক রাজ্য, সেই ছত্তীসগড়ের পুলিশ প্রধান করে দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

— ও। তার মানে উনি আই পি এস?

অহিতাগ্নি বলল, শুধু আই পি এস নন, দুঁদে আই পি এস।

— তা, আই পি এস হয়ে উনি হঠাৎ কবি সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছেন কেন?

— করবেন না? উনি নিজেই যে হিন্দি ভাষার একজন বিখ্যাত কবি।

— তাই নাকি? পুলিশ হয়ে কবিতা লেখে! তিয়াস একটু অবাকই হল।

— তুই তো দেখছি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো বলছিস, ‘পুলিশও কবিতা লেখে, সেই দুঃখে লিখি না কবিতা...’

— না না, তা নয়।

— কার নাতি দ্যাখ।

— কার?

— উর্দু সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র রঘুপতি সহায়ের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছিস? যাকে সবাই ফিরাক গোরখপুরি নামেই বেশি চেনে, তাঁর মেয়ের ঘরের ছেলে।

তিয়াস বুঝতে পারল, যিনি আয়োজন করেছেন, তাঁর সম্পর্কে প্রচুর ইনফর্মেশন ইতিমধ্যেই জোগাড় করে ফেলেছে অহিতাগ্নি। তবু বলল, তাই? তা হলে বলছিস ভয়ের কিছু নেই, উনি পুরো প্রোটেকশন দেবেন?

— দেবেন মানে? ওঁর কথায় ওখানে বাঘে হরিণে এক ঘাটে জল খায়, জানিস? উনি এই কবি সম্মেলন তো নতুন করছেন না, সারা বছর ধরেই বিভিন্ন সময়ে করেন। কত দূর দূর থেকে কত কবি যায়। আজ পর্যন্ত কোনও গুণ্ডগোল হয়নি। এ বার বাঙালি কবিদের মধ্যে কেবল তাকে আর আমাকেই আমন্ত্রণ করেছেন।

— শুধু দু'জনকে?

— না না, শুনলাম, নীরেনদা আর জয়দাকেও বলেছিল।

— ওঁরা যাবেন না?

অহিতাগ্নি বলল, নীরেনদা কী করে যাবেন বল? শরীরের যা অবস্থা, কম বয়স তো হল না। এই তো সে দিন দেখলাম, বয়সের ভারে কেমন নুইয়ে গেছেন। আর জয়দা নাকি বলেছেন, সে সময় বাংলা আকাদেমিতে কী একটা উৎসব আছে, তাই যেতে পারবেন না। ফলে ওঁদের দু'জনের কেউই যাচ্ছেন না। যাচ্ছি শুধু তুই আর আমি।

তিয়াস বলল, ঠিক আছে। তুই যখন বলছিস ভয়ের কিছু নেই, যাব। তবে আমি একা হলে কিন্তু কিছুতেই যেতাম না। তুই সঙ্গে যাচ্ছিস, তাই। অবশ্য ভালই হল। অনেক দিন পর একটু জঙ্গল ঘুরে আসা যাবে।

দান্তেওয়াড়া জেলা সদরে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল মাথায় লাল আলো লাগানো একটি এসি স্করপিও। সেটা যখন জগরগুন্ডার সালওয়া জুড়ুম ক্যাম্পে পৌঁছল, অহিতাগ্নি আর তিয়াসের চক্ষু চড়কগাছ। সে কী এলাহি আয়োজন! ফাইভ স্টার হোটেলকেও হার মানাবে এমন সুসজ্জিত এক-একটা ঘর। খাবারদাবারেও রাজসিক ব্যবস্থা। ঢালাও মদ। যেন কবিতা পড়তে নয়, তারা মোচ্ছব করতে এসেছে।

এর আগে ওরা বহু জায়গায় বহু কবি সম্মেলনে গেছে। প্রতি বছর একুশে



ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যে জাতীয় কবিতা উৎসব হয়, সেখানেও গেছে পরপর তিন বার। ভাষা শহীদের স্মারকে ফুলের স্তবক দেওয়ার জন্য আগের দিন রাত থেকেই নানা বয়সি ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ীদের জনশ্রোত দেখে ওরা চমকে গিয়েছিল। ওই ভিড় দেখে ওদের বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল, একডালিয়া এভারগ্রিন বা চेतলার অগ্রণী মাঠ কিংবা নিউ আলিপুরের সুরুচি সংঘের কথা।

অভিভূত হয়েছিল, ভোর ছ'টায় কবিতা পাঠ শোনার জন্য ঢাকার মতো ব্যস্ত শহরের প্রাণকেন্দ্র, বাংলা আকাদেমির সামনের বিশাল খোলা জায়গায় হাজার হাজার লোকের সমাবেশ দেখে। ছোট বড় সবার গালেই রং তুলি দিয়ে আঁকা 'অ', 'আ' কিংবা 'ক', 'খ'-র এক-একটা বর্ণ দেখে।

ভারত থেকে এসেছে শুনে বাংলা আকাদেমির সচিব সরকার আমিন ওদের বলেছিলেন, যতক্ষণ না কবিতা পাঠের আসর শেষ হচ্ছে, দেখবেন, এখান থেকে একটা লোকও নড়বে না।

ওরা দেখেছিল, সত্যিই তাই। এক মাস ধরে যে বইমেলা হচ্ছিল, সেখানে প্রতিদিনই ছিল প্রায় একই রকম ভিড়। এবং রোজই মেলার মধ্যে এখানে সেখানে খবরের কাগজ বিছিয়ে তরুণ তরুণীদের গোল করে বসে কবিতা পড়তে দেখেছিল ওরা।

তবে ওদের দেখা এ পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যয়বহুল কবি সম্মেলন করেন সম্ভবত মেদিনীপুরের একচ্ছত্র বামপন্থী নেতা কাম এম পি শত্রুঘ্ন শেঠের বউ কমলিকা পন্ডাশেঠ। সেই বিশ্ব বাংলা কবিতা উৎসবে শুধু এ দেশেরই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান কবিদের উড়িয়ে নিয়ে আসেন তিনি। টানা তিন দিন ধরে চলে খানাপিনা হই-হট্টগোল। সেখানে অবশ্য কবিতা পড়ার জন্য স্থানীয় কোনও কবি ডাক পান না। ডাক না পাওয়া, ওই অনুষ্ঠান শুনতে আসা এমনই এক স্থানীয় কবি ওদের বলেছিলেন, কমলিকা আজকাল কবিতা লিখছে তো, তাই বরের সুবাদে অনুষ্ঠান করে, বড় বড় কবিদের ডেকে এনে, তাঁদের নানা উপটোকন দিয়ে, তাঁদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করছে। ভাবছে, আমিও ওঁদের মতো কবি হয়ে গেলাম। আরে বাবা, যখন এ সব থাকবে না, তখন বোঝা যাবে ও কবি না কপি।

সে বছর অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই ওই মঞ্চে কমলিকার একটি কবিতার বইয়ের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হয়েছিল। যেমন দামি কাগজে ছাপা, তেমনই

পাতায় পাতায় প্রথিতযশা এক শিল্পীর আঁকা রেখাচিত্র। বিপুল টাকা খরচ করে সেই বইয়ের এক-একটা পাতার গ্লো-সাইন বোর্ড বানিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল হলদিয়ার এ মাথা থেকে ও মাথা। স্পনসর করেছিল ইন্ডিয়ান অয়েল। শোনা যায়, কয়েক জন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক ছাড়া সে বই নাকি আর একজনও কেনেননি। পরে বিনে পয়সায় বিলিয়েও শেষ করতে না পেরে কিলো দরে বেচে দিয়েছিলেন তিনি।

ওই স্থানীয় কবি আফসোস করে আরও বলেছিলেন, রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে লোকে কী না করে, না!

সেই আয়োজনকেও হার মানাল বিশ্বরঞ্জনের এই কবি সম্মেলন। ওখানে যাওয়ার পর ওরা শুনল, উনি শুধু কবিই নন, বিশিষ্ট একজন গল্পকারও। রুশ কবিদের প্রতি নাকি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। মায়াকভস্কি আর পুশকিন তাঁর আদর্শ। ভালবাসেন পাবলো নেরুদাকেও। রাজ্যবাসীর দুঃখ দুর্দশা আর বর্তমান বাজার অর্থনীতি নিয়ে তীব্র ফ্লোভ বারবার ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। স্থানীয় শিল্প সংস্কৃতির প্রতি তাঁর বিপুল প্রীতি।

অহিতাঘ্নি অবাক। তিয়াসও তাই। কোনও ডি জি পি যে এমন হতে পারেন, ভাবাই যায় না। কবিদের মন তো নরম হয়। এ রকম একজন কবি যে কী ভাবে এখানকার এমন মাও-সন্ত্রাস দাবিয়ে রেখেছেন, ওরা ভেবেই পেল না। তিয়াস বলেছিল, যে পারে, সে পারেই।

কবিতা শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছিল ওরা। তাই সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে টুক করে ওই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে খানিক দূরের একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসেছিল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, এ রকম ডি জি পি যদি আরও দু'—একটা থাকতেন, তা হলে আর দেখতে হত না। গোটা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা নেমে আসত।

— হ্যাঁ, শান্তি নাইমা আসত। শ্বশানের শান্তি।

কে বলল কথাটা! ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, চোখ মুখ ঢুকে যাওয়া, হাড় জিরজিরে, কালো কালসিটে পড়ে যাওয়া পোড়া কাঠের মতো একটা লোক টুলের উপরে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। পরনে শতচ্ছিন্ন, তেলকষ্টি ময়লা একটা নাতা। কত বয়স হবে বোঝা যাচ্ছে না। ওরা তাকাতেই লোকটা বলল, আপনারা পশিক্ষন নিতে আইছেন, না?

— প্রশিক্ষণ?

— তা-ই তো কয়। আমাগো পিষার কল হইতে আইছেন তো?

— পিষার কল মানে?

লোকটার কথা ওরা বুঝতে পারছে না দেখে, চায়ের দোকানদার বলল, ও ভাবসে, আপনারা বুঝি সালওয়া জুড়ুয়ার লোক।

— সালওয়া জুড়ুয়া? সেটা আবার কী?

— সালওয়া জুড়ুয়ার নাম শোনে নাই? মাওবাদীর নাম শুনছেন তো? এরা তার বাবা। আপনাগো ওই বিশ্বরঞ্জনরই হাতে গড়া দল।

— সে কী! এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অহিতাগ্নি আর তিয়াস।

বিস্ময়ের পারদ আরও চড়ল, যখন মশার হাত থেকে বাঁচতে হাতে পায়ে গায়ে মসকিউটো রেপেল্যান্ট ক্রিম মেখে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা কবিরা গভীর রাতে দোতলার করিডরে চেয়ার নিয়ে বসে আড্ডা মারছিল, তখন সমস্ত নিঃসুদ্রতা ভেঙে একটা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল আলো-আঁধারিতে ঢাকা লোহার বিশাল বন্ধ ফটকের ও পারে। সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে গেল। জিপটা ভিতরে ঢোকামাত্র গেট বন্ধ হয়ে গেল। জিপ থেকে টেনে হিঁচড়ে নামানো হতে লাগল এক-একটা মেয়েকে। তাদের কারও পরনে সালোয়ার কামিজ। কারও পরনে শাড়ি। আবার কারও পরনে আলখাল্লার মতো কী যেন। যে পুলিশগুলো নামাচ্ছিল, তাদের হাত ছাড়িয়ে কোনও রকমে ওই মেয়েগুলোর দৌড়ে পালানোর আশ্রয় চেষ্টা দেখেই ওরা বুঝতে পারল, জোর করে তুলে আনা হয়েছে ওদের। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না, আপত্তি থাকলে ওরা চিৎকার করে লোক জড়ো করছে না কেন!

এ কে ফটিসেভেনের নল দিয়ে খোঁচা মারতে মারতে যখন ওদের এই বিল্ডিংয়ের ভিতরে নিয়ে আসা হচ্ছিল, করিডরের উপর থেকে ঝুঁকে তিয়াস দেখল, ওদের মুখগুলো কাপড় দিয়ে বাঁধা। হাত দুটোও পিছমোড়া করে বাঁধা।

মেয়েগুলোকে দেখে বয়স্ক এক ওড়িয়া কবি বললেন, এগুলো কি আজ রাতে আমাদের ভেট দেবে নাকি?

তার পাশেই বসেছিলেন মধ্যবয়স্ক এক অসমিয়া কবি। তিনি তাঁকে বললেন, আপনারা বুঝি এখানে এই প্রথম বার, না? তাই হয়তো জানেন

না। বিশ্বরঞ্জনের প্রতিদিন নতুন নতুন মেয়ে চাই। তাও আবার একটা-দুটোয় ওর হয় না। একসঙ্গে পাঁচ ছাঁটা লাগে। ওর জন্যই বোধহয় আনল। ভাগ্যে থাকলে আমরাও ছিটেফোঁটা পেতে পারি।

আরও এক কবি, তাঁর নামটা এমন বিদঘুটে যে, এক দু'বার শুনে কেউই মনে রাখতে পারে না। তিনি হঠাৎ ও পাশ থেকে বলে উঠলেন, না না, সে গুড়ে বালি। মেয়ে যদি ভেট দিতেই হয়, ও আমাকে-আপনাকে দেবে না। দেবে বাবুদের।

কিন্তু বাবু যে কারা! অহিতাগ্নি বুঝতে পারল না। তিয়াসও না। আড্ডা দিতে থাকা ওই কবিদের মধ্য থেকে যে কেউ বুঝতে পেরেছে, তাদের চোখ মুখ দেখেও সেটা বোঝা গেল না। সবার মনেই কেমন যেন একটা খটকা লাগল।

সেই খটকাটা মনের গভীরে একটা গাঢ় ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, যখন ওই ক্যাম্পেরই এক পুলিশ কর্মী ভয় মেশানো গলায় ওদের কাছে চুপিচুপি বলেছিল, এই ডি জি পি-র কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের কথা। যে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলের উন্নয়ন করার কথা, মাও-দমনের প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম কেনার কথা, পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কথা, সেই টাকা খরচ করার এজিয়ার যেহেতু শুধু জেলাশাসক আর পুলিশ সুপারের হাতে, তাই প্রশাসনের হত্যাকত্তারা ওই টাকা নিয়ে কোনও মাথা ঘামান না। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, মাওবাদীদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি দান্তেওয়াড়া, বস্তার, নায়ারণপুর, বিজাপুর আর কনক-এর জন্য নাকি কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছিল সবচেয়ে বেশি টাকা। সেই টাকায় ওই সব জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প বানানো, থানা, বাংলোর পুনর্নিমাণ বা সংস্কারের কাজ, কাঁটাতারের বেড়া, টিউবয়েল ও জলের পাম্প বসানোর কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে ক'টা বালির বস্তা আর কয়েক পেটি মিনারেল ওয়াটার কেনা ছাড়া কিছুই নাকি খরচ করা হয়নি। যেহেতু কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নির্দেশিকায় এ সব ক্ষেত্রে খরচের কোনও উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া নেই, তাই খাতায়-কলমে দেখানো হয়েছে শুধু ব্লিচিং পাউডারই ছড়ানো হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার। মাওবাদীদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য সোর্স মানি হিসেবে জলের মতো টাকা ঢালা হয়েছে। মাও দমনের নামে বিভিন্ন জায়গায় হানা দেওয়া হয়েছে ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে। সেখানেও দোদার টাকা খরচ দেখানো হয়েছে।

কিন্তু কেউ একবারের জন্যও প্রশ্ন তোলেননি, তা হলে অতগুলি সরকারি গাড়ি কী করছিল? এ সব তো ছিলই। তার উপরে ছিল দিস্তে দিস্তে ভুয়ো বিল।

ওই সব খাত থেকে টাকা সরিয়ে কয়েক জন মুষ্টিমেয় পুলিশ সুপার শুধু বিলাসবহুল জীবনই যাপন করেননি, তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বাংলাটাকেও রাজসিক ভাবে সাজিয়েছেন। ফুটি করার জন্য বানিয়েছেন ফাইভ স্টার হোটেলের মতো এক-একটা গেস্ট হাউস। কেনা হয়েছে একের পর এক এসি গাড়ি। আর, যাঁর মদতে এ সব হয়েছে, তাঁর নাম সবাই জানেন— বিশ্বরঞ্জন সহায়। তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এই মুহূর্তে কত, তিনি হয়তো নিজেও জানেন না। এ নিয়ে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে খোদ রায়পুরের পুলিশ সদর দফতরেই। কেউ কেউ এ কথা জানিয়েওছেন উপর মহলে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন সব জেনেও এই সব পুলিশ অফিসারকে কিছুতেই ঘাঁটাতে চায় না। কারণ, এমনিতেই মাও অধ্যুষিত অঞ্চলে পুলিশ আধিকারিকেরা কেউই চট করে যেতে চান না। তাই তাঁরা যত যাই করুন না কেন, কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই তাঁদের খামোকা চটাতে চায় না। আর সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছেন এই বিশ্বরঞ্জন। তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে গড়ে উঠেছে সালওয়া জুড়ুম।

মাওবাদীরা তো আছেই। তারা মাঝে মাঝেই মাঝরাতে গ্রামে এসে এর ওর বাড়িতে ঢুকে বুকের উপরে ওয়ান শটার ঠেকিয়ে তাদের যা দরকার, তা হাট থেকে এনে দিতে বলে। আনতে না চাইলেই— টাই!

আগে হাটই ছিল বস্তারের প্রাণকেন্দ্র। সপ্তাহে একবার করে বসত। সেই হাটে শুধু যে বেচাকেনাই হত, তা নয়। মিলনক্ষেত্রও ছিল ওটা। দূর-দূরান্ত থেকে আসা আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ থেকে শুরু করে বিয়ের জন্য পাত্রপাত্রী বাছাই, সবই হত ওখানে। বিক্রির জন্য বহু দূর দূর গ্রাম থেকে মছয়া আর জংলি ফল নিয়ে আসত আদিবাসীরা। আর ফেরার সময় কিনে নিয়ে যেত তেল, নুন, হলুদ থেকে শুরু করে কাচের চুড়ি, বাচ্চার খেলনা, সব, সব। তার সঙ্গে নিয়ে যেত মাওবাদীদের ফরমাশ মতো এটা ওটা সেটা। আর ওরা যে মাওবাদীদের জন্যই ওগুলি কিনছে, মানে ভয়েই হোক আর আবেগেই হোক, মাওবাদীদের সাহায্য করছে, এটা আন্দাজ করে, সোজা হাট থেকেই গ্রামবাসীদের তুলে নিয়ে যেত পুলিশ। অকথ্য অত্যাচার করে বার করে নিত মাওবাদীদের সম্পর্কে নানা তথ্য। সেই সূত্র ধরে তারা কয়েক জন



মাওবাদীকে ধরেওছিল। আর তাতেই খোপে গিয়েছিল মাও দলের লোকেরা। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা কাঁপিয়ে পড়েছিল গ্রামবাসীদের উপর। যেখান থেকে গ্রামবাসীদের তুলে নিয়ে যেত পুলিশ, সেই হাটটাকেই টার্গেট করেছিল ওরা। হঠাৎ হঠাৎ চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে, গাছের আড়াল থেকে এলোপাখাড়ি গুলি চালিয়ে, ওরা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল ওদের বিরুদ্ধে চালানো যাবতীয় অভিযান। শুধু গ্রামবাসীই নয়, কত দোকানদার আর পুলিশকেও যে ওরা অপহরণ করেছিল, তার ঠিক নেই। যাদের অপহরণ করত, দু’-একদিন পরেই তাদের মুণ্ডুহীন ধড় কিংবা ক্ষতবিক্ষত দেহ মিলত কোনও না কোনও জলার ধারে কিংবা জঙ্গলের মধ্যে। দিনে-দিনে ওই হাটে যাওয়াটা এমন আতঙ্কের হয়ে দাঁড়াল যে, দোকানদাররা পর্যন্ত দোকানে যাওয়া ছেড়ে দিল। একে তো পুলিশের ধরপাকড়, তার উপরে মাওবাদীদের ফতোয়া জারি, ফলে পুরো হাটটাই একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

হাট বন্ধ হলেও এক দিকে পুলিশ আর অন্য দিকে মাওবাদী— দু’দিক থেকেই সাঁড়াশি আক্রমণ চলছিল। তার পাশাপাশি গোদের উপরে বিষফোঁড়ার মতো শুরু হল সদ্য গজিয়ে ওঠা সালওয়া জুড়ুম সদস্যদের অত্যাচার। যে অত্যাচার পুলিশ আর মাওবাদীদের চেয়েও বহু গুণ মারাত্মক এবং ভয়াবহ। যে কোনও বাড়িতে ঢুকে, সে বারো বছরের কিশোরীই হোক কিংবা বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যবয়সি, কোনও বাছবিচার করত না, মেয়ে পেলেই তুলে নিয়ে যেত। দেখতে সুন্দর হলে তো আর কথাই নেই। দিনেদুপুরে প্রকাশ্যে রাস্তায় ফেলে সবার সামনেই ধর্ষণ করত। অসহায় গ্রামবাসীরা মুখ বুজে সহ্য করত। কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করত না। করতে গেলেই, হয় গুলি, নয় কাতানের কোপে আলাদা করে দিত ধড় থেকে মুণ্ডু।

এই তো কিছু দিন আগে জোরো গ্রামে পরপর পঁচিশটা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তারা। কেউ এক মগ জলও দিতে পারেনি। একজন এক বালতি জল নিয়ে গিয়েছিল, তাকে ওরা রাস্তার উপর ফেলে এমন মার মেরেছিল, সাত দিন বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেনি। থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিল গ্রামের লোকেরা, মুখের উপরে পুলিশেরা বলে দিয়েছিল, হাট থেকে মাওবাদীদের জন্য চাল ডাল জামাকাপড় কিনে আনতে গেলে তার খেসারত তো দিতেই হবে।

তাই গ্রামের মেয়েরা পুলিশ বা মাওবাদীদের যত না ভয় পায়, তার চেয়ে



হাজার গুণ বেশি ভয় পায় সালওয়া জুড়ুম সদস্যদের। তাই কোনও জায়গায় বিচার না পেয়ে, সর্বত্র মার খেতে খেতে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই তারা মরিয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গড়ে তুলেছে ক্রান্তিকারী আদিবাসী মহিলা সংগঠন।

বিভিন্ন রাজ্যের যে ক'জন কবি দোতলার করিডরে চেয়ারে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন, আমি যত দূর জানি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে সালওয়া জুড়ুম অভিযুক্ত হয়েছিল। উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজ্য সরকার তো ওদের নিষিদ্ধও ঘোষণা করেছিল...

তাঁর কথা শুনে ওই রাজ্যের এক ডাকসাইটে কবি বললেন, হ্যাঁ, সালওয়া জুড়ুম অফিসিয়ালি নিষিদ্ধ হয়েছে ঠিকই, তবে ওরা বহাল তবিয়েই আছে। পুরোদস্তুর আছে। শুধু নামটা বদলে নিয়েছে। যারা নেতা গোছের ছিল, লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নিজস্ব দলবল নিয়ে তারা নিজেদের মতো এক-একটা দল গড়ে তুলেছে। কেউ নাম দিয়েছে জাগরণ মোর্চা, কেউ নাম দিয়েছে বিকাশ পরিষদ, আবার কেউ নাম দিয়েছে সমন্বয় সমিতি। নাম যা-ই দিক না কেন, ওরা কিন্তু তলে তলে ঠিক আছে। ওদের অত্যাচারও আছে। তাই আদিবাসীরা বাধ্য হয়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ তো ইদানীং কোনও উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত মাওবাদীদের সঙ্গেই গায়ে গা ঘষছে। হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে।

পাশ থেকে আর এক কবি বললেন, মাওবাদীদের মতো ওরাও তো এখন বলতে শুরু করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেয়ে বিদেশি দস্যুদের হাতে জল জঙ্গল জমি বিক্রি করে দেওয়ার সরকারি আমলাদের জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে শহিদের মৃত্যুবরণ করা অনেক ভাল। আমি নিজে ওদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওরা বলছে, চিদম্বরম তো কখনওই দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসার সদিচ্ছা দেখাননি। যদি তাঁর কথা এবং কাজের মধ্যে সামান্যতম মিলও থাকত, তা হলে দু'পক্ষের অস্ত্র সমর্পণের কথা ঘোষণার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে যৌথ বাহিনীকে দিয়ে নিরস্ত্র লালমোহন টুডুকে ও ভাবে হত্যা করা ত না। আবার ঘন জঙ্গলে যখন ওদের একটা হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল, তখন ওরাই তো সাহায্যের জন্য ছুটে গিয়েছিল বিশিষ্ট সমাজসেবী হিমাংশুর কাছে।

টানা সতেরো বছর ধরে দান্তেওয়াড়ার জঙ্গলে একটি আশ্রম চালাচ্ছিল সে। ও যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। কিন্তু তার পরিণাম কী হল? সি আর পি-রা এসে তাঁর আশ্রম একেবারে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিল। ওরা এখন বলছে, এই মুহূর্তে যে দু'লক্ষেরও বেশি কৃষক পরিবার ঋণে জর্জরিত হয়ে আছেন, তাঁদের কাছে এখন একটাই পথ খোলা, হয় আত্মহত্যা করে ওই ঋণ থেকে নিকৃতি পাওয়া, আর তা না হলে এই ষড়যন্ত্র, অকথা অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই করা। আপাতত তাঁরা নাকি পরের পথটাকেই বেছে নিয়েছেন।

বিভিন্ন কবির কাছে নানা কথা শুনতে শুনতে সে দিন ওদের ভোর হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে দুই কবি-বন্ধু ঠিক করেছিল, তারা আবার এখানে আসবে। তবে এই ডি জি পি-র তত্ত্বাবধানে নয়। একেবারে নিজেদের উদ্যোগে। অত্যন্ত সাদামাঠা আর পাঁচজন ছাপোষা মানুষের মতো। এখানকার সাধারণ মানুষ জনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবে। কেন জঙ্গলমহলের নাম শুনলেই লোকে আঁতকে ওঠে, সেটা একটু তলিয়ে দেখবে। আর বিভিন্ন লোকজন যা বলছে, তার কতটা সত্যি, আর কতটা গুজব, সেটাও খতিয়ে দেখবে।

সে দিনের সেই পরিকল্পনা মতো ওরা আজ এসে পৌঁছেছে দান্তেওয়াড়ার জেলা সদরে। এখানে আসতে তাদের প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। তাকে তাকে থাকতে হয়েছে অনেক দিন। খোঁজখবরও রাখতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। ওরা খবর পেয়েছিল, বেশ কিছু দিন ধরেই হাট বন্ধ। হাট বন্ধ বলে তো আর হাঁড়ি বন্ধ হতে পারে না। তাই সরকারি উদ্যোগে বছরে অন্তত দু'বার একশোরও বেশি ট্রাক বোঝাই করে যৌথ বাহিনীর জওয়ানরা একেবারে নিরাপদ বেষ্টিতনে ঘিরে ওখানকার আদিবাসীদের জন্য খাবারদাবার নিয়ে যায়।

ওরা অপেক্ষায় ছিল। সুযোগ বুঝে, সে রকমই এক ট্রাক চালকের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে হেল্লারের ছদ্মবেশে ওরা উঠে পড়ল একটি ট্রাকে।

যেতে যেতে ড্রাইভারের মুখে শুনল, ভোটের সময় পশ্চিমবঙ্গের মতো ওদের ওখানেও, প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশরা নাকি রাস্তা থেকে ট্রাকগুলি আটক করে ওখানে রসদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য রীতিমত জোর জুলুম করে, তাদের এই মৃত্যুপথে ঠেলে দেয়।

ড্রাইভার দুঃখ করে আরও বললেন, পুলিশের জওয়ান বা প্রশাসনিক কর্মীদের কোনও বিপদ হলে, রাজ্য সরকার ওদের ক্ষতিপূরণ দেয়। কিন্তু আমাদের জন্য ক্ষতিপূরণ তো দূরের কথা, সামান্য বিমাও করে না। আমাদের কোনও বিপদআপদ হলে, আমাদের বউ ছেলেমেয়েরা তো পথে গিয়ে বসবে।

— আপনারা কাউকে জানাননি এ কথা?

— কেন জানাব না? বারবার জানিয়েছি। কিন্তু কেউ শুনলে তো।

থম মেরে গেল অহিতান্নি। কবি সম্মেলনে আসার সময় যে সোজা পথ দিয়ে ওরা গিয়েছিল, এটা সে পথ নয়। ও সব পথে নাকি মাইন পোঁতা থাকে। তাই প্রশাসনের নির্দেশেই ওরা ঘুরপথে যাচ্ছে। এ পথও যে খুব নিরাপদ, সে কথাও হলফ করে বলা যায় না। আর সেটা বলা যায় না দেখেই, যৌথ বাহিনীর জওয়ানরা কাঁধে পুরো লোড করা এস এল আর নিয়ে জিপে বসে তাক করে আছে ডানে, বাঁয়ে, সামনে। ওরা সদা সতর্ক। জিপ চলছে খুব আস্তে আস্তে। ওদের পিছু পিছু একই ভাবে ধীর গতিতে চলেছে রসদ বোঝাই সার সার ট্রাক।

রাস্তাঘাট খুব খারাপ। একেবারে নরম মাটি। তার উপরে এখানে-সেখানে গর্ত। কয়েকটা ট্রাক যাওয়ার পরেই রাস্তা দেবে যাচ্ছে। ফলে পরের ট্রাকগুলিকে আরও সাবধানে যেতে হচ্ছে। গত বছর নাকি পাকা সড়ক তৈরির জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। কিন্তু যে বেসরকারি ঠিকাদার কাজ শুরু করার জন্য পনেরো কোটি টাকা অগ্রিম পেয়েছিলেন, মাওবাদীরা নাকি তাঁকে কাজ না করার জন্য বারবার হুমকি দিচ্ছে, প্রাণনাশের ভয় দেখাচ্ছে, এই অজুহাত দেখিয়ে তিনি তল্লিতল্লা গুটিয়ে, প্রাণের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। অফিস পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রশাসনের খাতায় তিনি আজও বেপান্ডা। হৃদিশ নেই ওই পনেরো কোটি টাকারও। তবে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, ওই ঠিকাদার নাকি আসলে বিশ্বরঞ্জনেরই শ্যালক। বিশ্বরঞ্জনের তৎপরতাতেই নাকি তিনি ওই বরাত পেয়েছিলেন। আর এখন বিশ্বরঞ্জনের বাড়িতেই বহাল তব্বিতে আছেন। স্বয়ং ডি জি পি-র শ্যালক বলে ওই টাকা উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের কর্তব্যব্যক্তিরূপে খুব একটা গা করছেন না। এটা যে নিন্দুকদের নিছক রটনা নয়, সেটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, যখন ওই কবি সম্মেলনের ফাঁকে সেরা সমাজসেবী হিসেবে তাঁর ওই শ্যালকের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছিল স্বর্ণপদক।

নব্বই কিলোমিটার আসতেই ওদের লেগে গেল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। শহরতলি সুকুমায় পৌঁছে সকলেই একটু বিশ্রাম নিল। প্রচুর ধকল গেছে ওদের। যত না শরীরের উপর দিয়ে, তার চেয়ে ঢের বেশি মনের উপর দিয়ে। কারণ, সারাক্ষণই তাদের তটস্থ থাকতে হয়েছে, কখন কী হয়, কিছুই বলা যায় না। তবে একটা বাঁচোয়া, তারা যে কোনও সময় মারা যেতে পারে ঠিকই, কিন্তু আগে পিছে যে ভাবে যৌথ বাহিনীর জওয়ানরা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে আর যাই হোক, তাদের কিডন্যাপড হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এটা ভাবতে গিয়ে এ রকম অবস্থাতেও নিজের মনেই ফিক করে হেসে ফেলল তিয়াস।

সুকুমায় তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে ওরা আবার রওনা হল। সামনের চল্লিশ কিলোমিটার নাকি আরও বিপজ্জনক। যে কোনও সময় মাইন বিস্ফোরণে উড়ে যেতে পারে ট্রাক। ঝাঁক ঝাঁক গুলি এসে বিদ্ধ করে দিতে পারে তাদের। ভয়ে বুক দুরু দুরু করছে। পা কাঁপছে। তার উপরে সড়ক প্রায় নেই বললেই চলে। এই রাস্তাটাই নাকি সোজা ছত্তীসগড় অঙ্কপ্রদেশ জাতীয় সড়কে গিয়ে মেশার কথা ছিল। কিন্তু মাওবাদীরা হুমকি দেওয়ায় এক ফোঁটাও কাজ এগোয়নি। একে তো খারাপ রাস্তা, তার উপরে কোথায় মাইন পোঁতা আছে, কেউ জানে না। তাই সন্দেহ হলেই জিপ থেকে নেমে মাঝে মাঝেই মাইন ডিটেক্ট করতে করতে জওয়ানরা এগোচ্ছে। ফলে ট্রাকগুলিকেও অত্যন্ত ধীরে, প্রতি ইঞ্চি মেপে মেপে এগোতে হচ্ছে। দোরনাপালে পৌঁছতেই ওদের লেগে গেল বারো ঘণ্টারও বেশি।

গাড়ি ঠিক মতো চললে বোঝাই যেত না কতটা পথ যাচ্ছে। কিন্তু এ ভাবে শামুকের মতো ধীর গতিতে চলা ট্রাকের ভিতরে বসে থাকতে থাকতে অহিতাগ্নি আর তিয়াসের হাত-পা লেগে যাওয়ার জোগাড়। তাই সবার মতো ওরাও দোরনাপালের একটি পুলিশ ক্যাম্পের সামনে নামল। ফের বিশ্রাম। এ বারও ওই ঘণ্টা চারেকেরই। তবে বিশ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি, তা নয়। এখানে বিশ্রাম মানে সারাক্ষণই মৃত্যুভয়ে কুঁকড়ে থাকা। কোথা থেকে যে কী হবে, এক মুহূর্ত আগেও কেউ টের পাবে না। সবার চোখেমুখেই তাই ভয়ানক এক ভয় জেঁকে বসে আছে।

আরও নব্বই কিলোমিটার গেলে অহিতাগ্নি আর তিয়াস পৌঁছতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল— জগরগুন্ডায়। কিন্তু যে পথ দিয়ে তারা যাবে, সে পথে

প্রতি পদে পদে এতই বিপদ ওত পেতে আছে যে, স্থানীয় প্রশাসনের গ্রিন সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত তারা এক পা-ও এগোতে পারবে না।

অবশেষে অনুমতি এল। এ পথটা আরও ভয়ঙ্কর। সবার প্রথমে যৌথ বাহিনীর জওয়ানেরা পায়ে হেঁটে ল্যান্ডমাইন ডিটেক্ট করতে করতে এগোচ্ছে। তার পেছনে লং মার্চ করছে কিছু জওয়ান। তারও পেছনে আগের চেয়েও ধীরে ধীরে চলছে রসদবাহী কনভয়। যেন পিঁপড়েরাও হেঁটে গেলে ওদের ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু একটুখানি এগোতে না এগোতেই হঠাৎ কোথা থেকে শ'পাঁচেক লোক ছুটে এল। কথা নেই বার্তা নেই, হুড়মুড় করে ট্রাকের গায়ে, মাথায়, পেছনে উঠে পড়ল।

প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল তিয়াস। কিন্তু ড্রাইভার এবং যৌথ বাহিনীর জওয়ানদের কোনও হেলদোল না দেখে একটু আশ্বস্ত হল সে। এরা কারা? জিজ্ঞেস করতেই ট্রাক চালক বললেন, এরা জগরগুন্ডার লোক। খাবারদাবারে টান পড়লে ওখানকার মানুষেরা এখানে এসে রসদ বোঝাই ট্রাকগুলির জন্য হা-পিতোশ করে পথ চেয়ে বসে থাকে। মাস ছয়েক আগে শেষ যে বার জগরগুন্ডায় রসদ গিয়েছিল, যৌথ বাহিনীর লোকেরা চলে আসতেই আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে থাকা মাওবাদীরা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল অর্ধেকেরও বেশি। আরও কিছুটা জোর-জবরদস্তি তুলে নিয়ে গিয়েছিল সালওয়া জুড়ুমের সদস্যরা। ফলে শেষ পর্যন্ত যেটুকু রসদ পড়েছিল, তাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের বেশি দিন চলেনি। ফলে চাল ডাল কেনার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকলেও বাজারে জোগান না থাকায় শাক পাতা খেয়েই কোনও রকমে অতি কষ্টে দিন গুজরান করতে হচ্ছিল ওদের। তাই অনেকেই জগরগুন্ডা ছেড়ে ঘাঁটি গেড়েছিল এখানে। এ বার নাকি তিন সাড়ে তিন মাস ধরে ওরা অপেক্ষা করছিল শুধু মাত্র এই ট্রাকগুলির জন্য। প্রতিবারের মতো এ বারও ওরা এই ট্রাকে করেই জগরগুন্ডায় ফিরে যাবে। পুলিশ প্রশাসন সবাই ওদের কথা জানে। বেশির ভাগ লোককে চেনেও। তাই ওদের আর কাউকেই বারণ করে না জওয়ানেরা।

আগের বার কবি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য যে পথ দিয়ে ওরা গিয়েছিল, এটা নাকি সেই পথ নয়। চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। আগে বোধহয় পায়ে হাঁটা পথ ছিল এটা। মাঝেমধ্যে গরুর গাড়ি আর দু'-চারটে ট্রাক্টর যাতায়াত করতে করতে খানিকটা পথের মতো চেহারা নিয়েছিল।



এখন মাঝেসাঝে জিপটিপ যায়। সেই পথটাই ধরেছে ওরা। এটা নাকি প্রধান রাস্তার থেকে অনেক বেশি নিরাপদ। আর এই পথ ধরার জন্যই একটু বেশি ঘুরতে হচ্ছে তাদের। তাই সময়ও লাগছে একটু বেশি। এর মধ্যেই কী করে যেন আঠারো-উনিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে! এখনও নাকি ছ'-সাত ঘণ্টার রাস্তা।

গভীর রাত। দু'দিকেই গভীর জঙ্গল। ট্রাকের জোরালো আলোয় ল্যান্ড মাইন খুঁজতে খুঁজতে পিছিয়ে পড়েছিল যৌথ বাহিনীর এক জওয়ান। তিয়াস জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তার সঙ্গে কথা না বললে, ও জানতেই পারত না, সে একজন বাঙালি। তার কাছেই ওরা জানতে পারল, গোটা জঙ্গল জুড়েই ল্যান্ড মাইন পাতা। এই মাইন-সাগর রাতারাতি নিষ্ক্রিয় করার মতো প্রযুক্তি নাকি প্রশাসনের হাতে নেই। তা ছাড়া কোন জায়গাটা ল্যান্ড মাইন অধ্যুষিত আর কোনটা নয়, সেটা ঠিক করতেই কালঘাম ছুটে যাচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর। যেতে যেতে কখন যে কোন গাড়ি হঠাৎ উড়ে যাবে, ঠিক নেই। গাড়ি বা ট্রাক থেকে সিভিলিয়ানদের নামাও বারণ। কারণ, এখানে পায়ে পায়ে বিপদ। বলা যায় না, গাড়ি থেকে নামলেই হয়তো কোনও গাছের আড়াল থেকে শুরু হয়ে যাবে অ্যান্শুশ ফায়ারিং।

ওই জওয়ান আরও বলল, এই তো গত মাসে দান্তেওয়াড়া থেকে বিজাপুরের মধ্যে তিনটি আলাদা আলাদা ঘটনায় কমপক্ষে তিরিশ জন সি আর পি এফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আর ওই তিনটেই হয়েছে মাইন বিস্ফোরণে।

— তা হলে সরকার কী করছে? ওই জওয়ানকে প্রশ্ন করেছিল অহিতাগ্নি।

সে বলেছিল, কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ে মিলে যৌথ বাহিনী গড়লেও, যেহেতু এখানে রাজ্য সরকারের অঙ্গুলি হেলেনেই সব কিছু হয়, তাই আমার ধারণা, মুখে যতই বলুক, রাজ্য সরকার কিন্তু মন থেকে কিছুতেই চায় না এখানে মাও দমন হোক। বরং আমার তো মনে হয়, এই সরকার চায়, মাওবাদীরা থাকুক। তাতে তাদেরই সুবিধে। যে কোনও সময় যে কোনও ঘটনা ঘটিয়ে মাওবাদীদের নামে চালিয়ে দেওয়া যাবে...

জওয়ানটি ফের ল্যান্ড মাইন ডিটেক্ট করার জন্য রাস্তার ধারে চলে যেতেই তিয়াস বলল, ওই দ্যাখ, রাস্তার দু'ধারে কী সুন্দর ছোট ছোট ঘাসফুল ফুটেছে।



ট্রাকটার দরজার ধারে বসেছিল তিয়াস। তিয়াস আর ড্রাইভারের মাঝখানে অহিতাগ্নি। ট্রাকটা এত আশ্বে আশ্বে যাচ্ছে যে, বোঝাই যাচ্ছে না, ট্রাকটা যাচ্ছে, না, দাঁড়িয়ে আছে। সেই ট্রাকের হেডলাইটের তীক্ষ্ণ আলো ঠিকরে পড়েছে সামনে। তারই ছটায় চার পাশ আলোয় আলোকিত। সামনের জওয়ানরা ল্যান্ড মাইন ডিটেক্ট করতে করতে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। ওরা জানে না, কোথায় মাইন পোঁতা আছে। আদৌ আছে কি না, তাও জানে না। তিয়াস ঘাসফুলের কথা বলতেই অহিতাগ্নির দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রাস্তার ধারে। দেখল, সত্যিই, মেঠো পথের দু'ধারে তন্নতন্ন করে মাইন খুঁজতে থাকা জওয়ানদের বুটের তলায় চাপা পড়ে গেলেও, ওরা পা সরাতেই ফের কী সুন্দর মাথা তুলে খিলখিল করে হেসে উঠছে ঘাসফুলগুলি।

তিয়াস বলল, যেখানে এ রকম সুন্দর রঙচঙে ঘাসফুল ফোটে, সেখানে লোকে মাইন পোঁতে কী করে! ওদের চোখে কি এগুলো পড়ে না!

তিয়াস বলল, জানি না। তবে ঘাসফুল যখন ফুটতে শুরু করেছে, ওদের নজরে একদিন না একদিন পড়বেই। আর এগুলো একবার চোখে পড়লে, ওরা থমকে দাঁড়াবেই।

অহিতাগ্নি বলল, তাই!

ওরা কথা বলছিল। কথার মধ্যে মশগুল হয়ে থাকলেও গাড়ির চলন দেখে দু'জনেই আচমকা বুঝতে পারল, ট্রাকটার গতি আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। তাই অহিতাগ্নির মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, আমরা কি তা হলে বিপদসীমা পেরিয়ে এলাম!

ট্রাকচালক বলল, হ্যাঁ। এই তো জগরগুন্ডা। বলেই, স্টার্ট বন্ধ করে দিল। চালকের দিকে তাকিয়ে তিয়াস বলল, কই, উগ্রপন্থীদের কোনও টিকি দেখতে পেলাম না তো...

ট্রাকচালক বলল, সবই তাঁর ইচ্ছে।

উপরের দিকে তাকিয়ে তার বলার ধরন দেখে অহিতাগ্নি বুঝতে পারল, ও ঈশ্বরের কথা বলছে। তবু জিজ্ঞেস করল, কার?

ট্রাকচালক বলল, কেন, এখানকার ডি জি পি-র।

তার কথা শুনে ওরা দু'জনেই থ' হয়ে গেল।



## মিল অমিল

ডায়েরি খুলে বাঁ দিকের পাতার একদম উপরে আর্থা লিখল— মিল। আর ডান দিকের পাতার উপরে লিখল— অমিল। তার পর ওর সঙ্গে সাতকির কী কী মিল, তা এক দুই তিন নম্বর দিয়ে দিয়ে ও লিখতে শুরু করল। মিল লেখাটার নীচে।

ও আইসক্রিম ভালবাসে। সে-ও। ওর নীল রং পছন্দ। তারও। ওর নিরিবিলি জায়গা ভাল লাগে, তারও তাই। এই ভাবে একের পর এক ওর সঙ্গে তার যা যা মিল মনে পড়ল, ও লিখতে লাগল। তার পরে লিখল ওর কী কী তার ভাল লাগে। ওর হাসিটা খুব মিষ্টি। অনেক সময় ভাল না লাগলেও ও সব কিছু খুব সহজে মানিয়ে নিতে পারে। যেখানেই দেখা করার কথা থাক না কেন, হাজার কাজ থাকলেও ও সব সময় আগে এসে দাঁড়ায়। বলে, তোমার ভালবাসার চেয়ে আমার ভালবাসার টান অনেক বেশি। তাই আমি সব সময় আগে আসি। সে কথা শুনে, আর্থা বহু বার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, তার ভালবাসার টানও কোনও অংশে কম নয়। কিন্তু যত বারই ও আগে গেছে, গিয়ে দেখেছে; তার বহু আগেই ও এসে হাজির। ওর আর একটা বড় গুণ, ওর মনে কোনও জিলিপির প্যাঁচ নেই।

আর কী! আর কী! আর কী! ওর সঙ্গে তার আর কী কী মিল আছে বা ওর আর কী কী তার ভাল লাগে, এই মুহূর্তে তার আর মনে পড়ছে না। ঠিক করল, পরে যদি মনে পড়ে, তখন লিখবে। তার চেয়ে বরং, তার সঙ্গে ওর কী কী অমিল বা তার কী কী ওর পছন্দ নয়, সেগুলো যে কাটা এখন মনে পড়ছে, ও লিখে ফেলবে। তাই ডান দিকের পাতায় অমিল-এর নীচে আর্থা লিখল— ও একালবতী পরিবারে বড় হয়েছে। বিয়ের পরেও ওর বাবা-মায়ের সঙ্গেই ও থাকতে চায়। সেটা ওর একদম পছন্দ নয়। যাকে কোনও দিন দেখেনি, জানে না, চেনে না, সেই বাড়িতে বিয়ে করে যাচ্ছে বলে,

আচমকা একজন ভদ্রমহিলাকে ‘মা’ বলে ডাকতে হবে, এ কী কথা! ছিঃ। ওর হাতে আবার একগাদা আংটি। খুব ভাল কথা। হঠাৎ বিপদ-আপদ হলে ওগুলো কাজে লাগতে পারে ঠিকই, কিন্তু তা বলে অত শিকড়বাকড় পরতে হবে! এই বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কেউ এ সব বিশ্বাস করে? খুব মনে আছে, সে দিন রাত্তার ধারে একটা বিড়ালছানাকে কুঁইকুঁই করতে দেখে, ও তাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। চায়ের দোকান থেকে ভাঁড়ে করে দুধ কিনে এনে খাইয়েছিল। তার পরে কোথায় ওকে ছাড়বে, তা নিয়ে ওর সে কী চিন্তা! আশেপাশে কোনও কুকুর নেই তো? হাঁটতে হাঁটতে আবার গাড়ির রাস্তায় চলে যাবে না তো! তার পরে সামনে বাজারে গিয়ে মাছের পটিতে ওকে ছেড়ে দিয়ে আসে।

কোনও মানে হয়! সপ্তাহে একদিন কি দু’দিন দেখা হয়, তাও মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। আর সেই সময়টা কেউ এ ভাবে নষ্ট করে! ওর এ সব একেবারে ভাল লাগে না। আর অপছন্দ? কেউ কখনও শুনেছে যে, বাবা-মাকে ছেড়ে দূরে থাকতে হবে বলে কেউ প্রোমোশন নিতে চায় না? কোনও ছেলের সঙ্গে একটু হেসে হেসে কথা বলতে দেখলেই ওর মুখ গোমড়া হয়ে যায়। কী সব সাত-পাঁচ ভাবে। অথচ নির্জন জায়গায় কাছাকাছি হলেও হাত ছোঁওয়া বা এক আধটা চুমুর বেশি ও এগোতেই সাহস পায় না। এত ভিত্ত! ওর আর কী কী পছন্দ নয় তার? তালিকাটা একটার পর একটা বাড়তেই লাগল।

মাস ছয়েকও হয়নি শিশির মঞ্চে একটা অনুষ্ঠানে অ্যাক্টিং করতে গিয়ে সাত্যাকির সঙ্গে পরিচয় হয় আর্যার। সাত্যাকি দীর্ঘ দিন ধরে আবৃত্তি করছে। ইদানীং অ্যাক্টিং করছে। এক বছরও হয়নি একটা টিভি চ্যানেলে কাজ করছে। বছর পঁচিশেক বয়স। দক্ষিণ কলকাতায় দু’পুরুষের বাস। দেখতে শুনতে মন্দ নয়।

আর্য্য থাকে সল্টলেকে। তেরো নম্বর ট্যাক্সের কাছে। ছোটবেলায় ছবি আঁকা শিখত। ফাইভে উঠে নাচে ভর্তি হয়। মাস ছয়েক গানেরও তালিম নিয়েছিল। কিন্তু কোনওটাতেই তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। শেষে কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে এক সহপাঠীর দেখাদেখি, সেও ভর্তি হয় অ্যাক্টিংয়ের একটা কোর্সে। ছ’মাসের কোর্স। কোর্স শেষ হওয়ার পরে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার জন্য ওই প্রতিষ্ঠানই আর পাঁচ জন ছাত্রছাত্রীর মতো তাকেও কয়েকটি জায়গায় সহ-অ্যাক্টিং করার সুযোগ করে দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল শিশির

মঞ্চের ওই অনুষ্ঠানটি। বয়স আঠারো কি উনিশ। হলদেটে ফরসা। গোলগাল। মুখশ্রীও বেশ ঢলঢলে। যে-কোনও ছেলের নজরে পড়ার মতো দেখতে।

শিশির মঞ্চের সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎ বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটে। সারা প্রেক্ষাগৃহ একেবারে ঘুরঘুটি অন্ধকার। অনেকেই তাঁদের মোবাইল অন করে দেন। কিন্তু সেই আলো কোনও কাজে আসে না। হল ভর্তি লোক। কোন লোক কেমন, বলা মুশকিল। যে-কোনও সময় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা সামলে নেয় সাত্যকি। মঞ্চে উঠে খালি গলায় কথার জাদুতে দর্শকদের সে এমন মাতিয়ে রাখে যে, জেনারেটর চালু করে আলো জ্বালাতে জ্বালাতে হল-কর্ভপক্ষের যে দশ-বারো মিনিট সময় লেগেছিল, সেই সময়টা ও যে কী করে পার করে দিয়েছিল, কেউ বুঝতেই পারেনি। ও রকম পরিস্থিতির অমন সামাল দেওয়া দেখে আয়োজকেরা অবাক। অবাক হয়েছিল আর্থাও। কারণ, এমন সিচুয়েশনে পড়লে কী করতে হবে, সে কথা তার অ্যাক্সরিং সিলেবাসের মধ্যে কোথাও বলা ছিল না। এমনটা যে হয়, হতে পারে, এটা কেউ তাকে বলেওনি। সত্যিই এটা তার একটা বড় অভিজ্ঞতা। আর্থা ওর প্রশংসা না করে পারেনি। সে দিনই অনুষ্ঠানের শেষে ওদের মধ্যে ফোন নম্বর দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল।

সেই থেকে আলাপ। ফোনাফুনি এবং দেখা করা। এবং দ্রুত একজন অন্য জনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। আর এই জড়িয়ে পড়ার কথাটা আর্থা কারও কাছে লুকোয়ওনি। বন্ধুবান্ধবদেরও বলেছিল।

সব শুনে ওর এক বন্ধু বলেছিল, মেশ। কিন্তু দেখেশুনে মেশ। এখন আমাদের পড়াশোনা করার সময়। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। অন্য দিকে সময় নষ্ট করলে জানবি, আখেরে নিজেরই ক্ষতি। তার উপরে তুই যা বলছিস, তাদের দু'জনের মধ্যে কোনও মিলই নেই, তুই চাস বিয়ের পরে আলাদা থাকতে। অথচ ও চায় বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতে। তুই যেটাকে কুসংস্কার বলিস, ও সেটাকেই সংস্কার মনে করে। তুই চাস হই-হুল্লোড় করে জীবন কাটাতে, আর ও চায় শান্ত দিঘির মতো থাকতে। কী করে দু'জনে একসঙ্গে থাকবি বল?

— তা হলে কী করব বল তো? জিজ্ঞেস করেছিল আর্থা।

বন্ধুটি বলেছিল, এক কাজ কর। দুটো কাগজ নে। একটা কাগজে লেখ, তোর সঙ্গে ওর কী কী মেলে, ওর কী কী তোর ভাল লাগে, সে সব। আর

অন্য কাগজটায় লেখ, তোর সঙ্গে ওর কী কী অমিল। ওর কী কী তোর পছন্দ নয়, সে সব। তার পরে দ্যাখ, কোন দিকের পাল্লাটা ভারী। যদি দেখিস, মিলটাই বেশি, তখন এগোবি। আর যদি দেখিস, অমিল বেশি, তখন না হয় সরে আসবি।

— এত দিন মেশার পরে সরে আসব?

— কত দিন হয়েছে?

— প্রায় ছ'মাস।

— ছ'মাস? ধুস, প্রেমের ক্ষেত্রে ছ'মাস আবার কোনও সময় নাকি?

— কিন্তু কী করে বলব?

— সবাই যে ভাবে বলে, সেই ভাবে বলবি। বলবি, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আমাদের রিলেশনটা বোধহয় আর টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কিছু মনে কোরো না। আমরা বরং আজ থেকে খুব ভাল বন্ধু হয়ে থাকব, কেমন?

— ও রাজি হবে?

— বুদ্ধিমান ছেলে হলে হবে।

— যদি রাজি না হয়?

— তখন একটু কড়া হবি।

— তাতেও যদি না দমে?

— দেখা করবি না।

— ফোন করলে?

— ধরবি না।

— যদি কলেজের গেটে এসে দাঁড়ায়?

— ইগনোর করবি। ক'দিন দাঁড়াবে?

— যদি জোরাজুরি করে?

— ওর বাড়িতে ফোন করে বলবি, আপনাদের ছেলে আমাকে বিরক্ত করছে, ওকে সামলান।

— সেটা কি ঠিক হবে?

— সেটা পরের কথা। আগে দ্যাখ, কোনটা বেশি, মিল না অমিল।

ওই বন্ধুর কথা মতোই ও তালিকা তৈরি করতে বসেছে। ডায়েরির এক দিকের পাতায় পরপর লিখে যাচ্ছে মিল, আর অন্য দিকের পাতায় অমিল।

অমিল লিখতে লিখতে মিল পেয়ে গেলেই, পাছে ভুলে যায়, তাই চট করে মিলের পাতায় গিয়ে সেটা লিখে ফেলছে। মিল লিখতে লিখতে অমিল মনে পড়লেই, অমিল চলে যাচ্ছে অমিলের পাতায়। এই ভাবে লিখতে লিখতে আর্থা দেখল, ওর সঙ্গে সাতকির মিল এক পাতার মধ্যেই আটকে গেছে। অথচ অমিলগুলো একের পর এক বেড়েই যাচ্ছে। দ্বিতীয় পাতা ছেড়ে তৃতীয় পাতার শেষ প্রান্তে এসে ঠেকেছে। তার পরেও একটা একটা করে এখনও অমিল মনে পড়ছে।

তা হলে কী হবে! ও কি সাতকিকে 'না' করে দেবে! না করে দিলে তো তারই ক্ষতি। ও যেটায় অনেকখানি সাবলীল হয়ে উঠেছে। ও যেটা সতি সতিই করতে চায়, সেটা হল আক্ষরিং। সাতকির সঙ্গে থাকলে ও আরও অনেক কিছু শিখতে পারবে। জানতে পারবে। বুঝতে পারবে। অনেক বেশি সুযোগ পাবে। এ লাইনে সাতকির বহু দিনের অভিজ্ঞতা। যতই বলি না কেন, আমরা আজ থেকে বন্ধ হয়ে থাকব, কিন্তু একবার প্রেম ভেঙে গেলে কি কেউ আর পাশে থাকে?

আচ্ছা, আমি যে ভাবে আমার সঙ্গে ওর কী কী মিল আর কী কী অমিল, সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, ওর সঙ্গে আর এগোব কি না, আমার বাবা-মা বা তাঁদের বাবা-মায়েরা কি এ ভাবেই সিদ্ধান্ত নিতেন? আমি তো শুনেছি, আমার ঠাকুমার নাকি বিয়ে হয়েছিল মাত্র সাত বছর বয়সে। পিঁড়িতে নয়, কাঁসার থালায় বসিয়ে যখন তাঁদের শুভদৃষ্টি করানো হচ্ছিল, তিনি নাকি তখন ঘুমে ঢলে ঢলে পড়ছিলেন। তাঁরা কি সুখী হননি? সব কিছু কি হিসেব করে হয়? আমার সঙ্গে তো ওর তবু কয়েকটা মিল আছে, যাদের কোনও মিল হয় না, তারা কী করে?

আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না! আমার সঙ্গে ওর যেখানে যেখানে অমিল, সেগুলোকে যদি একটু একটু করে মিলের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারি, তা হলে কেমন হয়? নাহয় বিয়ের পরে ওর বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকলাম। তাতে অসুবিধে কী? মা-বাবারা কি ছেলে-বউয়ের ক্ষতি চায়? না হয় ও ক'টা শিকড়বাকড় পরলই, কারও বিশ্বাসে আমি আঘাত করতে যাব কেন? নাহয় ও একটু ভিত্তিই হল। ভয় পাওয়া ভাল। খারাপ কাজ করতে যাওয়ার আগে হাজার বার ভাববে। ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াবে। তার পরেও যদি ভয় পায়, যে কাছে থাকবে, তাকেই তো জড়িয়ে ধরবে, না কি? আর



ওর কাছে কে থাকবে? সে তো আমিই। তা হলে সমস্যা কোথায়?

তার পর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। এতক্ষণ ধরে মিল-অমিলের তালিকা লেখা পাতাগুলো ডায়েরি থেকে ঝট করে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিল আর্থা। আর তখনই বেজে উঠল ওর মোবাইল ফোন। সাত্যকির। — কী করছ?

আর্থা বলল, কিছু না। তোমার কথাই ভাবছিলাম।

— মনে আছে তো? চারটের সময় নন্দনের সামনে?

— অফিস নেই?

— আজকে তো নাইট।

— ওঃ হো...

— ঠিক সময়ে চলে এসো কিন্তু।

— হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ, তুমি আবার দেরি কোরো না যেন।

— কেন? কোনও দিন করেছি নাকি?

— না।

— তবে?

— ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। মোবাইল অফ করে আর্থা দেখল, ঘড়িতে একটা কুড়ি। রেডি হতে হতে আড়াইটে। তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ঘন ঘন বাস। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে বাস পেয়ে গেলে এক্সাইডের মোড়ে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে তিনটে। খুব বেশি হলে পৌনে চারটে। তার পরে মিনিট পাঁচেক হাঁটা। আজ ও আগেই যাবে। সাত্যকির আগে। সাত্যকিকে ও আজ একেবারে চমকে দেবে। প্রমাণ করে দেবে, এখন তার ভালবাসার টান ওর চেয়েও ঢের বেশি। তবে তার আগে আর একটা কাজ তাকে করতে হবে। এখন তো খুব তাড়া, তাই এখন নয়, বাসে উঠেই সেই কাজটা সারতে হবে। ওই বন্ধুটিকে ফোন করে বলতে হবে, তোর কথা মতোই মিল আর অমিলের হিসেব করতে গিয়ে দেখলাম, মিলের পাল্লাটাই বেশি। তাই এখন ওর কাছেই যাচ্ছি। ওর কাছেই।

## ৪৯ মৌ-পিউল

আর যুবতী বলা যাবে না মৌকে। প্রৌঢ়ত্ব পা দিয়েছেন। তাও প্রায় অনেক দিন হয়ে গেল। রেল লাইনের পাটাতনে পা ফেলে ফেলে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোচ্ছেন। জায়গাটা খুব নিরিবিলা। দূরে দূরে গ্রাম। শহর থেকে খুব বেশি দূরে না হলেও এ জায়গাটা এখনও গ্রামই। আর গ্রাম যখন, তখন ট্রেনও নিশ্চয় অনেকক্ষণ পর পর আসে। আসার সময় দিনের বেলাতেই এক ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। আর এখন তো রাত। অবশ্য টিকিট কাটার ঝামেলা নেই। ফেরার টিকিট একবারেই কেটে নিয়েছিলেন তিনি। স্টেশনটাও খুব ফাঁকা ফাঁকা। লোকজন প্রায় নেই বললেই হয়। প্ল্যাটফর্মে ওঠার আগেই ওঁর চোখে পড়ল, ও পারে একটা রাধাচূড়া। উনি মনে মনে বললেন, বাঃ, রাধাচূড়া গাছটা তো ভারী সুন্দর। বহু দিন পর এ রকম ফুলে ফুলে ভরা গাছ দেখলাম। যাই, গাছটার নীচে, ওই বেঞ্চটায় গিয়ে বসি। উনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

বসতে না বসতেই মাইকে ঘোষণা। ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না কী বলছে। ভীষণ নয়েজি। শুধু এটুকু বুঝতে পারলেন, কোন ক্রসিংয়ে যেন ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে কখন ট্রেন আসবে তার কোনও ঠিক নেই। এ রকম অভিজ্ঞতা এর আগেও তাঁর বহু বার হয়েছে। সেমিনারে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে প্রায়ই এ-দিকে ও-দিকে যেতে হয়। রাতও হয়। নাইয় আজ একটু রাতই হবে। কেউ তো বলার নেই। এ সব তাঁর এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া তাঁর শরীর জুড়িয়ে দিল। চোখ বুজে এল তাঁর। চোখ খুলতেই তাঁর মনে হল, এই স্টেশনটা যেন কেমন, অন্য স্টেশনের মতো নয়, অনেক শান্ত, নির্জন, ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনও কম। এমন সময় তিনি দেখলেন, একটা লোক পায়ে পায়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন।

লোকটি একদম কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ট্রেন আসছে, কিছু বলেছে?

মৌ বললেন, না, ট্রেনটা নাকি কোন ক্রসিংয়ে আটকে আছে।

— কোন ক্রসিংয়ে?

— ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার পর মৌ নিজেই প্রশ্ন করলেন, এখানে ঘোষণা-টোসনা ঠিক মতো করে তো?

বেঞ্চের ও ধারে বসতে বসতে লোকটি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, করবে না কেন? তবে মাইকটা অনেক দিন ধরেই খারাপ। আমি তো মাঝে মাঝেই আসি। আপনি নতুন বুঝি?

মৌ বললেন, হ্যাঁ, আমি এখানে এই প্রথম এলাম।

— এই প্রথম? ও। এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভাল।

চার পাশে তাকাতে তাকাতে মৌ বললেন, তাই বুঝি?

লোকটা বললেন, হ্যাঁ, আমি তো এই জায়গাটাকে এত ভালবেসে ফেলেছি যে, প্রায়ই চলে আসি। বিশেষ করে এই দিনটায়, এই গাছটার তলায় বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিই। আসলে এই গাছটাকে আমি ভীষণ ভালবাসি।

মৌ একটু অবাক হয়ে উপরে গাছটার দিকে তাকালেন, এই গাছটাকে?

— হ্যাঁ। ওর সঙ্গে কথা বলি। গল্প করি। ও সব বোঝে। চুপটি করে শোনে।

মৌ আরও অবাক। পাগল-টাগল নাকি! কী বলছে লোকটা! গাছ কথা শোনে! নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন তিনি। লোকটা তখনও বলে চলেছেন— ও তো সব জানে। সব কিছুর সাক্ষী। সে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন কলেজে পড়তাম। কয়েক জন বন্ধু মিলে একদিন ঠিক করলাম, আমরা গ্রাম দেখতে বেরোব। আমি, গীতি, তরু, কাকলি, নশ্রতা, সোনম আরও একজন ছিল...

লোকটার কথা শুনে মৌয়ের যেন কেমন লাগল। লোকটা যে নামগুলি বলছে সেগুলি ওর খুব চেনা চেনা। কিছু কিছু মনেও পড়তে লাগল তাঁর। উনি বললেন, গ্রাম দেখতে? আপনি কোন কলেজ পড়তেন?

— নিউ আলিপুর কলেজে।

মৌয়ের চোখে মুখে এক ঝলক আলো খেলে গেল, নিউ আলিপুর? আপনি কি পিউল?

লোকটি একটু হাসলেন, চিনতে এতক্ষণ লাগল? আমি কিন্তু তোমাকে প্রথমেই চিনতে পেরেছি।

— সে কী? তা হলে বলেননি কেন?

— দেখছিলাম চিনতে পারিস কি না...

এক মুখ খুশি নিয়ে মৌ বললেন, তাই তো বলছি, কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু দুম করে কি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায়?

— একদম অপরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করা যায় না ঠিকই, কিন্তু স্কুল কলেজের পুরনো বন্ধুদের বেলাতেও কি তাই?

মৌ যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন— না, আসলে আপনাকে প্রথমে ঠিক...

— আপনি! সে কী রে! আগে তো 'তুই' করে বলতিস, এখন হঠাৎ আপনি আজ্ঞে?

আমতা আমতা করে মৌ বললেন, না, আসলে অনেক দিন পর তো...

মৌয়ের মুখের দিকে তাকালেন পিউল, অনেক দিন পর...

— অনেক দিন না? লাস্ট কবে দেখা হয়েছে বল তো, সেই নাইন্টিন সেভেনটি...

পিউল ঝুঁকে কথা শেষ করতে দিলেন না। তার রেশ টেনেই বললেন, সেভেনটি ওয়ানের থার্টিনথ মার্চ, সন্ধ্যা ছ'টা কুড়ি কি বাইশ... দোলের ঠিক আগের দিন...

মৌ একটু থমকে গেল, তোর দেখছি সব মনে আছে...

পিউল বললেন, সব সব সব।

অভিযোগের সুরে মৌ বললেন, পরদিন তো তোর আসার কথা ছিল। বলেছিলি, বিকেলের দিকে আসবি। তার পর যে কোথায় হারিয়ে গেলি, কত খোঁজ করেছি, কত লোকের কাছে তোর কথা জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। একদিন তো গীতি, তরু, কাকলি, শ্যামা, আমরা সবাই মিলে তোদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তোর বাবাও বলতে পারলেন না, তুই কোথায়...

পিউল ধীরে ধীরে বললেন, সে দিন তোর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরার পথে আমাকে পুলিশে ধরল...

মৌ সোজা হয়ে বসলেন, পুলিশ?

— হ্যাঁ পুলিশ। মনে পড়ে সেই সময়ের কথা? সারা দেশ তখন উত্তাল। বাড়ি থেকে কেউ বেরোলে, যতক্ষণ না সে ফিরছে, কেউ বলতে পারত না, সে বাড়ি ফিরবে কি না। মনে পড়েছে?

— কিন্তু তুই তো কোনও রাজনীতি করতিস না...

— তখন কি কোনও রাজনীতি-টিতি লাগত? তবু ভাগ্য ভাল বলতে হবে, আমাকে ধরার খবরটা কী করে যেন বাবার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। না হলে তো থানার খাতায় উল্টোপাল্টা নাম লিখে মাঝরাতে শুনশান রাস্তায় নামিয়ে বলত, পালা। যেই পালাবার জন্য দৌড়তাম, অমনি পেছন থেকে গুলি... পরে জিপে করে আশপাশের কোনও নদী বা নালায় ফেলে দিয়ে আসত। কেউ কিছু বললে বলত, ওরা পালাচ্ছিল, তাই গুলি করেছি।

— তার পর?

— খবর পেয়েই বাবা ছুটে এসেছিলেন। তিনিই একে-তাকে ধরে, বলে কয়ে আমাকে রেসকিউ করে রাতারাতি শঙ্কস টি গার্ডেনে পাঠিয়ে দেন। আলিপুরদুয়ার থেকে পঁয়তেরিশ কিলোমিটার দূরে, মামার বাড়িতে...

— একটা ফোন তো করতে পারতিস...

পিউল ওঁর দিকে তাকালেন, কী ভাবে দুটো জামাকাপড় কিটব্যাগে ভরে তড়িঘড়ি ট্রেন ধরেছিলাম, তা আমিই জানি। টেলিফোনের ডায়েরিটা পর্যন্ত নিতে পারিনি। তা ছাড়া তখন তো আর অলিতে-গলিতে দু'হাত দূরে দূরে এ রকম টেলিফোন বুথ ছিল না যে, যখন খুশি ফোন করবা। না কি মোবাইল ছিল, বল? থাকলে তো, যে কথাটা একজনকে বারবার বলতে চেয়েছিলাম, অথচ কোনও দিন বলতে পারিনি, সে কথাগুলো তো এস এম এস করে অনায়াসেই তাকে পাঠিয়ে দিতে পারতাম।

মৌ অবাক, কাকে?

— সে একজন ছিল।

— কী কথা?

— নাঃ, থাকা। সেগুলো এখন আর বলা যাবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

গলার স্বর নামিয়ে মৌ বললেন, এমনও তো হতে পারে, সেই কথাগুলো শোনার জন্যই হয়তো সে এখনও মুখিয়ে আছে।

পিউল ঝট করে মৌয়ের দিকে তাকালেন, এখনও!

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে মৌ মাথা নাড়ল— হ্যাঁ।

একটা মাত্র শব্দ। কিন্তু সেটা শুনেই পিউলের সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল— তুমি বুঝতে পারতে?

— কেন বুঝতে পারব না? তুমি কি কঠিন অঙ্কের চেয়েও জটিল ছিলে নাকি?

— কিন্তু আমি তো তোমাকে নিজের মুখে কোনও দিন কিছু...

— কিছু কিছু কথা বলার দরকার হয় না। বরং না বলাটাই বলার চেয়ে অনেক বেশি বলা।

— তুমি বুঝলে কী করে?

— বোঝা যায় মশাই, বোঝা যায়। তোমার মনে আছে, অফ পিরিয়ডে আমরা কলেজের মাঠে বসে আড্ডা মারতাম। কোনও কোনও দিন বাচ্চাদের মতো খেলতাম। কোনও দিন রুমাল চোর, কোনও দিন অন্ত্যাক্ষরী, আবার কোনও দিন ব্যাডমিন্টন...

— মনে থাকবে না আবার?

— তোমার হয়তো মনে নেই। আমরা একদিন কানামাছি খেলছিলাম। হঠাৎ তুমি বললে, মৌ খেলবে না। আমি তো অবাক। আমি আবার কী করলাম! সে দিন সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে খেলতে নাওনি। পরদিন তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাল ও রকম করলে কেন? তুমি বলেছিলে, তোমাকে অন্য কেউ ছুঁক আমি চাই না।

পিউল ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, সে কথা তোমার মনে আছে?

— সব, সব মনে আছে। তোমার মনে আছে, তোমার ছোট বোনের জন্মদিনে আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলে। আমাদের যেতে দেরি হচ্ছিল দেখে তুমি একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলে...

পিউল বাচ্চাদের মতো হেসে উঠলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পরে তা নিয়ে কলেজে কী হাসাহাসি...

— কবিতাটা কিন্তু আমার এখনও মনে আছে।

পিউলের চোখ দেখে মৌয়ের মনে হল পিউল বুঝি ওঁর কথা বিশ্বাস করছে না। তাই আবৃত্তির মতো করে উনি বলতে লাগলেন সেই কবিতাটা—  
মৌ আজ আমার বাড়ি আসবে। / আকড়া স্টেশন থেকে বারুইপুর / ও রাস্তা,  
তুমি নিজেকে গুটিয়ে একটু ছোট করে নাও / না হলে, এতটা পথ আসতে /



ওর যে অনেক সময় লেগে যাবে! / ও রাজহংস মেঘ / তোমার ডানা দিয়ে  
সূর্যকে তুমি একটু আড়াল করে রাখো / ও কক্ষনো ছাতা রাখে না সঙ্গে /  
এই ভরদুপুরে ও যদি আসে! / ও কামরূপ-কামাখ্যা / রক্ষাকবচ দিয়ে তুমি  
ওর চার দিকে বলয় তৈরি করে দাও / যাতে কোনও কিছুই ওকে ছুঁতে না  
পারে। / ও আজ আমার বাড়ি আসবে / ও আজ আমার বাড়ি আসবে / ও  
আজ আমার বাড়ি আসবে...

পিউল থ' হয়ে গেলেন। তোমার এখনও পুরোটা মনে আছে!

— বাঃ, আমাকে নিয়ে লিখেছ, আর আমার মনে থাকবে না? তারপর  
আর কোনও কবিতা লেখোনি?

পিউল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, নাঃ, ওটাই আমার প্রথম, ওটাই  
আমার শেষ কবিতা।

— কেন? লেখোনি কেন?

পিউল একটু থেমে বললেন, তুমি থাকলে হয়তো লিখতাম। আরও কী  
সব বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ট্রেনের ঘোষণা ভেসে এল। ওরা দু'জনেই কান  
পাতলেন। শুনলেন, শিয়ালদহ যাওয়ার গাড়ি আপ ক্যানিং লোকাল দু'নম্বর  
প্ল্যাটফর্মে আসছে...

— ওই যে, ট্রেন আসছে...

— হ্যাঁ। এত দিন বাদে সত্যিই খুব ভাল লাগল, এত দিন পরেও তোমার  
অনেক কিছু মনে আছে দেখে।

— অনেক কিছু নয়, সব, সব।

পিউল বললেন, না। সব বোধহয় নয়।

মৌ মুচকি হেসে বললেন, যেমন...

— এই যে একটু আগে তুমি বললে, এই স্টেশনে তুমি এই প্রথম  
এলে...

— হ্যাঁ, ঠিকই তো, এর আগে... কই... না তো...

— না। এটা বোধহয় ঠিক নয়...

— কেন?

— মনে করে দেখো। কলেজ থেকে দল বেঁধে আমরা একবার গ্রাম  
দেখতে বেরিয়েছিলাম। মনে আছে?

— হ্যাঁ।

— কোন স্টেশনে নেমেছিলাম, নামটা মনে আছে?

— না। নামটা মনে নেই, সেই কবেকার কথা, কেন বলো তো?

— এটা সেই স্টেশন।

মৌ আকাশ থেকে পড়লেন। না না, সেটা তো কেমন ছিল যেন। মাটির প্ল্যাটফর্ম, একদম নির্জন, চার দিকে শুধু ধানখেত। আশপাশে কোনও বাড়িঘর ছিল না...

— হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, তখন ও রকমই ছিল। কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে, খেয়াল আছে?

মৌ দাঁড়িয়ে এ দিক ও দিক দেখতে লাগলেন, এটা সেই স্টেশন!

— হ্যাঁ। এটা সেই স্টেশন। তোমার মনে আছে, ফেরার সময় রাহুল একটা ইটের টুকরো দিয়ে কার বাড়ির মাটির দেওয়ালে নিজের নাম আর তারিখ লিখছিল, সেটা দেখে...

মৌ লাফিয়ে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি বলেছিলে বৃষ্টি হলেই তো ওটা মুছে যাবে, সত্যিই যদি কোনও চিহ্ন রেখে যেতে চাস, তা হলে এমন কিছু কর, যেটা পঞ্চাশ বছর পরেও থাকবে। বলেই, তুমি একটা গাছের চারা কোথা থেকে এনে প্ল্যাটফর্মের পাশে লাগিয়ে দিয়েছিলে।

— ওটা ছিল কৃষ্ণচূড়া। আমার দেখাদেখি তুমিও আর একটা চারা এনে ঠিক তার উল্টো প্ল্যাটফর্মে লাগিয়ে দিয়েছিলে।

— হ্যাঁ হ্যাঁ...

— সেটা ছিল রাধাচূড়া। আমরা এখন যে গাছটার নীচে বসে আছি, এটা সেই গাছ।

মৌ অবাক। তাই নাকি? তা হলে তো এর উল্টো দিকে ওই প্ল্যাটফর্মে তোমার কৃষ্ণচূড়াটা থাকার কথা। সেটা কোথায়?

— মরে গেছে বোধহয়। কথা ক'টা পিউল এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন যে, পরিবেশটা ভারী হয়ে উঠছিল। এমন সময় আবার মাইকে ঘোষণা— শিয়ালদহ যাওয়ার গাড়ি আপ ক্যানিং লোকাল দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে...

— এত তাড়াতাড়ি!

পিউল জানতে চাইলেন, তুমি কোথায় যাবে?

— কলকাতা। তুমি?

— আমি যাব উল্টো দিকে।

কথায় কথায় মৌ ফিরে গেলেন পুরনো প্রসঙ্গে— আচ্ছা, পরে যখন তুমি ফিরে এলে, তখন যোগাযোগ করলে না কেন?

— করেছিলাম। তত দিনে তোমরা ও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছ।

— সে তো অনেক পরে।

— তা হবে... পিউল কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন।

— একটা চিঠি তো লিখতে পারতে?

— তোমার বাড়ি চিনতাম ঠিকই, কিন্তু পোস্টাল অ্যাড্রেস তো জানতাম না। তোমরা যে হুট করে এই ভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, জানব কী করে?

মৌ ধীরে ধীরে বললেন, যে শহরে তুমি নেই, অথচ তোমার স্মৃতি আছে, সেখানে আমি থাকি কী করে?

পিউল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আবার ছেদ টেনে দিল ট্রেনের ঘোষণা— শিয়ালদহ যাওয়ার গাড়ি আপ ক্যানিং লোকাল দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে...

মৌ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ট্রেন কখন?

— দেরি আছে। আমি এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকব। তোমাকে বললাম না, প্রতি বছর এই দিনটা আমি এখানে, এই গাছটার সঙ্গে কাটাই...

— হ্যাঁ, সে কথা তো একটু আগেও তুমি বললে, কিন্তু কেন?

— তোমার হয়তো খেয়াল নেই, এই দিনটাতেই তুমি এই গাছের চারাটা লাগিয়েছিলে...

মৌ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল একটা শব্দ— তাই!

মৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে উনি বলে উঠলেন, এই গাছের নীচে বসলে আমি তোমার গায়ের গন্ধ পাই। মনে হয়, তুমি আমার কাছেই আছ...

মৌয়ের চোখ ছলছল করে উঠল, এ কী বলছ তুমি!

পিউল আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, যে কথা কোনও দিন বলতে পারিনি...

বাকি কথা আর শুনতে পেলেন না মৌ। ট্রেন ঢুকে পড়ল স্টেশনে। সে দিকে তাকিয়ে পিউল বললেন, ওই যে তোমার ট্রেন এসে গেছে।

মৌ উঠে দাঁড়িয়ে ট্রেন ধরার জন্য এগিয়ে যেতেই, হঠাৎ খেয়াল হল, ওর

সঙ্গে যোগাযোগ করার মতো তাঁর কাছে কিছু নেই। না ঠিকানা। না কোনও ফোন নম্বর। তাই মৌ বললেন, তোমার ফোন নম্বরটা দেবে?

পিউল বললেন, টু ফোর থ্রি নাইন...

কাঁধের শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগ থেকে পেন আর ডায়েরি বার করতে যাচ্ছিলেন মৌ, কিন্তু বার করবেন কি, ট্রেনটা যে এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। পিউল বললেন, উঠে পড়ো, উঠো পড়ো। এর পর আর কোনও ট্রেন নেই। এটাই লাস্ট ট্রেন...

ট্রেনের কামরায় পা রেখে নিজেকে সামলাতে সামলাতে মৌ বললেন, তোমার নম্বরটা...

পিউল আবার বললেন, টু ফোর থ্রি নাইন...

মৌ তাঁর ডায়েরিতে লিখতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিল। দরজার সামনে ও ভাবে দাঁড়িয়ে লিখতে গেলে যে-কোনও সময় হাত ফসকে পড়ে যেতে পারেন। তাই ট্রেনের সঙ্গে বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে পিউল বললেন, ভেতরে ঢোকো, ভেতরে ঢোকো।

মৌ বললেন, শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বলো, জোরে...

পিউল আরও জোরে জোরে বলতে লাগলেন, টু ফোর থ্রি নাইন... মনে থাকবে? টু ফোর থ্রি নাইন... লেখো লেখো, টু ফোর থ্রি নাইন...

মৌ যে কামরাটায় উঠেছিলেন, সেই কামরাটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওঁর আর বলা হল না তাঁর বাড়ির ল্যান্ড নম্বরের বাকি সংখ্যাগুলি। ঠায় তাকিয়ে রইলেন চলে যাওয়া ট্রেনটার দিকে।



## আমার ছেলে কিচ্ছু খায় না

ডাক্তারের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে মুখ কাঁচুমাচু করে কাজরী বললেন, ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে কিচ্ছু খায় না। এর আগেও দু'জন চাইল্ড স্পেশালিস্টকে দেখিয়েছিলাম। এই যে তাঁদের প্রেসক্রিপশন... বলেই, আগে থেকে বের করে রাখা তিন-চারটে কাগজ উনি এগিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবুর দিকে। ডাক্তারবাবু সেগুলিতে চোখ বোলাতে লাগলেন।

কাজরী আবার বললেন, ও কিচ্ছু খাচ্ছে না, কী করা যায় বলুন তো?

ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশনগুলোয় চোখ বোলাচ্ছেন। বিশাল চেম্বার। দারুণ সাজানো গোছানো। এ সি চলছে। সাত দিন আগে নাম লেখাতে হয়েছে। এর আগে যে দু'জন ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন, তাঁদের একজন পাড়ার ডাক্তারখানায় বসেন। অন্য জন একটু দূরে।

ওর ছেলে কিচ্ছু খাচ্ছে না শুনে সহেলির মা বলেছিলেন, কোন ডাক্তার দেখাচ্ছিস? শুভেন্দু ডাক্তার? কত টাকা ভিজিট? চল্লিশ টাকা?

কাজরী বলেছিলেন, শুভেন্দু ডাক্তারকে দেখিয়ে কোনও কাজ না হওয়ায় লেক মার্কেটের কাছে একজন খুব বড় ডাক্তার বসেন, তাঁকে দেখিয়েছিলাম। তাঁর ভিজিট দুশো টাকা। শুনে সহেলির মা বলেছিলেন, ধুর, এ সব রোগের ক্ষেত্রে একদম লোকাল ডাক্তার দেখাবি না। বাচ্চার ব্যাপার তো, একটু ভাল ডাক্তার দেখা। তাতে যদি দু'পয়সা বেশি লাগে তো, লাগুক, বুঝেছিস?

সহেলি ওর ছেলের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। বাচ্চাদের স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়ে ওঁরা মায়েরা স্কুলের কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে বসেন। সেখানে নানা কথা হয়। আর সব কথাতেই সহেলির মায়ের কথা বলা চাই। যেই শুনেছেন ওঁর ছেলের কথা, অমনি আগ বাড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, সহেলিকে যিনি দেখেন, তার তো ডেটই পাওয়া যায় না। ভীষণ ব্যস্ত। একেবারে সাক্ষাৎ ধনন্তরী। এক ওষুধেই কাজ হয়ে যায়। তবে ভিজিট একটু বেশি। আটশো টাকা।

— আটশো টাকা! আঁতকে উঠেছিলেন কাজরী।

— হ্যাঁ, আটশো টাকা। শুভেন্দু ডাক্তারের চল্লিশ আর এর আটশো।  
তফাত তো হবেই, না?

— ডাক্তারের নাম কী?

— নাম? নামটা কী যেন বেশ। ওর বাবা জানে। দাঁড়া। জিজ্ঞেস করি...  
বলেই, টপাটপ বোতাম টিপে মোবাইলে ধরলেন স্বামীকে। এই, আমরা  
সহেলিকে যে ডাক্তার দেখাই, তাঁর নামটা কী গো? ও, আচ্ছা আচ্ছা। না,  
কাজরী আছে না, ওর ছেলেও তো কিছু খেতে চায় না, তাই। আচ্ছা আচ্ছা,  
ঠিক আছে, রাখছি।

স্বামীর সঙ্গে কথা বলেই আফসোস করেছিলেন সহেলির মা, না রে,  
ও-ও নামটা জানে না। আসলে ওর অফিসের এক বন্ধুর স্ত্রী ওই ডাক্তারের  
খোঁজ দিয়েছিলেন। উনি হয়তো জানতে পারেন। কিন্তু ওঁর নম্বরটা আমার  
কাছে নেই।

— তা হলে ওই ডাক্তারকে তোরা কী বলে ডাকিস?

— ডাক্তারবাবু বলে।

— না না, তা বলছি না। বলছি, তোরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলিস,  
তখন ওই ডাক্তারের কথা বলার সময় তোরা কী বলিস?

— বলি, আটশো টাকার ডাক্তার।

— আটশো টাকার ডাক্তার? ও, তা আমাকে দে না ওই ডাক্তারের  
ঠিকানাটা।

— ওর চেম্বার তো গড়িয়াহাটায়।

— গড়িয়াহাটায়? রোজ বসেন?

— ধুর, অত বড় একজন ডাক্তার রোজ রোজ বসবেন? উনি বহু জায়গায়  
বসেন। বড় বড় সব নার্সিংহোমে। তবে আমাদের কাছাকাছি হল গড়িয়াহাট।

— ওখানে কবে কবে বসেন?

— সপ্তাহে দু'দিন। মঙ্গল আর শনি, সন্কে ছ'টা থেকে রাত আটটা।

— ভালই হল। আজ তো বৃহস্পতিবার। তার মানে কাল শুক্র, পরশু  
শনি। তাই তো? তা হলে এই শনিবারই ওকে নিয়ে যাব।

— আরে, ও ভাবে গেলে কি উনি দেখবেন নাকি? আটশো টাকার ডাক্তার  
বলে কথা। প্রচুর ভিড় হয়। এক মাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়।



— এক মাসে আগে!

— তা হলে আর বলছি কী? দাঁড়া, তোকে একটা নম্বর দিচ্ছি, এখানে ফোন করে কথা বলবি। আমার কথা বলতে পারিস। আসলে যে ছেলেটা নাম লেখে, সে আমাকে খুব ইয়ে করে... মানে, ওকে বলবি, তুই আমার বন্ধু। একটু রিকোয়েস্ট করবি, ডেটটা যাতে একটু আগে করে দেয়। দেখবি, ও ঠিক করে দেবে।

স্বামী বাড়ি ফেরার পর পরই কাজরী বায়না ধরেছিলেন, তিনি তাঁর ছেলেকে নতুন ডাক্তার দেখাবেন। স্বামী গাঁইগুঁই করতেই তাঁর মুখের উপরে বলে দিয়েছিলেন, তুমি যদি টাকা দিতে না চাও, দিয়ো না। আমি আমার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসব। সহেলির মা সহেলিকে ওখানেই দেখায়। এটা একটা প্রেস্টিজ ইস্যু!

অগত্যা ডাক্তারের জন্য আটশো এবং যাতায়াত বাবদ আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন ওঁর স্বামী। অবশ্য টাকা হাতে পাওয়ার সাত দিন আগেই ফোন করে চেষ্টার থেকে উনি ডেট নিয়ে নিয়েছিলেন।

কাজরীর মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার, তা হলে ও কী খায়?

— কিছু না।

— কিছু না মানে?

— সেটাই তো বলছি, ও না কিছু মুখে তোলে না।

— কিছু না?

— না।

ডাক্তার ঞ্চ কুঁচকে তাকালেন।

ঠিক এ ভাবেই মাঝেমাঝে ঞ্চ কুঁচকে যায় কাজরীর। যখন তাঁর ছেলে হঠাৎ হঠাৎ জানতে চায়, এটা কী, ওটা কী? উনি যে জানেন না, তা নয়। জানেন বাংলাটা। ইংরেজির জন্য তখন তার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। এই তো সে দিন, বিকেলবেলায় মুড়ি মেখে ছেলেকে দিতে গিয়ে বললেন, নে, মুড়িটা খেয়ে নে। বলতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, তার ছেলেকে যে মেয়েটি পড়ায়, সে বারবার করে বলে দিয়েছে, বউদি, ও কিন্তু ইংরেজিতে খুব কাঁচা। ওর সঙ্গে যতটা সম্ভব ইংরেজিতে কথা বলবেন। পুরো না হলেও ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে। তাতে ওর অন্তত স্টক অব ওয়ার্ড বাড়বে। অথচ কাজরী ইংরেজি

জানেন না। ছোটবেলায় পড়তেন পাড়ার একটা পাতি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে। এখনও ঠিক করে স্কুল বলতে পারেন না। বলেন ইস্কুল। মার্ডারকে মাদার। ফাস্ট ফুডকে ফাস ফুড। এমন বিদ্যে নিয়ে মাধ্যমিকে ব্যাক পাওয়ার পরে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বইয়ের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তার পরে ছেলের জন্য আবার এই বই নিয়ে বসা। শ্বশুর শাশুড়ি, এমনকী ওঁর স্বামীও বলেছিলেন, ইংরেজি মিডিয়ামে ভর্তি করাতে হলে বাবা-মাকেও একটু ইংরেজি জানতে হয়। না হলে নার্সারি থেকেই দু'জন মাস্টার রাখতে হবে। তার চেয়ে ভাল দেখে কোনও একটা বাংলা মিডিয়ামে ছেলেকে ভর্তি করে দিই। কাজরী রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন, যত দিন পারবেন, তিনি নিজেই ছেলেকে পড়াবেন। আর সে জন্যই আবার নতুন করে পড়া শুরু করেছিলেন তিনি। যতটা পারতেন, ছেলের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলতেন।

ইংরেজিতে কথা মানে, ছেলেকে নিয়ে পার্কে ঘুরতে ঘুরতে হয়তো কোনও গাছে একটা প্রজাপতিকে বসতে দেখলেন, অমনি ছেলেকে তিনি বলতে লাগলেন, ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ, কী সুন্দর একটা বাটারফ্লাই। বা টাপুরটুপুর বুষ্টি দেখিয়ে বলতে লাগলেন, দেখছিস, কী রকম রেইন হচ্ছে। কিংবা ছেলের খাবার বাড়তে বাড়তে ক'হাত দূরে থাকা চামচটা দেখিয়ে বললেন, যা তো বাবা, ওই স্পুনটা নিয়ে আয় তো। এই রকম। এতে ছেলেকে দারুণ ইংরেজি শেখাচ্ছি ভেবে মনে মনে খুব গর্ববোধ করতেন তিনি। এই তো সে দিন ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি থেকে ফেরার সময় কেকার সঙ্গে তাঁর দেখা। কেকা যেই জিঙেস করল, কোথায় গিয়েছিলি? ও অমনি দুম করে বলে ফেলল, শ্রেয়াদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর মেয়েকে যে বাংলা পড়ায় তার ঠিকানাটা নিতে...

— বাংলা টিচার! কেন?

— আর বলিস না। আমার ছেলেটা না একদম বাংলা জানে না।

— সে কী রে? তুই তো বাংলা স্কুলেই পড়তিস। আর তোর ছেলে কিনা বাংলা জানে না?

— কী করব বল? ওর আর সব বিষয়ে ঠিক আছে। কোনও প্রবলেম নেই। কিন্তু বাংলা পড়তে গেলেই ওর গায়ে জ্বর আসে।

— সে জন্য বাংলা মাস্টার খুঁজতে বেরিয়েছিস?

- আর বলিস কেন?
- কোন ক্লাস হল ওর?
- এই তো সব টুয়ে উঠল।
- কত পেয়েছে বাংলায়?
- একচল্লিশ।
- একচল্লিশ? কতয় পাশ?
- চল্লিশে।

— চল্লিশে পাশ, একচল্লিশ? না না, পড়াশোনার ব্যাপারে একদম অবহেলা করবি না। প্রথম থেকেই নজর দে। না হলে পরে কিন্তু পস্তাতে হবে। আমার মেয়েও তো একদম বাংলা জানত না। তার পর মাস্টার রাখার পরে এখন খানিকটা ঠিক হয়েছে। এখন থেকেই ওর জন্য একটা ভাল মাস্টার রাখ। বুঝেছিস?

ও বুঝেছিল। কিন্তু ওর ছেলে বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা। তাই কেকা চলে যেতেই ও মাকে বলেছিল, আচ্ছা মান্নি, আমি বাংলায় কত পেয়েছি, সেটা তো তুমি আন্টিটাকে বললে, লেकिन বাকিগুলোতে কত পেয়েছি, তা তো বললে না।

— বললে খুতু দিত। তোমার মনে নেই, কত পেয়েছ? অঙ্কে গায়ে গায়ে, আর ইংরেজিতে তো একেবারে এই এত্ত বড় একটা গোলা। মনে আছে, দু’-দুটো বিষয়ে ফেল। ক্লাস টুতেই গার্ডিয়ান টু সি... আবার কথা বলছ?

— লেकिन, আমি তো পড়ি মান্নি।

— ছাই পড়ো। সারাক্ষণ খালি টিভি, টিভি আর টিভি।

— হ্যাঁ, টিভি দেখি। লেकिन, প্রোগ্রামের মাঝে মাঝেই যে অ্যাড হয়, তখন তো পড়ি।

— ও ভাবে পড়া হয় না, বুঝলে?

— তুমিই তো সবাইকে বলো, আমি খুব পড়ি।

— কেন বলি, তুমি যখন বড় হবে, তখন বুঝবে।

— লেकिन মান্নি, আমরা তো দিদুনের বাড়ি গিয়েছিলাম। তুমি যে আন্টিটাকে বললে, শ্রেয়া আন্টির মেয়েকে যে বাংলা পড়ায়, তাঁর ঠিকানা আনতে গিয়েছিলে...

— চুপ। একটাও কথা বলবি না। খালি বকবক বকবক। একটু চুপ করে

থাকতে পারিস না? ছেলে কী বলতে যাচ্ছিল, উনি ফের ধমকে উঠলেন, চুপ। বলেই, মনে পড়ে গেল ছেলেকে উনি বাংলায় বকছেন। অমনি বললেন, স্যরি! শাট আপ। রেগে গেলে মানুষ কেন যে মাতৃভাষায় কথা বলে, বুঝি না! বাঙালি বাচ্চাদের বাংলা না জানাটা যে কত গর্বের, সেটা অন্যান্য মায়েদের সঙ্গে দু'মিনিট কথা বললেই টের পাওয়া যায়। সবারই এক কথা, আমার বাচ্চার ইংরেজিতে কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু বাংলাটায় ভীষণ কাঁচা। থাটি নাইনের বাংলা কী? জিজ্ঞেস করো, বলতে পারবে না। কী যে করি! এই 'কী যে করি!' বলাটা আসলে কিন্তু গর্ব করে বলা।

তাই বাংলা নয়, উনি জোর দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। কিন্তু তাঁর ছেলেকে যে তিনি কিছুই শেখাতে পারেননি, সেটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন, সি বি এস সি বোর্ডের একটা স্কুলে ওকে নার্সারিতে ভর্তি করাতে গিয়ে। রেজাল্টের দিন দেখলেন, তাঁর ছেলের নামই ওঠেনি। তাই উনি ঠিক করলেন, যে করেই হোক, দরকার হলে ডোনেশন দিয়ে ছেলেকে ভর্তি করাবেন।

স্বামী একদম রাজি নন। তাই বাবাকে গিয়ে ধরলেন। তোমার নাতিকে সামনের সপ্তাহেই স্কুলে ভর্তি করতে হবে। কিন্তু তোমার জামাইয়ের হাতে এখন, এই মুহূর্তে একদম কোনও টাকা-পয়সা নেই। তুমি যদি ডোনেশনের টাকাটা এখন দিয়ে দাও, তা হলে খুব ভাল হয়। ও পরে তোমাকে দিয়ে দেবে, বলে বাবার কাছ থেকে কায়দা করে টাকাটা ম্যানেজ করে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা আর দেওয়া হয়নি। সেটা যে কত টাকা, তাও মনে করতে চান না তিনি। এবং তিনি যে ভাবে চান, ছেলেকে সে ভাবে পড়াতে পারছেন না বলে, নার্সারি ওয়ানেই রাখতে হয়েছে একটা মেয়েকে। সেই মেয়েটিই সে দিন বলে গিয়েছে, যতটা পারবেন, ওর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলবেন।

সেটা বলার জন্যই বিকেলবেলায় ছেলের দিকে মুড়ি-মাখা বাটিটা এগিয়ে দিয়ে, নে, মুড়িটা খেয়ে নে, বলেও, থমকে গিয়েছিলেন। ক'দিন আগেই বাসে করে ফেরার সময় একটা হকারের কাছ থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা বই কিনেছিলেন তিনি। বেঙ্গলি টু ইংলিশ। কয়েক পাতার পাতলা একটা চটি বই। সেই বইটা উল্টেপাল্টে মুড়ির ইংরেজিটা দেখে নিজেই হেসে ফেললেন! ফ্রায়েড রাইস! মুড়ি ইংরাজি ফ্রায়েড রাইস! তা হলে আমরা যাকে ফ্রায়েড রাইস বলি, সেটার ইংরেজি কী?

— ও কবে থেকে খাচ্ছে না? ডাক্তার প্রশ্ন করতেই কাজরী সচকিত হলেন। নড়েচড়ে বসতে বসতে বললেন, প্রথম থেকেই। তবে সেটা আরও বেড়েছে, ওই গানের ক্লাসে গিয়ে।

গানের কথা বলে ফেলার পরেই নিজেকে একটু সামলে নিলেন কাজরী। কিছু দিন আগে একটা বিয়েবাড়িতে গিয়ে তাঁর এক পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা। দেখা আরও অনেকের সঙ্গেই। সেখানে সবাই সবার খোঁজখবর নিচ্ছিল। কে কী করছে, কার বর কী করে, কার বাচ্চা কোন ক্লাসে পড়ে। কথায় কথায় কাজরী বলেছিলেন, তাঁর ছেলের গান শেখার কথা। বলতে বলতে তাতে রং চড়ছিল। এক সময় বলে ফেললেন, নিজের ছেলে বলে বলছি না, এই বয়সেই ও যা গায়, কী বলব। ও যেখানে যায়, সেখানেই, সবাই ওকে গান করার জন্য ধরে। পাড়ায় কোনও ফাংশন হলেই হল, ওকে চাই। পাড়ার সবাই তো বলেই, ও আপনাদের ছেলে না, ও আমাদের ছেলে। শুধু গানের জন্য। স্কুলে যাবে, সেখানেও। এমনকী টিফিন পিরিয়ডে ওর আন্টিরা পর্যন্ত ওকে ডেকে নিয়ে যান। ও যার কাছে গান শেখে, তিনিও তো বলেন, ওর মধ্যে পার্টস আছে, ও যদি গানটাকে ধরে রাখতে পারে, ও একদিন...

আশপাশের লোকেরা যত মাথা নাড়ছেন, উনিও তত বলে যাচ্ছেন— এই তো কোন একটা চ্যানেলে ছোটদের গানের কমপিটিশন হচ্ছে না? ওর মাস্টার তো ওর নাম দিয়েই দিচ্ছিল। আমি বলে দিয়েছি, না। একদম না। এক্সুনি না। আগে লেখাপড়াটা করুক। তার পর এ সব। কারণ, ও যদি ফার্স্ট হয়ে যায় তা হলে তো আর নিস্তার নেই। মুশই যেতে হবে। একের পর এক গান রেকর্ড করতে হবে। সিনেমার জন্য গান গাইতে হবে। তোরাই বল, এতে পড়াশোনার ক্ষতি হবে না? ওদের স্কুল আবার প্রচণ্ড স্ট্রিক্ট। নাইন্টি এইট পারসেন্ট অ্যাটেনডেন্স না থাকলে... সবাই ভিড় করে ওর কথা শুনছিলেন। হঠাৎ পাশ থেকে সেই বন্ধু বলে উঠলেন, ঠিক বলেছিস, এখন গান করলেও তো কত নাম। দেখিস না, লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে, শান। এঁরা গান করেই যা রোজগার করেন, তাতেই তাঁদের সংসার চলে যায়। আর চাকরিবাকরি করতে হয় না।

প্রথমটা চট করে বুঝতে না পারলেও, কাজরী যখন দেখলেন, মুখ টিপে টিপে সবাই হাসছেন, তখন বুঝতে পারলেন, ওই বন্ধুটা তাঁর কথা নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন।

এর পরেই ওঁদের জমাটি আসর ভেঙে যায়। যে বার মতো এ দিক ও দিক ছড়িয়ে পড়েন। সে দিন ওঁর কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে রাখলেও উনি আর কোনও দিনই ওঁকে ফোন করেননি। তার পর থেকে ছেলের গানের কথা কাউকে বলতে গেলেই ওঁর মনে পড়ে যায়, ওই বন্ধুর কথা। তাই ডাক্তারবাবুকে ছেলের গানের কথা বলে ফেলেও কথা ঘোরালেন কাজরী—  
আসলে এমনিতেই ও কিছু খেতে যায় না।

— সকালে কী খায়?

— কিছু না।

— জলও না?

— না, জল খায়।

— দুধ?

— হ্যাঁ, দুধ খায়। আধ গ্লাস।

— দুধের সঙ্গে?

— কিছু না, ওই একটু কর্নফ্লেক্স।

— তার পর?

— তার পর আর কিছু না। সামান্য লবণ দিয়ে একটা দেশি ডিম, ব্যস...

— দুপুরে?

— দুপুরেও তাই। কিছু খায় না। শুধু একটু স্টু, ছোট্ট এইটুকুনি এক পিস মাছ আর একটু ভাত, ব্যস।

— তার পরে?

— তার পরে আর কিছু না। সেই বেলা চারটে নাগাদ একটা আপেল আর একটু সিজনের ফল।

— সন্ধ্যাবেলা?

— কিছু না। ঘরে যা হয়, তাই। কোনও দিন ম্যাগি করে দিলাম, কি কোনও দিন একটা এগরোল কিনে দিলাম...

— আর কিছু?

— না না, আর কিছু না। ওই কখনও-সখনও একটু চিপস্ বা এটা ওটা সেটা, ব্যস।

— রাতে?



— রাতে খেলে তো ধন্য হয়ে যেতাম। কিছু খায় না। ওই একটু ভাত, একটু তরকারি, কখনও দু’-চার পিস চিকেন বা একটু মাছ কিংবা একটা ডিম। ডিমটা ও খুব ভাল খায়।

— আর কিছু খায় না?

— না। সে জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি। না খেয়ে খেয়ে আমার ছেলেটা, কী বলব ডাক্তারবাবু, একেবারে ঝাঁটার কাঠি হয়ে গেছে।

— ও কোথায়?

— গানের ক্লাসে। আসলে সপ্তাহে একটা দিন ক্লাস তো। তাই ভাবলাম, আপনি যদি এই প্রেসক্রিপশনগুলো দেখে আর আমার মুখের কথা শুনে কোনও ওষুধ-টসুধ দিয়ে দেন, তা হলে... এর পর যে দিন আসব, সে দিন না হয়...

— না, ওকে আনতে হবে না।

— ও! আপনি বুঝে গেছেন, ওর কী হয়েছে?

— হ্যাঁ।

— কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

— কিছু না।

— কিন্তু ও যে একদম খেতে চায় না... জানেন? আমাদের পাড়ায় একটা ছেলে আছে। সবাই ওকে ভয় পায়। বড়রা পর্যন্ত সমঝে চলে। সে দিন তাকে সামনে দাঁড় করিয়েও ওকে এতটুকু খাওয়াতে পারিনি।

— শুধু ওই ছেলেটা কেন? ওর সামনে যদি একটা বাঘ এনেও দাঁড় করিয়ে দেন, ও আর খাবে না।

— কেন ডাক্তারবাবু? খাবার দেখলেই ও পালায় কেন?

— শুধু ও কেন? ও ভাবে যদি আমাকেও আপনি খাওয়ান, দেখবেন, পরের দিন থেকে আমিও খাবার দেখলে পালাচ্ছি। আর ওর বয়স তো সবে সাত বছর...

— কেন? আমি কি ওকে বেশি খাওয়াচ্ছি?

— শুধু বেশি না। খুব বেশি। হিসেব করে দেখবেন, ও যা খায়, আপনিও তা খান না। সুতরাং এ সব নিয়ে একদম ভাববেন না। পারলে এক-আধ বেলা ওকে না খাইয়ে রাখুন। খেতে না চাওয়া পর্যন্ত ওকে কোনও খাবার দেবেন না। দেখবেন, খিদে পেলে ও নিজেই আপনার কাছে এসে খাবার চাইবে।

জোর করে কখনও খাওয়াতে যাবেন না। জানবেন, না খেলে কেউ মরে না, খেয়েই মরে।

ডাক্তারের কথা শুনে কাজরী হাঁ হয়ে গেলেন। তিনি কত আশা করে এসেছিলেন, ডাক্তারবাবু তাঁকে এই পরীক্ষা করাতে বলবেন, সেই পরীক্ষা করাতে বলবেন, এত এত ওষুধ দেবেন, তা নয়, উল্টে বলছেন কিনা, যা খায়, সেটাও কমাতে! পারলে দু’-এক বেলা না খাইয়ে রাখতে! এ কেমন ডাক্তার রে বাবা! এর ভিজিট আটশো টাকা! যাক বাবা, আর কিছু না হোক, একটা কাজ তো হল, এ বার থেকে সহেলির মায়ের মতো তিনিও বড় মুখ করে বলতে পারবেন, আমি আমার ছেলেকে আটশো টাকার ডাক্তার দেখাই। সেটাই বা কম কী!

# ৪৮

## অমরত্ব

সেই কোন ছোটবেলায় গল্পটা শুনেছিল নির্মল। একটা মানুষের অমর হওয়ার গল্প। মানুষটা যদি সত্যিই অমর হয়ে থাকেন, তা হলে তো তাঁর এখনও বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু তিনি কোথায়! তাঁর কাছে গিয়ে সে জেনে নেবে, কী করে অমর হওয়া যায়।

কিন্তু না। হাজার চেষ্টা করেও সে তাঁর খোঁজ পায়নি। যত দূর জেনেছে, ওই লোকটাই প্রথম এবং ওই লোকটাই শেষ। তাঁর আগেও কেউ অমর হননি, তাঁর পরেও না। অর্থাৎ উনি একা একাই অমর হওয়ার কৌশলটা বার করেছিলেন। তিনি যদি পারেন, তবে সে কেন পারবে না! কিন্তু কোথা থেকে হাঁটা শুরু করবে সে!

ইতিমধ্যেই সমস্ত জ্যোতিষী তার চষা হয়ে গেছে। কেউ ওর কথা শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছেন। কেউ হেসে উঠেছেন, কেউ আবার ভেবেছেন ছেলেটা নির্যাৎ কোনও পাগল। অমর হওয়ার সত্যিই যদি কোনও রাস্তা থাকত, তা হলে কি তাঁরা অমর হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন না!

নির্মলের মনে হল, জ্যোতিষীরা যখন বলতে পারছেন না, তখন নিশ্চয়ই কোনও মন্ত্রটন্ত্র আছে! যেটা উচ্চারণ করলেই অমর হওয়া যায়! ও একের পর এক কিনতে শুরু করল তন্ত্রমন্ত্রের বই। দিন রাত এক করে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে ও পেল কয়েকটা টোটকা। সূর্য ওঠার আগে সমপরিমাণ স্বর্ণচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ আর কালো গরুর চোনা ভাল করে মিশিয়ে লেই করে, সেই লেই মুখে মেখে যার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে, মুহূর্তের মধ্যে সে-ই সন্মোহিত হয়ে যাবে। পাওয়া গেল এমন মন্ত্র, যার মুখ মনে মনে কল্পনা করে সেই মন্ত্র মাহেন্দ্রক্ষণে একশো আট বার জপ করলেই, সে যতই অপছন্দ করুক না কেন, তার পর থেকেই সে তাকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। তার পিছু পিছু ঘুরবে। শত্রু হলেও ভক্ত হয়ে যাবে। পাওয়া গেল এমন মন্ত্রও,

যে মন্ত্র মাঘি পূর্ণিমার মধ্যরাতে স্নানটান করে নতুন বস্ত্র পরে, ধূপ ধুনো জ্বেলে সহস্র এক বার জপ করলেই, মানুষ তো কোন ছার, সমস্ত জীবকুল, দৈত্যকুল এবং ঈশ্বরকুলও বশীভূত হয়ে যাবে।

কিন্তু এ সব তো সে চায় না। তাই ওগুলো কী ভাবে করতে হয় বা করলেও, আদৌ কোনও ফল পাওয়া যায় কি না, সেটা সে পরীক্ষা করে দেখেনি। সে চায় অমর হওয়ার চাবিকাঠি। কিন্তু না। তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওই সব বইয়ে সে রকম কিছুই পেল না সে। তবে কি প্রাচীন কোনও গ্রন্থে পাওয়া যেতে পারে এর হদিশ!

মনে হতেই, নির্মল ছুটল চোন্দো পুরুষ ধরে তন্ত্রসাধনা করা সিদ্ধপুরুষ শ্যামাকান্ত তর্কালঙ্কারের বাড়ি। কিন্তু সেখানে গিয়ে ধুলোয় ঢাকা পাহাড় প্রমাণ বই ঘেঁটেও কোনও লাভ হল না। খোঁজখবর করে হাজির হল, দীর্ঘ দিন তালা বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা, নষ্ট হতে বসা, তন্ত্রগ্রন্থের একমাত্র সংগ্রহশালায়। আঁশ বেরিয়ে যাওয়া, তুলো তুলো কাগজের এক-একটা পাতা আলতো আলতো করে উল্টেও সন্ধান পেল না তার, যেটা সে হনো হয়ে খুঁজছে। একদিন শুনল, পুকুরের মাটি কাটতে কাটতে কোথায় নাকি পাওয়া গেছে একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তার মধোই মিলেছে কতকগুলো পোড়া মাটির বাসনপত্র, মূর্তি আর লোহার চেয়েও মজবুত, মাটির একটা সিঁদুক। সেই সিঁদুকের ভেতরে পাওয়া গেছে একগাদা তালপাতার পুঁথি। কিন্তু ওগুলো যে কোন যুগের বোঝা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞের দল রওনা হয়ে গেছে।

পুঁথি! তালপাতার পুঁথি! তাও আবার পুরনো দিনের! খবর পাওয়ামাত্র সে ছুটে গেল সেখানে। কিন্তু ওই সব পুঁথি যে কোন হরফে লেখা, সেটাই উদ্ধার করতে পারল না বিশেষজ্ঞেরা। পণ্ডিতেরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ফলে ও-ও হাল ছেড়ে দিল।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটা খবরে চোখ আটকে গেল তার। কোথাকার এক কবিরাজ নাকি কী একটা ওষুধ বার করেছেন। সেই ওষুধ টানা সাত দিন খেলেই আর চিন্তা নেই, মৃত্যুর জন্য হাঁসফাঁস করা যন্ত্রণাক্লিষ্ট কর্কট রোগীও একদম সুস্থ হয়ে উঠছেন। দূরদূরান্ত থেকে লোক ছুটে আসছে। প্রতিদিন সকাল থেকে লাইন পড়ে যাচ্ছে তাঁর বাড়ির সামনে।

খবরটা পড়ে নির্মল ভাবতে লাগল, সত্যি, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র এক

সময় কত উন্নত ছিল! তখনকার চিকিৎসকেরা প্রায় মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। প্রায় কেন? মরা মানুষকেও তো বাঁচিয়েছেন বহু বার। মনে নেই? শক্তিশেলে ঘায়েল হয়ে লক্ষ্মণ তখন মরমর, পাশেই ছিলেন বানর রাজবৈদ্য সুষণ। তিনি বলেছিলেন মৃতসঞ্জীবনী গাছের কথা। কোথায় পাওয়া যাবে, তাও বলে দিয়েছিলেন। সেই মতো এক লাফে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল হনুমান। কিন্তু কোন গাছটা যে মৃতসঞ্জীবনী, বুঝতে না পেরে পুরো গন্ধমাদন পাহাড়টাকেই তুলে এনেছিল সে। সুষণ তখন ওই গাছের কটা পাতা ছিঁড়ে, হাতের তালুতে ডলে, ক্ষতস্থানে লাগাতেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল লক্ষ্মণ।

যে শাস্ত্র মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, সে শাস্ত্র কি জীবিত মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে না! নিশ্চয়ই পারে। এই বিশ্বাস থেকেই সে আবার পড়তে শুরু করল চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীনগ্রন্থ চরক সংহিতা, সুশ্রুতা সংহিতা, অথর্ব বেদ। অথর্ব বেদ পড়তে পড়তে তো তার চক্ষু চড়কগাছ। আয়ুর্বেদে তখন নাক, কান, গলা, শিশুচিকিৎসা, আকু পাংচার, শল্যচিকিৎসা, এমনকী মনোচিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল! এই জন্যই বুঝি আয়ুর্বেদকে বাংলা করলে দাঁড়ায় জীবন-জ্ঞান। জীবন-জ্ঞানই তো। আয়ু মানে যদি লাইফ হয়, আর ভেদা মানে নলেজ, তার বাংলা তো জীবন-জ্ঞানই হবে, তাই নয় কী? উৎসাহিত হয়ে সে খুঁজতে লাগল স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়, মগধের রাজা অজাতশত্রুর রাজবৈদ্য জীবক আর ধনন্তরীর মতো পণ্ডিত চিকিৎসকেরা কোনও ভূর্জপত্র বা তালপাতায় কিছু লিখে রেখে গেছেন কি না। হয়তো লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ও সেটা খুঁজে পেল না।

সে সময় অনেক চিকিৎসকই অনেক যুগান্তকারী ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু অনেকেই সেগুলো লিপিবদ্ধ করে যাননি। যেমন প্রশান্ত খাস্তগির। বেশ কয়েক দশক আগে এ দেশে এক মহামারীর চেহারা নেয় ঢেপুজ্বর। সেই জ্বরে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হতে লাগল। ঠিক তখনই ওই রোগ নিরাময়ের একটা মোক্ষম ওষুধ তৈরি করে ফেললেন এই দেশেরই এক চিকিৎসক— প্রশান্ত খাস্তগির। শুনেছি, তাঁর নামে নাকি একটা রাস্তাও হয়েছে কলকাতায়। তিনি নিজেই সেই ওষুধ বানাতেন। নিজের হাতেই রোগীদের দিতেন। কিন্তু কী কী দিয়ে বানাতেন আর তার অনুপাতই বা কী, সেটা নাকি কাউকেই বলে যাননি তিনি। লিখেও রেখে যাননি কোথাও।

হয়তো অমর হওয়ার ওষুধও কেউ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এই প্রশান্ত খাস্তগিরের মতো তিনিও হয়তো তা লিখে রেখে যাননি। কিংবা লিখে রেখে গেছেন এমন জায়গায়, যেখানে এখনও মানুষের নাগাল পৌঁছয়নি। যে দিন পৌঁছবে, সে দিন হয়তো মাটির সিন্দুক পাওয়া তালপাতার পুঁথিগুলোর মতোই, সেটা যে কোন হরফে লেখা, সেটাই বুঝতে পারবে না কেউ। নাঃ, চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনও বইতেই পাওয়া গেল না তেমন কিছু।

কিন্তু অমর শব্দটা যখন আছে, তখন সেটা পাওয়ার নিশ্চয়ই কোনও না কোনও একটা রাস্তা তো থাকবেই। সেটা তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু কোথায় খুঁজবে সে? কার কাছে! কোনও সাধু-সন্তের কাছে! হ্যাঁ, তাঁদের কাছে পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে! একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী!

নির্মল শুনেছে, তারাপীঠ নাকি খুব জাগ্রত। সেখানে প্রচুর লোক সাধনা করেন। তা হলে কি সেখানে ও একবার যাবে! গেলে হয়তো পাওয়াও যেতে পারে তেমন কোনও সাধু, যিনি ওকে বলে দিতে পারেন, অমর হওয়ার কোনও কৌশল! মনে হতেই, বাক্স প্যাটরা বেঁধে বেরিয়ে পড়ল নির্মল।

তারাপীঠে পা রাখতেই শিহরিত হল সে। এখানেই তো সাধনা করেছিলেন বামাখ্যাপা! ভক্তিতে মন গদগদ হয়ে উঠল। পূজোটুজো দিয়ে শ্মশানের দিকে হাঁটা দিল সে। দূর থেকেই দেখতে পেল, অজস্র ঝুরিটুরি নামা বিশাল একটা অশ্বখগাছের তলায় একজন বসে আছেন। মাথায় একগাদা জটাজুটো। কে উনি! তাঁকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগল তার। কিন্তু উনি যে কে, কিছুতেই মনে করতে পারল না। গুটিগুটি তাঁর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চার পাশ ভাল করে দেখে নিয়ে, খুব আস্তে আস্তে বলল, বাবা, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে...

— বল বেটা।

— বলছি, আপনি কি বলতে পারবেন, কী করলে অমর হওয়া যায়?

উনি আকাশের দিকে মুখ তুললেন। — সব তাঁর ইচ্ছে। তার পরেই গান ধরলেন— কারে দাও মা ব্রহ্মপদ / কারে করো অধোগামী / সকলই তোমারই ইচ্ছা / ইচ্ছাময়ী তারা তুমি / তোমার কর্ম তুমি করো মা / লোকে



বলে করি আমি... জয় মা তারা, জয় মা, জয় মা... কাজ কর, কাজ কর।  
বলতে বলতে চোখ বুজলেন তিনি।

কাজ কর! সে কি কাজ করে না! প্রচুর কাজ করে। তবে, তার এখন সব  
চেয়ে বড় কাজ, কী করলে অমর হওয়া যায়, তার সন্ধান করা। যে ভাবেই  
হোক, যার কাছ থেকেই হোক, এটা তাকে জানতেই হবে।

নির্মল উঠতে গিয়ে দেখে, তার পেছনে একজন ভদ্রলোক, সঙ্গে একজন  
ভদ্রমহিলা আর দুটো বাচ্চা। ঠিক বাচ্চা নয়, একটি বালক আর এক বালিকা।  
দেখে মনে হয়, এই ভদ্রলোকেরই বউ ছেলেমেয়ে। এরা যে কখন এসে  
দাঁড়িয়েছে, ও টের পায়নি। ও উঠতেই ভদ্রলোক বললেন, কী বলছেন বাবা?

— বলছেন, জয় মা তারা।

— ও।

ভদ্রলোক কথা বলতেই, ও কেমন যেন একটা ভরসা পেল। দুম করে  
জিঙেস করে বসল, আচ্ছা দাদা, সবথেকে বড় সাধু কোথায় পাওয়া যাবে  
বলতে পারেন?

— সবথেকে বড় সাধু! কে ছোট কে বড়, এ বিচার কে করবে! তবে,  
আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি যে ধরনের সাধু খুঁজছেন, সে রকম  
সাধু এখানে পাবেন না। হিমালয়ে হয়তো পেতে পারেন। শুনেছি, বড় বড়  
সাধুরা নাকি হিমালয়ের গুহায় যুগ যুগ ধরে সাধনা করেন।

— হিমালয়ে!

— না, আপনাকে হিমালয়ে যেতে বলছি না। কাছাকাছির মধ্যে কামরূপ  
কামাখ্যাতেও যেতে পারেন। ওখানেও নাকি অনেক বড় বড় সাধু আছেন।

— কামরূপ কামাখ্যায়!

মনে মনে নির্মল ভাবল, শুধু কামরূপ কামাখ্যায় কেন? সামান্য একটা  
খুন, জালিয়াতি বা বিস্ফোরণের কিনারা করতে সি আই ডি বা ভিজিল্যান্সের  
লোকেরা যদি চিন, জাপান, আমেরিকা যেতে পারেন, তো, কী ভাবে অমর  
হওয়া যায়, এটা জানার জন্য কি সে হিমালয়ে যেতে পারবে না! পারবে।  
পারবে। নিশ্চয়ই পারবে। তবে, হাতের কাছে যখন কামরূপ কামাখ্যা রয়েছে,  
সেখানেই আগে ঢুঁ মারা যাক।

নির্মল গিয়ে পৌঁছল কামরূপ কামাখ্যায়। এটা নাকি তন্ত্র সাধনার সাধনপীঠ।

অনেক বড় বড় সাধুই এখান থেকেই সিদ্ধ হয়েছেন। যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন তাঁদের কাউকে কি সে পাবে না! নিশ্চয়ই পাবে।

পেল শেষ পর্যন্ত। তিনি নাকি ত্রিকালদর্শী। সব দেখতে পান। ইহকাল পরকাল, সব। এমন কোনও প্রশ্ন নেই, যার উত্তর তাঁর অজানা। নির্মল তাঁর চরণে গিয়ে পড়ল। তিনি তখন চোখ বুজে ধ্যানে মগ্ন। তাঁর সামনে কতকগুলো ফলমূল, বাতাসা, মঠ, সন্দেশ। ফলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। গন্ধ বেরোচ্ছে। মঠ আর বাতাসাগুলো খেয়ে খেয়ে পিঁপড়েরা ফোঁপরা করে দিয়েছে। গিজগিজ করছে পিঁপড়ে।

নির্মল হঠাৎ দেখল, পিঁপড়েগুলো ছড়োছড়ি করছে। তার উপস্থিতি টের পেয়ে কি ওরা চলে যাচ্ছে! কোথায় যাচ্ছে ওরা! দেখতে গিয়ে দেখে, পিঁপড়েগুলো সার বেঁধে ওই ত্রিকালদর্শীর পা বেয়ে, এক চিলতে পোশাক পেরিয়ে, গা বেয়ে উঠে, ঠোঁটের ভিতর দিয়ে, নাকের ভিতর দিয়ে, কানের ভিতর দিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে! সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুনতে পেল, কে যেন তাকে বলছেন— বাবা এখন ধ্যানে বসেছেন...

কে বললেন কথাটা! ডান দিকে ঘাড় ঘোরাতেই নির্মল দেখল, পাশেই একজন সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। জিজ্ঞাস করল, বাবা কখন উঠবেন?

উনি বললেন, কয়েক মিনিট হতে পারে, কয়েক সপ্তাহ হতে পারে, কয়েক মাসও হতে পারে। আবার কয়েক বছরও হতে পারে। এমনকী কয়েক যুগ হলেও অবাধ হওয়ার কিছু নেই...

— সে কী!

— হ্যাঁ, বাবা যখন ধ্যানে বসেন, কখন উঠবেন কেউ বলতে পারে না।

— কিন্তু আমি যে অনেক দূর থেকে এসেছি...

— কী ব্যাপার বলুন।

— না, মানে, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

— আমাদেরও প্রচুর প্রশ্ন থাকে। উনি ধ্যানে থাকলে আমরা ওনার সামনে বসে মনে মনে সেই প্রশ্ন করি। উত্তরও পেয়ে যাই।

— তাই!

— হ্যাঁ। আপনি করে দেখুন। আপনিও আপনার সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।

— সত্যি?

— পৃথিবীর কিছুই সত্য নয়। সবই অনিত্য। করেই দেখুন না... বলেই, উনি হাঁটা দিলেন। নির্মল গুঁর কথা মতো সেই ত্রিকালদর্শীর সামনে আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মনে মনে জানতে চাইল— কী করে অমর হওয়া যায় বাবা?

সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে আবার একই প্রশ্ন করল সে— বলো না বাবা, কী করে অমর হওয়া যায়?

টু শব্দটি নেই। অনেকক্ষণ কেটে গেল। ফের মনে মনে বলল সে— বলো বাবা, কী করে অমর হওয়া যায়?

কোনও উত্তর নেই। হাঁটু টনটন করছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে ধক্ ধক্ ধক্...

উনি যে বললেন, গুঁর সামনে বসে মনে মনে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া যায়! কই, কোনও উত্তর তো পেলাম না! তা হলে কি উনি এমনি এমনি বললেন! মিথ্যে মিথ্যে! অবশ্য উনি বলেছেন, উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই যে পাওয়া যায়, ওটা কিন্তু একবারও বলেননি। তবে কি পরে পাব! দেখা যাক। না হলে তো হিমালয় আছেই। এর পরেই জার্নি টু হিমালয়।

ফেরার জন্য ট্রেনে উঠে বসল নির্মল। ট্রেন চলছে। তার সিট পড়েছে মাঝের বাস্কে। সে বুঝতে পারছে, এই খোপে সে-ই কেবল আলাদা। বাকিরা সব একই পরিবারের। এমনকী, ও দিকের জানালার মুখোমুখি দুটো সিটের, একটায় বসে যে বাচ্চা ছেলেটা বই পড়ছে, আর তার সামনেরটায় হেলান দিয়ে বসে যে মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটি চোখ বন্ধ করে চুলছেন, তাঁরাও এদেরই সঙ্গে। দিনের বেলা, তাই সিট নামানো হয়নি। নীচের সিটের এক ধারে বসে আছে সে। জানালার দিকে চোখ।

— অমর, কমলালেবু খাবি?

‘অমর’ শব্দটা শুনেই ফিরে তাকাল নির্মল। দেখল, সামনের সিটের ভদ্রমহিলার কোলের উপরে কতগুলো কমলালেবু। উনি একটু ঝুঁকে ওই দিকের জানালার সিটে বই পড়তে থাকা বাচ্চা ছেলেটাকে লক্ষ্য করে আবার একই কথা বললেন। ছেলেটি এতই মগ্ন হয়ে বই পড়ছিল যে, প্রথম বার

শুনতেই পায়নি। এ বার শুনতে পেল। বলল, দাও। বলেই, বইটা বন্ধ করে, সিনেটের উপরে রেখে এগিয়ে এল সে। কাছে আসতেই ভদ্রমহিলা তার হাতে দুটো কমলালেবু দিলেন। আড়চোখে নির্মলকে দেখিয়ে বললেন, আঙ্কলকে একটা দাও।

নির্মল বলল, না না, থাক।

— থাক কেন? খান না। ভদ্রমহিলা বলতেই ছেলেটার বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে একটা কমলালেবু নিল নির্মল। মৃদু স্বরে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম অমর?

— হ্যাঁ।

— কোথায় থাকো?

— কলকাতায়।

— কোন ক্লাসে পড়ো?

— সেভেনে।

— কোন স্কুলে?

— নব নালন্দায়।

— একটু আগে দেখছিলাম, তুমি একটা বই পড়ছিলে, স্কুলের বই?

— না না। গল্পের বই।

— ও, আচ্ছা। আচ্ছা, তোমার নাম তো অমর, তুমি কি জানো, কী করে অমর হওয়া যায়?

— হ্যাঁ। মাথা কাত করল ছেলেটা।

— জানো? বেশ মজা পেল নির্মল। যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সে হিল্লি-দিল্লি চেষ্টা বেড়াচ্ছে। কেউ বলতে পারছে না। সাধু সন্তরা পর্যন্ত ফেল পড়ে যাচ্ছে। আর এইটুকুন একটা ছেলে, সে বলে কিনা সে জানে, কী করে অমর হওয়া যায়! নির্মল তাকে বলল, বলো তো কী করে?

— কাজের মাধ্যমে।

— কাজের মাধ্যমে?

— হ্যাঁ। ওই যে বইটা পড়ছিলাম না... সেখানেও তো রয়েছে, নৌকো ডোবার পরে সবাইকে একে একে বাঁচিয়ে শেষে এই গল্পের নায়ক জলের তোড়ে নিজেই তলিয়ে গেল জলে। নিজের জীবন দিয়ে সে অমর হয়ে রইল।

— জীবন দিয়ে অমর!

— না না, জীবন দিয়ে না। নির্ঘাৎ মৃত্যুর হাত থেকে লোকদের বাঁচিয়ে তাঁদের মধ্যেই সে বেঁচে রইল। ভাল কাজ করলে সেই কাজের মধ্য দিয়েই লোক বেঁচে থাকে। জানেন না? যেমন শাজাহান। শাজাহান তো এখন নেই। কিন্তু তাজমহল গড়ার জন্য তিনি কিন্তু অমর হয়ে আছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ, তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই অমর হয়ে আছেন। যেমন রামকৃষ্ণ, তিনি সবার ঘরে ঘরে আছেন। সবার মনে মনে আছেন। এটাই তো অমর হওয়া...

— এটা অমর হওয়া!

— হ্যাঁ। মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু বেঁচে থাকতেই পারে। তার কাজের জন্য। কাজই মানুষকে অমর করে রাখে।

কাজ! এই জন্যই কি তারাপীঠের ওই সন্ন্যাসী তাকে বলেছিলেন, কাজ কর, কাজ কর! কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে! অমর হয়ে যায়! কামরূপ কামাখ্যার ওই সাধু তাকে ঠিকই বলেছিলেন, ওনার সামনে বসে মনে মনে প্রশ্ন করে দেখুন, ঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন। ও পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও, পেয়েছে। ওর আর হিমালয়ে যাওয়ার দরকার নেই। এখন ওকে কাজ করতে হবে, সত্যিকারের কাজ। যে কাজের মধ্য দিয়ে ও অমর হয়ে উঠবে। মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে সবার মনে, সবার হৃদয়ে। কিন্তু কী করবে সে! কী! ভাবতে ভাবতে জানালার দিকে মুখ করে বাইরের দিকে তাকাল সে। চোখের সামনে থেকে সরে সরে যাচ্ছে গাছ বাড়ি মাঠ গরু ছাগল ল্যাম্পপোস্ট... কিন্তু ওর চোখে কিছুই পড়ছে না। ও শুধু তাকিয়ে আছে। তাকিয়েই আছে। কী করা যায়! কী করা যায়! কী!



## কলহ

গ্রামের মাতব্বররা এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। এ কী বলছে ওরা!

ওরা মানে টগর আর মাটি। বিয়ে হয়েছে ছ'মাসও কাটেনি। দু'বাড়ি থেকে দেখাশোনা করে বিয়ে। কিন্তু বিয়ের পরদিনই ওদের অমন খোলামেলা কথাবার্তা শুনে কারও কারও ভ্রু কুঁচকেছিল। দু'-একজন জানতেও চেয়েছিল, তোমাদের কি প্রেম করে বিয়ে?

টগর হেসেছিল। উত্তর নয়, মাটি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিল উল্টো— বিয়ে কি আবার ঝগড়া করে হয় নাকি? হানিমুন সেরে আসার পর প্রথম ক'টা দিন সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু মাস গড়াতে না গড়াতেই শুরু হল সমস্যা। টগর হাড়ে হাড়ে টের পেল, এ রকম স্বামীর সঙ্গে ঘর করা যায় না। মাটির চোখেও ঘুম নেই, এমন একটা বউয়ের সঙ্গে বাকি জীবন কাটাতে হবে, ভাবতে গিয়েই তার গায়ে যেন জ্বর এল।

দ্বিতীয় মাসের শুরুতেই একদিন এমন কথা-কাটাকাটি হল যে, মাটি কাজে বেরিয়ে যেতেই টগরও ব্যাগটাগ গুছিয়ে রওনা হল কলকাতা। কলকাতা মানে কৃষ্ণনগর। বাপের বাড়ি। কৃষ্ণনগর থেকে আশি কিলোমিটার দূরের বাংলাদেশের বর্ডার লাগোয়া করিমপুরের লোকেরা কৃষ্ণনগরকে কলকাতাই বলে।

শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে চলে এসেছে শুনে মা-বাবার মাথায় হাত। তিলজলা থেকে ছুটে এল টগরের বড়দা। উস্তি থেকে মেজদি। কাঁচরাপাড়া থেকে ছোড়দা। সবাই কত করে বোঝাল, কিন্তু ওর সেই এক কথা, না। ও বাড়িতে আমি আর কিছুতেই যাব না।

— কিন্তু কেন? কী হয়েছে বল? ওর কি কারও সঙ্গে কিছু আছে? কিছু টের পেয়েছিস? একটার পর একটা প্রশ্ন। অথচ টগর নিশ্চুপ।



মাটির বাড়িতেও হাজার প্রশ্ন। হ্যাঁ রে, তোর বউ যে সেই গেল, গেল তো গেলই, আসার আর নামগন্ধ নেই। কী ব্যাপার? ও কি আসবে না? বন্ধুরা বলে, তুই কী রে? বিয়ে হতে না হতেই বউটাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিস, ওরা কি ভাববে বল তো?

দু'বাড়ি থেকেই নানা কথা উঠছিল। তার হাত থেকে রেহাই পেতেই টগর একদিন তার দাদাদের জানিয়ে দিল, তার পক্ষে ওর সঙ্গে ঘর করা সম্ভব নয়। সে ডিভোর্স চায়। সবাই অবাক। এই তো সব বিয়ে হল! এর মধ্যেই এই! আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ফিসফাস, ফোনাফুনি। মুখে মুখে সে খবর এসে পৌঁছল মাটিদের বাড়ি। সে কথা শুনে মাটি বলল, আমিও ওর সঙ্গে আর ঘর করতে চাই না।

এ বোঝায়। ও বোঝায়। সে বোঝায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! অবশেষে টগরের দাদারা যখন দেখল, আর কোনও উপায় নেই, তখন বোনকে বলল, তা হলে উকিলের সঙ্গে কথা বলি? টগর বলল, না। কোর্ট কাছারি নয়। আমি মিউচুয়াল ডিভোর্স চাই।

মাটিও তাই চায়। কিন্তু মিউচুয়াল ডিভোর্স হলেও দু'পক্ষেরই কিছু লোক থাকা দরকার। যতই আইন হোক, পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠুক থানা, তবু এখনও শহরতলি এবং গ্রামের দিকের ক্লাবগুলোতে মাঝে মাঝেই বিচারসভা বসে। সেখানে জমিজমার বিবাদ থেকে গাছের পেয়ারা চুরি, কার বাচ্চাকে কোন বাচ্চা প্রথম মেরেছে থেকে কারা পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছে, এমনকী পারিবারিক কলহ— সব কিছুই বিচার করা হয়। বিচার করেন এলাকার কিছু মাতব্বর গোছের লোক।

ওদের এই ডিভোর্স নিয়েও বিচারসভা বসল করিমপুরে। টগরের দাদাদের উদ্যোগে সেখানে হাজির হলেন কৃষ্ণনগরের কয়েক জন মাথা।

দু'পক্ষের লোকেরাই জেনে গিয়েছিলেন, ওরা কেউই কারও সঙ্গে ঘর করতে চায় না। কিন্তু বউয়ের যদি কোনও আর্থিক সংস্থান না থাকে, তা হলে তার চলবে কী করে? তাই বোনের দায়িত্ব যাতে তাদের ঘাড়ে এসে না পড়ে, সে জন্য মেয়ের দাদারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, তাদের পক্ষের লোকদের বলেছিল, ভরণপোষণের টাকা মাসে মাসে নয়— মাসে মাসে দেওয়ার কথা হলে নাকি প্রথম কয়েক মাস দিয়েই ছেলেরা টাকা বন্ধ

করে দেয়। তখন আবার সেই থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি। আপনারা বরং, এককালীন খোরপোশ আদায় করে দিন। এবং সেটা যেন সাত সাড়ে সাত লাখ টাকার কম না হয়।

মাতব্বররা বললেন, সাত সাড়ে সাত লাখ টাকা চাইলেই তো আর সাত সাড়ে সাত লাখ দেবে না। দরাদরি করবে। আমরা বরং প্রথমেই দশ লাখ বলি।

সেই মতো মাটির কাছে খোরপোশ বাবদ দশ লাখ টাকা দাবি করতেই বিস্ফারিত চোখে তাকাল টগর। বলল, আমি তো টাকা চাইনি। ডিভোর্স চেয়েছি। কিন্তু টগর সেই কথা এত আস্তে আস্তে বলল যে, সে কথা কারও কানে গিয়ে পৌঁছল না।

— দশ লাখ? দশ লাখ টাকায় ওর হবে? ব্যাঙ্কে রাখলে মাসে ক'টাকা ইন্টারেস্ট পাবে? তাতে ওর চলবে? দিন দিন জিনিসপত্রের যা দাম বাড়ছে, একটা মানুষের খেয়ে পরে ভাল ভাবে থাকতে গেলে ওই টাকায় কিছু হবে না। দশ লাখ নয়, আমি ওকে আঠেরো লাখ দেব।

— না। আমি কোনও টাকা চাই না। এ বার আর আস্তে নয়, বেশ জোরের সঙ্গেই বলল টগর। বড়দি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা স্বরে বলল, বোকার মতো কথা বলিস না। তোর কোনও ভবিষ্যৎ নেই? ও যখন নিজে থেকেই দিতে চাইছে, তোর অসুবিধে কোথায়?

— অসুবিধে আছে। কারণ, আমি জানি, আমাকে আঠেরো লাখ টাকা দিতে গেলে ওর শুধু ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙলেই হবে না, আমার বিয়ের আগে গোপালপুরে যে তিন কাঠা ছ'ছটাক জমি কিনেছিল, সেটাও ওকে বিক্রি করতে হবে। তাতেও কি আঠেরো লাখ হবে? ওকে অফিস থেকে লোন নিতে হবে। আমি চাই না, ও সর্বস্বান্ত হোক।

টগর আর মাটির কথা শুনে দু'পক্ষের লোকেরাই এ-ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

করিমপুরের এক মাতব্বর টগরকে বললেন, তোমার যখন ওর প্রতি এতই দরদ, তা হলে ডিভোর্স চাইছ কেন?

টগর বলল, ওর সঙ্গে সংসার করা যায় না, তাই।

— কেন যায় না?

প্রশ্ন শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়ল টগর— জানেন, ও কোনও কথা শোনে

না। এত সুগার হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, রোজ সকালে অন্তত ঘণ্টাখানেক হাঁটতে। অথচ যতই ডাকি না কেন, ও কিছুতেই সকালে ওঠে না।

— কেন, আমি উঠি না? টগরের চোখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল মাটি।

— উঠেছ। গুনে গুনে দু’দিন। উঠে কী করেছ? হেঁটেছ? আমি ঠেলে বাইরে বার করে দিয়েছি। খানিক পরে বেরিয়ে দেখি, ও দিকের শিমুল গাছটার তলায়, গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বাবু ঘুমোচ্ছেন...

— হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিলাম। কারণ, ঘুম পেয়েছিল, তাই। আর তুমি কী করেছ? আমি পইপই করে বলেছিলাম, তুমি রোজ বারোটোর মধ্যে খেয়ে নেবে। না হলে শরীর খারাপ হবে। কিন্তু কোনও দিন দুটোর আগে তুমি খেয়েছ?

মাথা নিচু করে নরম গলায় টগর বলল, কাজ থাকলে কী করব...

— না। করবে না। দরকার হলে ফেলে রাখবে। আমি এসে করব। কিন্তু তুমি যদি অসুস্থ হও, কে দেখবে?

— তোমাকে দেখতে হবে না।

— আমাকে দেখতে হবে না মানে? আলবাত দেখতে হবে। আমি তোমার স্বামী।

— তুমিও ভুলে যেয়ো না, আমি তোমার বউ। তোমাকে যা বলব, তা-ই করতে হবে। সকালে হাঁটতে হবে। ডাক্তার যে ওষুধ খেতে বলেছেন, নিয়ম করে খেতে হবে। এক মাস অন্তর নিয়মিত পি পি আর ফাস্টিং করতে হবে।

— আমি কি করব না বলেছি?

— সে তো মুখে বলছ। করো কি?

— করি তো।

— করো? আবার মিথ্যে কথা? আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না।

— আমার কথা না শুনলে আমিও তোমাকে ছাড়ব না।

বিচারসভায় বাদী-বিবাদীরা কোথায় চুপচাপ থাকবে। যে প্রশ্ন করবে, কেবল তার উত্তর দেবে। তা নয়, ওরা রীতিমত ঝগড়া শুরু করে দিল। বিচারকরা চুপচাপ। এ-ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

হঠাৎ এক মাতব্বর বলে উঠলেন, কে তোমাদের ছাড়তে বলেছে? আমরা বুঝে গেছি, তোমাদের জোর করে ছাড়ালেও তোমরা আলাদা হওয়ার নও।

যে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মঙ্গলের জন্য ডিভোর্স পর্যন্ত চাইতে পারে, তারাই তো প্রকৃত জুটি। আমরা চাইব, তোমরা দু'জন অন্তত কয়েক দিনের জন্য কোথাও থেকে একটু ঘুরে এসো।

টগরের দাদা বলল, এটা আপনারা মন্দ বলেননি। মকাইমারা ফরেস্টটা খুব ভাল। আমরা গতবার ওখানে গিয়েছিলাম। বললে, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

টগর বলল, না। ফরেস্টে না। আমি পাহাড়ে যাব।

মাটি বলল, পাহাড়টাহাড়ে নয়, সমুদ্রে।

টগর বলল, না, পাহাড়ে।

মাটি বলল, বললাম তো সমুদ্রে।

টগর বলল, না। তোমার ঠান্ডার ধাত আছে। একটু জলে নামলেই খুব ভোগে। তা ছাড়া আমি জানি, তুমি পাহাড় খুব ভালবাসো। আমি পাহাড়েই যাব। পাহাড়ে।

— না। পাহাড়ে না। আমি জানি, উঁচুতে উঠলেই তোমার বুক ধড়ফড় করে। আর তা ছাড়া, সমুদ্র তোমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। আমি সমুদ্রে যাব।

টগর বলল, পাহাড়ে। মাটি ফের বলল, সমুদ্রে।

— না। পাহাড়ে।

— না। সমুদ্রে।

— না। পাহাড়ে।

— না। সমুদ্রে।

দু'জনের মধ্যে আবার শুরু হল চাপানউতোর। কিন্তু ওদের কলহের মধ্যে কেউ আর মাথা গলাল না।



## জবান

বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে বাজার করতে গিয়ে কার কাছে যেন কথাটা শুনে ছেলের বাবা তো রেগে কাঁই। এত বড় সাহস? গজগজ করতে করতে বাড়িতে ঢুকলেন— যা আমাদের বংশে কেউ কোনও দিন করেনি, সেই কাজ কিনা শেষ পর্যন্ত আমার ছেলে করতে যাচ্ছিল? প্রেম করে বিয়ে? এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। কিছুতেই না।

বউ এসে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতেই, পুরো রাগটা ঘুরে গেল তাঁর দিকে— যত নষ্টের গোড়া তুমি। তুমি নিশ্চয়ই সব জানতে। আমার কাছে গোপন করে গেছ। তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই। চোখের সামনে থেকে সরে যাও বলছি।

এ বোঝায় ও বোঝায় সে বোঝায়। কিন্তু কারও কথায় কান দিচ্ছেন না তিনি। তাঁর সাফ কথা, ও যদি এ-বিয়ে করে, আমি ওর মুখদর্শন করব না। ত্যাজ্যপুত্র করব। প্রেম? আসুক আজকে। আমি ওর প্রেম করা ছোট্টাচ্ছি।

নিমন্ত্রণের জন্য যে ক'টা কার্ড তখনও বাকি ছিল, ব্যাগ থেকে বার করে ঘাঁচঘাঁচ করে ছিঁড়ে ফেললেন। ইতিমধ্যেই যাদের নিমন্ত্ণ করেছিলেন, ফোন করে করে তাদের বলতে লাগলেন, ছেলের বিয়ে ক্যানসেল। বলেই, লাইন কেটে দিচ্ছিলেন। বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করা যাবে না। প্রচুর লোককে ফোন করতে হবে। তখন যদি আইনি বিধি মেনে পঞ্চাশ জনকেই নিমন্ত্রণ করতেন, তা হলে এত ফোন করতে হত না।

ক্ষতি হলে হোক, যে টাকা আগাম দেওয়া হয়েছে, সেটা ফেরত পাওয়া যাবে না জেনেও, ক্যাটারার থেকে ইলেকট্রিশিয়ান, বিয়েবাড়ি থেকে বরযাত্রীর বাস, একে একে প্রত্যেককেই জানিয়ে দিলেন, এ বিয়ে হচ্ছে না।

পঞ্চাশ-ষাটটা ফোন করার পর যখন একটু হাঁপ ছেড়েছেন, বড় বড় ক'টা শ্বাস নিয়ে চেয়ারে বসেছেন, খবর দেখার জন্য হাতে তুলে নিয়েছেন রিমোট,

ঠিক তখনই বড় এক কাপ চা নিয়ে এসে বউ বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব?

— কী? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকো না। যা বলার বলো।

— বলছিলাম কি, তুমি কি সত্যি সত্যিই ওর বিয়েটা ভেঙে দিচ্ছ?

— হ্যাঁ, দিচ্ছি।

— তা হলে তেরো তারিখে বিয়ে হচ্ছে না?

— না। হচ্ছে না। আর যদি হয়ও, এই মেয়ের সঙ্গে হবে না। সে দিন সকালে উঠে প্রথম যে মেয়ের মুখ দেখব, তার সঙ্গেই আমি ওর বিয়ে দেব। সে যদি কালো পেতনিও হয়, তাই সই। ও আমাকে চেনে না। আমি ভালর ভাল, খারাপের খারাপ। বলে দিয়ো তোমার ছেলেকে, বুঝেছ? এ নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না। যাও।

মুখঝামটা শুনে বউ চুপচাপ ফিরে এলেন পাশের ঘরে। তিনি তাঁর স্বামীকে চেনেন। উনি যা বলেন, তা-ই করেন। উনি যখন বলেছেন, ওই মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন না, তখন তাঁকে রাজি করানোর সাধা স্বয়ং ভগবানেরও নেই। তবু উনি ফোন করলেন ছোট ভাইকে। ওর প্রখর বুদ্ধি। ও যদি কোনও পথ বার করতে পারে! ফোন করলেন বড়দিকে। বাদ দিলেন না বাবাকেও। স্বশুরকে উনি খুব শ্রদ্ধা করেন। ছোটবেলায় বাপ-মা মারা যাওয়ার পর অযত্নে অবহেলায় মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। প্রচণ্ড জেদি ছিলেন। আর সেই জেদের জন্যই আজ উনি এখানে এসে পৌঁছেছেন। কী নেই তাঁর? রয়েছে দাপুটে চাকরি। মধ্য কলকাতায় চারতলা বাড়ি। ঘরে ঘরে এসি। দুটি গাড়ি। বউয়ের নামে সাত অঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট। আর ছেলে? তাকে উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। তাঁরই নির্দেশে একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে সে এখন ডাবলিউ বি সি এস অফিসার। বাইরে যতই তার লুকুম চলুক, বাড়িতে ঢুকলেই কেঁচো। বাবা যা বলবেন তাই। এ হেন মানুষটাও বিয়ের পর থেকেই স্বশুরকে নিজের বাবার মতো দেখেন।

সে দিনই সন্ধ্যায় স্বশুরমশাই এসে তাঁকে বোঝাতে যেতেই জামাই তাঁর মুখের উপরে বলে দিলেন, বাবা, আমাকে মাপ করবেন। এ নিয়ে আমি আর একটি কথাও বলতে চাই না। যা বলার বলে দিয়েছি।

জামাই তাঁর সঙ্গে আজ অবধি এ রকম আচরণ করেনি। মাথা নিচু করে



তিনি সরে গেলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এলেন বউয়ের বড়দি। বড়দিকে উনি খুব মানেন। ভালওবাসেন। কোনও কিছু বললে ‘না’ করতে পারেন না। তাঁর দু’-চারটে কথা শুনলেন ঠিকই, কিন্তু তার পরেই বললেন, জবান, জবান। আমি যখন একবার বলে দিয়েছি, তখন তার অন্যথা হবে না।

বাবার কথায় কাজ হয়নি। বড়দিও ফেল পড়েছেন। অগত্যা ছুটে এল ছোট ভাই। সে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই উনি তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, অন্য কথা বললে বলো। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আমাকে কোনও রিকোয়েস্ট করতে এসো না।

জামাইবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে ভাণ্ডার ঘরে গিয়ে দিদির সঙ্গে অনেকক্ষণ শলা-পরামর্শ করল সে। তার পর চলে গেল।

দেখতে দেখতে দু’দিন কেটে গেল। আজই ছেলের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা বাতিল হয়ে যাওয়ায় সব পণ্ড হয়ে গেছে। বউ বললেন, কী গো, বাজার যাবে না? কিছুই তো নেই।

চা-টা খেয়ে বাজারে যাওয়ার জন্য সদর দরজা খুলতেই যেন ভৃত্য দেখলেন তিনি— এ কী তুমি?

— হ্যাঁ, আমি।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই এ-পাশ ও-পাশ থেকে সামনে এসে দাঁড়াল ছোট শালা, বড় শালি আর স্বশুরমশাই।

ওদের দেখে একদম থতমত খেয়ে গেলেন তিনি। — কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

ছোট শালা বলল, আপনি তো দিদিকে বলেছিলেন, আজ সকালে উঠে প্রথম যে মেয়ের মুখ দেখবেন, তার সঙ্গেই আপনার ছেলের বিয়ে দেবেন। তা, সকালে উঠে তো প্রথম এই মেয়েটারই মুখ দেখলেন, না কি?

বড় শালি বললেন, তুমি তো বলেছিলে, জবান, জবান। তুমি যখন একবার বলে দিয়েছে, তার অন্যথা হবে না।

পিছন থেকে বউ বলে উঠলেন, ওনার কথার খুব দাম। যা বলেন, তাই করেন।

পিছন ফিরে বউকে দেখে উনি বলে উঠলেন, তা বলে এই মেয়ের সঙ্গে? যাকে ও প্রেম করে?

ছোট শালা বলল, বিয়ে তো প্রেম করেই হয়। আমি তো কোনও দিন শুনিনি কেউ ঝগড়া করে বিয়ে করেছে। তা, প্রেম করলে দোষ কোথায়?

— দোষ কোথায় মানে? আমাদের বংশে কেউ কখনও প্রেম করে বিয়ে করেনি।

— সবাই বিয়ের পরে করেছে, তাই তো? তা, যেটা একদিন করবেই, সেটা একটু আগে করলে ক্ষতি কী?

আজ মাথা অনেক ঠান্ডা। শ্বশুরের কথা শুনে একটু দমে গেলেন তিনি। বড় শালি বললেন, সকালে উঠে যখন প্রথমেই এর মুখ দেখেছ, অন্তত নিজের কথার দাম রাখার জন্য ছেলের সঙ্গে এর বিয়েটা দিয়ে দাও।

আমতা আমতা করতে লাগলেন উনি— কী করে বিয়ে হবে! আমি যে সবাইকে বারণ করে দিয়েছি। বিয়েবাড়ি, ক্যাটারার, লাইটের লোককে, এমনকী নিমন্ত্রিতদেরও...

— ও সব আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনি বারণ করে দিলেও, আমি যে দিন এসেছিলাম, সে দিনই দিদির কাছ থেকে ফোন নম্বর, ঠিকানা টিকানা নিয়ে সবাইকেই ফের বলে দিয়েছিলাম, এ বিয়ে হচ্ছে। এবং তেরো তারিখেই হচ্ছে।

— তুমি কি হাত গুনতে পারো নাকি? এ বিয়ে যে হবে, তুমি জানতে?

— জানতাম। কারণ, আপনাকে আমি চিনি।

ছোট শালার মুখে এ রকম কথা শুনে এই প্রথম হাসি ফুটল তাঁর। হঠাৎ খেয়াল হল— শালা, শালি, শ্বশুর, এমনকী ভাবি পুত্রবধূকেও গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, এসো এসো, আপনারাও আসুন। ভেতরে আসুন। পিছন ফিরে বউয়ের চোখে চোখ পড়তেই বললেন, দেখছ আমার মাথার ঠিক নেই, একবার তো বলবে, ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে...

উনি যখন ভিতরে ঢুকছেন, বউ শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। তাঁকে দেখে তাঁর বড় মেয়েও উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন। ভাবী পুত্রবধূর মনে হল, বিয়ে যখনই হোক, তার শাশুড়ি মা এখনই তাকে বরণ করে ঘরে তুলে নিচ্ছেন।



## হিরে

সকালে গ্রাম দেখতে বেরিয়েছেন কুন্তল। এমনিতে উনি রোজই সকালে ওঠেন। ছ'টা, সওয়া ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যান সাই-তে। সেখান থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম। গ্রাম, তস্য গ্রাম থেকে প্রচুর ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিতে আসে। দৌড়ের কোচ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি আছে তাঁর। টানা পাঁচ বছর জার্মানি থেকে শিখে এসেছেন নানান কৌশল। তাঁর হাতেই তৈরি হয়েছে সুস্মিতা, সোমা, বাবলি। তাঁকে চেনে না, খেলার জগতে এমন কেউ নেই।

বহু দিন আগে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল লোকেশের। সে এখন ট্র্যাক ফিল্ডের থ্রো ইভেন্টে এক নম্বর। শুধু শটপাটাই নয়, ডিসকাস, জ্যাভলিন, এমনকী হ্যামারেও সমান দক্ষ। সেই লোকেশ যখন তার বিয়েতে যাওয়ার জন্য তাঁকে নেমস্ত্রন করল, সুন্দরবন শুনে প্রথমে একটু গাঁইগুঁই করলেও, শেষ পর্যন্ত আর 'না' করতে পারেননি তিনি।

তার ক'দিন পরেই লোকেশ বলেছিল, আমাদের ওখানে যখন যাচ্ছেনই, ক'টা দিন হাতে নিয়ে চলুন। শুধু আমাদের দ্বীপটাই নয়, আশপাশের দ্বীপগুলোও আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাব।

কুন্তল বলেছিলেন, আমার সুন্দরবন ঘোরা আছে। দু'বার গিয়েছি।

— কোথায়?

— তা বলতে পারব না। দু'বারই ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে গিয়েছিলাম। সপরিবার। একবার দু'দিন তিন রাত। আর একবার চার দিন পাঁচ রাত।

— চার-পাঁচ দিনে সুন্দরবন? সুন্দরবনে ক'টা দ্বীপ আছে জানেন? একশো দু'খানা। তার মধ্যে লোক থাকে চুয়ান্নখানায়। বাকিগুলি নো ম্যানস ল্যান্ড। সুন্দরবন দেখতে হলে লঞ্চ করে নদীর বুক থেকে নয়, সুন্দরবনের মাটিতে নেমে দেখতে হবে। আপনি তো দু'বার গেছেন, আমাদের ওখানে একবার চলুন।

তাই ক'টা দিন হাতে নিয়ে কুন্তল চলে এসেছেন সুন্দরবনের একদম শেষ প্রান্ত— রাক্ষসখালিতে। এখানে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। দিনের বেলাতেও প্রচুর মশা। রাক্ষসখালির যেখানে ওদের পূর্বপুরুষের ভিটে, সেখান থেকে মিনিট তিনেক হাঁটলেই বে অব বেঙ্গল। বঙ্গোপসাগর।

সেই রাস্তা ধরেই কুন্তল হেঁটে যাচ্ছেন সাগরের দিকে। আজকের সকালটা তাঁর কাছে একদম অন্য রকম। চার পাশে গাছ আর গাছ। সবুজে সবুজ। ফুরফুর করে হাওয়া বইছে। বড় বড় শ্বাস নিলেন তিনি। কত দিন এ রকম বুক ভরে শ্বাস নেননি। হঠাৎ তাঁর কানে এল কতকগুলো কুকুরের ঘেউ ঘেউ। পেছন ফিরে দেখেন, তিন-চারটে কুকুর ছুটে আসছে। তাদের পেছনে পেছনে একটা মেয়ে। উনি এত দিন শুনেছেন মানুষকে কুকুর তড়া করে, কিন্তু এই প্রথম উনি দেখলেন, কোনও মানুষ কয়েকটা কুকুরকে তড়া করেছে। হঠাৎ ওঁর মনে হল, তাঁকে কামড়াবার জন্য ওরা ছুটে আসছে না তো! মেয়েটা হয়তো কুকুরগুলোকে আটকাতে চাইছে! হতে পারে! তা হলে! সঙ্গে সঙ্গে মেঠো পথ থেকে নেমে উনি মাঠে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন, কুকুরগুলো সোজা রাস্তা ধরে ছুটেছে। ওদের পেছনে পেছনে মেয়েটা। ছুটেতে ছুটেতে ওদের ছাড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। কিছুটা গিয়ে কুকুরগুলোও হাঁপাতে হাঁপাতে রাস্তার মধ্যে বসে পড়ল। ওর হঠাৎ মনে হল, মেয়েটা নিশ্চয় কুকুরগুলোর সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিচ্ছিল। দারুণ স্পিড তো মেয়েটার! তবে স্টেপগুলো ঠিক মতো ফেলছিল না। গোড়ালিটা আর একটু তুলে ও যদি টো-য়ের উপরে জোর দিত, তা হলে আরও আগেই কুকুরগুলোকে বিট করে বেরিয়ে যেতে পারত।

কুন্তল এ সব ভাবতে ভাবতে পাশ ফিরে দেখেন, কোথেকে লোকেশ এসে হাজির। কথা বলতে বলতে দু'জন এগোতে লাগলেন। এ-দিক ও-দিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ কুন্তলের চোখে পড়ল, ক'হাত দূরেই একটা গাছ। গাছটায় প্রচুর কদম ফুল ফুটে আছে। কুন্তলদের গ্রামের বাড়ি বারুইপুরে। পদ্মপুকুরে নেমে নর্মান বেথুন সরণি ধরে এঁকেবেঁকে হেঁটে গেলে রেল গেট। রেল গেটের আগেই ডান হাতে কানসার হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের উল্টো দিকে কৃষ্ণ গ্লাস ফ্যাক্টরি। তার গা দিয়ে ইট-বিছানো সরু একটা রাস্তা চলে গেছে সালেপুরের দিকে। সেখানেই ওদের আদিবাড়ি। ওখানেই ওঁর ছেলেবেলাটা কেটেছে। ওই বাড়িতে বহু পুরনো একটা মন্দির আছে। ত্রিমাত্র

মন্দির। ওই মন্দিরের দু'পাশে বড় বড় দুটো কদম গাছ ছিল। টুপটাপ করে ফুল ঝরলে কেউ নেওয়ার আগেই তিনি ছুটে গিয়ে তুলে নিতেন। তার গায়ে হাত বোলালে শিরশির করে উঠত গা। আলতো করে গালে ঘষলে সুড়সুড়ি লাগত। সে সব কবেকার কথা।

এত দিন পরে হঠাৎ এই কদম গাছটাকে দেখেই, এই পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সেও উনি কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। গাছটার নীচের দিকে তাকালেন। আশপাশে কোনও কদম ফুল পড়ে আছে কি না। না নেই। অনেকটা নিচু হয়ে আসা ডালে একটা কদম ফুলকে দেখে সেটা নেওয়ার জন্য উনি বেশ কয়েক বার লাফালেন। কিন্তু নাগাল পেলেন না। আরও কিছুটা লাফাতে পারলে হত। কুন্তলের এই অবস্থা দেখে লোকেশ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, অ্যাঁই পুঁটি, অ্যাঁই..., অ্যাঁই...

কুন্তল দেখলেন দূরে, খুব বেশি হলে বছর তেরো-চোদ্দোর একটি মেয়ে। সে তাকাতেই লোকেশ তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে কাছে ডাকল। কাকে না কাকে ও ডাকছে। তাই ও দিকে কোনও আগ্রহ নেই গুঁর। উনি ফের গাছটার দিকে তাকালেন। দেখতে লাগলেন, ডালে ডালে কত কদম ফুল ফুটে আছে।

— সেই ছোটবেলা থেকেই পুঁটি মাছের মতো তিড়িংবিড়িং করে লাফাত দেখে ওর বাবা ওর নাম দিয়েছিল পুঁটি।

লোকেশের কথায় সম্মিত ফিরল কুন্তলের। চোখ নামাতেই দেখে মেয়েটা তাঁর সামনে। তাকে দেখে কুন্তল একেবারে থ'। এ সেই মেয়েটা না! যে কুকুরের পিছনে ছুটেতে ছুটেতে মিলিয়ে গিয়েছিল! কুন্তল তাকে দেখতে লাগল।

মেয়েটার পরনে ময়লা একটা জামা। পিঠে বোধহয় কোনও ছকটুকু নেই। একেবারে উদলা। খালি পা। ধুলোয় সাদা হয়ে গেছে। লোকেশ তাকে বলল, অ্যাঁই, এনাকে ওইটা পাইড়া দে তো।

ও কোনও কথা বলল না। সোজা নিচু ডালটার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে, মুখ তুলে একটুক্ষণ দেখে নিয়েই মারল এক লাফ। লাফ নয়, যেন স্প্রিং থেকে ছিটকে গেল সে। এবং এক লাফেই ছিঁড়ে আনল ওই কদম ফুলটা। ওটা হাতে নিয়ে কুন্তল আরও অবাক। কারণ, ওই ভাবে লাফ মেরে কিছু ধরলে সেটা চটকে যাওয়ার কথা। অথচ, দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন বৃত্ত থেকে খুব সাবধানে এটা খুলে এনেছে। কোনও পাপড়ির গায়ে এতটুকুও চাপ লাগেনি।

লোকেশ বলল, কুন্তলদা আর নেবেন?

কুন্তল বললেন, নীচের দিকে তো আর দেখছি না। সবই তো উপরের দিকে।

লোকেশ বলল, তাতে কী? পুঁটি আছে তো। ও মনে করলে এক লাফে ওই যে মগডালটা দেখছেন, ওখান থেকেও কদম ফুল ছিঁড়ে আনতে পারে।

— তাই? বলেই একটু মুচকে হাসলেন তিনি।

— শুধু লাফানোই নয়, ওর টিপও একদম অব্যর্থ। চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। যত উঁচুতেই থাকুক না কেন, ঢিল ছুড়ে শুধু আম, জাম, পেয়ারাই নয়, আদলা ইট ছুড়ে ও নাকি সুপুরির ঝাড়, পাকা তাল, গাবও পেড়ে আনে। একবার নাকি একটা নারকেলও পেড়েছিল।

— আদলা ইট ছুড়ে ও নারকেল, তাল, সুপারি পারে? ওইটুকু মেয়ে? ওর ছোড়া আদলা ইট অত দূরে যায়?

— বিশ্বাস হচ্ছে না তো? দেখবেন?

— না না, ঠিক আছে। এই মেয়ে, তুই কী করিস রে?

পুঁটি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, মালা বুনি। বলেই দে ছুট।

মেয়েটাকে আর দেখা গেল না। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল সে। কুন্তল বললেন, মালা বুনি মানে?

লোকেশ বলল, মালা গাঁথে। ও পারে একজন থাকেন, তিনি পুঁতির মালার ব্যবসা করেন। এখানকার অনেকেই তার মালা গাঁথে। এক ডজন মালা গাঁথে দিলে আট আনা। ও তো চোখের নিমেষে পাঁচ ডজন মালা করে ফেলে।

— চোখের নিমেষে পাঁচ ডজন!

— তা হলে আর বলছি কী? ও ভীষণ সুইস্ট। আপনি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না... আমরা আসার সময় বাঁশের একটা সাঁকো পেরোলাম না? মনে আছে? আগে তো ওটায় কোনও সাঁকো ছিল না। ও পারে যেতে হলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হত। মালা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ও কিন্তু অন্যদের মতো অতটা পথ ঘুরে যেত না। এক লাফে উপকে যেত ওই নালা।

— এক লাফে অত বড় নালা! ওটা তো সাড়ে চার মিটারেরও বেশি হবে!

— হ্যাঁ, তা তো হবেই।



— ও কি কারও কাছে শিখেছে?

— কোথায় শিখবে? ও ছোটবেলা থেকেই ওই রকম...

— না শিখেই এক লাফে সাড়ে চার মিটারেরও বেশি! কী বলছ? ইউ পি-র সঞ্জয় রাইকে তৈরি করতে তো আমার সাত বছর লেগে গিয়েছিল। তার পর ও আট মিটার উপকাতে পেরেছিল। অবশ্য একবার নয়, চার-চার বার। যেটা এখনও একটা রেকর্ড। আর এই মেয়েটা শুধু মালা পৌঁছে দেওয়ার জন্য রোজ রোজ অতটা লাফায়! ওকে ঠিক মতো তৈরি করতে পারলে তো পাগলা করে দেবে।

— ওর বাবাও এ রকম ছিল। আশপাশ দিয়ে কোনও পাখি উড়ে গেলে নাকি উনি লাফ দিয়ে খপ্প করে ধরে ফেলতেন। একবার এক রয়েল বেঙ্গল টাইগার ওনাকে তাড়া করেছিল। উনি নাকি এমন ছুটেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বাঘ ফিরে গিয়েছিল জঙ্গলে।

— তার মানে ওর জিনের মধ্যেই এটা আছে। ওকে যদি ঠিক মতো তালিম দেওয়া যায়, তা হলে তো মাত্র ক’দিনের মধ্যে সঞ্জয়কেও ও ছাড়িয়ে যাবে...

— শুধু সঞ্জয় কেন? আরও অনেককেই ছাপিয়ে যাবে।

কুন্তলের মনে পড়ে গেল মতি নন্দীর সেই বিখ্যাত উপন্যাস ‘কোনি’র কথা। সেই কবে পড়েছিলেন! পুণ্যি লাভের আশায় গঙ্গায় ছুড়ে ফেলা যাত্রীদের পয়সা নেওয়ার জন্য কী ভাবে সাঁতারে সবার আগে চলে যেত কোনি। ওর মধ্যে সম্ভাবনা দেখে চমকে উঠেছিলেন সাঁতারের ট্রেনার ক্ষীরোদদা। তিনি কেমন ভাবে দিনের পর দিন তার পিছনে লেগে থেকে তাকে তৈরি করেছিলেন, যাঁরা উপন্যাসটা পড়েছেন, তাঁরা জানেন। কিন্তু ওটা তো উপন্যাস। বানিয়ে বানিয়ে লেখা একটা কাল্পনিক চরিত্র। আর এ! এ তো রক্ত-মাংসের জীবন্ত একটা মেয়ে! এর ট্যালেন্ট কোনির চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। একে যদি ঠিক মতো ট্রেন্ড করা যায়! লোকেশ, চলো তো, ওদের বাড়ি যাই। ওর মা-বাবার সঙ্গে একটু কথা বলি।

— ওর বাবা নেই।

— কোথায় গেছে?

— জঙ্গলে মধু পাড়তে গিয়েছিল। বাঘে নিয়ে গেছে।

— সে কী গো?

— সেই জন্যই তো ওর মা ওকে চোখে চোখে রাখে। মিন পর্যন্ত ধরতে

নিয়ে যায় না। কখন পেছন থেকে হঠাৎ করে কুমিরে নিয়ে যাবে।

— আর ওর মা?

— সকাল হলেই মিন ধরতে সাগরে চলে যায়।

— মিন!

— ওই বাগদা চিংড়ির বাচ্চা...

— ও! তা হলে একটা কাজ করো না। ওর মাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মেয়েটাকে আমাদের ওখানে নিয়ে চলো। এ রকম একটা ট্যালেন্ট নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। কী? ওর মাকে রাজি করাতে পারবে?

— আসলে ও তো মালা গোঁথে সংসারের অনেকটাই...

— সারা মাসে ও কত পায়?

— সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে।

— যা যা করার, করো। ওকে আমার চাই।

— আপনাকে ঠিক বুঝতে পারি না।

— কেন?

— আপনার কাছে কত ছেলেমেয়ে আসে। আপনি তো অনেককেই ফিরিয়ে দেন। তা হলে...

— না, আমি কাউকেই ফেরাই না। যারা আসে, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে যদি বুঝি তার ফটি পারসেন্ট আগ্রহ আছে, আমি টেন টু টুয়েলভ পারসেন্ট আগ্রহ দেখাই। যদি দেখি, এইটি পারসেন্ট আগ্রহ আছে, আমি ফটি পারসেন্ট আগ্রহ দেখাই। আর যদি দেখি, তার আগ্রহ হান্ড্রেড পারসেন্ট, আমি তখন টু হান্ড্রেড পারসেন্ট আগ্রহ দেখাই। ফেরাই কাদের, জানো? যারা শখ করে আসে, তাদের।

— তাই?

— আমি যদি বুঝতে পারি, এর মধ্যে ট্যালেন্ট আছে, আমি তার জন্য লড়ে যাই। বাঁকুড়ার সীতাপতি পালকে মনে আছে? ও যখন প্রথম এসেছিল, কাঁ পরে এসেছিল জানো? খুঁত আর ফতুয়া পরে। তখন কেউ ভেবেছিল ও একদিন বাংলার পোলো ভল্টের রেকর্ড হোল্ডার হবে? এই খেলার জন্যই ইনকাম ট্যাক্সের অত বড় চাকরি পাবে? জানবে, যারা কোচ বা ট্রেনার, তারা ঠিক বুঝতে পারে, কার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। কে হিরের টুকরো। আমরা সারা জীবন ধরে সেই হীরকখণ্ডের সন্ধানে থাকি।

— সে তো ঠিকই...

— বিশ্বাস করবে? আমার এক বন্ধু ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এ কাজ করত। ক্রিকেট নিয়ে কথা ওঠায় সে একদিন আমাকে বলেছিল, একটা দলের সঙ্গে ও নাকি একবার আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে গিয়েছিল। সেখানে ওরা একটি আদিবাসীর সন্ধান পায়। যাদের সঙ্গে আমাদের এই সভ্য সমাজের কোনও সম্পর্ক নেই। তারাও নাকি ক্রিকেট খেলে। তবে আমাদের মতো নয়। তাদের ব্যাট হল গাছের সরু ডাল। উইকেট দু’দিকের দুটো গাছের গুঁড়ি। যার মাঝখানের দূরত্ব ন’ইঞ্চি নয়, দেড়-দু’মানুষ, কখনও সখনও তারও বেশি। আর বল বলতে পাথর ঘষে ঘষে বানানো একটা গোলাকার বস্তু। ও-ই বলেছিল, ওরা একবার ব্যাট হাঁকালে বল চলে যায় এক দেড় মাইল। ওরা ফিল্ডিং করে গাছের মগডালে, পাহাড়ের টিলায়। চার ছয় নয়, ওদের সর্বোচ্চ রান কাউন্ট হয়, পাহাড় চূড়ার ও পারে বল পাঠাতে পারলে...

— তাই?

— তার মানে বুঝতে পারছ, ওরা যদি আমাদের টেস্ট ক্রিকেটে আসে, ওদের মধ্যে যারা একদম এলেবেলে, তারাও কিন্তু ডন ব্র্যাডম্যান, ভিভ রিচার্ডস, গ্যারি সোবার্স, শচীন তেন্ডুলকরের মতো পৃথিবী কাঁপানো খেলোয়াড়দেরও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে।

— সত্যিই এ রকম আছে নাকি?

— কেন? এই মেয়েটাকে দেখলে না? ও যে ভাবে দৌড়ায়, যে ভাবে লাফ মারে, যে ভাবে থ্রো করে, ও যদি কমপিটিশনে নামে, তাবড় তাবড় রেকর্ড হোল্ডারদের তো ও ধরাশায়ী করে দেবে। শুধু দুয়ে দুয়ে চার হওয়া দরকার। একজনের স্পোর্টসম্যান হয়ে ওঠার পেছনে কতকগুলি ফ্যাক্টর কাজ করে। তুমি সুস্মিতার কথাই ধরো না। ওর মা যতই স্কুল লেভেলে দৌড়ে থাকুন, ওর বাবা যদি পুলিশের বদলির চাকরি না করতেন, যদি বউ ছেলেমেয়েকে নিয়ে মেদিনীপুর টাউনে চলে না আসতেন, তা হলে তো ধনেখালির ওই একান্নবতী পরিবারেই ওকে থাকতে হত। ও রকম একটা রক্ষণশীল পরিবারে থেকে ও কি আজ এই জায়গায় আসতে পারত? অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হতে পারত? কিছুতেই পারত না। ওর সাফল্যের পেছনেও অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করেছে। কাজ করেছে ওর মায়ের খেলার প্রতি টান, ওর বাবার বদলির চাকরি, গোটা পরিবার নিয়ে ওর বাবার শহরে চলে আসা এবং একজন

ঠিকঠাক কোচের হাতে ওর পড়া। এটা ভীষণ ইম্পোর্ট্যান্ট। কারণ একজন কোচই বুঝতে পারেন কার স্লো টুইচ ফাইবার, কার ফাস্ট টুইচ ফাইবার। মানে কাকে তিনি স্প্রিন্ট-এ দেবেন, কাকে দেবেন মাঝারি পাল্লার দৌড়ে, আর কাকে তিনি তৈরি করবেন ম্যারাথনের ৪২.১৮৫ কিলোমিটার দৌড়ের জন্য।

— এই মেয়েটাকে দেখে আপনার কী মনে হল?

— ও যে ভাবে ছুটল, ওকে যদি ঠিক মতো ট্রেন্ড করা যায়, আমার তো মনে হয় জামাইকার উসেইন বোল্টের রেকর্ডও ও ভেঙে দেবে।

— উসেইন বোল্ট? যে মাত্র ৯.৫৮ সেকেন্ডে একশো মিটার দৌড়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে?

— হ্যাঁ। দেখবে, যে কোনও বাচ্চার স্পিড তৈরি হয় সাত থেকে ন'বছরের মধ্যে। নয় থেকে এগারো হচ্ছে টেকনিক আর স্কিল তৈরির সময়। এগারো থেকে তেরো আবার স্পিড তৈরির বয়স। তেরো থেকে পনেরো হচ্ছে পাওয়ার তৈরির সময়। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর বয়স বারো কি তেরো। এই সময় যদি ওকে টেকনিক, স্কিল আর পাওয়ার তৈরির খুঁটিনাটি কৌশল একটু শিখিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে ও একদম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। যে ভাবে পারো, তুমি ওর মাকে রাজি করাও।

— যদি রাজি না হয়?

— টোপ দাও। টোপ। দ্যাখো কোনটা গিলবে। সোমা প্রথম দিকে অতটা চার্জড ছিল না। আমিই ওকে বলেছিলাম, ভাল করে প্র্যাক্টিস কর। যে দিন তুই আমাকে ছেড়ে যাবি, তোর ব্যান্ড ব্যালেন্স থাকবে কম করে পাঁচ লাখ টাকা। সঙ্গে একটা সরকারি চাকরি। তখন ওকে যা বলতাম, ও তা-ই করত। তবে পাঁচ লাখ নয়, ও যখন আমাকে ছেড়ে গেল, তখন ওর ব্যান্ড ব্যালেন্স তার অন্তত কুড়ি গুণ। সরকার থেকে ওকে যে জমিটা দিয়েছে, তার দাম এখন নয় নয় করেও এক কোটি টাকা তো হবেই। তার ওপরে সরকারি চাকরি তো আছেই। আমাদের উদ্দেশ্য, শুধু ভাল স্পোর্টসম্যান তৈরি করা নয়, যার মধ্যে সম্ভাবনা আছে, তাকে খুঁজে বার করা। জানো, বাবলি যখন এসেছিল, এত মোটা ছিল যে, নিশ্বাস নিতেও ওর কষ্ট হত। ওর মা-বাবাকে নাকি ডাক্তারেরা বলেছিলেন, ওকে দৌড়ঝাঁপ করাতে। তাই ওর মা-বাবা আমার কাছে ওকে নিয়ে এসেছিলেন। আমি দেখেই বুঝেছিলাম, ওকে দিয়ে হবে।

ওর মধ্যে ট্যালেন্ট আছে। সেই মতো ওকে ট্রেন্ড করেছিলাম। আমি যে ভুল করিনি, তার প্রমাণ, ও এখন অল ইন্ডিয়া পুলিশ গেমের গোল্ড মেডালিস্ট। দু'হাতে বন্দুক চালাতে পারে। এখন মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশ্যাল সিকিওরিটি গার্ড। যে ভাবে পারো তুমি ওকে নিয়ে চলো। আমি ওকে নিজের হাতে তৈরি করব। ওর মা কখন ফেরে?

— ওই মিনটিন ধরে ফিরতে ফিরতে ওনার বেলা গড়িয়ে যায়।

— পারলে তুমি আজই ওর মায়ের কাছে যাও। ভাল করে বোঝাও। খুব ভাল হয়, যদি যাওয়ার সময় ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি।

লোকেশ বলল, ঠিক আছে, দেখছি।

লোকেশের কথা শুনে পুঁটির মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। যে দস্যুপনার জন্য তার মেয়ে যখন-তখন তার হাতে মার খায়, গ্রামের লোকেরা বাড়ি বয়ে এসে নালিশ করে যায়, কখন কোন বিপদ ঘটায়, সে নিয়ে সব সময় তিনি উৎকণ্ঠায় থাকেন, ওর সেই লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখেই লোকেশ আজ তার বাড়ি এসেছে! ওর ওই দুরন্তপনাই ওর জীবন বদলে দিতে পারে! তাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে! দেশের নাম বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পারে! এ কী বলছে লোকেশ! তাই যদি হয়, তবে আর দেরি কেন? আজই তাঁর মেয়েকে সে নিয়ে যাক। যদিও তিনি শুনেছেন, শহরের মানুষেরা খুব একটা ভাল হয় না। ওখানে আকাশ নেই। নদী নেই। এ রকম ফুরফুরে হাওয়া নেই। না থাকুক। লোকেশ যদি ওকে দশ জনের একজন করে তুলতে পারে, তো করুক। পুঁটির মা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন।

লোকেশের বিয়ের পাট চুকে গেছে ঠিকই, তবু আরও ক'টা দিন সে এখানে থাকবে। কিন্তু আগামী কালই কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন কুন্তল। উনি পুঁটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান। সেই মতো পুঁটির মাকে কুন্তল বলে এসেছে, পরদিন সকালেই যেন তাঁর মেয়েকে তিনি রেডি করে রাখেন।

সকাল সকাল না বেরোলে ও দিকে আবার ভাঁটা পড়ে যাবে। তখন এক ঘণ্টার পথ আড়াই ঘণ্টা লাগবে। আর চড়া পড়ে গেলে তো কথাই নেই। নৌকোই যাবে না। তখন কোমরজল ভেঙে নদী পেরোতে হবে। অন্য আর

কোনও রাস্তা নেই। তাই লোকেশকে নিয়ে একটা তাড়াতাড়িই বেরোলেন কুন্তল। তার এখন একটাই চিন্তা, মেয়েটা রেডি আছে তো!

পুঁটিদের বাড়ি গিয়ে ওঁরা দেখেন পুঁটি শাড়ি পরে ঘুরছে। ওর মা নাকি ঘাটে গেছে কাদের তুলে দিতে। আসতে আরও আধ ঘণ্টাটুক লাগবে। লোকেশ বলল, আপনার ওয়েট করতে অসুবিধে হবে না তো?

কুন্তল বললেন, আধ ঘণ্টা কেন? একটা ট্যালেন্ট পাওয়ার জন্য আধ বেলা, দরকার হলে অর্ধেক জীবনও অপেক্ষা করতে পারি। চলো, ওদের দাওয়ায় গিয়ে বসি।

না। আধ ঘণ্টা নয়, মিনিট পনেরোর মধ্যেই পুঁটির মা চলে এলেন। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে ওদের বসা দেখে তিনি বলে উঠলেন, কিস্যু মনে কইরো না বাবা, ও যাইতে পারব না। ওর বিয়া ঠিক হইয়া গ্যাসে গিয়া।

কুন্তল অবাক। বিয়ে!

উনি তখনও বলে চলেছেন, এই তো খানিক আগে পাত্রবাড়ি থিকা আইসিল। মাইয়া দেইখা পছন্দ হইসে। পোলার মায়ের খুব অসুখ। ডাক্তার জবাব দিয়া দিসে। তিনি থাকতে থাকতেই তাই পোলার বিয়াটা ওরা দিয়া দিতে চায়। ওরা চাইতাসে, সামনের মাসে বিয়াটা হইয়া যাক। ওদেরই আগাইয়া দিতে গেছিলাম।

কুন্তল কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, এই বয়সে বিয়ে!

পুঁটির মা শুনতে পেলেন কথাটা। তিনি বললেন, এই বয়সে মানে? দিনে দিনে কি কম হইল নাকি? আড়াই গুণার উপর বয়স হইয়া গেল। আমার তো দেড় গুণা বয়সেই বিয়া হইয়া গেছিল।

সে কী! হতবাক হয়ে গেলেন কুন্তল।

লোকেশ বলল, এখনও এখানকার বেশির ভাগ মেয়েরই ওই বয়সে বিয়ে হয়ে যায়।

পুঁটির মা বললেন, এই সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? আমি তো আজ আছি, কাল নাই। আমি না থাকলে বাপ মরা এই মাইয়াডারে দাখবে কেডা শুনি?

কথার পর কথা। পাল্টা কথা। কথার চাপান-উতোর। কিছুতেই আর রাজি করানো গেল না পুঁটির মাকে। লোকেশের সঙ্গে পায়ে পায়ে ও-বাড়ি থেকে



বেরিয়ে এলেন কুন্তল। ঘাটে যাওয়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে উনি বললেন, জানো লোকেশ, শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই, গ্রামগঞ্জের আনাচে-কানাচে এ রকম কত হিরে মণিমাণিক্য যে ছড়িয়ে আছে, আমরা তার সম্মান পাই না। পেলেও, এ রকম ভাবে পিছিয়ে আসতে হয়। এই ভাবে প্রতিদিন কত ট্যালেন্ট যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কেউ তা জানতেও পারে না। অথচ এরা যদি একটু সুযোগ পেত, যারা খেলাধুলোর রাজ্য দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, একের পর এক রেকর্ড গড়ছে, তাদেরও অনায়াসে নস্যাত্ন করে দিতে পারত। গোটা পৃথিবী এদের মাথায় করে রাখত। কিন্তু কী করা যাবে! এরা নিজেরাও কোনও দিন জানতে পারবে না, এদের মধ্যে কী ছিল! ওই যে একটা নৌকো দাঁড়িয়ে আছে, ওটা কি যাবে?

লোকেশ বলল, এখানকার সব ক'টা নৌকোই ওখানে যাবে।

কুন্তল বললেন, তা হলে উঠে পড়ি?

লোকেশ কোনও কথা বলল না। শুধু মাথা কাত করল।



## আশ্চর্য পুকুর

জানালা দিয়ে পুকুরটাকে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল নবীন। নবীনরা থাকে উত্তরবঙ্গের একদম শেষ সীমানায়। আলিপুরদুয়ার থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সঙ্কোশে। সঙ্কোশ টি গার্ডেনে ওর বাবা কাজ করেন। দু’-এক বছর বাদে বাদেই বাবার সঙ্গে ও কলকাতায় আসে। এখানে ওর দাদুর বাড়ি। কয়েক মাস আগেই ওরা এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ছোটমাসির বিয়ে ঠিক হওয়ায় আবার আসতে হল ওদের।

বিয়ের তোড়জোড় এখন শেষ পর্যায়ে। প্যাভেলের লোক থেকে ক্যাটারার, সব বলা হয়ে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজনরা আসতে শুরু করে দিয়েছে। বাড়িতে প্রচুর লোক। হইহই করে কেটে যাচ্ছে। অনেক রাত অবধি গল্পগুজব হচ্ছে।

কিছু দিন আগে একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন ওর দিদুন। সেখানে শালপাতায় করে খেতে দিয়েছিল। খাবারদাবার যথেষ্ট ভাল ছিল। কিন্তু মাংস থেকে চাটনি, পাতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঝোলগুলো গড়িয়ে শালপাতার ফাঁক গলে নীচ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাই তিনি সাপটেসুপটে তৃপ্তি করে খেতে পারেননি।

রাত্রিবেলায় দল বেঁধে খেতে বসে হঠাৎ সেটা মনে পড়ে যাওয়ায় মামার দিকে তাকিয়ে দিদুন বললেন, ক্যাটারারের সঙ্গে ভাল করে আগে কথা বলে নিস। ওরা আবার শালপাতায় করে খেতে দেবে না তো?

মামা বললেন, না না। আমি দেখে এসেছি। ওরা নকশা করা মাটির থালায় করে খেতে দেয়।

দিদুন বললেন, আসলে আগেকার দিন হলে তো কোনও চিন্তা ছিল না। শাশুড়ির মুখে গল্প শুনেছি, তাঁর মায়ের বিয়ের সময় নাকি এই আশ্চর্য পুকুরটাই সমস্ত বাসনকোসন জোগান দিয়েছিল।

আশ্চর্য পুকুর! যাঁরা দূর দূর থেকে এসেছেন, তাঁরা এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, এটা গল্পগাছা মনে হতে পারে, তবে এর পেছনে সত্যি সত্যিই একটা গল্প আছে। বলেই, উনি বলতে শুরু করেছিলেন সেই গল্প।

তখন এখানে এত বাড়িঘর ছিল না। খানিকটা গ্রামের মতো। মাত্র কয়েক ঘরের বাস। সবাই সবাইকে চিনত। ন'টা সাড়ে ন'টা বাজতে না বাজতেই লোকেরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ত। দত্তবাড়ির তারিণীখুড়োও শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ঘরে গরম লাগছিল বলে উনি মাঝরাতে উঠে ঘর-লাগোয়া এই পুকুরটার পাড়ে এসে একটা গাছের তলায় বসে ছিলেন। সেই বিশাল পাকুড় গাছটা অবশ্য এখন আর নেই। চার দিক তখন নিঃকুম। জনমানুষ শূন্য। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে আসছে। এমন সময় তারিণীখুড়ো হঠাৎ দেখেন, পুকুরের উপরে আশ্চর্য দুটো আলো। তার পরে দেখেন, আলো নয়, আলোর মতো ফুটফুটে দুটো বাচ্চা। জলের উপরে খেলা করছে। ডোবা তো দূরের কথা, ওদের পায়ের পাতা পর্যন্ত ভিজছে না।

ওরা কারা? কোনও ভূতটুত? তার পরে নিজের মনেই বললেন, ধাতা। ভূত আবার ও রকম হয় নাকি? নিশ্চয়ই কোনও দেবশিশুটিশু হবে। লোকে সারা জীবন তপস্যা করেও ঈশ্বরের দেখা পায় না। তিনি যখন পেয়েছেন, কিছুতেই ছাড়বেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। ঝাঁপানোর শব্দ শুনেই বাচ্চা দুটো খেলাটেলা ফেলে সাঁ করে সোজা জলের তলায়। তারিণীখুড়োও পিছু নিলেন তাদের। যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন। কিছুতেই পথ শেষ হচ্ছে না। বাচ্চা দুটো তখন একেবারে সামনে। হাত বাড়িয়ে যেই ধরতে যাবেন, অমনি দেখেন, সামনেই একটা আলো ঝলমলে রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদ! না, স্বর্গপুরী!

বাচ্চা দুটোর পিছু পিছু উনিও ঢুকে পড়লেন সেখানে। আর ঢোকামাত্র চমকে উঠলেন তিনি। জলের তলায় এটা কী! তিনি স্বপ্ন দেখছেন না তো! সেই চমক কাটতে না কাটতেই আর একটা চমক। দেখলেন, ওই বাচ্চা দুটো দৌড়ে গিয়ে যাঁর পেছনে গিয়ে লুকোলো, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং মহালক্ষ্মী। মাত্র কয়েক হাত দূরে জলজ্যাস্ত দেবীকে দেখে তিনি কী করবেন, বুঝে উঠতে পারলেন না। দেবীও বিচলিত। তাঁর যে জগৎটা এত দিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল, সেটা এখন জানাজানি হয়ে যাবে!

তারিণীখুড়েকে বড় যত্ন করে পাঁচ রকমের ফল থালায় সাজিয়ে খেতে দিলেন তিনি। উনি খাবেন কী, থালা দেখে তো তাঁর চম্ভুস্থির। মণিমাণিক্যখচিত সোনার থালা। আর গোটা থালা জুড়ে সে কী সৃক্ষ্ম কারুকাজ! বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। এমন থালা ইহজগতে এর আগে কেউ কখনও দেখেছে কি না সন্দেহ!

তারিণীখুড়া মনে মনে ভাবলেন, মেয়ের বিয়েতে যদি এ রকম থালায় করে অতিথিদের খেতে দিতে পারতাম!

মনে মনে ভাবলেও সে কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন দেবী। বলেছিলেন, তোমার মেয়ের বিয়ে কবে?

খতমত খেয়ে উনি বলেছিলেন, সামনের মাসে।

দেবী বলেছিলেন, ঠিক আছে। তোমার মেয়ের বিয়েতে কত লোক হবে?

উনি বলেছিলেন, এখনও ঠিক হয়নি।

দেবী বলেছিলেন, ঠিক হয়ে গেলে সংখ্যাটা একটা কাগজে লিখে এই পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিয়ো।

উনি বলেছিলেন, পুকুরে ভাসিয়ে দিলে তো সে লেখা জলে ধুয়ে যাবে!

দেবী বলেছিলেন, ধুয়ে আর যাবে কোথায়? এই জলেই তো থাকবে। পৃথিবীতে যেমন কেউ কোনও কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনই এই পৃথিবীর কোনও কিছুই কোথাও হারায় না। কাগজটা জলে ভাসিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা কোরো। দেখবে, পুকুর থেকে পাড়ে উঠে আসবে একটার পর একটা সোনার থালা বাটি গ্লাস।

দেবীর কথা মতো উনি তা-ই করেছিলেন। এবং সত্যিই পুকুর থেকে উঠে এসেছিল চোখ ধাঁধানো সব বাসনকোসন। আর সেই সব বাসনে খাবার দেওয়ামাত্র খাবারের স্বাদই পাল্টে গিয়েছিল। লোকজন চেটেপুটে খেয়েছিল। ধন্য ধন্য করেছিল সবাই।

কাজ মিটে যাওয়ার পরে দেবীর কথা মতো সমস্ত থালাবাসন ওই পুকুরের জলেই ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তারিণীখুড়া। যে দিন দিয়েছিলেন, সে দিন রাতেই স্বপ্নে দেখেছিলেন, দেবী প্রসন্ন হয়েছেন তাঁর উপরে। অতগুলো সোনার থালা বাটি গ্লাস পেয়েও যে অবলীলায় ফেরত দিয়ে দেয়, সে শুধু মানুষ নয়, সত্যিকারের মানুষ।

তাই দেবী খুশি হয়ে বলেছিলেন, এ বার থেকে এই অঞ্চলের বা তোমার পরিচিত কারও বাড়িতে যদি কোনও অনুষ্ঠান হয়, সে অন্নপ্রাশনই হোক কিংবা শ্রাদ্ধ, যদি তোমার মনে হয়, অতিথিদের খাওয়ানোর জন্য বাসনপত্র লাগবে, তা হলে কোনও চিন্তা করো না, ক'টা থালা বাটি গ্লাস লাগবে, সেটা একটা কাগজে লিখে এই পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিয়ো, আমি ঠিক পাঠিয়ে দেব।

উনি দু'-একজনকে এটা বলতেই লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল এই খবর। ফলে শুধু এলাকারই নয়, বিশ-পঁচিশ ক্রোশ দূরের কারও বাড়িতেও যদি খাওয়াদাওয়ার কোনও আয়োজন হত, তা হলে তাঁরাও এসে তাঁকে ধরতেন। আর উনি কাউকেই 'না' করতে পারতেন না।

সবাই যে বাসনপত্রের জন্যই আসতেন, তা নয়। একটু চেষ্টা করলেই, ও সব হয়তো অনেকেই কোনও না কোনও ভাবে ঠিক জোগাড় করতে পারতেন, কিন্তু খাবারের ওই স্বাদ? ওই রং? ওই গন্ধ? ওটা পাবেন কোথায়? তাই এত ধরাধরি। এত দূর থেকে বাসন বয়ে নিয়ে যাওয়া।

পুকুর থেকে সোনার বাসন উঠে আসছে! তা হলে তো সেটা যে-সে পুকুর নয়! আশ্চর্য পুকুর! কয়েক দিনের মধ্যেই লোকের মুখে মুখে পুকুরটার নাম হয়ে গেল— আশ্চর্য পুকুর। লোকজন ভিড় করতে শুরু করল। দেখতে দেখতে পুকুরটা হয়ে উঠল একটা তীর্থক্ষেত্র। আগের মতো কেউ আর এই পুকুরে মুখ ধুয়ে কুলকুচি করে না। জামাকাপড় কাচে না। বাচ্চারা পর্যন্ত স্নান করতে নেমে জলে হিসি করে না। বরং মাঝরাতে যে গাছের তলায় বসে তারিণীখুড়ো ফুটফুটো দুটো বাচ্চাকে পুকুরের উপরে খেলা করতে দেখেছিলেন, পাড়ার মেয়ে বউরা সেই গাছটাকে পূজো করতে শুরু করে দিলেন। নিয়ম করে প্রতিদিন ফুল বেলপাতা জল দিতে লাগলেন। সন্ধ্যা হলেই দেখাতে লাগলেন ধূপ ধুনো প্রদীপ। কেউ কেউ আবার মানত করতে লাগলেন। গাছটার ডালে লাল সুতো দিয়ে বাঁধতে লাগলেন ঢিল।

ঠাকুরকে দেওয়া ফুল, এ তো আর যেখানে সেখানে ফেলা যায় না। তাই গাছের গোড়ায় প্রত্যেক দিন যে গাদা গাদা ফুল জমা হতে লাগল, পরদিন সকালেই পরিষ্কার করার সময় সেগুলো সাপটে ফেলা হতে লাগল পুকুরে। আর সেই ফুল বেলপাতা পচে গলে পুকুরের জলে মিশতে লাগল।

আর এরই মধ্যে হঠাৎ করে ঘটে গেল একটা অঘটন। পাশের গ্রামের

একটা মেয়ের বিয়ে ছিল। সে জন্য এই পুকুর থেকে নেওয়া হয়েছিল বেশ কিছু থালা বাটি গ্লাস। কিন্তু ফেরত দেওয়ার সময় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও একটা থালার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

সে দিন রাতেই তারিণীখুড়োকে স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবী। তাঁর মূর্তি তখন ভয়ানক। দেবী বললেন, ওই থালা যে নিয়েছে, আমি তার একটা সন্তান নিয়ে নেব। আর খুব তাড়াতাড়িই এখানকার পাট চুকিয়ে আমি চলে যাব। তুমি আর কখনও কারও জন্য কোনও বাসনের তালিকা লিখে পুকুরের জলে ভাসিও না।

তারিণীখুড়োর তো মাথায় হাত। তিনি তো বটেই, গ্রামের কত লোক কত কাকুতি-মিনতি করে, ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখে জলে ভাসালেন। কিন্তু কোনও কাজ হল না। বন্ধ হয়ে গেল পুকুর থেকে বাসনপত্র আসা।

এর কিছু দিন পরেই বৃষ্টিতে পিছল হয়ে থাকা পুকুরের পাড়ে খেলা করতে করতে একটা বাচ্চা ছেলে পা পিছলে পড়ে গেল জলে। আশপাশে যারা ছিল, বাঁপিয়ে পড়ল। বড় জাল ফেলা হল। দু'জন ডুবুরি সারা পুকুর তোলপাড় করল। কিন্তু সেই ছেলেটাকে আর পাওয়া গেল না। কোথায় গেল ছেলেটা!

সন্দেহ হয়েছিল তারিণীখুড়োর। তলে তলে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন তিনি। এবং শেষ পর্যন্ত জানতে পারলেন, তাঁর ধারণাই ঠিক। পাশের গ্রামের যে বিয়েবাড়ির বাসন পুকুরে ফেরত দেওয়ার সময় একটা থালা উধাও হয়ে গিয়েছিল, সেই বাড়িতে ওই দিন নিমন্ত্রিত ছিলেন এই বাচ্চাটির বাবা।

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে এখানে বেড়াতে আসা আর একটি ছেলেও জলে ডুবে মারা যায়। আর এই ছেলেটা মারা যাওয়ার পরেই লোকজন বলতে শুরু করলেন, এই পুকুরটা প্রতি বছর একটা করে ছেলে নেয়।

তার পরে কত বছর যে কেটে গেছে, এই পুকুরে ডুবে কেউ আর মারা যায়নি, সেটা কিন্তু কেউ হিসেব করে দেখেনি। এখনও এই পুকুরের কথা উঠলে লোকে সেই একই কথা বলে। ওর দিদুনও তার ব্যতিক্রম নন। তাই এই পুকুরে কোনও বাচ্চাকে কেউ একা যেতে দেন না। স্নান করতে হলে বাড়ির বড় কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়।

এটা সেই আশ্চর্য পুকুর! নবীন জানালা দিয়ে পুকুরটাকে দেখছে। পুকুরটা আগে এমনিই ছিল। এখন পাড়গুলো বাঁধানো হয়েছে। বাঁধানোর পরে কেমন



যেন ছোট ছোট লাগছে। ও যে সুইমিং ক্লাবে সাঁতার কাটে, এ পুকুরটা যেন তার থেকেও ছোট।

এ বাড়িতে যখন লোকজন বেশি থাকে, তখন স্নান করার জন্য সবাই এই পুকুরেই যায়। এখানে থাকলে, তাদের সঙ্গে ও-ও যায়। আর এখন তো ছোটমাসির বিয়ের জন্য বাড়ি ভর্তি লোক। সুতরাং স্নান করার জন্য আজ নিশ্চয়ই তাকেও পুকুরে যেতে হবে। ও ঠিক করল, ও তো খুব ভাল সাঁতার জানে— জানে, নীচে লতাগুল্ম থাকলেও সেগুলোর গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কী ভাবে বেরিয়ে আসতে হয়, ফলে ভয়ের কোনও কারণ নেই। ও যখন যাবে, তখন সবার নজর এড়িয়ে এক ফাঁকে টুক করে ডুব দিয়ে পুকুরের একদম তলায় গিয়ে দেখে আসবে, সত্যি সত্যি সেখানে কোনও রাজপ্রাসাদ টাসাদ আছে কি না। এখনও দু'-একটা সোনার থালাবাসন পড়ে আছে কি না।

স্নান করার জন্য ছোটমামুর সঙ্গে ও যখন পুকুরে নামল, গা ঘিনঘিন করে উঠল ওর। কী বিচ্ছিরি গন্ধ। তবু ডুব দিয়ে পুকুরের একেবারে নীচে চলে গেল নবীন। নীচে তখন থিকথিক করছে কাদা। কাদা! না কি এত দিন ধরে পচা ফুল বেলপাতা জমে জমে এ রকম হয়েছে! কী বীভৎস গন্ধ। নাক রাখা যাচ্ছে না। গন্ধে থাকতে না পেরে তরতর করে সে উপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে ওর মনে হল, হয়তো সত্যি সত্যিই একদিন এখানে দেবী ছিলেন। কিন্তু পুণ্য করার নামে এই পুকুরের জলে ফুল বেলপাতা ফেলে ফেলে মানুষ যে ভাবে এটাকে নরককুণ্ড করে তুলেছে, সেখানে দেবী কেন? মানুষই টিকতে পারবে না। ভূত পেতনি-শাকচুল্লিও থাকতে পারবে কি!

জল থেকে উঠে ছোটমামুকে ও বলল, এখানে নয়, আমি বাড়ি গিয়ে স্নান করব। দরকার হলে রাস্তার টিউবওয়েলে গিয়ে স্নান করব। তবু এখানে নয়। আমি বাড়ি যাচ্ছি। আমার এখন একটা আস্ত সাবান লাগবে আর কমপক্ষে দু'-তিন পাতা শ্যাম্পু। না হলে গা থেকে এই পচা গন্ধ কিছুতেই যাবে না। এটা একটা পুকুর! তাও আবার যে-সে পুকুর নয়, আশ্চর্য পুকুর! সত্যিই আশ্চর্য! ছিঃ...

৪৫

স্পেস

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নদ্বীপের। রাত তখন কত হবে কে জানে! দেখল, সৌমনা খাটে নেই। টিভি চলছে। মিউট করা। ও পাশের ঘরে উঁকি মারল। সেখানে ছেলে ঘুমোচ্ছে। টু বেডরুমের এই ফ্ল্যাটে আর কোথায় যেতে পারে ও! এত রাতে নিশ্চয়ই রান্নাঘরে যাবে না। আর বাথরুমের দরজা তো হাট করে খোলা। লাইট নেভানো। যে মেয়ে সামান্য একটা আরশোলা দেখলে ভয়ে চিৎকার করে গোটা বাড়ি মাথায় তোলে, সে যাবে অন্ধকারে! তবে কি ব্যালকনিতে!

ও গুটিগুটি পায়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দেখে, গ্রিলের সামনে ঝুঁকে রাস্তার দিকে মুখ করে সৌমনা কার সঙ্গে যেন মোবাইলে খুব চাপা স্বরে কথা বলছে। কিন্তু এত রাতে কার সঙ্গে কথা বলছে ও!

আগে তো ও এ রকম ছিল না। বিয়ের চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই ওদের আলাপ। কয়েক মাসের মধোই ঘনিষ্ঠতা। তার পর প্রেম। বিয়ে। সেই কবেকার কথা! দেখতে দেখতে ছেলের বয়সই চোন্দো হয়ে গেল। কোথায়, এ রকম লুকিয়েচুরিয়ে রাতদুপুরে তো ও তাকে কোনও দিন ফোন করতে দেখেনি। তা হলে!

তা হলে কি তার অফিসের কবিতাপাগল অনিমেঘের শোনানো ওই লাইনগুলোই ঠিক? কিছু দিন আগে কলেজ স্ট্রিটের পাতিরাম থেকে ও একটা পকেট কবিতার বই কিনে নিয়ে এসেছিল। কবির নামটা এখন ওর আর মনে নেই। কিন্তু বইটার নাম মনে আছে— অণুকবিতা। শিরোনাম ছাড়াই পাতায় পাতায় দু'-তিন-চার লাইনের এক-একটা কবিতা। ও পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিল। তার মধ্যে যেমন ছিল, 'মেয়েরা এত সুন্দর করে ঘর লেপতে পারে / কেউ বুঝবে না, আগে কেউ পা রেখেছিল।' তেমনই ছিল, 'মেয়েরা জায়গা মতো হরিশ্চন্দর / বড় জাহাজ দেখলেই জেটি বা বন্দর।' ছিল 'মেয়েরা একুশ

পর্যন্তই সভ্যভব্য / চল্লিশ পেরোলেই সহজলভ্য।’ এই ধরনের আরও বহু লাইন। শুধু তা-ই নয়, দু’-একটা শোনার পর তার মতো আরও অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। মেয়েদের নিয়ে ন্যাকারজনক লেখা। অথচ কবি নাকি ভূমিকায় লিখেছেন, এগুলি সবই তার অভিজ্ঞতালব্ধ। সে যাই হোক, ওই বই থেকে অনেকগুলো কবিতাই পড়ে পড়ে শুনিয়েছিল সে। তার মধ্যে এই লাইনগুলোই ওর মাথার মধ্যে গেঁথে গেছে। ক’দিন ধরে এই লাইন ক’টাই ওকে জ্বালাচ্ছে। কারণ, ও হিসেব করে দেখেছে, তার বউয়ের বয়স এখন আটত্রিশ প্লাস। এটা তার বউয়ের হিসেব অনুযায়ী। আর মেয়েরা তো সব সময় দু’-চার বছর কমিয়েই বলে, সেটা যোগ করলে ওর বয়স এখন নিশ্চয়ই চল্লিশ পেরিয়ে গেছে।

কিছু দিন আগে ‘হ্যাং ওভার’ নামে যে বাংলা সিনেমাটা এসেছিল, সেটার বিষয়ও নাকি এই একই। সেখানেও দেখানো হয়েছে, চল্লিশ বছর বয়স কত ভয়ঙ্কর। তা হলে কি তার বউ এখন সেই ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠেছে!

যেমন মেতে উঠেছে সৌমনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু— অদিতি। দুই মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে দারুণ সংসার ছিল তার। ছোট ফ্যামিলি। হাসিখুশি। ওর বরের শনি-রবিবার ছুটি। তাই প্রত্যেক উইকএন্ডেই গোটা পরিবার স্কুটারে করে বেরিয়ে পড়ত এ-দিকে ও-দিকে।

সে বারও বেরিয়েছিল। স্কুটার চালাচ্ছিল তার স্বামী। স্বামীর পেছনের সিটে অদিতি। অদিতির কোলে তাদের বছর দেড়েকের ছোট মেয়ে। আর একদম সামনে, স্কুটারের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের বছর চারেকের বড় মেয়ে। গাড়ি চলছিল। হঠাৎ কোথেকে একটা টাটা সুমো ধীরে চলা মাল বোঝাই ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলল নিয়ন্ত্রণ। একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের স্কুটারের উপর। চার জনই ছিটকে পড়ল। স্বামীর মাথার উপর দিয়ে চলে গেল পেছন থেকে ছুটে আসা একটা সিটিসি বাস। ছোট মেয়েটার মাথায় এমন লাগল যে টানা একুশ দিন কোমায় ছিল সে। তার পর যা হওয়ার তাই। বড় মেয়ের হাত পা ছড়লেও তেমন মারাত্মক কিছু হয়নি। আর ও, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে, গুরুতর আহত অবস্থায় নার্সিংহোমে পড়েছিল দীর্ঘ দিন। ওর বাপের বাড়ির লোকেরা পাশে এসে না দাঁড়ালে যে কী হত! গোটা পরিবারটা ভেসে যেত।

এ সব সেই আট-দশ বছর আগেকার কথা। ওর সেই মেয়েটা এখন ক্লাস

নাইন না টেনে পড়ে। তার পড়াশোনার খরচ নাকি তুষার বলে একটা ছেলে চালায়। অদিতির বরেরই বন্ধু। ডিভোর্সি। কেউ কেউ বলে, ওই ছেলেটার সঙ্গে নাকি অদিতির একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে। ছেলেটা প্রায়ই ওদের বাড়ি যায়। মাঝে মাঝে থাকেও। মেয়েটাকে নাকি সে নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসে।

সেই অদিতির সঙ্গে মাঝখানে বেশ কয়েক বছর ওদের আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু কয়েক মাস আগে একদিন অফিস থেকে ফিরে স্বপ্নদ্বীপ দেখে, অদিতি আর ওই ছেলেটা তাদের বাড়িতে।

সেটা ওর ভাল লাগেনি। সে কথা সৌমনাকে অকপটে বলেওছিল স্বপ্নদ্বীপ। তার পর থেকে ওই ছেলেটাকে তাদের বাড়িতে আর না দেখলেও অদিতিকে কিন্তু ও বহু বার দেখেছে। তাই ইদানীং ওর মনে হচ্ছে, যারা ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয়, তারাও একদিন একটু একটু করে ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে। যেমন তার বউ জড়িয়ে পড়েছে।

সৌমনা সেই থেকে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ওই দিকে মুখ করে একমনে কথা বলে যাচ্ছে। সে দিনও কথা বলছিল। ওর ফোনটায় আবার পাশ থেকে সব শোনা যায়। কী বলছে শোনার জন্য ওর কাছে যেতেই সরে গিয়েছিল সৌমনা। স্বপ্নদ্বীপ অন্য কাজের অছিলায় ফের ওর কাছ ঘেঁষতেই ফোনের মুখ চেপে বরের দিকে তাকিয়েছিল সে। বলেছিল, কী হল? কিছু বলবে?

কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিল ও। ইদানীং তার বউয়ের এই চালচলন মোটেই ভাল লাগছে না তার। বাজারে গিয়ে দরদাম করতেও ইচ্ছে করছে না। ফোন বেজে যায় তো বেজেই যায়, পাশে বসে থাকলেও শুনতে পায় না। চা দিয়ে গেলে ঠান্ডা জল হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে অফিসের কাজেও আজকাল ভুল হয়ে যাচ্ছে তার।

ওর এই দশা দেখে অনিমেষ বলেছিল, তোর কী হয়েছে বল তো? প্রথমে ও কিছু বলতে চায়নি। কিন্তু তার বারবার জেরার কাছে, শেষ পর্যন্ত ও আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। একেবারে ভেঙে পড়েছিল। চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

স্বপ্নদ্বীপের কথা শুনে অনিমেষ বলেছিল, সব সময় ঐটুলির মতো বউয়ের সঙ্গে লেগে থাকিস না তো। জানবি, সবারই নিজস্ব একটা জগৎ আছে। সেখানে তাকে একটু-আধটু ছাড়তে হয়। একটা কাজ কর, বউকে একটু স্পেস দে। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ও তা-ই করেছিল। বউয়ের মোবাইল বেজে উঠলেই ও পাশের ঘরে চলে যেত। যখন-তখন বউ বেরোলেও ও একবারও জিজ্ঞেস করত না, কোথায় যাচ্ছে? অফিস থেকে কোনও কারণে ফোন করলে, দীর্ঘক্ষণ বিজি পেলেও ও জানতে চাইত না, অতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলছিলে? বউয়ের মোবাইল ঘেঁটে দেখত না, কে কী মেসেজ পাঠাচ্ছে, কোন নম্বর থেকে এত ঘনঘন ফোন আসছে। কিন্তু তার সেই স্পেস যে দু'জনের মধ্যে ক্রমশ স্পেসই বাড়িয়ে যাবে, ও তা ঘুণাঙ্করেও বুঝতে পারেনি। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে সৌমনা সেই থেকে কথা বলেই যাচ্ছে। ও যে কখন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে টের পায়নি। আরও একটু এগোলেই ও হাতেনাতে ধরে ফেলতে পারে, এত রাতে ও কার সঙ্গে কথা বলছে। কী বলছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও, ও প্রান্তে কে আছে, ছেলে না মেয়ে, গলার স্বর শুনে সেটা তো বোঝা যাবে। কিন্তু না, ও আর এক পা-ও এগোল না। যে ভাবে চুপিচুপি পা টিপে টিপে ব্যালকনিতে এসেছিল, তার চেয়েও সন্তর্পণে ওখান থেকে ও ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সকালবেলায় স্বপ্নদ্বীপের সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে সৌমনা বলল, অ্যাঁই, বলছিলাম কি, তুমি অফিস থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে পারবে?

— কেন?

— দেখো না, যদি একটু বেরোতে পারো। চারটে-সাতটা চারটে হলেও হবে।

— কেন? সেটা বলবে তো?

— আমি দু'-একজনকে বলেছি। তারা আসবে কি না জানি না। তুমি যদি থাকো খুব ভাল হয়।

— কোথায়?

— রেজিস্ট্রি অফিসে।

— রেজিস্ট্রি অফিস?

— ওহ, তোমাকে তো বলাই হয়নি। অদিতিরা বিয়ে করছে।

— বিয়ে! যেন আকাশ থেকে পড়ল স্বপ্নদ্বীপ। মানে?

— সে অনেক কথা। তোমার মনে আছে, কয়েক মাস আগে ওর সঙ্গে একটা ছেলে এসেছিল। ওরা চলে যাওয়ার পর তুমি খুব আপত্তি করেছিলে...

— হ্যাঁ, ওই তো, তুষার...

— হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, তুষার। জানো তো, ওদের দু'জনের না খুব ভাব। ছেলেটা ডিভোর্সি। ওর বাবা-মা চাইছে ছেলেটার আবার বিয়ে দিতে। সে যেমন মেয়েই হোক। প্রথম বার অনেক দেখে শুনে, বাছবিচার করে, ঠিকুড়ি কোষ্ঠী মিলিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই বিয়ে যখন ভেঙে গেছে, ওরা বলছে, আর ও সব নয়, এখন হাতের কাছে যাকে পাবেন, তার সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দিবেন। সে ডিভোর্সিই হোক আর বিধবাই হোক, মেয়ে হলেই হল। ও অদিতিকে বারবার বলছিল বিয়ের কথা, কিন্তু অদিতি রাজি হচ্ছিল না।

— কেন?

— বলছিল, মেয়ে বড় হয়েছে, এই বয়সে, ও মানতে পারবে কি না। তাই তো মাঝে মাঝে আমি ওর বাড়ি যেতাম। মেয়েটার স্কুলে যেতাম। ওকে নিয়ে কোনও রেস্টোরাঁ বা পার্কে বসে ওকে বোঝাতাম। মেয়েদের মাথার উপরে একটা ছাতা না থাকলে...

— ও, তাই তুমি মাঝেমধ্যে ছুটহাট করে বেরিয়ে যেতে?

— তা হলে কি ঘুরতে যেতাম? তা, ওর মেয়েকে তো রাজি করালাম। সমস্যা শুরু হল অদিতিকে নিয়ে। ও কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। ক'দিন ধরেই তাই বোঝাচ্ছিলাম। বললাম, তোর মেয়ে যখন রাজি হয়ে গেছে, তোর অসুবিধে কোথায়? তা ছাড়া, তুই ওকে ভালবাসিস। ও-ও তোকে ভালবাসে। তোকে যে ভালবাসে, তাকে তুই ফিরিয়ে দিবি? ও দিকে ওর বাবা-মা যে ভাবে ওকে চাপ দিচ্ছে, ও আর কত দিন এটা-ওটা বলে বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখবে বল? ও যদি অন্য কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, তোর ভাল লাগবে? সহ্য করতে পারবি? তুই একা একা মেয়েটাকে মানুষ করতে পারবি তো? তোর মেয়ের যে এত খরচ, সেটা তুই একা চালাতে পারবি? কাল তো রাত একটা-দেড়টা অবধি ওকে বুকিয়েছি...

— কাল তুমি ওর সঙ্গে কথা বলছিলে?

— হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?



— না, এমনিই, মনে হল, তাই বললাম।

— আই, একটু দ্যাখো না, যদি অফিসটা একটু ম্যানেজ করতে পারো।

— ও রাজি আছে তো?

— এখন পর্যন্ত তো আছে। এই তো একটু আগে কথা বললাম। কখন মত বদলে যায়, তাই আমরা আর কেউই দেরি করতে চাইছি না। শুভস্য শীঘ্রম। দেখো না গো...

চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্বপ্নদ্বীপের মনে হল, অনিমেষের কথা মতো বউকে দেওয়া সেই স্পেসটাই বুঝি মাঝখানের সমস্ত স্পেস বুজিয়ে দিয়ে ওদের দু'জনকে আজ এত কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। স্বপ্নদ্বীপ বলল, ফোনটা দাও তো।

সৌমনা চার্জ থেকে খুলে মোবাইলটা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দিতেই টপাটপ বোতাম টিপল স্বপ্নদ্বীপ। — অনিমেষ, আমি আজ অফিসে যাচ্ছি না। একটু ম্যানেজ করে নিবি?

সৌমনা অবাক।— তুমি অফিস যাবে না?

স্বপ্নদ্বীপ বলল, না! একদম না। আজ সারা দিন শুধু তোমার সঙ্গে থাকব। সারা দিন।



## কোড

প্যাস্টেলের বাস্কাটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না তুতান। অথচ আজ বিকেলেই আঁকার ক্লাস। বাবাকে বলতেই ওর বাবা বললেন, আগে বলতে পারতিস তো। এইমাত্র বাজার থেকে এলাম। একবারে নিয়ে আসতে পারতাম।

তুতান চুপ।

সপ্তাহে দু'দিন বাজার করেন ওর বাবা। বৃহস্পতিবার বিকেলে। অফিস থেকে ফিরে। আর এই রবিবার সকালে। একসঙ্গে তিন-চার দিনের শাক সবজি, মাছ, মাংস নিয়ে আসেন। আর বাজার থেকে ফিরেই তার এক কাপ গরমাগরম চা চাই। সে শীতকালই হোক বা গ্রীষ্ম। চা খেলেই তার বাবা একদম দিলখুশ। এটা যেমন ওর মা জানেন, তুতানও জানে।

বাবার চা খাওয়া শেষ হতেই তুতান বলল, বাবা, চলো না রং নিয়ে আসি। বিকেলে আঁকার ক্লাস আছে।

— দাঁড়া দাঁড়া, নিয়ে আসছি। বাবা বলতেই ও বলল, আমিও যাব।

— তুই আবার কী করতে যাবি?

ভেতরঘর থেকে ওর মা বলে উঠলেন, ও যখন যেতে চাইছে, নিয়ে যাও না। থাকলেই তো হয় পোগো, নয় কাটুন নিয়ে বসবে।

ওর বাবা বললেন, ঠিক আছে।

দোকানটা একটু দূরে। বাবার হাত ধরে যেতে যেতে রাস্তার এক ধারে লোকজনের একটা জটলা দেখে তুতান বলল, বাবা, আমি বাঁদরখেলা দেখব।

— বাঁদরখেলা?

— ওই তো ওখানে।

ক'দিন আগে ছুটির সময় ওদের স্কুলের সামনে বাঁদরখেলা বসেছিল। সেখানেও এ রকম ভিড় হয়েছিল। আর ওই একই রকম ভিড় দেখে ওর মনে হয়েছে, এখানেও বুঝি বাঁদর খেলা হচ্ছে।

ওর বাবা বললেন, বাঁদরখেলা না রে, আমার মনে হচ্ছে, অন্য কিছু হবে।

ও নাছোড়বান্দা। — চলো না, গিয়ে দেখি, বলেই বাবাকে টানতে টানতে ও নিয়ে গেল সেখানে। গিয়েই বাবার হাত ছেড়ে সবাইকে ঠেলেঠেলে একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল। না। বাঁদরখেলা নয়। রাস্তার উপরে একটা প্লাস্টিক শিট বিছানো। তার উপরে কতকগুলো কৌটোটোটো, গাছের শিকড়বাকড়, হাড়গোড় আর মানুষের মাথার একটা খুলি। সেখানে একটা ছেলে বসে আছে। কালো পুরু কাপড় দিয়ে তার চোখ বাঁধা। তাদের ঘিরে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। তার মধ্যে তুতানও আছে। সেখানে নীল জামা পরা একটা লোক গোল করে জটলা হওয়া লোকগুলোর কাছে যাচ্ছে, তাদের এক একটা জিনিস ধরছে আর জিজ্ঞেস করছে, এটা কী? ওটা কী? সেটা কী? আর চোখ বাঁধা ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে তা বলে দিচ্ছে।

নীল জামা পরা লোকটা তখনও বলে যাচ্ছে, টনির ভাই...

— হ্যাঁ ভাই... উত্তর দিল চোখ বাঁধা ছেলেটা।

লোকটা বলল, আমার সঙ্গে ঘুরতে যাবে?

— কোথায় কোথায় যাবে?

— সব জায়গায় যাব।

— এখানে এসো। ভিড়ের সামনে ঘুরতে ঘুরতে একবার এ দিকে আর একবার ও দিকে যাচ্ছে লোকটা।

ছেলেটা বলল, যাচ্ছি।

লোকটা সামনে একটা লোকের চশমা দেখিয়ে বলল, কী দেখছ?

ছেলেটা বলল, চশমা।

অবাক হয়ে গেল তুতান। লোকটার তো চোখ বাঁধা। কী করে বলল!

তার পাশেই অন্য আর একটা লোকের কাছে গিয়ে তার জামা দেখিয়ে লোকটা বলল, গায়ে কী?

ছেলেটা বলল, জামা।

— না বলতে পারলে কিন্তু দাদা রেগে যাবে। জামার রংটা কী বলো...

ছেলেটা বলল, লাল।

তুতান চমকে গেল। অদ্ভুত তো! স্কুলে টিফিনের সময় যখন কোনও মেয়ে পেছন দিক থেকে তার চোখ টিপে ধরে, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, কে

ধরেছে। আর, ওই ছেলেটা, চোখ বাঁধা অবস্থায় অত দূর থেকে জামার রং বলে দিচ্ছে!

ওই লোকটার পাশেই একটা টাকমাথা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার মাথায় হাত রেখে সে বলল, আমি কোথায় হাত দিলাম?

ছেলেটা বলল, টাকে।

লোকটা ঘুরে ঘুরে ভিড়ে দাঁড়ানো লোকগুলোর এক-একটা জিনিস দেখানো মাত্রই চোখ বাঁধা ছেলেটা মুহূর্তের মধ্যে পটাপট বলে দিচ্ছে। লোকটা ফের আর একটা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তার বুকপকেটে থাকা কলম দেখিয়ে বলল, এটা কী?

ছেলেটা বলল, পেন।

যার কলম, সে পকেট থেকে কলমটা বের করে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, এটায় কী রঙের কালি আছে, ও বলতে পারবে?

লোকটা বলল, কেন পারবে না? আলবাত পারবে। বলেই কলমটার খাপ খুলে নিজের হাতের তালুতে খচখচ করে দু'-তিন বার ঘষেই বলল, ও টনির ভাই, বলো তো এই পেনের কালিটা কী রঙের?

ছেলেটা বলল, নীল। যার পেন তার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। একটা ছেলের হাতে ছিল মোবাইল। ওই মোবাইলটা হাতে নিয়ে নীল জামা লোকটা বলল, আরে মাথামোটা ভাই, বলো তো এটা কোন কোম্পানির মোবাইল?

ছেলেটা বলল, মটোরোলা।

যার মোবাইল, তার হাতের দিকে তাকাতে লাগল আশপাশের লোকেরা। একজন পকেট থেকে তার হ্যান্ডসেটটা দেখিয়ে বলল, এটা কোন কোম্পানির হ্যান্ডসেট ও বলতে পারবে?

— কেন পারবে না? লোকটা এক ঝলক সেটটা দেখে নিয়েই বলল, এটা কী কোম্পানির বলতে পারবে?

সে বলল, নোকিয়া।

তুতান যত দেখছে ততই চমকে চমকে উঠছে। সে যখন বিকেলবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে মাঝেমাঝে কানামাছি খেলে, চোখ বেঁধে দিলে তো সে কিছুই দেখতে পারে না। আন্দাজে আন্দাজে কোনও রকমে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে একবার এ-দিকে একবার ও-দিকে যায়। যে দিকে যাচ্ছে ভাবে, চোখ

খুললে দেখে, সে একেবারে অন্য দিকে চলে এসেছে। ছেলেটা এত দূরে যে, চোখ খোলা থাকলেও লোকটা কী দেখাচ্ছে, ওখান থেকে বোঝা মুশকিল। আর ওই ছেলেটার চোখ তো মোটা কাপড় দিয়ে বাঁধা, তবু ও দেখছে কী করে? না দেখলে কি কেউ এই ভাবে একেবারে প্রত্যেকটা জিনিস নির্ভুল ভাবে বলতে পারে? তা হলে কি ও কোনও মস্তটন্ত্র জানে?

নীল জামা পরা লোকটা ততক্ষণে আর একজনের কাছে গিয়ে তার হাতঘড়ি দেখে বলল, টনির ভাই, এ দিকে এসো। টাইমে টাইমে বলো, দাদার হাতের ঘড়িটা কোন কোম্পানির?

ছেলেটা বলল, টাইমেক্স।

শুধু তুতান নয়, অবাধ হয়ে যাচ্ছে সবাই। একজনের বুদ্ধি সন্দেহ হয়েছিল, সে ভিড় ঠেলে সামনে এসে তার আংটিটা দেখিয়ে বলল, দাদা, এই পাথরটার কী রং ওকে বলতে বলুন দেখি...

নীল জামা পরা লোকটা বলল, আরে এ দিকে এসো, আরও সামনে ভাল করে দ্যাখো, দাদার আংটিটার পাথরের রং কী?

ছেলেটা বলল, সাদা।

নীল জামা লোকটা এ বার একজনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, দাদা, আপনি তো খুব পেটের রোগে ভোগেন। ভাল করে চিকিৎসা করান।

লোকটা হাঁ হয়ে গেল। সত্যিই তো, তার পেটের রোগ আছে। আর একজনের সামনে গিয়ে সে বলল, একবার তো অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে খুব জোর বেঁচে গেছেন। একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন।

তুতান বিস্মিতর পর বিস্মিত। যাকে চেনে না, জানে না, তার কী অসুখ আছে, সে কবে অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেছে, উনি জানলেন কী করে! এমনিতে ও পড়াশোনায় ভাল। একবার শুনলেই মনে রাখতে পারে। ও প্রতিটা প্রশ্ন আর তার উত্তর মন দিয়ে শুনতে লাগল। হঠাৎ নীল জামা লোকটা ওর কাছে এসে বলল, টনির ভাই, বলো তো এটা ছেলে না মেয়ে?

ছেলেটা বলল, মেয়ে।

তুতানের পাশে ছিল একটা লোক। সে হঠাৎ বলল, দাদা, আমার পকেটে কত টাকা আছে ও কি বলতে পারবে?

নীল জামা লোকটা বলল, না। কারও নাম, কে কোথায় থাকে বা কে কোথায় কাজ করে কিংবা কার পকেটে কত পয়সা আছে, এ সব উত্তর ও

দেবে না। এ ছাড়া যদি অন্য কোনও প্রশ্ন থাকে তো বলুন।

ওই লোকটার পাশেই যে লোকটা ছিল, সে পকেট থেকে ছোট্ট একটা তালা, সঙ্গে সুতো লাগানো চাবি দেখিয়ে বলল, এটা কী বলতে বলুন তো... লোকটা দেখল, তালাটা একেবারে নতুন। বুঝতে পারল, লোকটা এফুনি কিনে নিয়ে আসছে।

নীল জামা লোকটা বলল, টনির ভাই, এ দিকে এসো। দাদা কী দেখাচ্ছে বলো।

চোখ বাঁধা ছেলেটা বলল, সাদা।

নীল জামা লোকটা রেগেমেগে বলে উঠল, তোমার মাদুলি কাজ করছে না। ঠিক করে বলো। তার পরেই গোল করে ঘিরে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা হাতগুলো ছেড়ে দিন। হাত বাঁধা থাকলে ওর অসুবিধে হয়। এ কথা শোনামাত্র যারা বিবেকানন্দের মতো দাঁড়িয়েছিল বা যারা এক হাত দিয়ে অন্য হাত ধরে ছিল কিংবা হাতের তালু মুঠ করে ছিল, তারা সবাই যে যার হাত ছেড়ে দিল। নীল-জামা ফের তালার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাল করে দেখে নাও, এখানে যে ভাইবোনেরা আছে, তারা জানতে চায়, সবাই যা দেখছে, সেটা কী, সেটা বলো। এ বার ‘কী’ শব্দটার উপরে জোর দিল সে।

অমনি চোখ বাঁধা ছেলেটা বলল, আরে বাবা, তালা, তালা।

তুতান অবাক। কী করে বলল ছেলেটা!

লোকটা তখনও বলে যাচ্ছে, এটা এমন কিছু না। আপনারাও বলতে পারবেন। শুধু একটা মাদুলি। বাস। শিকড়বাকড়, কৌটোটোটো আর মানুষের খুলি যেখানে ছিল, সেখান থেকে একটা বড়মতো ডিবে তুলে নিয়ে এসে বলল, এই কৌটোয় কয়েকটা শিকড় আছে। মহামূল্যবান শিকড়। সুতো দিয়ে পরলে এটা শুকিয়ে পড়ে যেতে পারে, সে জন্য মাদুলির মধ্যে ভরা আছে। এই মাদুলি সঙ্গে থাকলে, একুশ দিন পর থেকে আপনিও চোখ বন্ধ করে সব বলে দিতে পারবেন। যেমন ও পারছে।

শিকড়! চকচক করে উঠল তুতানের চোখ। লোকটা বলে যাচ্ছে, এই শিকড়টা যার যার লাগবে, হাত তুলুন। ছড়োছড়ি করবেন না। সবাই পাবেন। আমি প্রত্যেককেই দেব। এর জন্য কোনও পয়সাকড়ি লাগবে না। আমার গুরু, কামাখ্যা কামরূপে সাধনা করে এই শিকড়টার সন্ধান পেয়েছেন। উনি



বলে গিয়েছেন, এটা তোকে দিয়ে গেলাম বেটা। তুই লোককে দিবি। লোকের ভাল করবি। তাই এই শিকড় দেওয়ার জন্যই আমি এখানে এসেছি।

তুতান পেছনে তাকাল। তার বাবা বোধহয় একদম পেছন দিকে রয়েছে। বাবা কি হাত তুলেছে! অনেকেই হাত তুলেছে। তুতানও হাত তুলল।

হঠাৎ সে তার বাবার গলা শুনতে পেল, তুতান, তুতান...

পেছন ফিরে সে বলল, হ্যাঁ বাবা...

— এ দিকে আয়।

— শিকড়টা নিয়ে নিই...

— এ দিকে আয়, এ দিকে আয়...

কী করবে বুঝতে পারছে না তুতান। তার পর ভাবল, অত বড় একটা ডিবে ভর্তি মাদুলি, মাদুলি তো এইটুকু-টুকু হয়, ওখানে কি আর চার-পাঁচশোটা হবে না? সেই তুলনায় তো লোক অনেক কম। সবার শেষে গেলেও সে একটা পাবে। তাই ভিড় ঠেলে ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে এল সে।— কী বলছ?

— চল, রং নিবি না?

— আগে শিকড়টা নিয়ে নিই।

— শিকড়?

— হ্যাঁ, বিনে পয়সায় দিচ্ছে গো...

— ধ্যাত, যত সব। চল। প্রায় ধমকের সুরেই কথাটা বলল ওর বাবা।

— আরে, শিকড় নিলে একুশ দিনের পর থেকে আমিও চোখ বন্ধ করে সব বলতে পারব। লোকটা বলল, শুনলে না!

— তুই ওই লোকটার কথা বিশ্বাস করেছিস? ওগুলো সব বাজে কথা।

— বাজে কথা! তা হলে ওই চোখ বাঁধা ছেলেটা সব বলছে কী করে?

— এটাকে বলে সাংকেতিক ভাষা। এটা কেবল ওরা দু'জনেই বুঝতে পারবে। অন্যরা হাজার চেষ্টা করলেও বুঝতে পারবে না। ওই নীল জামা পরা লোকটা যা যা প্রশ্ন করছিল, সেই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর দেওয়া ছিল। সেই উত্তরটাই চোখ বাঁধা ছেলেটা বলে যাচ্ছিল।

— কী করে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করল তুতান।

ওর বাবা বললেন, এই খেলা দেখাবার আগে অন্তত পঞ্চাশবার ওরা প্র্যাক্টিস করেছে। আর সেখানেই ওরা ঠিক করে নিয়েছে, কোন সংকেত দিলে কী উত্তর দিতে হবে। যেমন লোকটা প্রথমেই বলল, কী দেখছ? লোক

কী দিয়ে দেখে? চশমা দিয়ে। তাই তো? ওই 'দেখা' মানেই চশমা। ফলে ছেলেটা বলল, চশমা। তার পরে বলল, গায়ে কী? ছেলেটা বলল, জামা। গায়ে তো প্যান্ট থাকবে না। জামাই থাকবে।

— যদি শাড়ি পরে থাকত? তুতান জানতে চাইল।

— তখন প্রশ্নটা আর 'গায়ে কী' হত না। হত 'পরনে কী?'

— কিন্তু জামার রংটা বলল কী করে?

— প্রশ্নটা মনে আছে? জামার রং জিজ্ঞেস করার আগে লোকটা বলেছিল, 'না বলতে পারলে কিন্তু দাদা রেগে যাবো।' ওই 'রাগ'টাই হচ্ছে কোড। আমরা যেমন অনেক সময় বলি, রেগে লাল। তার মানে রাগের রং লাল। লোকটা যখনই 'রাগ' শব্দটা বলেছে, ছেলেটা বুঝে গেছে, আমাকে লাল বলতে হবে।

— মাথায় হাত দিয়ে যখন জিজ্ঞেস করল, কোথায় হাত দিলাম, তখন ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে টাক বলে দিল কী করে?

— সেটা আগে থেকেই ওদের ঠিক করা আছে। বেশির ভাগ লোকেরই তো চুল আছে। ওই ভিড়ের মধ্যে যদি টাক মাথা কাউকে দেখা যায়, তা হলে তার মাথায় হাত রেখেই সে এই প্রশ্নটা করবে। আর ওই প্রশ্নটা করলেই ও বলে দেবে, টাক।

— কলমটা কী করে বলল?

— এটাও আগে থেকে ঠিক করা আছে। বুক পকেটে কেউ আর ট্রানজিস্টর নিয়ে ঘুরবে না। ঘুরলেও তাকে দেখিয়ে ও জিজ্ঞেস করবে না। যার পকেটে কলম আছে, একমাত্র তাকে দেখিয়েই ও প্রশ্ন করবে, পকেটে কী? ফলে ওই লোকটা এই প্রশ্নটা করতেই ছেলেটা বলল, কলম।

— কালির রংটা বলল কী করে?

— এটা আরও সোজা। কারণ বেশির ভাগ লোকই নীল রঙের কালি ব্যবহার করে। তাই।

— যদি কালো রং হত?

— তখন অন্য কোড দিত।

— ঠিক আছে, এটা নয় হল। কিন্তু মোবাইলটা কোন কোম্পানির সেটা বলল কী করে?

— তার আগে কী বলেছে মনে আছে?

— হ্যাঁ, ওরে মাথামোটা...

— এই 'মাথামোটা'টাই হচ্ছে কোড। মাথামোটা মানে 'ম'। আর ম মানেই মটোরোলা।

— তা হলে পরেরটা বলল কী করে?

— ও বলেছিল, 'এটা কী কোম্পানি?' নোকিয়ার মাঝের অক্ষরটা 'কী'। ফলে কী মানেই নোকিয়া।

— যদি মটোরোলা বা নোকিয়া না হয়ে অন্য কোনও কোম্পানির হত?

— তা হলে তার কোড অন্য হত। যেমন আমারটা স্যামসং। আমারটার ক্ষেত্রে হয়তো বলত, দাদার মোবাইলটা বেশ সুন্দর। এই সুন্দরের 'সু' দেখেই চোখ বাঁধা ছেলেটা স্যামসংয়ের তৃতীয় অক্ষর 'সু'য়ের সঙ্গে মিলিয়ে স্যামসং বলে দিত।

— আচ্ছা, ঘড়িটা কোন কোম্পানির, সেটা বলল কী করে?

— ওই কোড অনুযায়ী। কোন কোম্পানি জিঙ্কস করার আগেই কিন্তু লোকটা বলে দিয়েছিল, টাইমে টাইমে বলো। এই 'টাইমে টাইমে'টাই হচ্ছে কোড। টাইমে টাইমে মানেই টাইমেক্স।

— আচ্ছা, নীল জামা পরা লোকটা ওই লোকটাকে বলল কী করে, আপনি পেটের রোগে ভোগেন?

— ওটা কমন সেন্স। নব্বুই ভাগ লোকই কমবেশি পেটের রোগে ভোগে।

— যারা পেটের রোগে ভোগে না। না বুঝে তেমন কাউকে যদি ভুল করে এই কথা বলে দিত?

— কোনও অসুবিধে হত না। কারণ, এতগুলো ঠিক বলছে তো... তখন ওই লোকটাই ধন্দে পড়ে যেত, তা হলে কি আমি এত দিন বুঝতে পারিনি যে, আমার পেটের রোগ আছে। মনে মনে বলত, ঠিক আছে বাবা, একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেব।

— আর অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা?

— ওই একই ব্যাপার। শহরে ঘুরবে আর একবারও অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হবে না, এমন লোক কি একটাও আছে নাকি? ফলে মিলে যাচ্ছে। আবার এই খেলাটা যদি এরা গ্রামের দিকে গিয়ে দেখাত, তখন অ্যাক্সিডেন্টের ধরন পালেট যেত। হয়তো বলত, আপনি ছোটবেলায় একবার পুকুরে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছিলেন...

— আমাকে দেখিয়ে যখন জিজ্ঞেস করল, ছেলে না মেয়ে, তখন কী করে বলল, মেয়ে?

— কী বলেছিল মনে আছে? ছেলে না মেয়ে? প্রশ্নের মধ্যেই কিন্তু উত্তর আছে। ভাল করে শোন। উনি বলেছেন, ছেলে না মেয়ে? তার মনে প্রথমেই বলে দিচ্ছে ‘ছেলে না।’ আবার তার পরেই বলছে ‘মেয়ে।’ ফলে ও বলছে মেয়ে। মনে রাখবি, নীল জামা পরা লোকটা যা দেখছে, চোখ বাঁধা ছেলেটা কেবল সেটুকুই বলতে পারবে, তার বাইরে কিছু বলতে পারবে না। দেখলি না, ওই লোকটা বলল, কারও নাম-ধাম, কোথায় কাজ করে বা পকেটে কত টাকা আছে, সেটা বলা যাবে না।

— ও... আচ্ছা, প্রশ্নের মধ্যেই যদি উত্তর থাকে, তা হলে তালার ক্ষেত্রে প্রথমেই ঠিক করে বলতে পারল না কেন?

— কারণ, লোকটা ওকে কোড দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ছেলেটা বুঝতে পারেনি। তোর মনে আছে, একটা লোকের আংটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, পাথরের রংটা কী? ছেলেটা বলেছিল, সাদা। এই ‘কী’ হচ্ছে সাদার সংকেত। তাই লোকটা যখন বলল, দাদা কী দেখাচ্ছে বলো। ছেলেটা ওই ‘কী’র উপরে ভর করে বলে ফেলেছিল সাদা। আর সেই উত্তর শুনেই নীল জামা লোকটা বুঝতে পেরেছিল, ও তার কোড বুঝতে পারেনি। তাই সঙ্গে সঙ্গে লোকের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই ও বলেছিল, তোর মাদুলি কাজ করছে না। তার মানে তুই আমার কোডটা বুঝতে পারিসনি। নতুন কোড দিচ্ছি। আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছিল, আপনারা আপনাদের হাতগুলো ছেড়ে দিন। এমন করে কথাটা বলেছিল, যেন ওই হাত বাঁধা থাকার জন্যই ছেলেটা ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারছে না।

— তার পরে তো ঠিক বলল।

— হ্যাঁ। তখন লোকটা অন্য কোড দিল। বলল, ‘এখানে যে ভাইবোনেরা আছে, তারা জানতে চায়, সবাই যা দেখছে, সেটা কী, সেটা বলো।’ এই ‘কী’টার উপরে জোর দিল সে। কী মানেই চাবি।

— কিন্তু তুমি যে একটু আগে বললে ‘কী’ হচ্ছে ‘সাদা’র সংকেত।

— হ্যাঁ, ‘কী’ হচ্ছে সাদার সংকেত। কিন্তু সেই ‘কী’ উচ্চারণের আবার তারতম্য আছে। মনে করে দ্যাখ, উচ্চারণের সময় এই ‘কী’টার উপরে একটু জোর দিয়েছিল লোকটা। আর তার আগে বলে দিয়েছিল ‘ভাইবোনে’রা।

অর্থাৎ একজনের সঙ্গে অন্যজনের ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। ফলে চাবি যদি ভাই হয়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই বোন হবে তালা। সেটা বুঝে নিয়েই ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছিল, তালা।

— তা হলে এই শিকড়বাকড় কিচ্ছু না?

— না! বাবা বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন।

— কিন্তু বিনে পয়সায় দিচ্ছে যে...

— বিনে পয়সায় বলছে, এর পরেই বলবে, শিকড়টা বিনে পয়সায় দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু মাদুলিটার তো দাম আছে। তা ছাড়া প্রণামী না দিলে কোনও কাজ হয় না। বাবার পূজোর জন্য যে যা পারেন দিন। বেশি না পারলেও, অন্তত একুশ টাকা দিন। যদি দশটা লোকও দেয়, তা হলে কত হয়? দুশো দশ টাকা। তার পর বলবে, যাদের একুশ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের জন্য বাবা বলেছেন, যদি এগারো টাকাও দেয়, দিয়ে দিবি। এই ভাবে ধাপে ধাপে ওরা পাঁচ টাকাতে নেমে আসবে। শেষে, শুধু শিকড় দেবে পাঁচ সিকিতে। এই ভাবে এক-একবার খেলা দেখিয়ে ওদের কত রোজগার হয় জানিস? কম করেও তিন থেকে চারশো টাকা। দিনে যদি চারটে জায়গাতেও খেলা দেখায়, কত হয় একবার ভাব...

— কিন্তু এ সব তুমি জানলে কী করে?

রঙের দোকানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বাবা বললেন, আমার এক বন্ধু আছে, অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী।

— ও, যে কাকুটা গণশক্তিতে কাজ করে?

— না না, এটা সেই কাকু না। এ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য। এই সব তুকতাক, তন্ত্রমন্ত্র, ভূতে ধরা, ভর হওয়ার মতো নানা বুজরুকি আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্য ও বিভিন্ন জায়গায় শো করে। ও-ই কথায় কথায় আমাকে একদিন বলেছিল, মাদারি কা খেল যারা দেখায়, তারা কী ভাবে নিজেদের মধ্যে কোড ল্যান্সুয়েজে কথা বলে...

— তাই? বাবা, তুমি আমাকে ওই কাকুটার বাড়িতে একদিন নিয়ে যাবে?

— কেন নেব না? নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। ওর বাড়ি তো হরিশ মুখার্জি রোডে, বলরাম বসু ঘাটের পাশেই...

কথা বলতে বলতে ওরা এসে দাঁড়াল বইখাতার দোকানের সামনে। আর

ক'পা গেলেই কাউন্টার। তুতান রং কিনবে। প্যাস্টেল। ও সাধারণত ক্যামেল কোম্পানির রংই কেনে। কিন্তু ক্যামেল না বলেও দোকানদারকে কী বললে দোকানদার ওকে ওই কোম্পানির রংটাই দেবে, ও ভাবতে লাগল। কী বলবে ও! কী! উট মার্কা বললে কি দোকানদার বুঝতে পারবে? ওটা তো ওই কোম্পানির সিম্বল। না কি অন্য কিছু বলতে হবে? একটা ভাল কোড তার চাই। অন্তত একটা ভাল কোড...



## ৪৫ স্ট্রেট পাঞ্চ

পাড়ার মুখের চায়ের দোকানের সামনে একটা জটলা। দূর থেকেই তাদের চোঁচামেচি শুনে আর ধাক্কাধাক্কি দেখে অবনীবাবু বুঝতে পারলেন, কোনও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। ওঁকে শুধু পাড়ার নয়, এলাকার সবাই চেনে। উনি মাথা নিচু করে পাড়া থেকে বেরোন। মাথা নিচু করেই ঢোকেন।

আগে অবশ্য উনি এ রকম ছিলেন না। ভীষণ ফুটিবাজ আর প্রাণবন্ত ছিলেন। হইহই করে কাটাতেন। বক্সিং ছাড়া কিছু বুঝতেন না। পাড়ার ছেলেদের ধরে ধরে ক্লাবে নিয়ে যেতেন। নিজে ট্রেনিং দিতেন। খাওয়ার চাট করে দিতেন। দরকার হলে নিজের পকেটের পয়সা খরচা করে তাদের খাওয়াতেন।

আর নিজের ছেলেকে? সেই ছোটবেলা থেকেই বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন করে নিয়ে আসছিলেন প্রতিবার। শুধু এ রাজ্য নয় বা আশপাশের রাজ্য নয়, যারা বক্সিং সম্পর্কে বিন্দুমাত্র খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানেন, ওই ছেলেটা অবনীবাবুর ছেলে। আর রিংয়ে উঠলে, ও একেবারে হিংস্র বাঘ হয়ে যায়। ঘুসি নয়, যেন এক-একটা থাবা পড়ে প্রতিপক্ষের মুখে।

সেই ছেলে গত বছর মিজোরামে গিয়েছিল ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ লড়তে। সবে পনেরো বছর তিন মাস বয়স। আর ক'মাস পরেই জুনিয়ারে চলে যাবে। ওজন একতিরিশ থেকে তেত্রিশ কিলোর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সবার নজর ওর উপরে। যে দিন লড়াই, তার ঠিক আগের দিন ওরা কয়েক জন বন্ধু মিলে ঘুরতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ কয়েকটা ছেলে রাস্তার মধ্যে তাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। এবং বাকিদের পালাবার সুযোগ করে দিয়ে তাকে রাস্তার উপরে ফেলে বেধড়ক মারধর করে। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে সে। রাস্তার লোকেরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায়, ওর স্পাইনাল কর্ডের হিপ জয়েন্ট ভেঙে গেছে।

সে বছর সাব জুনিয়ারে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব ছিনিয়ে নেয় হরিয়ানার এক ডাকসাইটে নেতার ছেলে যশবন্ত রাঠোর।

খবরটা শোনামাত্র অবনীবাবু থম মেরে গেলেন। যেন ছেলের নয়, তাঁরই শিরদাঁড়া চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। রাস্তার মধ্যেই উনি বসে পড়লেন। ছেলের সঙ্গে তাঁরও চিকিৎসা চলল। কিছু দিন পর উনি উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর ছেলে আর উঠে দাঁড়াতে পারল না। সেই থেকে অবনীবাবু এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে, তিনি ক্লাবে গেলেও, কোণের একটা বেঞ্চে বসে চুপচাপ শুধু ছেলেদের তালিম দেখেন। আর নিশ্চক্ষে চলে আসেন।

উনি যখন মাথা নিচু করে ওই জটলার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে তাকিয়ে দেখেন, একটা ছেলে নাক চেপে বসে পড়েছে। সেখান থেকে গলগল করে রক্ত। বাকি ছেলেগুলো কালো মতো একটা গাট্টাগোট্টা ছেলেকে জাপটে ধরতেই, সে এমন এক ঝটকা মারল যে, ছেলেগুলো ছিটকে গেল। একজন ওই ছেলেটাকে মারতে যেতেই সে তাকে এমন এক ঘুসি মারল, ‘বাবা গো, মা গো’ বলে সে মাটিতে বসে পড়ল। আর একটা ঘুসি মারতে যাচ্ছিল, অবনীবাবু তড়িৎ বেগে সামনে গিয়ে এক হাতের তালু দিয়ে সেটা আটকে দিলেন।

উনি যখনই কোনও ছেলেকে ক্লাবে নিয়ে যেতেন বা ভর্তি হওয়ার জন্য যখনই কেউ আসত, উনি তাদের ঘুসি মারতে বলতেন আর সেই ঘুসি উনি এই ভাবে হাত দিয়ে আটকে দেখতেন, ঘুসির রেঞ্জ কী রকম।

এই কালো মতো গাট্টাগোট্টা ছেলেটার রেঞ্জ দেখে উনি চমকে উঠলেন।

পরদিন চায়ের দোকানে গিয়ে ওই ছেলেটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। ছেলেটার নাম কী? কোথায় থাকে? ওর বাবা কী করেন?

ওই চায়ের দোকানের লোকটার কাছ থেকে আরও জানতে পারলেন, ছেলেটা খুব ভাল। খুব ঠান্ডা প্রকৃতির। কারও কোনও সাত-পাঁচে থাকে না। কয়েক বছর আগে ওর বাবারই এক বন্ধুর সঙ্গে ওর মা পালিয়ে গেছে। ওর মায়ের এই ব্যাপারটা নিয়ে কেউ কিছু বললেই ও খেপে যায়। তখন ও আর ওর মধ্যে থাকে না।

— কী নাম বললেন যেন ছেলেটার?

— নিতাই।

সে দিনই চेतলার সতেরো নম্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে, সাইডিংয়ের পাশে এ-গলি ও-গলি তস্য গলির ভেতর দিয়ে জিঙ্গেস করতে করতে উনি গিয়ে হাজির হলেন নিতাইদের বাড়ি। টালির ছাউনি। ছোট ঘর। ঘরে ঢোকান দু'পাশে একগাদা ড্রাম, জার, বালতি। বালতির উপরে কাঠ পেতে তার উপরে বালতি। জল মজুত করা। প্রথম দিকে রাজি না হলেও অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে শেষ পর্যন্ত উনি তাকে রাজি করালেন। তার পর বললেন, আজ বিকেলে থেকো। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

— কোথায়?

— এস ও পি সি।

নিতাই পেছন ফিরে তাকাল। তার ঘরে তো আর কেউ নেই। তা হলে উনি কাকে বলছেন, এসো পিসি!

— পেছনে কী দেখছ?

— না, আপনি বললেন না... এসো পিসি...

— আরে বাবা, 'এসো পিসি' নয়। বলছি 'এস ও পি সি'। স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচার। এটা একটা ক্লাবের নাম। যেটা ওয়েলিংটনে।

— এখানেও তো বক্সিং ক্লাব আছে। রাসবিহারীতে। গুরুদ্বারের পাশে।

— ওখানে হবে না।

— কে যেন বলছিল, চेतলা পার্কেও নাকি নতুন করে আবার বক্সিং শুরু হচ্ছে...

— সব জায়গায় সব কিছু হয় না। তা-ই যদি হোত, তা হলে সবাই বাড়ির কাছের স্কুলেই বাচ্চাদের ভর্তি করত। কেউ আর দূরে যেত না। পাড়ার মাস্টার ছেড়ে কেউ বাসভাড়া অটোভাড়া দিয়ে দূরে দূরে টিউশন নিতে যেত না। তুমি কৈলাশ স্কুলের উল্টো দিকে 'দেশের খাবার'-এর সামনে দাঁড়িও, ঠিক সাড়ে চারটের সময়। কেমন?

নিতাই মাথা কাত করল।

দু'দিন যায়, চার দিন যায়, ছ'দিন যায়, বিরক্ত হয়ে উঠল নিতাই। অবনীকাকু কাকে বলেছিলেন, দু'-আড়াই মাসের মধ্যে কমপিটিশনে নামাবেন। কিন্তু এ কী, বক্সিংয়ের তো কোনও বালাই-ই নেই। শুধু দৌড় করাচ্ছেন আর স্কিপিং করাচ্ছেন। গাড়িভাড়া দিয়ে এত দূরে নিয়ে এসে এ সব করানোর

মান্নে কী? এ তো চেতলা পার্কেও করাতে পারতেন, না কি?

অবনীবাৰু এত দিন এত ছেলে চরিয়েছেন, ওর চোখমুখ দেখে সব বুঝতে পারলেন। বললেন, সব কিছুর একটা স্থান কাল পাত্র আছে। সাধু হতে গেলেন আগে সাধুসঙ্গ করতে হয়। ওই যে, ওই ছেলেটা পাপিং বাগে তখন থেকে পাঞ্চ করে যাচ্ছে। ওই যে, ওই দেখাছ, ওই ছেলেগুলো তখন থেকে ফ্রি বক্সিং প্র্যাক্টিস করে যাচ্ছে, এই যে এতগুলো ছেলে একসঙ্গে একদম টাইম ধরে স্কিপিং করছে, তুমি কি এটা চেতলা পার্কে পোতে? এই পরিবেশটার সঙ্গে তুমি আগে ধাতস্থ হও, তার পরে বক্সিং শিখবে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে স্কিপিং করার পরে অবনীবাৰু নিতাইকে বললেন, আগে দাঁড়ানো শেখো। বলে, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দেখো, পা দুটো পাশাপাশি জোড়া লাগানো আছে। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল কেমন গায়ে গা লাগিয়ে আছে। এ বার ডান পায়ের মাথাটা ডান দিকে ফিট ফাইভ ডিগ্রি এ ভাবে ঘুরিয়ে দাও। তার পরে বুড়ো আঙুলটা যেখানে আছে, সেখানে রেখে গোড়ালিটা তুলে বুড়ো আঙুলের বরাবর নিয়ে এসো। এই গ্যাপটা ছোট বড় হলে কিছু বক্সিং কেরিয়ার শেষ। এ বার ডান পায়ের গোড়ালিটা একটু তোলো। ঠিক এতটা, বলে উনি নিজে সেটা দেখিয়ে দিলেন। তার পরে বললেন, একটা কথা মনে রাখবে, বাঁ পা সব সময় আগে থাকবে। ফুট ওয়ার্ক ইজ মোর ইম্পট্যান্ট ইন বক্সিং। এ বার হাত দুটোকে ভাঁজ করে পাঁজরের সঙ্গে লাগিয়ে নাকুল দুটোকে দিয়ে মুখটা গার্ড করো।

— নাকুল?

— আরে বাবা, নাকুল, নাকুল। নাকুল মানে গাঁটা। হাত মুঠো করলে আঙুলের হাড়ের যে অংশগুলো উঁচু হয়ে থাকে, সেই গাঁটগুলোকেই বলে নাকুল। বুঝেছ? এ বার এই ডান হাতের মুঠোটা কাত করে পেছনে টেনে নিয়ে স্ট্রেট সামনে ছোড়ে। আর যখন ভেলিভারি অব দ্য পাঞ্চ করবে, তখন বুকের ভেতরের পুরো শ্বাসটা জোরে বার করে দেবে। এতে ঘুসির জোরটা বাড়ে। বুঝেছ? নাও, এই ভাবে জগিং করার মতো করে একা একা প্র্যাক্টিস করো।

— একা একা? সামনে কিছু না থাকলে কাকে দেখে মারব?

— মনে মনে ভেবে নাও, সামনে কেউ আছে। তাকে মারছ। বুঝেছ?

ক্লাবে আসার প্রথম দিনই তার ওজন নিয়েছিলেন অবনীবাবু। আজ পনেরো দিনের মাথায় আবার ওজন নিলেন। তার এই ওজনে তিনি খুব খুশি। বুঝতে পারলেন, তাঁর কথা মতো প্রত্যেক দিন সকালে চেতলা পার্কটা নিতাই অন্তত আট-দশ বার করে পাক দেয়। না হলে ওর এই ওজন হত না। ওর হবে।

নিতাইকে ডেকে দুটো ক্রেপ ব্যান্ডেজ দিলেন। যে ছেলেটা পাকিং ব্যাগে পাক করছিল, তাকে দেখিয়ে বললেন, ওর কাছে গিয়ে দেখে নাও, কী ভাবে এটা পেঁচাতে হবে। ও সেই মতো ওই ছেলেটির কাছে গিয়ে দেখে নিল। তার পরে সেটা হাতে পেঁচিয়ে অবনীবাবুর কাছে আসতেই উনি তাকে দুটো গ্লাভস দিলেন। বললেন, পরে নাও। আর ওই পাকিং ব্যাগে গিয়ে পাক করো। নিতাই তা-ই করতে লাগল।

হঠাৎ কী মনে হতেই অবনীবাবুর কাছে এসে নিতাই বলল, গ্লাভস তো পরেছি। তা হলে আবার আলাদা করে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধার কী দরকার?

উনি বললেন, এটা না বাঁধলে হাতে চোট লাগতে পারে, তাই।

নিতাই কী বুঝল কে জানে, মুখে শুধু বলল, ও।

নিতাইদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। তাই একদিন অন্তর অন্তর ও যাতে ডিম, মাছ বা মাংস খেতে পারে, তার জন্য তিনি প্রায়ই টাকা দিতে লাগলেন।

আর মাত্র তিন মাস বাকি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের। তার আগে অবশ্য বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। সেটা নিয়ে উনি ভাবছেনই না। ওঁর লক্ষ্য ন্যাশনাল।

এখন আর ফ্রি বা পাকিং ব্যাগে নয়, মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য ক্লাবের এক-একটা ছেলের সঙ্গে এক-একটা ছেলেকে উনি ট্যাগ করে দিয়েছেন। নিতাইয়ের সঙ্গে যে প্র্যাক্টিস করছে, তাকে বারবার করে বলে দিয়েছেন, সে যেন প্র্যাক্টিসে নামার আগে অবশ্যই টুথগার্ডটা পরে নেয়।

স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়রদের দু'মিনিট করে তিন রাউন্ড লড়াই। কিন্তু ন্যাশনালে সেটা হয়ে যায় চার রাউন্ড। উনি সবাইকে ওই চার রাউন্ডই লড়তে হবে মাথায় রেখে প্র্যাক্টিস করতে বলেছেন। সবাই তা-ই করছে। নিতাইও করছে।

হঠাৎ একদিন সকালবেলায় হাঁপাতে হাঁপাতে অবনীবাবু এসে হাজির নিতাইদের বাড়ি। আগের মতো ওকে আর ‘তুমিটুমি’ নয়। ইদানীং ‘তুই’ করেই বলছেন। ঘরে ঢুকেই বললেন, দশ পাক নয়, তোকে চোদ্দো পাক করে দৌড়তে হবে পুরো পার্কটা। ন্যাশনালের আগে তোকে অন্তত আরও দেড় কিলো ওজন কমাতে হবে। কমাতেই হবে। যশবন্তের ওজন এখন উনচল্লিশ কিলো।

— যশবন্ত? কে যশবন্ত?

খতমত খেয়ে গেলেন উনি। বললেন, ও সব জেনে তোর কাজ নেই। তুই পারবি না, বল? না হলে যে আমি হেরে যাব। চোখ ছিলছিল করে উঠল অবনীবাবুর। ও কিছু বুঝতে পারল না। শুধু বলল, পারব।

উনি বললেন, আর একটা কথা মাথায় রাখবি, পাঞ্চ যখন করবি, একদম কারেন্ট পাঞ্চ করবি। যেন ফল্‌স না হয়। ফল্‌স হলে এনার্জি লস হয়। দেখেশুনে বুঝেসুজে মারবি। ন্যাশনালে কিন্তু ম্যানুয়ালি নয়, পয়েন্ট কাউন্ট হয় ইলেকট্রনিক্সে।

অন্য ছেলেরা তো বটেই, ক্লাবের বয়স্ক সদস্যরা পর্যন্ত খুব একটা ভাল চোখে দেখছিল না অবনীবাবুর এই পক্ষপাতিত্ব। তাঁর পেছনে নানা কথা আলোচনা হতে লাগল।

এ বার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে বডিগার্ডে। খেলার আগের দিন অবনীবাবু দশটা টাকা দিয়ে নিতাইকে বললেন, যা চুল বানিয়েছিস, লড়তে গেলে তো চোখে এসে পড়বে। যা, চুলটা কেটে আয়। আর হ্যাঁ, একটু ছোট ছোট করে কাটিস, কেমন? নিতাই তাই করল।

ঠিক হয়েছে যে যার মতো বডিগার্ডে চলে যাবে। নিতাইও তাই ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু অবনীবাবুই বললেন, তুই একা বাড়ি থেকে বেরোবি না। আমি তোকে নিয়ে যাব।

খেলা সন্ধ্যাবেলায়। উনি সাড়ে চারটের মধ্যে নিতাইদের বাড়ি চলে গেলেন।

— এত আগে? নিতাই অবাক।

উনি বললেন, তোর সঙ্গে ক’টা কথা আছে। শোন, তুই একটু হিসেব করে খেলিস।



— হিসেব করে মানে?

— মানে এমন ভাবে খেলবি, যাতে তুই জিতে যাস। কিন্তু পয়েন্টের ব্যবধান যেন খুব একটা বেশি না হয়।

— কেন কাকু?

— সেটা তোর জানার দরকার নেই। আমি যা বললাম, তুই তা-ই করবি। বুঝেছিস? আমি চাই না তোর উপর কারও নজর পড়ুক।

রেড কর্নার থেকে লড়াই শুরু করল নিতাই। ব্লু কর্নারে তখন আমতলার গণেশ। গণেশ যত বারই পাঞ্চ করছে, ও তত বারই গার্ড করে নিচ্ছে। দ্বিতীয় রাউন্ডে একটাও হাত চালান না নিতাই। গণেশের পাঞ্চগুলি শুধু পাশ কাটিয়ে গেল। তৃতীয় রাউন্ডের শেষের দিকে দর্শকেরা যখন এই ম্যাডম্যাডে খেলা দেখতে দেখতে হতাশ, ঠিক তখনই গণেশকে যেন ইচ্ছে করেই ক'টা মারার সুযোগ দিল নিতাই। তার পরেই একটু পিছিয়ে এসে পর পর কয়াল দুটো ছক। তৃতীয় রাউন্ডের শেষে চার-সাতে জিতে গেল নিতাই।

ক'দিন পরেই ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। এ বার হরিয়ানায় হচ্ছে। রাজ্য থেকে এগারো জনের একটা দল যাচ্ছে। যাচ্ছে নিতাইও। এখন সকাল হলেই অবনীবাবু চলে যান নিতাইদের বাড়ি। ওকে নিয়ে চেতলা পার্কে গিয়ে দৌড় করান। স্কিপিং করান। ছোটখাটো ফ্রি এক্সারসাইজ করান। আর বিকেলের আগেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যান এস ও পি সি-তে। অনেক ছোটখাটো মুভমেন্ট, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্টেপ যেমন শেখান, তেমনই শেখান কী ভাবে নজর রাখতে হয় প্রতিপক্ষের চোখের দিকে। তার মুভমেন্টের দিকে। প্রতিপক্ষ তখন কোন হাত চালাতে পারে, তার আগাম হৃদিশেরও টিপস দিয়ে দেন তিনি। প্রতিপক্ষ কত পয়েন্ট পাচ্ছে সে দিকে নয়, তোকে শুধু মেরে যেতে হবে। শুধু মার। কারেঙ্ক পাঞ্চ হলে ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই। শুধু মেরে যাবি। এলোপাথাড়ি মার।

নিতাই অবাক। আগে উনি বলতেন, কারেঙ্ক পাঞ্চ করবি। আর এখন বলছেন কিনা, কারেঙ্ক পাঞ্চ হলে ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কারেঙ্ক পাঞ্চ না হলে তো পয়েন্ট পাব না। উনি হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন!

বিশ্বাস করে ক্লাবেরাই এক বন্ধুকে এ কথাটা বলায়, সে বলল, দ্যাখ, তোর

বিপক্ষে কে লড়ছে, সেটা জানতে পেরে তাদের কাছ থেকে উনি হয়তো টাকা খেয়েছেন। কিছু বলার যায় না। না হলে কেউ বলে, কারেক্ট পাঞ্চ না হলে ও ক্ষতি নেই...

— সে কী! অবাক হয়ে গেল নিতাই। ভেতরে ভেতরে ভেঙে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অবনীকাকুও! ছিঃ। সে দিন বাড়ি ফিরে সে কিছু খেল না। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে খুব কাঁদল।

অবনীবাবু সকালে ওর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, ও নেই। বেলার দিকে গিয়ে ও ওর দেখা পেলেন না। ও কোথায় যেতে পারে! কোথায়! আশপাশের কেউই কিছু বলতে পারল না। সন্দের দিকে ক্লাবে ঢুকে দেখলেন, ভেতরের ঘরে নিতাইকে নিয়ে সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট আর কয়েক জন সদস্য কী সব আলোচনা করছেন। অবনীবাবুকে দেখেও কাছে এল না ও। একা একাই প্র্যাক্টিস করতে লাগল। উনি কাছে যাওয়ার জন্য এগোতেই এক সদস্য এসে বলল, আপনাকে তরুণদা ডাকছেন। তরুণদা এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।

হরিয়ানার বিশাল স্টেডিয়ামে লোকে লোকারণা। গমগম করছে। সার্ব জুনিয়রদের খেলা হয়ে গেছে। এখন জুনিয়রদের পাল্লা। দেখতে দেখতে ছ’দিন হয়ে গেল। প্রি কোয়ার্টার, কোয়ার্টার, সেমিফাইনাল জিতে নিতাই এখন ফাইনালের জন্য মুখিয়ে আছে। সকালেই ওজন দিয়ে গেছে সে। আটচল্লিশ কিলো চারশো গ্রাম। তার মানে ও পড়ছে আটচল্লিশ থেকে একান্ন কিলোর মধ্যে যাদের ওজন, তাদের কারও সঙ্গে।

রেড কর্নারে এসে দাঁড়াল নিতাই। ব্লু কর্নারে গত বছরের চ্যাম্পিয়ন যশবন্ত রাঠোর। বেল পড়তেই ক্ষিপ্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। এক-একটা আপার কাট লোয়ার কাটে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল নিতাই। হাতই চালাতে পারল না। শুধু ঠেকাবার চেষ্টা করে গেল সে। প্রথম রাউন্ডের শেষে ইলেকট্রনিক্স বোর্ডে ভেসে উঠল রেড কর্নার ওয়ান। ব্লু কর্নার ফোর। দর্শকেরা চিৎকার করছে, ব্লু কর্নার ব্লু কর্নার...

দ্বিতীয় রাউন্ডেও নিজেকে সেভ করার চেষ্টা করল সে। যশবন্ত এ বার পেয়ে গেল পাঁচ। তৃতীয় রাউন্ডে কয়েক সেকেন্ডের মধোই নাক থেকে

গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল নিতাইয়ের। তবু সে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে। এ রাউন্ডে কিছুতেই ও তাকে ছয় করতে দেবে না। দিলে এ রাউন্ডেই শেষ হয়ে যাবে খেলা। আর চতুর্থ রাউন্ড লড়তে হবে না যশবন্তকে। পনেরো পেয়ে এক রাউন্ড আগেই সে জয়ী হয়ে যাবে।

ক্লাব কোনও ব্যবস্থা করেনি। তাই নিজের খরচায় একা একাই গত কাল রাতে ট্রেনে চোপে বসেছিলেন অবনীবাবু। দুপুরবেলায় ট্রেন থেকে নেমেই সোজা চলে এসেছেন এখানে। সবার আড়ালে পেছনে বসে লড়াই দেখছিলেন। নিতাইকে ও রকম মার খেতে দেখে আর থাকতে পারলেন না। এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ওদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তরুণদা তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে তাঁর হাত চেপে ধরলেন— আপনি এখানে?

— আপনি ছাড়ুন। আমি ওর কাছে যাব।

— কী ছেলেমানুষি করছেন? এ দিকে আসুন। তরুণবাবু প্রায় ধমকের সুরেই কথাটা বললেন।

তৃতীয় রাউন্ড শেষ হতে আর কয়েক সেকেন্ড বাকি। একদম কাবু হয়ে পড়েছে নিতাই। দাঁড়াতেই পারছে না। যেন নেশা করেছে। টলছে। এফুনি মুখ খুবড়ে পড়বে। ঠিক তখনই ঘণ্টা পড়ে গেল। ইলেকট্রনিক্স বোর্ডে তখন রেড কর্নারে ফোর। আর ব্লু কর্নারে ফোটিন। চেয়ারে বসতেই ওর চোখে মুখে জল দিতে লাগল দলের ম্যানেজার। ঠোঁট ফেঁটে গেছে। চোখের নীচে কালশিটে।

আর থাকতে পারলেন না অবনীবাবু। এক ঝটকায় তরুণবাবুর হাত ছাড়িয়ে রিংয়ের দিকে ছুটে গেলেন। রিংয়ের নীচে দাঁড়িয়েই বললেন, এটা শেষ রাউন্ড।

অত হইচইয়ের মধ্যেও আলাদা করে শুনতে পেল কথাটা। কে? কোনও রকমে মাথা ঘুরিয়ে যন্ত্রণায় বুজে আসা চোখ একটু ফাঁক করে নিতাই দেখল, নীচে দাঁড়িয়ে আছে অবনীকাকু। তাঁকে দেখে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিল সে। যে-কোনও সময় ঘণ্টা পড়তে পারে। উনি বললেন, ওই ছেলেটা রিংয়ে ওঠার আগে কী বলেছে জানিস?

নিতাই ফিরেও তাকাল না। তবু উনি বললেন, বলছিল, তোর মা নাকি তোদের পাড়ার কোন একটা ছেলের সঙ্গে ভেগে গেছে...

তড়াক করে উঠল নিতাই। অবনীকাকুর দিকে তাকাল। ভয়ঙ্কর সেই চাহনি।

ঘণ্টা পড়ে গেল। যশবন্ত পাঞ্চ করতেই একটু ঝাঁকে সেটাকে কাটিয়ে থুতনি লক্ষ করে ও সপাতে চালিয়ে দিল একটা আধমনি ঘুসি। স্ট্রেট পাঞ্চ। পাঞ্চ নয়, যেন আগুনের গোলা এসে পড়ল তার মুখে। তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল যশবন্ত। লক্ষাবাড়ার মতো জ্বলে যাচ্ছে তার মুখটা। তবু কোনও রকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেও আবার একটা মারাত্মক আপার কাটে ছিটকে পড়ল সে। ফের উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আর একটা। এ বার হুক। আর উঠতে পারল না যশবন্ত। রেফারি এসে এক দুই তিন গুনতে লাগল। ইলেকট্রনিক্স বোর্ডে জ্বলজ্বল করে উঠল উইন দ্য রেড কর্নার। ব্লু কর্নার নক আউট।

লাফিয়ে উঠলেন অবনীবাবু। তরুণবাবু কাছে এসে বললেন, আপনার এত উল্লাস কীসের?

উনি বললেন, আমি পেরেছি। আমি পেরেছি।

— কী পেরেছেন?

— প্রতিশোধ নিতে। প্রতিশোধ।

— প্রতিশোধ?

— জানেন, আমার ছেলে থাকলে ও কিছুতেই ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হবে না বুঝতে পেরে, ওই ছেলেটা, ওই যে যশবন্ত, গত বছর খেলার আগের দিন লোক লাগিয়ে আমার ছেলেকে রাস্তায় ফেলে এমন মার মেরেছিল যে, ও আর কোনও দিন রিংয়েই উঠতে পারবে না।

— ওইটুকু ছেলে...

— ও ওইটুকু, কিন্তু ওর বাবা কে জানেন?

— কে?

— এখানকার ডাকসাইটে এক নেতা। এক সময় নাম করা বক্সার ছিল। এখন দাগী আসামি। তার নামে এখনও খানদশেক মামলা বুলছে।

— কিন্তু নিতাই যে বলছিল, আপনি নাকি বলেছেন, কারেক্ট পাঞ্চ না হলেও ক্ষতি নেই...

— হ্যাঁ বলেছিলাম। কারণ আমি চেয়েছিলাম আমার ছেলে যেমন মার খেয়েছে, যশবন্তও থাক। তবে রাস্তায় নয়, রিংয়ে। বক্সিং রিংয়ে। আর নিতাই?

আমি জানি ও সোনা পাবেই। কারণ ওকে চ্যাম্পিয়ন করার মন্ত্র আমার কাছে আছে। যেটা একটু আগে ওর কানে আমি দিয়ে এসেছি।

— মন্ত্র! অবনীবাবুর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তরুণবাবু। কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে নিতাই, তাদের কথা শুনেছে, বুঝতে পারেননি অবনীবাবু। নিতাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই, ‘থাক বাবা, থাক’ বলে ওকে বুকে জড়িয়ে নিলেন উনি। গুরু শিষ্য দু’জনের চোখেই তখন জলের ধারা।

৪৫

আই

ডায়েরির পাতায় লেখা ফোনের নম্বরে চোখ বোলাতে বোলাতে একটা জায়গায় এসে থমকে গেল কসবা থানার অফিসার জয়ন্ত সরকারের চোখ। না। ওই নম্বরটার আগে কোনও নাম নেই। শুধু একটা গোল চিহ্ন। আর তার মধ্যে ইংরেজি বড় হরফে লেখা একটা— ‘আই’।

নম্বর দেখে মনে হচ্ছে ল্যান্ড নম্বর। কিন্তু আটটা নয়, সাতটা সংখ্যা। তার মানে ইচ্ছে করেই মেয়েটি একটা সংখ্যা লেখেনি। যত দূর মনে হয়, মাকের কোনও সংখ্যা নয়। হয় প্রথম কিংবা শেষ একটা সংখ্যা ও ওর মনের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। যাতে এই ডায়েরি খুললেও, এই নম্বরটি দেখলেও, কৌতূহলবশত এই নম্বরে ফোন করতে চাইলেও, পুরো নম্বর না থাকার জন্য কেউ যাতে ফোন করতে না পারে। এবং এটা কার নম্বর সেটা যাতে ঘণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে, সে জন্য ও শুধু একটা আই লিখে রেখেছে। তার মানে, এটা যার নম্বর, তার নাম আই দিয়েই শুরু। না হলে এত অক্ষর থাকতে খামোকা আই লিখতে যাবেন কেন! কিন্তু তার কী নাম! ইন্দ্র! ঈশান! ইমন! না কি অন্য কিছু। কিন্তু কী! কী হতে পারে। কী হতে পারে! অবশ্য ছেলেটি হিন্দু কি না কে জানে! ঠিক আছে, দেখা যাক। এটা এঁদের বলে কোনও লাভ নেই। তাই কাউকে কিছু না বলে উনি পকেট থেকে ছোট্ট একটা ডায়েরি বার করে তার মধ্যে ওই নম্বরটা টুকে নিলেন। বলা যায় না, এই নম্বরটা থেকেই হয়তো মেয়েটির হদিশ পাওয়া যেতে পারে।

মেয়েটির শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছ থেকে ডায়েরি নিতে নিতে পুলিশ ভদ্রলোকটি ওঁদের তিন জনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়ের বাপের বাড়ির লোকেরা কী বলছে?

আভাস কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ওঁর মা জয়ন্তী দেবী



বলে উঠলেন, না। এখনও ওঁদের খবর দিয়ে উঠতে পারিনি। এই এখন থানা থেকে বেরিয়ে ওঁদের জানাব।

— সে কী? পুলিশ ভদ্রলোকটি লেখা থামিয়ে নড়েচড়ে বসলেন, আপনারা মেয়ের বাড়িতে খবর দেননি?

— আমাদের মাথার ঠিক নেই। ঘরের বউ এই ভাবে... জয়ন্তী দেবীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আভাসের বাবা সৃজনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, আসলে পাড়ার লোকেরা বলল... আগে থানায় জানাতে, ফলে...

— সে ঠিক আছে। কিন্তু বাড়ির বউয়ের নামে মিসিং ডায়েরি করার আগে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে একবার ভাল করে খোঁজখবর করবেন তো, নাকি? আর আপনারা তাঁর বাপের বাড়িতেও খোঁজ নেননি? এটা কেমন কথা!

পুলিশ ভদ্রলোকটিকে বাঁকা কথা বলতে দেখে আভাস বললেন, ও কোথায় গেছে, আমরা জানি। তাই শুধু শুধু সবাইকে জানিয়ে...

— কোথায় গেছে?

— বললাম না... যে ছেলেটার সঙ্গে ও মেশে...

পুলিশ ভদ্রলোকটি জানতে চাইলেন, আপনি এতটা শিওর হচ্ছেন কী করে?

— যে মেয়ে মাঝরাতে চুপিচুপি বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, সে তার প্রেমিক ছাড়া আর কার কাছে যাবে!

— একটা জলজ্যান্ত মানুষ রাত্রিবেলায় আপনার পাশ থেকে উঠে বেমালাম চলে গেল, আপনি টের পেলেন না?

আভাস বললেন, আসলে গোটা এলাকায় এখন যা ভামের উপদ্রব শুরু হয়েছে, আলো নেভালেই হল। রান্নাঘর তছনছ করবে। খাটের তলায় দক্ষ্যজ্ঞ বাধাবে। ওদের জ্বালায় ঘুমোনের জো নেই। আর সকালের দিকে যখন দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে, তখন মড়ার ঘুম শুরু হয়। শরীরের উপর দিয়ে দশ মণি একটা রোলার চলে গেলেও বুকি ঘুম ভাঙবে না। আমার মনে হয়, ও সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে।

পুলিশ ভদ্রলোক মাথা দোলালেন, কী নাম যেন বললেন, আপনার বউয়ের?

— রুচিরা।

উনি আবার খাতায় ঝুঁকে পড়লেন।

জয়ন্তী দেবী অত্যন্ত দেমাকি। দেমাক হওয়ারই কথা। নিজের হাতে ছেলেকে তৈরি করেছেন। এখন সেই ছেলে বিশাল চাকরি করেন। প্রচুর টাকা মাইনে পান। তাঁর সুবাদে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছেন তাঁরা। লাইফ স্টাইল ও পাল্টে গেছে তাঁদের। পাড়ার লোকেদের সঙ্গে খুব একটা মেশেন না। পাড়ার লোকেরাই সেটা বলাবলি করেন।

সেই জয়ন্তী দেবীকে রাস্তামুখো ঘরের সামনের এক চিলতে বারান্দায় গ্রিল ধরে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যাতায়াতের পথে পাড়ার লোকেরা একটু অবাকই হয়েছিলেন। যিনি সব সময় ফিটফাট থাকেন— তাঁর অমন চোখ মুখ, আলুথালু পোশাক আশাক দেখেই আঁচ করেছিলেন, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। তাই কেউ দুধ আনতে যাওয়ার পথে, কেউ প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে, কেউ আবার বাজার করতে যাওয়ার পথে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী হল, এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন?

প্রত্যেককেই উনি বলেছিলেন সেই একই কথা। বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে আমাদের। আর বলবেন না। আমাদের বউমা কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ মাঝরাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

‘সে কী! কেন? ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল নাকি?’, ‘মাঝরাতে আচমকা ফোনে মা বা বাবার কোনও দুর্ঘটনার খবর শুনে তড়াহুড়ো করে কাউকে কিছু না বলেই, ওই রাত-পোশাকেই আবার বাপের বাড়ি চলে যায়নি তো? হয়তো ভেবেছেন, পরে এসে বলবেন। ভোররাতে শুয়েছেন, তাই আর আপনাদের বিরক্ত করতে চাননি। কিংবা ডেকেছেন, আপনারা উঠতে পারেননি। তখন হয়তো বেঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। কত কিছুই তো হতে পারে। আপনারা বরং ওখানে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন, মেয়েটাকেও নিয়ে গেছে নাকি?’

নানান লোক নানা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছিলেন। আর উনি সেগুলি গলাধঃকরণ করছিলেন। কিন্তু নাতনির প্রসঙ্গ উঠতেই উনি খাঁক করে উঠলেন, তা হলেই হয়েছে। মেয়ের প্রতি কোনও টান আছে নাকি? এই যে সাত বছরে পড়ল, আজ পর্যন্ত মেয়ের জন্য কোনও দিন কিছু করেছে? বাচ্চা এত বড় হয়ে

যাওয়ার পরেও মায়েরা যে কী করে পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করে, কে জানে।

মুখে মুখে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল আভাসের বউয়ের পালিয়ে যাওয়ার কথা। ওর বউ যে একটা ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করে, সে কথা পাড়ার অনেকেই জানতেন। কারণ, তাঁর সঙ্গে ওঁকে প্রায়ই এখানে-সেখানে দেখা যেত। কিন্তু সেই অ্যাফেয়ার যে বিয়ের আগে থেকেই চলছিল, সেটা জয়ন্তী দেবীর মুখ থেকেই সবাই জানতে পারলেন।

যাঁরা শুনলেন, তাঁরাই বললেন, আপনাদের এক্ষুনি থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করা উচিত। না হলে উল্টে আপনাদের ঘাড়েই সব দোষ এসে পড়বে। যা দিনকাল পড়েছে! তাঁদের পরামর্শেই ছেলে আর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে উনি থানার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। যাওয়ার আগে, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে, মেয়ের বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন নাতনিকে। বলেছিলেন, আমরা যে হোক কেউ এসে বিকেলের দিকে ওকে নিয়ে যাব।

সেই কথা শুনে মেয়ে বলেছিল, ও এখানে না-হয় ক'টা দিন থাকুক না... তেমন হলে না-হয় এখান থেকেই স্কুলে যাবে। তোমরা ওকে নিয়ে কোনও চিন্তা কোরো না। তোমরা বরং ও দিকটা দ্যাখো।

রুচিরার বাড়িতে খবর পৌঁছতেই তাঁর বাড়ির লোকেরা ভেঙে পড়লেন। তাঁদের মেয়ে এ রকম করতেই পারে না। হ্যাঁ, বিয়ের আগে দু'-একটা ছেলের সঙ্গে সে মিশত ঠিকই। বিয়ের আগে ও রকম প্রেম সবাই-ই করে। শেষ প্রেমটা ভেঙে যেতে সে-ই মত দিয়েছিল এই বিয়েতে। তা হলে কি সেই প্রেম আবার কোনও ভাবে জেগে উঠেছিল! না কি অন্য কোনও ছেলে! হতে পারে! হতেই পারে। তা বলে এমন ভরভরন্ত সংসার ফেলে, ওই রকম একটা ফুটফুটে মেয়েকে ফেলে কেউ যেতে পারে! ছি ছি ছিঃ...

বোনের এই কীর্তি শুনে অফিস থেকে ছুটে এলেন বড় ভাই অসীম আর ছোট ভাই সসীম। ছেলেকে স্কুলের গাড়িতে তুলে দিয়ে ছোট মেয়ে সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি করে ছুটে এলেন। খবর পেয়ে তিনি আগেই সকালবেলায় ফোন করে বড়দির আসানসোলার শ্বশুরবাড়িতে জানিয়ে দিয়েছেন পুরো ব্যাপারটা।

দুই ভাই তখন সোফার দুই ফোণে গুম হয়ে বসে আছেন। ঘর বারান্দা

করছেন মেয়ের বাবা। কোনও ফোন এলেই বাঁপিয়ে পড়ছেন ছোট বোন। তখনই হঠাৎ কী মনে করে মেয়ের মা বলে উঠলেন, আমার মেয়েটাকে গুঁরা আবার কিছু করল না তো!

— না না, গুঁরা ও রকম না। মাকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন অসীম।

সান্ত্বনা বললেন, রুচি যা করল, এর পর স্বশ্রবণবোধিত আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।

ওদের বড়দি বারবার ফোন করে খবর নিচ্ছেন। গলার স্বরেই ধরা পড়ছে তাঁর উদ্বেগ হয়ে ওঠা। তিনি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সান্ত্বনাকে বললেন, এতই যখন প্রেম, তা হলে ওকে বিয়ে করতে গেল কেন বল তো? আমিও তো ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোর এই বিয়েতে মত আছে? ও তো তখন বলেছিল, হ্যাঁ। ছি ছি ছি ছিঃ। যাওয়ার সময় মেয়ের মুখটাও ওর একবার মনে পড়ল না! ওর কোনও খোঁজ পেলেই কিন্তু আমাকে সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে জানাবি। আর হ্যাঁ, আর একটা কথা, এ-বাড়িতে কিন্তু আগে থেকে কাউকে কিছু জানাস না। আমাকে তো স্বশ্রবণ শাস্ত্রি নন্দকে নিয়ে ঘর করতে হয়, বুঝেছিস?

এত কিছু শোনার পরেও মেয়ের মা ফের বললেন, চার দিকে যা শুনি, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। একবার থানায় গেলে হয় না?

— থানায় গিয়ে কী বলবে? আমার মেয়ে অন্য ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে? বেশ কড়া গলাতেই বলল সান্ত্বনা।

মা বললেন, না। আমরা তো জানি না। ও সত্যি সত্যিই পালিয়ে গেছে কি না।

— পালায়নি তো কোথায় গেছে? রাগত স্বরে সান্ত্বনা মুখ খুলল।

মায়ের মন মানছে না। তিনি বললেন, অন্য কিছুও তো হতে পারে।

— কী? সসীম জানতে চাইলেন।

— বিভিন্ন জায়গায় যা ঘটে।

— তোমার মেয়েকে মেরে ফেলেছে? ফের সান্ত্বনা বলল।

— আমার মনে কু ডাক দিচ্ছে রে!

— তেমন কিছু হলে গুঁরা আর আমাদের ফোন করে জানাত না। মা বোন আর ছোট ভাইয়ের কথা শুনে অসীম বললেন, মা কিন্তু খুব একটা খারাপ কিছু বলছে না। চার দিকে যা ঘটছে। আমার মনে হয়, একবার থানায় গেলে হত।

— সে তো ওঁরা গেছেই। বলল না?

সসীমের কথা শুনে অসীম বললেন, ওঁদের যাওয়া আর আমাদের যাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

সান্ত্বনা থাকতে না পেরে বলে উঠল— গেলে, মুখে আরও চুন কালি পড়বে।

ঘর-বার করছিলেন ওঁদের বাবা। তিনি হঠাৎ ওঁদের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, ওঁরা আমাদেরই যখন ও-সব বলেছে, থানায় না জানি ইনিয়ে বিনিয়ে আরও কত কী সাত-পাঁচ বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। মনে হয় আমাদের একবার থানায় যাওয়া দরকার।

বাবার উপরে কথা বলতে পারেন না ছেলেরা। তাই খুব একটা ইচ্ছে না থাকলেও তাঁরা নিম-রাজি হলেন।

বাবাকে নিয়ে অসীম, সসীম আর তাঁদের ছোট বোন সান্ত্বনা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন, আমার মেজ বোনকে স্বশুরবাড়ি থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওঁরা বলছেন, ও নাকি মাঝরাত থেকে নেই। আমরা বুঝতে পারছি না, কী হল। আপনারা যদি একটু ইনিশিয়েটিভ নেন, তা হলে খুব ভাল হয়।

ধরা গলায় হাত জোড় করে ওঁদের বাবা বললেন, আপনারা সব পারেন। যে ভাবে হোক আমার মেয়েটাকে খুঁজে দিন।

পুলিশ অফিসার জয়ন্ত সরকার বললেন, আপনাদের কি কাউকে সন্দেহ হয়?

ওঁরা এ-ওঁর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। কী বলবেন, কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না। আজ পর্যন্ত আভাসের খারাপ কিছু ওঁরা দেখেননি। মেয়েও বলেছে, ও বাড়ির লোকেরা খুব ভাল। তাই মেয়ের বাবা বললেন, কাকে সন্দেহ করব বলুন! আমরা তো কিছু বুঝতে পারছি না ও কোথায় গেল।

— আপনার মেয়ে কি কখনও স্বশুরবাড়িতে কোনও অশান্তি বা ঝগড়াঝাঁটির কথা বলেছিলেন?

অসীম বললেন, না।

— জামাই কি কখনও টাকাপয়সা বা ওই জাতীয় কোনও কিছুর জন্য মেয়ের উপর চাপটাপ দিতেন?

বাবা কিছু বলার আগেই সান্ত্বনা বললেন, না। সে রকম কখনও কিছু শুনিনি।

— আপনারা যখন মেয়ের বাড়ি যেতেন, তখন কি সে রকম কিছু টের পেয়েছিলেন বা আপনার মেয়ের কথায় আপনাদের কি কখনও কিছু সন্দেহ হয়েছিল?

— না না। আমার জামাই ও রকম না। ভীষণ ভাল। মেয়ে না এলেও আমার জামাই মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ি চলে আসত। আমাদের খোঁজখবর নিত। কিছু লাগবে কি না জানতে চাইত।

— ওঁরা কী বলছে?

সসীম বললেন, ওঁরা তো অনেক কিছু বলছে। বলছে, মাঝরাতে না ভোররাতে উঠে ও নাকি চলে গেছে।

— গেলে কোথায় যেতে পারে বলে আপনাদের মনে হয়? কোনও বন্ধুবান্ধব? আত্মীয়স্বজন?

— সে রকম কোথাও যাওয়ার হলে কাউকে কিছু না বলে, অত রাতে বা অত ভোরবেলায় যাবে কেন?

— এর আগে কি উনি এ ভাবে কোথাও গিয়েছিলেন?

— না।

জয়ন্তবাবু ‘বুঝতে পেরেছি’ গোছের মাথা নাড়তেই ওঁদের বাবা ফের হাত জোড় করে কাঁচুমাচু মুখে বলে উঠলেন, যেখান থেকে পারেন, আপনি আমার মেয়েকে খুঁজে এনে দিন।

জয়ন্তবাবু বললেন, ঠিক আছে, দেখছি। আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করছি।

এত দিন এই এলাকায় ভামের কোনও উৎপাত ছিল না। আবাসন তৈরির জন্য একটি বিখ্যাত রিয়েল এস্টেট সংস্থা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মাঠ—খেলার মাঠটা যে-ই খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করল, অমনি লাখো লাখো ভাম এই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। কোনওটা সদ্য জন্মানো তো কোনওটা আবার বিশাল বড়। খানিকটা বেজির মতো দেখতে।

ওই মাঠে যে এত ভাম ছিল ক’দিন আগেও কেউ টের পায়নি। ওখানে রাসের মেলা বসত। শীতের সময় ছোটখাটো সার্কাসের দল তাঁবু ফেলত।



প্রতি বছর ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হত। এমনকী, রাজনৈতিক দলের সমাবেশ পর্যন্ত হত। কিন্তু ওই মাঠের তলায় যে ভামেরা এত বড় একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, ওই মাঠে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু না হলে কেউ টেরই পেত না। আর কিছু দিন পর হয়তো দেখা যেত তলে তলে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ওরা হয়তো গোটা অঞ্চলটাকেই একেবারে ফোঁপরা করে দিয়েছে। বলা যায় না, হয়তো ধসও নামত কোনও দিন। ভাগ্যিস, আবাসনের দৌলতে খোঁড়াখুঁড়িটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ভামেরা এত উৎপাত শুরু করেছিল যে, তাতে তিতিবিরক্ত হয়ে কেউ কেউ বিষ মাখানো রুটি, বিস্কুট ছড়িয়ে রাখতেন ঘরের আনাচে কানাচে। কেউ কেউ আবার খেড়ে ইঁদুর ধরার বড় বড় কল কিনে এনে ঘরে পেতেছিলেন।

সকালে কর্পোরেশনের লোকেরা ঝাঁট দিতে এসে এ-বাড়ি ও-বাড়ির সামনে মরা ভাম পড়ে থাকতে দেখতেন। কেউ এমনই পড়ে আছে, আবার কারও পায়ে দড়ি বাঁধা, তো কেউ আবার গাড়ির চাকায় একেবারে পিষ্ট হয়ে আছে। এ বাড়ির কার্নিশে, ও বাড়ির ঝুলবারান্দায় বেশ কিছু কাক ওত পেতে বসে আছে। সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝেই নেমে এসে ঠুকরে যাচ্ছে।

রুচিরার স্বশুরবাড়ির লোকেরা সে দিন বাড়ির বউয়ের নামে মিসিং ডায়েরি করে গেছেন ঠিকই, কিন্তু কোনও মোবাইল নম্বর দিয়ে যাননি। বারবার ল্যান্ড ফোনে ফোন করেও কাউকে না পেয়ে জয়ন্তবাবু নিজেই যে দিন আভাসদের বাড়িতে ইনভেস্টিগেশনের জন্য গেলেন। দেখলেন, দরজায় একটা মস্ত বড় তালা ঝুলছে। পাশ দিয়ে বাড়ির ধার বরাবর দেখে বুঝতে পারলেন, জানালাগুলো সব আটকানো। উল্টো দিকের বাড়ির লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, বাড়িতে বউ নেই দেখে নাকি শুধু আভাসই নয়, স্বশুর শাশুড়িরও মন খুব খারাপ। যে বাড়িতে ছেলের বউই নেই, সে বাড়িতে ওঁরা থাকেন কী করে! মন-মেজাজ খুব খারাপ। পাশের পাড়াতেই তো ওঁদের ছোট মেয়ের বাড়ি, ওখানেই নাকি থাকছেন ওঁরা।

মোটামুটি লোকেশনটা বুঝে নিয়ে জয়ন্তবাবু সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। ওখানে আভাস নেই। আভাসের মা জয়ন্তী দেবী বললেন, বউ চলে যাওয়াতে আমার ছেলে খুব ভেঙে পড়েছে। খাচ্ছে না, দাচ্ছে না। রাতে ঘুমোচ্ছে না

পর্যন্ত। সারা ঘর শুধু পায়চারি করে। আর তা না হলে গুম হয়ে বসে থাকে। ওর মুখের দিকে তাকানো যায় না। অফিসে গেলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে। কথা হবে। মনটা একটু হাল্কা হবে। এই ভেবে, আজকেই ওকে প্রায় জোর করেই অফিসে পাঠিয়েছি আমি। তা, ওর বউয়ের কোনও খবর পেলেন?

জয়ন্তবাবু বললেন, এখন অবধি কোনও খবর নেই। আপনাদের কি কোনও ফোনটোন করেছিল?

আভাসের বাবা সৃজনবাবু বললেন, না না। ও সে জাতের মেয়ে না। দেখলাম তো। বাচ্চাটার কথাও একবার ভাবল না! এ কেমন মা, কে জানে!

— আচ্ছা, ও যে ছেলেটার সঙ্গে মিশত, তার নামটাম কিছু জানেন?

— একটা তো না। ক’টা নাম বলব?

জয়ন্তী দেবী বলে উঠলেন, বিয়ের আগে থেকেই নাকি ও এ রকম। আজ এই ছেলের সঙ্গে মেশে তো কাল সেই ছেলের সঙ্গে। ইদানীং যার সঙ্গে মিশত, তার সঙ্গে নাকি বিয়ের আগে থেকেই প্রেম ভালবাসা। তা, তাকে বিয়ে করলেই তো পারতিস। খামোকা আমার ছেলের জীবনটা নষ্ট করতে এলি কেন?

সৃজনবাবু বললেন, হ্যাঁ। অল্প বয়সে প্রেম ভালবাসা হতে পারে। কিন্তু তার তো একটা লিমিট থাকবে। বিয়ের পর, একটা বাচ্চা হওয়ার পর, এই সব কেউ করে?

— উনি যে অন্য কারও সঙ্গে মেশেন, সেটা আপনারা টের পেলেন কী ভাবে?

জয়ন্তী দেবী বললেন, বিয়ে হয়ে আসার পর প্রথম তিন-চার বছর কিছু বুঝতে পারিনি। মেয়ের যখন সাড়ে তিন বছর বয়স হল, ওরা তখন বড় রাস্তার মোড়ে যে স্কুলটা আছে, সেখানে ভর্তি করল...

জয়ন্তবাবু বললেন, ওই যে নার্সারি স্কুলটা, প্লে গ্রাউন্ড, সেখানে?

জয়ন্তী দেবী বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর বউই নিয়ে যেত। প্রথম প্রথম বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে বাড়ি চলে আসত। তার পর হঠাৎ একদিন বলল, ঘণ্টা দুয়েকের তো ক্লাস। শুধু শুধু ওকে দিয়ে আবার এতটা পথ হেঁটে আসব কেন, একেবারে ওকে নিয়েই ফিরব। আমিও আর কিছু বললাম না। তখন তো আর বুঝিনি, আমার কী সর্বনাশ হতে চলেছে...

— তার পর?

সৃজনবাবু মুখ খুললেন, শুচি তো স্কুল থেকে এসেই ‘দাদু দাদু’ করে আমার কাছে চলে আসে।

— শুচিটা কে? আভাসের মেয়ে?

— হ্যাঁ। তো, বৃষ্টির জন্য ক’দিন ধরেই নাকি রিকশা পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই আমি ওকে জিঞ্জেস করলাম, রিকশা পেয়েছিলে দিদিভাই, না, আজও হেঁটে হেঁটে এসেছ? ও বলল, না না। আমরা আজকেও রিকশা পাইনি। তো, ওর কথা শুনে আমি বললাম, এই জন্যই তো বলেছিলাম, এই জল বৃষ্টির মধ্যে তোমাকে আজ স্কুলে যেতে হবে না। তা হলে কি এই জল কাদার মধ্যে হেঁটে হেঁটেই এলে? আমার কথা শুনে ও বলল, না, আমরা হেঁটে হেঁটে আসেনি। আঙ্কল স্কুটারে করে গলির মুখে আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেছে। আমি ওকে জিঞ্জেস করলাম, আঙ্কল? সেটা আবার কে? ঠিক তখনই আমার ঘরে ঢুকে শুচিকে প্রায় জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওর মা। ওকে নাকি স্কুলের জামাপ্যান্ট ছাড়াবে। সে দিনই আমার প্রথম খটকা লাগে।

— তার পর পাড়ার বিভিন্ন লোক বলতে শুরু করল, আভাসের বউকে আজকে একটা ছেলের সঙ্গে ওখানে দেখলাম। কেউ বলল, স্কুটারে একটা ছেলের পেছনে বসে আপনার বউমাকে তো যেতে দেখলাম। ছেলেটা কে? আবার কেউ বলল, গোলপার্কের মোড়ে চায়ের দোকানে একটা ছেলের সঙ্গে আভাসের বউকে চা খেতে দেখলাম।

ওঁদের মাঝখানে ফোড়ন কাটলেন জয়ন্তী দেবী— বউ ও-রকম কীর্তি করলে লোকে তো বলবেই। ক’জনের মুখ চাপা দেওয়া যায়?

— উনি কি শুধু স্কুলের ওই সময়টুকুই বেরোতেন? না কি অন্যান্য সময়েও?

— না না। যখন-তখন। একদিন তো রাতে ফিরলই না।

— সে কী? আপনার ছেলে কিছু বলেনি?

— ও জানলে তো।

— জানলে তো মানে? উনি রোজ বাড়ি ফেরেন না?

— ফিরবে না কেন? সে দিন ও বাড়িতে ছিল না। অফিসের কাজে একটু বাইরে গিয়েছিল।

— তো, ছেলে যখন এল, তখন তাঁকে আপনারা কিছু বলেননি?

— না। আমাদের ওই লাগানো-পড়ানো স্বভাব নেই।

— উনি কখন অফিসে বেরোন?

— এই ন'টা, সাড়ে ন'টা নাগাদ।

— কখন ফেরেন?

— তার কোনও ঠিক নেই। ও তো বড় পোস্টে কাজ করে। অনেক দায়দায়িত্ব। মিটিং-টিটিং থাকে। তা, ন'টা-দশটার আগে কোনও দিনই ফেরে না।

সৃজনবাবু বললেন, ও বাড়িতে গেলেই আশপাশের লোকেরা বারবার জিজ্ঞেস করছে, আভাসের বউয়ের কোনও খবর পেলেন? উনি কি ওই ছেলেটার সঙ্গেই গেছেন নাকি? ‘ওই ছেলেটা’ মানে যে কোন ছেলেটা তা ওরাই জানে। আমাদের দিকটা একবার ভেবে দেখুন। মাথাটা একেবারে হেঁট করে দিয়ে চলে গেল।

জয়ন্তবাবু বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমরা দেখছি। তবে আপনারাও একটু ওর বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে ফোনটোন করে দেখুন। আর কোনও খবর পেলেই আমাদের জানাবেন, কেমন?

সৃজনবাবু বললেন, আমরা খোঁজখবর করেছি। কিন্তু ও কারও বাড়িতেই যায়নি। কোথাও কোনও অ্যাক্সিডেন্ট-ট্যাক্সিডেন্টেরও খবর নেই। বাইপাসের ধারে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, সেই বাড়ির দোতলায় গলার নলি কাটা এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ পাওয়া গেছে শুনে, পাড়ার লোকেরা ওকে বলেছিল। ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে, অন্য মেয়ে। আচ্ছা, ও বাড়ির ওঁরা কী বলছেন? আমার তো মনে হয়, যার সঙ্গে ও মিশত, তার নাম ধাম ওঁরা সব বলতে পারবেন। ওঁরা কিছু জানেন না, এটা আবার হয় নাকি? ওঁরা সব জানেন। আমাদের কাছে সব লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছেন।

জয়ন্তবাবু বললেন, কোনও চিন্তা করবেন না। আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি। খবর ঠিকই পেয়ে যাব।

মেয়ের বাপের বাড়িতে গিয়ে জয়ন্তবাবু যখন জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, তখন সান্ত্বনাই বলে দিলেন ছেলেটির নাম। একবার নাকি উনি তাকে দেখেওছিলেন। কিন্তু কোথায় থাকে উনি জানেন না।

জয়ন্তবাবু বললেন, তাঁর কোনও ছবি নেই, না?

— না।

— রুচিরা কোন ঘরে থাকতেন?

মেয়ের মা বললেন, আমার ঘরে।

— ঘরটা একটু দেখা যাবে?

— হ্যাঁ। আসুন। বলেই, মা আর সান্ত্বনা মিলে তাঁকে নিয়ে গেলেন একটা কোণের ঘরে। উনি জিঞ্জেস করলেন, ওঁর কোনও জিনিসপত্র এখানে আছে নাকি?

ওঁর মা বললেন, না। ও তো সবই নিয়ে গেছে।

হঠাৎ দেয়াল ঘেঁষা কাঠের পুরনো আলমারির তাকে কয়েকটা বই দেখে জয়ন্তবাবু জানতে চাইলেন, এগুলো কার?

সান্ত্বনা বললেন, মেজদির।

— মেজদিটা কে?

— রুচি। মানে রুচিরা।

— আলমারিটা খুলুন তো। জয়ন্তবাবু বলতেই রুচিরার মা বললেন, খোলাই তো। বলেই, আংটা ধরে এক টান মেরে একটা পাল্লা খুলে দিলেন। জয়ন্তবাবু একটা একটা করে বই হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। কোনওটায় লেখা— ‘রুচিকে’। কোনওটায় লেখা— ‘তোমাকে’। আবার কোনওটায় লেখা— ‘আমার আদরের রুচিকে’।

এক-একটা বই দেখতে দেখতে হঠাৎ জয়ন্তবাবু দেখেন, একটা বইয়ের মধ্যে গ্রিটিংস কার্ড। উপরে একটা গোলাপের ছবি। ভিতরে লেখা— ‘রাগ করো না লক্ষ্মীটি’। কিন্তু কে পাঠিয়েছে! কোথাও তো কারও নাম নেই। নীচে শুধু লেখা— ‘ইতি, তোমার আমি’।

জয়ন্তবাবুর হ্রু কুঁচকে গেল। কবে পাঠানো হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, কোথাও কোনও তারিখ লেখা নেই। তা ছাড়া ‘আমি’ই কি সে? যার নাম একটু আগেই বলেছিল রুচিরার ছোট বোন! না কি অন্য কেউ! কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাও বাকি বইগুলো ওল্টাতে লাগলেন উনি। যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়! হঠাৎ দেখেন বইগুলোর মাঝখানে, বইয়ের মাপেরই একটা পুরনো ডায়েরি। হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখলেন, তাতে দু’-চারটে ঠিকানা, কয়েকটা ফোন নম্বর ছাড়া পুরো ডায়েরিটাই প্রায় ফাঁকা। উনি ঠিকানাগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলেন। আর যে নামগুলোতে সন্দেহ

হচ্ছিল, উনি ওঁদের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছিলেন, এটা কে? আর তখনই উনি জেনেছিলেন, কোনওটা আমার বাড়ির ঠিকানা তো কোনওটা দূর সম্পর্কের এক দাদার।

জিপে করে থানায় যাওয়ার পথে জয়ন্তবাবুর মাতার মধ্যে হঠাৎ কী একটা ঝলক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা বার করলেন। তার পর পকেট থেকে ছোট্ট ডায়েরিটা বার করে ওই বাড়ি থেকে টুকে আনা নম্বরটা টিপাটপ টিপলেন। শুধু ওই সাতটা সংখ্যার আগে একটা ‘২’ বসিয়ে দিলেন। ওই নম্বরটা টোকার সময় ওঁর একবারও মনে পড়েনি যে, উনিশশো আটানব্বইয়ের আগে কলকাতার ফোন নম্বরের ডিজিট ছিল সাতটা। ফোনের গ্রাহক সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায়, সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার জন্য কলকাতা ফোনের নম্বরটাকে আটটা ডিজিটে রূপান্তরিত করা হয়। কারও কোনও সমস্যা যাতে না হয়, তাই ফোনের নম্বর যা ছিল, সেটা রেখে, সামনে শুধু একটা ‘২’ যোগ করে দেওয়া হল। উনি সেটাই করলেন। অথচ ও প্রাপ্ত থেকে ভেসে এল রেকর্ডেড ভয়েস— দিজ নম্বর ইজ আউট অব অর্ডার।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন সমীরকে। তাঁকে নম্বরটা দিয়ে বললেন, এই ফোন নম্বরটা কার নামে অ্যালট করা আছে, টেলিফোন ভবন থেকে একটু খোঁজ নিয়ে দ্যাখ তো। পারলে ঠিকানাটাও নিয়ে নিস।

আগে হলে ক’দিন লাগত কে জানে! এখন সব কিছু কমপিউটারে লোড করা থাকে দেখে দশ মিনিটও লাগল না। সমীর ফোন করে জানালেন, এই ফোনটি ছিল প্রজিত পুরকায়স্থের নামে। উনি ওটা ছেড়ে দিয়েছেন।

— ঠিকানাটা পেয়েছিস?

— হ্যাঁ। ৮২/৪/কে, হিন্দ রোড, কলকাতা ৭৫।

— ওটার লোকেশনটা কী জানিস?

সমীর বললেন, কলকাতা পাঁচাত্তর তো? তার মানে সন্তোষপুর।

— স...ন্তো...ষ...পু...র, মানে সেই বজবজ...

সমীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিরস্ত করলেন, আঁতকে উঠবেন না। আমি আঁকড়া সন্তোষপুরের কথা বলছি না।

— তা হলে?

— যাদবপুর সন্তোষপুরের কথা বলছি।



— তাই বল। ঠিক আছে। বলেই, লাইনটা কেটে দিয়ে জয়ন্তবাবু ফোন করলেন যাদবপুর থানায়। একবার, দু'বার, তিন বার। ফোন বেজেই গেল। অগত্যা ডায়াল করলেন হুমায়ুন কবীরকে। থানার পেছনের কোয়ার্টারেই উনি থাকেন। এক সময় ডি সি ডি ডি ছিলেন। কিছু দিন সল্টলেকের এস ডি পি ও-ও ছিলেন। তার পর ভবানীভবনেও কাজ করতেন। ভীষণ ডাকাবুকো। অথচ খুব ধীরস্থির। যাই করেন খুব ভেবেচিন্তেই করেন। কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না। সমস্ত কিছু ওঁর নখদর্পণে।

জয়ন্তকে হুমায়ুনই বললেন, সন্তোষপুরের লেক ছাড়িয়ে সোজা গেলে যে জোড়া ব্রিজটা পড়ে, ব্রিজের ঠিক আগেই বাঁ হাতে যে গলিটা আছে, সেটা দিয়ে কিছুটা গেলেই হিন্দ রোড। কেন? কী হয়েছে?

মাত্র কয়েকটি বাক্যেই মূল ঘটনাটা হুমায়ুনকে বলে দিলেন উনি। হুমায়ুন বললেন, তুই একটু রাজীবের সঙ্গে কথা বলে নে। ও এখন যাদবপুর থানার ওসি। চিনিস তো?

উনি 'না' বলতেই হুমায়ুন বললেন, ঠিক আছে, তুই ওর নম্বরটা লেখ। কথা বলে নিস। আর আমিও এ-দিকে ওকে ফোন করে দিচ্ছি। কোনও অসুবিধে হবে না।

উনি বললেন, এই জন্যই তোকে ফোন করা। ও. কে ঠিক আছে, রাখছি।

যাদবপুর থানা থেকে একজন কনস্টেবলকে নিয়ে জয়ন্তবাবু যখন প্রজিত পুরকায়স্থর বাড়িতে গেলেন, শুনলেন, বছর তিনেক আগেই তিনি গত হয়েছেন।

— উনি মারা গেছেন! কী হয়েছিল? ক্রু কুঁচকে গেল জয়ন্তবাবুর।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, দেড় বছরের মধ্যে পরপর দুটো স্ট্রোক। এই বয়সে ওই ধকল নিতে পারেন?

— কেন? কত বয়স হয়েছিল?

— তা ধরুন, পঁচাশি তো হবেই।

— পঁচাশি! অবাক হয়ে গেলেন জয়ন্তবাবু। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাঁর কে হন?

উনি বললেন, ছেলে।

— ছেলে! চেহারা এবং বয়স দেখে মনে হচ্ছে রুচিরার সঙ্গে এর নিশ্চয়ই কিছু ছিল না। অবশ্য বলা যায় না। আজকাল যা শুরু হয়েছে, কার সঙ্গে কার যে পটে, কিছুই বলা যায় না। দিনকাল কী পড়ল! তবে কি এরই নাম ‘আই’ দিয়ে! ‘আই’ দিয়ে হলেও এর সঙ্গে যে ও রকম একটি মেয়ের আর যা-ই হোক, কিছুতেই প্রেমঘটিত কিছু হতে পারে না, তা তিনি একশো শতাংশ শিওর। তবু জানতে চাইলেন, আপনার নাম?

উনি বললেন, ভেতরে আসুন না, বসে কথা বলুন।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম প্রফুল্ল পুরকায়স্থ।

— প্রফুল্ল! নাঃ, তা হলে ইনি নন। আচ্ছা, ‘আই’ দিয়ে শুরু, এ রকম নামের কেউ আপনাদের বাড়িতে আছে নাকি?

— ‘আই’ দিয়ে? কই! না তো।

— মনে করে দেখুন।

— আমি এই বাড়ির গার্জিয়ান। আমি জানব না?

— না, মানে ডাকনাম বা অন্য কিছু...

— না না, ‘আই’ দিয়ে কারও নাম নেই। কেন বলুন তো?

জয়ন্তবাবুর মাথায় তখন নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তা হলে কি এ বাড়ির কোনও ছেলে রুচিরার সঙ্গে মেশার সময় অন্য কোনও নাম বানিয়ে বলেছিল। যে নামের শুরু ‘আই’ দিয়ে! না হলে, ‘আই’ দিয়ে ও এই বাড়ির ফোন নম্বরটা লিখতে যাবে কেন? একটা চিন্তা খচখচ করতে লাগল মনের মধ্যে। তবু কোনও সূত্র পাওয়ার জন্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উনি জেনে নিতে লাগলেন, এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন, তাঁরা কী করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং তিনি জানলেন, এই প্রফুল্লবাবুর একটাই ছেলে। কর্মসূত্রে তিনি এখন ইন্দোরে থাকেন। বিবাহিত। বউ বাচ্চা নিয়ে তিনি কালই কলকাতায় আসছেন, জানতে পেরে জয়ন্তবাবু বললেন, উনি এলে আমার সঙ্গে একটু কসবা থানায় দেখা করতে বলবেন তো।

— কেন বলুন তো? কী হয়েছে?

— না। তেমন কিছু না। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারবেন, রুচিরা বলে কোনও মেয়েকে ও চেনে কি না। যে কসবায় থাকত।

রুচিরার নামটা শুনেই প্রফুল্লবাবুর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

না-কোনও পথ দুর্ঘটনা, না-কোনও দাবিদারহীন শনাক্তহীন দেহ, না কোনও কিছু। একটা জলজ্যন্ত মেয়ে বেমালুম উধাও হয়ে গেল কী করে! কোনও সূত্রই খুঁজে পাচ্ছিলেন না জয়ন্তবাবু। তা হলে কি অন্য কোনও চক্রের পড়লেন উনি! পড়তেই পারেন। ওর সম্পর্কে যত জানা যাচ্ছে, ততই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, মেয়েটি খুব একটা সুবিধের ছিল না। সে না থাক। উনি যেখানেই থাকুন, তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে।

বাপের বাড়িতে উনি যেমন প্রাক্তন প্রেমিকের দেওয়া উপহার, কার্ড, এটা, ওটা, সেটা সযত্নে আলমারিতে রেখে দিয়েছিলেন, স্বশুরবাড়িতেও কি তেমন কিছু তিনি লুকিয়ে রেখেছেন? ও রকম একটা ডায়েরি! ডায়েরির পাতায় কোনও ফোন নম্বর!

জয়ন্তবাবু জানেন, এই ধরনের মহিলারা দু'রকমের হয়। এক হচ্ছে, একজনের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার যাবতীয় স্মৃতি ভিজে ন্যাকড়ার টুকরো দিয়ে স্লেটের দাগ মোছার মতো করে একেবারে সব মুছে দেন, কিছু মনে রাখেন না। এমনকী, তার নামটা পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে, যতগুলো ছেলের সঙ্গে তিনি মিশেছেন বা প্রেম করেছেন, তাদের প্রত্যেকটা স্মৃতি আলাদা আলাদা করে অতি যত্নে লালন করেন। এক-একটা সম্পর্ক তার কাছে সোনাদানা বা মূল্যবান রত্নের চেয়েও দামি।

রুচিরা হয়তো গয়নার বাক্সেই সেই স্মৃতিগুলি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছেন। যখন বাড়িতে কেউ থাকতেন না, তখন সেগুলি বার করে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন। উল্টেপাল্টে দেখতেন। সেগুলিকে আদর করতেন। চুমু খেতেন। সেই দিনগুলিতে ফিরে যেতেন। রোমাঞ্চিত হতেন। জয়ন্তবাবু ঠিক করলেন, রুচিরার ঘরটা একবার তল্লাশি করবেন।

কিন্তু রুচিরার স্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখলেন, গ্রিলে একটা বড় তালা ঝুলছে। জিপের আওয়াজ পেয়ে ততক্ষণে পাশের বাড়ির একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে নিজে থেকেই আগ বাড়িয়ে বললেন, সৃজনবাবুরা তো নেই।

— কোথায় গেছেন?

— মেয়ের বাড়িতে।

— ওঁরা কি এখন ওখানেই থাকেন নাকি?

— না না, ওখানেও থাকেন। এখানেও থাকেন। বাড়ির বউ এই ভাবে

কারও সঙ্গে চলে গেলে যা হয়। একটা মান-সম্মানের ব্যাপার তো। খুব ভেঙে পড়েছেন। তার ওপর পাড়ার লোকের নানান রকম কথা। বুঝতেই তো পারছেন। তাই... আজকে দুপুরেও তো এসেছিল।

— কে?

— আভাস। এখন তো এখানে খুব ভামের উৎপাত শুরু হয়েছে। ওদের জ্বালায় টেকা যায় না। কেউ ঘরে বিষ মাখানো রুটি ছড়িয়ে রাখে। কেউ হুঁদুর ধরার বড় কল পেতে রাখে। গুঁরাও বোধহয় কল পেতে রেখেছিলেন। দেখলাম তো, ইয়া বড় বড় দুটো পচা গলা ভাম ফেলল।

— ও। তা, গুঁরা কবে আসবেন?

— কে জানে! আসলে গুঁদের নাতনিটা তো এখন ও-বাড়িতেই থাকে। গুঁরা নাতনিটাকে খুব ভালবাসেন, তাই...

— তা হলে নাতনিটাকেই তো এখানে নিয়ে আসতে পারেন।

— না, ও নাকি এ বাড়িতে আসতে চাইছে না।

— কেন?

— কী জানি!

থানায় ফিরে এসে দেখেন, রুচিরার ভাই সসীম আর তাঁর ছোট বোন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করতেই সাস্তুনা বললেন, আপনার কাছেই এসেছি, সে দিন আপনাকে বলা হয়নি। কিছু দিন আগে ওর মেয়ের স্কুলের একটা পুরনো ব্যাগ আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। বলেছিল, তোর কাছে এটা রেখে দে। পরে নিয়ে যাব। তো, তিন-চার মাস হয়ে গেছে। ও আর নিয়ে যায়নি। আমিও আর খুঁলে দেখিনি। গতকাল খুঁলে দেখি, তিন তিনটে পুরনো ডায়েরি। তাতে নানান হিসেবনিকেশ, বিখ্যাত লোকদের বিভিন্ন কোটেশন ছাড়াও প্রচুর ফোন নম্বর আছে। ওটা দেখে আমি আমার ভাইকে ফোন করেছিলাম। তা, ও-ই বলল, আপনাকে এটা দেখাতে, এর থেকে যদি কোনও সূত্র খুঁজে পান! আমরা তো বুঝব না। আপনাদের যদি কোনও কাজে আসে!

— দেখি। বলে, ডায়েরি তিনটে নিয়ে জয়ন্তবাবু বললেন, এটা আমার কাছে আপাতত থাক। একটু দেখে নিই। তার পর ফেরত দিয়ে দেব।

গুঁরা চলে যেতেই চায়ে চুমুক দিতে দিতে ডায়েরির পাতা ওলটাতো

লাগলেন উনি। দেখলেন, ডায়েরির প্রথমেই যেখানে এ বি সি ডি করে এক একটা পাতায় নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী ফোন নম্বর লেখার কথা, সেখানে কোনও নম্বর লেখা নেই। শুধুই কোটেশন আর কোটেশন। কোনও পাতায় লেখা— ‘জীবনের মূল্য আয়ুতে নয়, / কল্যাণপূত কর্মে।’ কোনও পাতায়— ‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।’ আবার কোনও পাতায় লেখা— ‘পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না / পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।’

ঝপাঝপ করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখেন, ভিতরের পাতায় মাঝে মাঝেই এক-একটা নাম আর ফোন নম্বর। দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা পাতায় থমকে গেলেন জয়ন্তবাবু। দেখলেন, ওঁর বাপের বাড়ির আলমারি থেকে পাওয়া ডায়েরির মতো এখানেও একটা ‘আই’ লেখা। আর তার নীচে দশ ডিজিটের একটা মোবাইল নম্বর।

উনি সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরিটা উল্টে দেখলেন, কভারে যে সালটা লেখা রয়েছে, সেটা এই বছরেরই। অথচ বছর শেষ হতে তো এখনও বেশ কয়েক মাস বাকি। তা হলে উনি চলতি বছরের এই ডায়েরিটা বোনের কাছে রাখতে দিয়েছিলেন কেন! এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। কিন্তু কারণটা কী!

উনি ফোন নম্বর লেখা পাতাটা মুড়ে টেবিলের উপরে রেখে অন্য একটা ডায়েরি তুলে নিলেন। এটা এর আগের বছরের। প্রতিটা পাতা এক এক করে উল্টে তেমন কিছু নজরে পড়ল না তাঁর। শেষ ডায়েরিটা তারও আগের বছরের। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখলেন, এটাতেও একটা পাতায় ‘আই’ লেখা এবং যথারীতি একটা মোবাইল নম্বর।

দুটো নম্বরই কি এক! পাতা মুড়ে রাখা প্রথম ডায়েরির ভাঁজটা খুলে মেলাতে গিয়ে দেখলেন, নম্বর দুটো এক তো নয়ই, ভিন্ন কোম্পানিরও। তার মানে এই ‘আই’ নামের লোকটির দুটি মোবাইল আছে। কিংবা ডুয়েল সিমের হ্যান্ডসেট ব্যবহার করে। অথবা ঘন ঘন নম্বর বদলায়। আর যে লোক ঘন ঘন নম্বর পালায়, সে লোক মোটেই সুবিধের নয়। কিন্তু এই ‘আই’টা কে?

জয়ন্তবাবু ডায়াল করলেন এই বছরের ডায়েরিতে লেখা ‘আই’ নামের মোবাইল নম্বরে। ফোনটা বেজেই গেল। কেউ ধরল না। দু’মিনিট পর ফের ফোন করলেন, তখনও বেজে গেল। বেজেই গেল। কী মনে করে, দু’বছর

আগের ডায়েরিতে লেখা নম্বরটাতেও ডায়াল করলেন তিনি। দু'বার রিং হতে না হতেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, হ্যালো?

জয়ন্তবাবু জিঙ্গেস করলেন, কে বলছেন!

উনি বললেন, ফোনটা তো আপনি করেছেন। কাকে চাইছেন?

— এটা কি নাইন এইট থ্রি সিক্স এইট ফাইভ ওয়ান সেভেন ডবল নাইন?

— হ্যাঁ। কী ব্যাপার বলুন।

— আপনি কি রুচিরা নামে কাউকে চেনেন?

— রুচিরা! কে রুচিরা?

— সেটা তো আমি আপনাকে জিঙ্গেস করছি।

— না। এই নামে কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না।

— মনে পড়ছে না, না, মনে করতে চাইছেন না?

— কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি কে?

— সেটা পরে বলব। তার আগে বলুন তো আপনি রুচিরা নামে কাউকে সত্যিই চেনেন কি না?

— না বললাম তো।

— আপনার নাম কি 'আই' দিয়ে শুরু?

— না। আমার নাম তাপস গাঙ্গুলি।

— তাপস! ও। আর ডাকনাম?

— তপু।

— ও। ঠিক আছে। এই কথা বলেই, জয়ন্তবাবুর মনে হল উনি হয়তো এফুনি লাইনটা কেটে দেবেন। তাই, তাড়াতাড়ি করে বললেন, এক মিনিট, এক মিনিট। ছাড়বেন না। আপনি কি এই নম্বরটা নতুন নিয়েছেন?

ও প্রান্ত থেকে বললেন, না। কেন, কী হয়েছে বলুন তো?

— আমার মনে হচ্ছে, এই নম্বরটা আগে 'আই' দিয়ে শুরু কারও নামে ছিল। তিনি হয়তো লাইনটা ছেড়ে দিয়েছেন, তার পর...

— না না। এই থ্রি সিক্স এইট ডিজিটটা যখন বাজারে প্রথম আসে, আমি তখনই নিই। আমার আগে এই নম্বরটা কারও ছিল না। কিন্তু আপনি কী জানতে চাইছেন একটু খুলে বলুন তো...

— বলছি। তার আগে বলুন তো, আপনি কী করেন?



— আমি নিউ আলিপুর থানার এস আই।

— এস আই!

— হ্যাঁ। কেন? কী হয়েছে?

— আমি কসবা থানার ইনস্পেক্টর জয়ন্ত সরকার। এখানকার এক গৃহবধু ক’দিন আগে স্বশ্রববাড়ি থেকে মাঝরাতে পালিয়ে গেছে। তার ইনভেস্টিগেশন করতে করতে বিভিন্ন ডায়েরিতে বিভিন্ন লোকের ফোন নম্বর পেয়েছি। আর তার মধ্যে শুধু ইংরেজি অক্ষরে লেখা একটা ‘আই’ আমাকে একটু ভাবাচ্ছে। কারণ, এর আগে যে নম্বরটা পেয়েছিলাম, সেটার সূত্র ধরে খুঁজতে খুঁজতে যে বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানে ‘আই’ দিয়ে শুরু কোনও নামের কেউ থাকেন না। এবং ওই বাড়ির কেউ ওই ধরনের কাউকে চেনেনও না। আবার আপনার নম্বরের আগেও দেখছি একটা আই লেখা। অথচ আপনার নামও ‘আই’ দিয়ে শুরু নয়। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। স্যরি, আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম। কিছু মনে করবেন না।

— না না। এতে মনে করার কী আছে। যদি কোনও দরকার হয়, আবার ফোন করবেন, কেমন?

— ও. কে।

জয়ন্তবাবু হয়তো আরও কথা বলতেন, কিন্তু এরই মধ্যে দুটো কল বিপ বিপ করে গেছে। ধরা যায়নি। এখন মিসড্ কল থেকে ওই নম্বর দুটো বার করে দেখতে হবে, কে করেছিল। অপরিচিত নম্বর হলে ফোন করতে হবে। কিন্তু না, তাঁকে আর মিসড্ কল লিস্টে যেতে হল না। তার আগেই তাঁর ফোন বেজে উঠল।

— হ্যালো, কে বলছেন?

জয়ন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাইছেন?

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, একটু আগে এই নম্বর থেকে আমার কাছে দুটো মিসড্ কল এসেছিল। তাই করছি। কে বলছেন?

আমি মিসড্ কল করেছিলাম! রুচিরার বোন সাস্ত্রনার দিয়ে যাওয়া তিনটে ডায়েরির দুটোই তখন তার সামনে খোলা। যে পাতায় ‘আই’য়ের নম্বর লেখা। সেটায় চোখ পড়তেই জয়ন্তবাবু বুঝতে পারলেন, প্রথম যে ‘আই’কে দু’-দু’বার ফোন করেও তিনি পাননি, উনিই রিং ব্যাক করেছেন। তাই বললেন, আমি কসবা থানার ইনস্পেক্টর জয়ন্ত সরকার বলছি।

ও প্রান্ত থেকে খুব চাপাস্বরে ভেসে এল, হ্যাঁ, বলুন।

— আপনার নামটা জানতে পারি?

— আপনি আমার নাম জানেন না। অথচ ফোন করেছেন!

— বলার ধরন শুনে জয়ন্তবাবুর মনে হল, উনি মুখের কাছে হাত দিয়ে ঢেকে কথা বলছেন। তবু বললেন, দরকার আছে।

— কী দরকার?

— আপনি রুচিরাকে চেনেন?

— রুচিরা! কে রুচিরা! কোথায় থাকেন?

— কোথায় থাকেন! নাম শোনেননি! কথাগুলি এমন ভাবে উনি উচ্চারণ করলেন, যেন বোঝাতে চাইলেন, সবই জানেন, অথচ এমন ভান করছেন, কিছুই জানেন না। আমার কাছে এ সব করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু তার উত্তরে যে ও প্রান্ত থেকে বিরক্তি মেশানো গলায় ‘শুনেছি হয়তো, মনে নেই। হ্যাঁ বলুন, কী বলতে চান’ ভেসে আসবে, উনি তা ভাবতেই পারেননি। তবু বললেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

ফোনের ও প্রান্তের ‘আই’ বলে উঠলেন, আমি এখন ব্যস্ত আছি। ঘণ্টা দেড়েক পরে করুন।

— ব্যস্ত? কীসের ব্যস্ত?

— আমি এখন নবান্নে। সি এম-এর ঘরে আছি। বলেই, লাইনটা কেটে দিলেন উনি।

জয়ন্তবাবু অবাক হয়ে গেলেন। নবান্নে! সি এম-এর ঘরে! মানে চিফ মিনিষ্টারের ঘরে! এ আবার কে রে বাবা! তবু যে-ই হোন, ঐকে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে। দেড় ঘণ্টা তো? ঠিক আছে, আমি দু’ঘণ্টা পরে ফোন করব। দেখি উনি কত বড় মাতব্বর।

রুচিরার স্বশ্রববাড়িতে গিয়ে ওঁর ঘর তল্লাশি করতে পারলে নিশ্চয়ই কোনও সূত্র পাওয়া যাবে। অন্তত কোনও ছবিটবি। নিদেনপক্ষে কোনও ডায়েরির পাতায় লেখা এ রকম কোনও নম্বর। তাই আভাসদের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলেন জয়ন্তবাবু। কারণ, ল্যান্ডফোনে ফোন করলে ফোন বেজেই যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। তার মানে, হয় ও বাড়ির ফোন খারাপ, আর তা না হলে ও বাড়িতে এখনও ওঁরা ফেরেননি। ছোট মেয়ের বাড়িতেই আছেন।

তবু উনি আভাসদের বাড়িতেই গেলেন এবং দেখলেন, যথারীতি গেটে তালা ঝুলছে। ফলে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলেন পাশের পাড়ায়। আভাসের ছোট বোনের বাড়ি।

আভাস তখন নেই। ওর ছোট বোনও নেই। রুচিরার মেয়েটাকে নিয়ে নাকি আশপাশে কোথাও গেছে। বাড়িতে শুধু আভাসের বাবা-মা। তাঁদের কাছে রুচিরার ঘরটা একবার দেখতে চাওয়ার কথা বলতেই ওঁরা দু'জনেই বললেন, আপনি যদি ওকে খুঁজে পাওয়ার কোনও সূত্র ওঁদের ঘর থেকে খুঁজে পান, তা হলে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু কে যাবে আপনাকে নিয়ে? এখন তো বাড়িতে কেউ নেই। জয়ন্তী দেবী বললেন, আমি যেতে পারতাম, কিন্তু ওনার শরীরের যা অবস্থা, একা রেখে যেতে ভরসা পাই না। আমি বরং কাল সকাল ন'টা, সাড়ে ন'টার মধ্যে আভাসকে ও বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। আপনি আপনার সময়মতো এসে ওর ঘরটা দেখে যাবেন, কেমন?

জয়ন্তীবাবু বললেন, ঠিক আছে। বলে, ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে হঠাৎ কী মনে হল, উনি বললেন, বাচ্চাটাকেও ওঁর সঙ্গে একটু পাঠিয়ে দেবেন তো...

জয়ন্তী দেবী মাথা কাত করলেন।

জিপে উঠে এসে ফের ফোন করতে যাচ্ছিলেন 'আমি এখন সি এম-এর ঘরে আছি' বলা 'আই'কে। ঘণ্টা দেড়েক পরে ফোন করতে বলেছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে যে কত বার উনি ফোন করেছেন, তার কোনও হিসেব নেই। ফোন করলে যিনি ধরেন না, তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গলদ আছে। মনে মনে ভাবলেন, আরও দু'-চার বার ফোন করবেন। তাতেও যদি তিনি ফোন না ধরেন, এটা তো ভোডাফোনের নম্বর, তা হলে সরাসরি ভোডাফোনের অফিস থেকে এই নম্বরটা কার নামে নথিভুক্ত করা আছে, আর তাঁর ঠিকানাটাই বা কী, সেটা জেনে নিয়ে তিনি সোজা সেখানেই হানা দেবেন।

যখন এ সব ভাবছেন, তখন তাঁর মাথার মধ্যে আর একটা বুদ্ধি খেলে গেল। উনি জানেন, অনেকেই আছেন, যাঁরা সহজে ফোন ধরেন না। কিন্তু কিছু কিছু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোককে, যাঁকে ওঁদের দরকার নেই, যাঁর নম্বর ওঁরা সেভও করে রাখেন না, অথচ বলা থাকে, আমাদের একটা মিসড কল দিয়ে ছেড়ে দিও। আমি সময় মতো করে নেব। এবং মজা হচ্ছে, ঘন ঘন একটানা

ফোন বেজে গেলেও, তাঁরা যদি না ধরেন, মিসড্ কল দেখলেই কিন্তু তাঁরা সব কাজ ফেলে দিয়ে, কে করেছে, কেন করেছে, কোনও কিছু না দেখেই আগে সেখানে রিং ব্যাক করেন। এটা একটা অদ্ভুত মানসিকতা।

জয়ন্তবাবু সেটাকেই কাজে লাগালেন। ওই নম্বরে ফোন করে দু'বার রিং হতে না হতেই উনি লাইনটা কেটে দিলেন। এবং অবাধ কাণ্ড, তিরিশ সেকেন্ডও কাটল না, ওই নম্বর থেকে ফোন ভেসে এল।

জয়ন্তবাবু ফোনটা ধরেই বললেন, আপনি আমাকে ঘণ্টা দেড়েক পরে ফোন করতে বলেছিলেন। কিন্তু তার পর বহু বার ফোন করেও আপনাকে পাইনি। তাই মিসড্ কল করলাম।

— ফোনটা ভাইব্রেশনে রাখা ছিল। হ্যাঁ, বলুন, কী জানতে চান?

— রুচিরার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

— রুচিরা! সেটা আবার কে?

— রুচিরা বলে আপনি কাউকে চেনেন না?

— না... অন্তত এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

— নামটাই মনে পড়ছে না!

— না। বললাম তো। কী দরকার বলুন।

— উনি গত পরশু ভোররাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন।

— পালিয়ে গেছেন? না। এটাকে কোনও খবর করা যাবে না। আপনি বরং লোকাল থানায় আগে একটা মিসিং ডায়েরি করুন।

— আমি থানা থেকেই বলছি।

— থানা থেকে?

— হ্যাঁ।

— কোন থানা?

— কসবা থানা।

— ওখানে এখন অশোকদা ও. সি. না?

— হ্যাঁ। আপনি তাঁকে চেনেন?

— খুব ভাল করেই চিনি। আগে যখন পুলিশ বিট করতাম, তখন অনেকের সঙ্গেই নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। শুধু অশোকদাই না, আপনাদের ওখানকার অনেককেই চিনি।

— তাই? আপনি এমনিতে কী করেন?

— আমি আনন্দবাজারে আছি।

— আনন্দবাজারে? সাংবাদিক?

— হ্যাঁ। এখন পলিটিক্যাল বিট করি।

— ও। আসলে হয়েছে কী জানেন, যে জন্য বারবার ফোন করছি, আপনাকে একটু বলি, দু’মিনিট কথা বলা যাবে তো?

উনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না...

— আমার হাতে একটা কেস এসেছে। দু’দিন আগে এক গৃহবধূ তাঁর স্বশুরবাড়ি থেকে মধ্যরাতে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ পালিয়ে গেছেন। সেটার ইনভেস্টিগেশন করতে করতে ওঁর একটা ডায়েরিতে আপনার এই নম্বরটা পাই।

— আমার নম্বর?

— হ্যাঁ। তবে কোনও নাম লেখা ছিল না। নম্বরটার আগে শুধু একটা গোল চিহ্নের মধ্যে ইংরেজি অক্ষরের ‘আই’ লেখা ছিল।

— আই! ভারী ইন্টারেস্টিং তো।

— কেন?

— আমার ফোন নম্বরের সঙ্গে আইয়ের কী সম্পর্ক?

— আপনার নাম কী?

— অনিন্দ্য গোস্বামী।

— অনিন্দ্য! তা হলে তো ‘এ’ লেখার কথা। আই...

— কোথায় থাকতেন ভদ্রমহিলা?

— এই তো কসবাতেই। বি বি চ্যাটার্জি স্ট্রিটে।

— বি বি চ্যাটার্জি স্ট্রিটে?

— কী নাম বললেন যেন ভদ্রমহিলার?

— রুচিরা।

— তাঁর কি কোনও বাচ্চা আছে? মেয়ে?

— হ্যাঁ। চেনেন?

— দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান... যাঁর স্বামী সেক্টর ফাইভে কাজ করেন? তাঁরই এক অফিস কলিগের সঙ্গে প্রেম করেন?

— প্রেম করেন! তা তো বলতে পারব না। তবে আপনি এগুলো জানলেন কী করে?

— শচীনকে কাছে থেকে।

— শচীন? তিনি কে?

— আমার কলেজের এক বন্ধু। বালিগঞ্জ ব্রিজের নীচে, ভারত সেবাশ্রম সংঘের যে আশ্রমটা আছে না? সেটা ছাড়িয়ে একটু গেলেই, বাঁ হাতে জামির লেন...

— হ্যাঁ, জামির লেন চিনি...

— ও ওখানেই থাকে। ওর বাচ্চা যে স্কুলে পড়ে, সেই স্কুলেই নাকি ওই ভদ্রমহিলার বাচ্চাও পড়ে। বাচ্চা দিয়ে-আসা নিয়ে-আসা করতে করতেই ওঁদের চেনাজানা। খুব ভাল বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল ওঁদের মধ্যে। তা বলে আপনি আবার অন্য কিছু ভাববেন না। রুচিরা কী করে যেন জানতে পেরেছিল, তাঁর স্বামীর ওই অ্যাফেয়ারের কথা। বাড়িতে ওই ভদ্রলোক নাকি এমন ভাবে থাকেন, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানেন না। একদিন রুচিরা ওঁর প্রেম নিয়ে ওঁকে সামান্য ঈর্ষিত দেওয়াতে, উনি হাসতে হাসতে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যার ঘরে এ রকম একটি সুন্দরী বউ আছে, সে কোন দুঃখে অন্য মেয়ের পেছনে যাবে, শুনি? তাঁকে হাতেনাতে ধরার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন রুচিরা। কিন্তু একটা মেয়ের পক্ষে তো সব সময় সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়, তাই উনি শচীনের সাহায্য নিতেন।

— কী রকম সাহায্য?

— তাঁর স্বামী ওই মেয়েটির সঙ্গে কোথাও যেতে পারে, জানতে পারলেই, উনি শচীনকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলতেন।

— উনি যেতেন?

— হ্যাঁ। ও ভীষণ হেল্পফুল ছেলে। যে যখন বলে, ও তার কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায়। কার রক্ত দরকার, কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কে টাকা-পয়সার অভাবে পড়াশোনা করতে পারছে না, ওকে একবার বললেই হল। মুহূর্তের মধ্যে বাইক ছুটিয়ে ও হাজির। ও-ই তো আমার কাছে ওই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসেছিল।

— কেন?

— কারণ, ওদের পক্ষে ওঁর স্বামীকে হাতেনাতে ধরা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই আমার কাছে এসেছিল, আমি যদি তেমন কোনও প্রাইভেট গোয়েন্দার



হৃদিশ দিতে পারি, যারা কম খরচে ওঁর স্বামীর গতিবিধির উপরে নজর রাখবে এবং খোঁজখবর দেবে।

— কী নাম যেন বললেন ছেলেটার?

— শচীন।

— ওর ফোন নম্বরটা আপনার কাছে আছে?

— দেখছি। যদি পাই, আমি আপনাকে এস এম এস করে দিচ্ছি।  
কেমন?

— থ্যাঙ্ক ইউ দাদা, থ্যাঙ্ক ইউ।

ফোনটা বন্ধ করে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন জয়ন্তবাবু। যাক, অন্তত একটা ক্লু তো পাওয়া গেল। যার স্কুটারে করে ওঁকে এখানে-ওখানে দেখা যেত, তিনি তাঁর প্রেমিক নন। আর দুই হচ্ছে, আভাস তাঁর অফিসেরই এক সহকর্মীর সঙ্গে প্রেম করেন। ঠিক আছে, এ বার ইনভেস্টিগেশনটা এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

থানায় এসে চেয়ার টেনে বসতে না বসতেই জয়ন্তবাবুর পাশের চেয়ারে বসা অজয় তাঁর দিকে একটা চিরকুট এগিয়ে দিয়ে বললেন, একটু আগে এই ভদ্রলোক এসেছিলেন। আপনার খোঁজ করছিলেন। এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

চিরকুটটা হাতে নিয়ে উনি দেখতেন, তাতে লেখা— প্রবাল পুরকায়স্থ। নীচে একটা মোবাইল নম্বর লেখা। দশ ডিজিটের নম্বরটার আগে একটা শূন্য বসানো। তার মানে এটা কলকাতার নম্বর নয়। অথচ তার নীচে লেখা, ৮২/৪/ কে, হিন্দ রোড, কলকাতা ৭৫।

কলকাতা পঁচাত্তর দেখেই ওঁর মনে পড়ে গেল সন্তোষপুরের কথা। প্রফুল্ল পুরকায়স্থর কথা। উনি যখন এই কেসটার ইনভেস্টিগেশনের জন্য ওখানে গিয়েছিলেন, প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন, আগামী কাল তাঁর ছেলের কলকাতায় আসার কথা। তার মানে উনি ফিরে এসেছেন। আর যেহেতু উনি তাঁকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, তাই বাবার মুখে তাঁর কথা শোনামাত্রই হয়তো অন্য সব কাজ স্থগিত রেখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে ওই নম্বরে ফোন করলেন তিনি, আমি কসবা থানা থেকে জয়ন্ত সরকার বলছি। আপনি কি অনেকটা দূরে চলে গেছেন? কী বললেন?

‘দোলনা’ স্কুলের সামনে? একটি বার আসতে পারবেন? আমি এসে গেছি।

আর কিছু বলার দরকার হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবালবাবু এসে হাজির। লম্বা চওড়া, সুদর্শন চেহারা। তেমনই রুচিশীল পোশাক আশাক। দশ জনের মধ্যে থাকলেও তাঁকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। তিনি টেবিলের উল্টো দিকে বসতেই জয়ন্তবাবু বললেন, রুচিরার ব্যাপারে আপনার কাছে একটু জানতে চাই।

প্রবাল বললেন, হ্যাঁ, বাবার কাছে শুনেছি, কী জানতে চান বলুন।

— আপনার সঙ্গে ওঁর আলাপ হল কী করে?

— আলাপ... সে তো অনেক দিন আগের ঘটনা, এখন আর মনে নেই। কেন বলুন তো?

— আপনার সঙ্গে লাস্ট কবে দেখা হয়েছে?

— লাস্ট? সে তো বহু দিন আগে। ওর বিয়ে হওয়ার পর আর কোনও যোগাযোগ নেই।

— কেন?

— না। ও তো আমার কাছে চাকরির জন্য আসত। বিয়ের পর বোধহয় ওর আর চাকরির দরকার ছিল না। তাই আর কোনও যোগাযোগ রাখেনি।

— আপনি কোনও যোগাযোগ করেননি?

— না না, আমি কেন খামোকা যোগাযোগ করতে যাব? ওর দরকার ছিল, ও আসত। আমার কোনও দরকার ছিল না।

— ও কি আপনার কাছে শুধু চাকরির জন্যই যেত?

— হ্যাঁ। এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। আমি আকার-ইঙ্গিতে, কথার ভাঁজে ওকে চলে যেতে বললেও ও সহজে যেত না। একটু গায়ে পড়া স্বভাবের ছিল আর কী। আমার বাবা-মা’ও ওকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। কোনও কোনও দিন তো আমার সঙ্গেই বেরোত। আর সেই নিয়ে মা বাবার মনে একটা সন্দেহও দানা বেঁধেছিল।

— কী রকম?

— ওঁরা সরাসরি আমাকে কখনও কিছু বলেননি। কিন্তু ওঁদের চাহনি দেখে বুঝতে পারতাম, ওঁরা হয়তো মনে মনে ভাবছেন, আমি বুঝি ওর সঙ্গে প্রেম করছি।

— সেটা কি বিয়ের আগে?

— হ্যাঁ। বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। বিয়ের দু'দিন আগে ফোনও করেছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমি যেতে পারিনি।

— কেন?

— আমার হাজার রকম কাজ থাকে। একদম সময় পাই না।

— তাই?

— হ্যাঁ।

— তখন কী করতেন?

— তখন তিনটে কোম্পানিতে কনসালটেন্সির কাজ করতাম।

— ও, আচ্ছা আচ্ছা।

— হঠাৎ এত দিন পরে ওর ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, কী ব্যাপার বলুন তো? কিছু ঘটেছে নাকি?

— না না, তেমন কিছু নয়। ঠিক আছে। তবে দরকার হলে...

— হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর শিওর। অবশ্যই। উঠি তা হলে?

— ও, কে।

জয়ন্তবাবু কখনও মোবাইলের সুইচ অফ করেন না। রাত দুটোতেও ফোন বাজলে উনি ঝট করে উঠে ফোন ধরেন। মেসেজ এলেও খুলে দেখেন। কিন্তু এই মেসেজটা কখন এসেছে, উনি টের পাননি। সকালে খুলে দেখেন— শুধু একটা নাম আর একটা মোবাইল নম্বর।

ক'টায় পাঠিয়েছে এটা! বাবা, রাত একটা চৌত্রিশে! কে পাঠাল! কারও নাম নেই তো। অনেকেই আছেন, মেসেজ লেখেন, কিন্তু নিজের নামটা লেখেন না। ভাবেন, তিনি এত ইম্পর্ট্যান্ট মানুষ, তাঁর নামটা কি আর ওর মোবাইলে সেভ করা নেই! তবু কোন নম্বর থেকে পাঠিয়েছে একটু দেখি তো। আর সেই নম্বরটা দেখতে গিয়েই তাঁর মনে পড়ে গেল, সাংবাদিক অনিন্দ্য গোস্বামীর কথা। সত্যিই, তাঁর স্মৃতিশক্তি এখনও যথেষ্টই ভাল। হ্যাঁ, এটা তাঁরই নম্বর। সেই পাঠিয়েছে, তাঁর কলেজের বন্ধু শচীনবাবু ঘুম থেকে উঠেছেন! দেখি তো ফোন করে। ও প্রান্তে তিন-চারটে রিং হতে না হতেই

যিনি ধরলেন, হ্যালো-ট্যালো না বলেই তিনি বললেন, হ্যাঁ, বলছি, বলুন।

উনি বলতে বলছেন ঠিকই, কিন্তু বললে কি উনি শুনতে পারবেন? লাইনটা কেমন যেন কেটে কেটে যাচ্ছে। ভাল করে কান পেতে শুনলেন, একটা চলন্ত ট্রেনের আওয়াজ। না। আওয়াজটা লোকাল ট্রেনের নয়। কোনও এক্সপ্রেস ট্রেনের। তার মানে ওই সাংবাদিক ঝুঁকে যতই ‘ভাল’ বলে সার্টিফিকেট দিক না কেন, আসলে নাটের গুরু এ-ই। ট্রেনের আওয়াজ মানে, হয় রুচিরাকে নিয়ে তিনি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ট্রেনে করে যাচ্ছেন অথবা শখ মিটে যাওয়ায় আরও অনেক ছেলের মতো তিনিও ফিরে আসছেন। জয়ন্তবাবু নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, আমাকে নাস্তানাবুদ করা, না? এ বার দেখাচ্ছি মজা। কোথায় পালাবে, দেখি।

ও প্রান্ত থেকে তখন ক্রমাগত হ্যালো হ্যালো, কে বলছেন, হ্যালো, কে বলছেন... একটানা বলেই চলেছে।

হ্যাঁ, এ বার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। জয়ন্তবাবু বললেন, আমি কসবা থানা থেকে জয়ন্ত সরকার বলছি।

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, হ্যাঁ, বলুন। আমাকে অনিন্দা ফোন করেছিল। আপনার কথা বলেছে। আমিই ওকে বলেছিলাম, আমার মোবাইল নম্বরটা আপনাকে দিয়ে দিতে। আপনি না করলে কলকাতায় ফিরে আমিই আপনাকে ফোন করতাম।

— আপনি এখন কলকাতায় নেই?

— না। আমি মা বাবা বউ বাচ্চাকে নিয়ে একটু পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এই ফিরছি।

— এখন কোথায়?

— এই তো বালেশ্বর পেরোলাম।

— ও, তার মানে আজই ফিরছেন। খুব ভাল কথা। তা, বলছিলাম, আপনি কি আজ একটু আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?

— আজকে! ঠিক আছে, দেখছি। এখান থেকে হাওড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে এখনও ধরুন ঘণ্টা চারেক। সেখান থেকে বালিগঞ্জ কম করেও এক ঘণ্টা। তার পর একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে... দেখছি। কলকাতায় ফিরেই আপনাকে একটা ফোন করে নেব, কেমন?

জয়ন্তবাবু বললেন, ঠিক আছে। তার পরেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ

ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে আভাস চলে আসবেন তাঁদের বাড়িতে। এখনই ন'টা বাজতে চলল। হাতে আর সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, রুচিরার ঘরটা সার্চ করতে হবে। হয়তো তেমন কোনও সূত্র মিললেও মিলতে পারে। তাই খানিক আগে টেবিলের উপরে বউয়ের নামিয়ে দিয়ে যাওয়া চায়ের কাপটায় কোনও রকমে সুরুত সুরুত করে কয়েকটা চুমুক দিয়েই উনি বেরিয়ে পড়লেন।

আগের দিনই অরূপ আর অজয়কে জয়ন্তবাবু বলে রেখেছিলেন, সকাল সকাল তৈরি হয়ে থাকতে। আভাসদের বাড়ি যেতে হবে। সেই মতো গুঁরা থানায় রেডি হয়েই ছিলেন। উনি আসতেই জিপ নিয়ে গুঁরা রওনা হয়ে গেলেন। আভাসদের বাড়ির সামনে নেমে দেখেন, গ্রিলের দরজার ক'হাত দূরে বড় একটা ভাম মড়ে পড়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে, কাল রাতের নয়, দু'-তিন দিন আগের মড়া। একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তার মানে ফাঁকা ঘর পেয়ে সে দিনের মতো ঢুকে উৎপাত শুরু করতে না করতেই গুঁদের পাতা কাঁটাকলে পড়ে গিয়েছিল। আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে। কাঁটাকলের দাঁতগুলি তার শরীরে এত জোড়ে চেপে বসেছিল যে, ধড় থেকে শরীর প্রায় আলাদা হওয়ার জোগাড়। আজ নিশ্চয় ঘরে ঢুকে আভাস এটা বার করেছেন। কিন্তু ফেললেনই যখন, একটু দূরে গিয়ে ফেলতে পারলেন না! নিজের বাড়ির সামনে এই ভাবে কেউ ফেলে।

গ্রিলের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তবাবু দেখলেন, দরজায় আজ বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে তালা দেওয়া। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে আভাস চলে এসেছেন। তবে দেওয়ালের ধার দিয়ে বাড়ির যতটা দেখা যায়, সে দিকে তাকিয়ে জয়ন্তবাবু বুঝতে পারলেন, এখনও উনি কোনও জানালা কপাট খোলেননি। হয়তো একটু আগেই এসেছেন। তাই গ্রিলের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে কলিংবেল বাজালেন তিনি। আওয়াজ পেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার তালা খুলে দিলেন আভাস। বললেন, আসুন আসুন।

রুচিরার ওয়ারড্রোব থেকে বিছানার তলা, বাচ্চার বইয়ের র্যাক থেকে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার, শীতের পোশাক ঠেসে রাখা আলমারির খোপ, তিন জনে মিলে তন্নতন্ন করে খুঁজেও তেমন কিছু পেলেন না। বুঝতে পারলেন, যাওয়ার সময় সমস্ত কিছু একেবারে সাপটে-সুপটে নিয়ে গেছেন রুচিরা।

যাতে কোনও ক্লু থেকে না যায়। কিংবা যাওয়ার পরিকল্পনা আগে থেকেই ঠিক ছিল বলে, একটু একটু করে আগেভাগেই সব অন্যত্র পাচার করে দিয়েছেন। যেমন ছোট বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিন-তিনটে ডায়েরি।

তবে স্টিলের আলমারির লকার আর একদম তলার খোপের নীচে ইঞ্চি তিনেকের যে গোপন জায়গাটা আছে, যেখানে সাধারণত সবাই ফিল্ড ডিপোজিটের কাগজ, শেয়ারের সার্টিফিকেট কিংবা অত্যন্ত মূল্যবান ডকুমেন্টগুলি রাখেন, সেটা দেখা যায়নি। কারণ, ওটার চাবি নাকি রুচিরার কাছে আছে। কিন্তু চাবিটা উনি কোথায় রাখেন, যেহেতু তাঁর ওখানে হাত দেওয়ার দরকার হয় না, তাই আভাস নাকি কোনও দিনই ওটা জানতে চাননি।

তবুও হাল না ছেড়ে অজয় আর অরূপকে অন্য ঘরগুলো সার্চ করতে বলে আভাসের সঙ্গে কথা বলার জন্য বসার ঘরে গিয়ে বসলেন জয়ন্তবাবু। লম্বা সোফার উল্টো দিকে দুটো ছোট সোফা। মাঝখানে একটা টি-টেবিল। টেবিলের উপরে কয়েকটা পুরনো খবরের কাগজ আর একটা-দুটো সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা।

মুখোমুখি নয়, পাশাপাশি ছোট দুটো সোফায় দু'জনেই দু'জনের দিকে একটু বেঁকে বসেছেন। নানান কথা হচ্ছে। এক-একটা প্রশ্ন করছেন জয়ন্তবাবু আর তার উত্তর দিচ্ছেন আভাস। কথা বলতে বলতে মেঝেতে হঠাৎ চোখ পড়তেই জয়ন্তবাবু দেখলেন, ধানের চেয়ে সামান্য মোটা একটু বড় মাপের সাদা ধবধবে এক ধরনের পোকা জোঁকের মতো ঢেউ তুলে তুলে এগিয়ে আসছে। উনি ঝপ করে পা সরিয়ে নিলেন। উনি জানেন, ইঁদুর-বেড়াল মরলে ক'দিন পরেই তাদের পচা শরীর থেকে এই ধরনের পোকা বেরোয়। তার মানে ওই ভামটা এই ঘরেই মরেছিল। কিন্তু কই, যেটা গেটের সামনে পড়ে আছে, সেটার গায়ে তো কোনও পোকা দেখিনি। তা হলে!

মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে এই সব সাত-পাঁচ ভেবে আভাসকে উনি জিজ্ঞেস করলেন, যে ভামটা দরজার সামনে ফেলেছেন, সেটা এ ঘরে মরেছিল, না?

আভাস বলল, না না। ওটা আমি ফেলিনি। ওটা মনে হয় আশপাশের কোনও বাড়ি থেকে ফেলেছে। আমরা ছিলাম না তো, যে যা পেরেছে, করেছে...



আভাসের কথা শেষ হওয়ার আগেই জয়ন্তবাবুর পকেটের মোবাইলটা বেজে উঠল। — আমি শচীন বলছি। সকালে কথা হয়েছিল... মনে আছে? অনিন্দ্যর বন্ধু...

— অনিন্দ্যর বন্ধু? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।

— আমি এই একটু আগেই ফিরেছি। তাই ফোন করলাম।

— আমি এখন একটু ব্যস্ত। রুচিরার শ্বশুরবাড়িতে আছি। আপনি কি থানায় চলে এসেছেন?

— না না। আপনি কখন থাকবেন, সেটা জানার জন্যই ফোন করলাম।

সোফা ছেড়ে ঘরের অন্য দিকে সরে যেতে যেতে তিনি বললেন, খুব ভাল করেছেন। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। আমি শুনলাম, আপনার সঙ্গে রুচিরার খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু অনিন্দ্যবাবুর কাছে আপনার নাম শোনার পরে, উনি আপনার ফোন নম্বরটা তখনও দেননি দেখে, যে তিনটে ডায়েরি রুচিরা দেবীর বোন সান্ত্বনা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আপনার কোনও নাম কিংবা কোনও টেলিফোন নম্বর তো পেলাম না।

— না না। ওর ডায়েরিতে আমার নম্বর আছে। তবে শচীন নামে নেই।

— তা হলে?

— দেখবেন, ইংরেজি অক্ষরে একটা ‘এফ’ লেখা আছে। তার পাশে যেটা, সেটাই আমার নম্বর।

— এফ?

— হ্যাঁ। এফ নামে ফ্রেন্ড।

— কই, সে রকম কিছু চোখে পড়ল না তো।

— আমার নম্বর নেওয়ার সময় আমার সামনেই তো ও ওর ডায়েরিতে ওটা লিখেছিল।

— হয়তো হবে। চোখ এড়িয়ে গেছে। তবে ‘আই’ পেয়েছি। একটা নয়, অনেকগুলো।

— হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ওই ভাবেই লিখত।

— ওই ভাবে লিখত মানে?

— ওর যখন যাকে ইম্পট্যান্ট মনে হত, তাঁর নাম না লিখে ও সংক্ষেপে শুধু ইংরেজি অক্ষরের একটা ‘আই’ লিখে রাখত। আমি নিজে দেখেছি।

শচীনের কথা শুনে জয়ন্তবাবুর কাছে পরিকার হয়ে গেল পুরো ব্যাপারটা। রুচিরার বাপের বাড়ির আলমারির ডায়েরি থেকে যে ‘আই’ নামের নম্বরটা উনি তাঁর পকেটের ছোট ডায়েরিতে টুকে নিয়েছিলেন, সেই প্রবালবাবুর কাছে উনি তখন চাকরির জন্য যেতেন। তার মানে প্রবালবাবু তখন ওর কাছে খুব ইম্পট্যান্ট ছিলেন। তার পর যে ‘আই’ নম্বরটা পেয়েছিলেন, তিনি একজন পুলিশ অফিসার। উনি হয়তো কখনও কোনও কারণে রুচিরার কাছে ইম্পট্যান্ট হয়ে উঠেছিলেন। আর তৃতীয় ‘আই’ হল সাংবাদিক অনিন্দা গোস্বামী। ওঁকেও নিশ্চয়ই রুচিরার ইম্পট্যান্ট মনে হয়েছিল। তাই তাঁর নাম না লিখে উনি শুধু একটা ‘আই’ লিখেছিলেন। শচীনও তো ওঁর কাছে অত্যন্ত ইম্পট্যান্ট ছিল, তা হলে ওঁর নামের আগে উনি ‘আই’ লিখলেন না কেন! শুধু বন্ধু বলে! হতে পারে।

ও প্রান্ত থেকে শচীন বললেন, তা হলে কখন যাব?

জয়ন্তবাবু বললেন, আমার মনে হয় না, আপনার আর আসার দরকার আছে। যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে আমিই আপনাকে ফোন করব। ঠিক আছে?

জয়ন্তবাবু ও. কে. বলার আগেই গিল খোলার শব্দ শোনা গেল। ওঁরা ঢোকের পরে তাড়াতাড়িতে নিশ্চয়ই গেটে তালা লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন আভাস। গিল খুলে ঢুকলেই ছোট একচিলতে বারান্দা। সেটা পেরোলেই এই ঘর।

চটির শব্দ শুনে মনে হল একজন নয়, একাধিক লোক। কিন্তু কারা এল! দরজার দিকে তাকাতেই জয়ন্তবাবু দেখলেন, একটা বাচ্চা মেয়ে আর আভাসের ছোট বোন সান্ত্বনা। জয়ন্তবাবু বুঝতে পারলেন, এই বাচ্চাটাই রুচিরার মেয়ে। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখেও সে ঘরে ঢুকল না। ও-দিকে চলে গেল। ওর বাবা কত বার ডাকলেন, এ-দিকে এসো। কী হল, ডাকছি না! এ-দিকে এসো।

জয়ন্তবাবুর দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা বললেন, আপনি আসবেন দেখে দাদাকে একটু আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওকে রেডি করা মানে পাক্সা এক ঘণ্টা।

উনি বকবক করে যাচ্ছিলেন। জয়ন্তবাবুর চোখ তখন দরজার দিকে। উনি দেখলেন, বাবার ডাক শুনেও বাচ্চাটি ফের দরজার কাছে এসে গুটিগুটি পায়ে দু’পা ঘরে ঢুকেই ঝট করে একছুটে বেরিয়ে গেল। মেয়ের কাছে

যাওয়ার জন্য আভাস উঠতে যাচ্ছিলেন। জয়ন্তবাবু তাঁকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে বললেন, আপনি বসুন, আমি দেখছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের ঘরে তাকালেন। সে ঘরে তখন তল্লাশি চালাচ্ছেন অজয় আর অরূপ। তার পরেই ছোট্ট একটা শোওয়ার ঘর। সেখানেও ও নেই। এ বার ডান দিকের বড় শোওয়ার ঘরটায় উঁকি মারলেন তিনি। যে ঘরে খানিকক্ষণ আগে সব কিছু একেবারে ওলটপালট করে দেখেছেন ওঁরা তিন জন। যে ঘরে রুচিরা থাকতেন। সেই ঘরের এক কোণে হাঁটু মুড়ে জড়োসড়ো হয়ে মেঝের উপরে বসে আছে বাচ্চাটা। ভয়ে তার চোখ-মুখ পাLETTE গেছে। জয়ন্তবাবু তার সামনে একদম হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। বললেন, কী হয়েছে মা? ভয় পেয়েছ?

বহু বাচ্চাই আছে যারা পুলিশ দেখলে তো বটেই, পুলিশের নাম শুনেও ভয় পায়। আর এর থেকে ছোট বাচ্চারাও টিভির নানান সিরিয়ালের দৌলতে এখন জেনে গেছে, শুধু খাকি নয়, পুলিশরা সাদা ধবধবে পোশাকও পরে। আর তিনি যেহেতু সাদা পোশাক পরে এসেছেন, তাই ও বুঝতে পেরেছে, উনি পুলিশ। তাই এত ভয় পেয়ে গেছে। সেই ভয় ভাঙাতেই জয়ন্তবাবু বললেন, আমি কিন্তু পুলিশ না। পুলিশের অভিনয় করি। আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ?

বাচ্চাটা মুখ তুলে তাকাল। শুধু ভয় নয়, এক অব্যক্ত বেদনায় তাঁর মুখ থমথম করছে। চোখের জলে গালটাল ভিজে একেবারে একশা। তাঁর দিকে তাকিয়েই আছে সে। তাই ফের উনি বললেন, আমাকে ভয় পেয়েছ, মা?

বাচ্চাটি মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল, না।

— তা হলে? ও ঘরে না ঢুকে এখানে পালিয়ে এলে কেন?

মেয়েটি বলল, ও ঘরে আমার মা আছে।

ততক্ষণে তাঁর পিছু পিছু এসে ও ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন সাস্ত্রনা। জয়ন্তবাবু মুখ না ঘুরিয়েই ডান হাত তুলে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, আপনি ও ঘরে বসুন। আমি আসছি।

উনি চলে যেতেই বাচ্চাটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জয়ন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও ঘরে তোমার মা আছেন, তুমি জানো?

মেয়েটি বলল, আমি দেখেছি।

— কী দেখেছ মা?

— আমি সে দিন দাদুর ঘরে ঘুমিয়েছিলাম। তখন অনেক রাত। হঠাৎ চাপাস্বরে চিৎকার চোঁচামেচি শুনে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার পাশে কেউ নেই। আমি ভয়ে ভয়ে বিছানা থেকে নেমে বুঝতে পারি, কথাবার্তাগুলো বসার ঘর থেকে আসছে। আমি পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, মা মেঝেতে শুয়ে আছে। বড় সোফাটা ছেঁড়াখোঁড়া। সোফার ভিতরে থাকা স্প্রিংগুলোকে বাবা তখন পাগলের মতো গায়ের জোরে টান মেরে মেরে উপড়াচ্ছে। চোখমুখও যেন কেমন হয়ে গেছে। বাবাকে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

হঠাৎ দেখি, ওখানে দাদু ঠাকুমাও আছে। ঠাকুমা বলছে, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।

দাদু বলছে, রান্নাঘরে ঢুকিয়ে কেরোসিন তেল ঢেলে জ্বালিয়ে দিলে হয় না? বলব, রান্না করতে গিয়ে পুড়ে গেছে।

ঠাকুমা বলল, তোমার বুদ্ধিতে চললে হবে না। আপাতত এখানে ঢুকিয়ে চাপাচুপি দিয়ে বরং সেলাই করে রাখি। পরে ভাবা যাবে, কী করা যায়।

বাচ্চাটির কথা শুনে জয়ন্তবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর সন্দেহটাই ঠিক। শুধু ইঁদুর বেড়াল নয়, মানুষ মরলেও প্রথম দু'-তিন দিন পচা গন্ধ বেরোয় ঠিকই, তার পর আস্তে আস্তে বডি শুকোতে শুরু করলে গন্ধটা উবে যায়। শরীরের ভিতরে পোকা জন্মাতে শুরু করে। ধানের চেয়ে বড় মাপের সাদা ধবধবে যে পোকাটাকে দেখে উনি পা সরিয়ে নিয়েছিলেন— কথা বলতে বলতে তখনই উনি দেখেছিলেন, একটা নয়, ও রকম আরও অনেক পোকা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সব ক'টা পোকাই যে ওই সোফার তলা থেকেই আসছে, তা ওই পোকাগুলির চলন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সেটা আরও নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন আভাস নিজেই। উনি যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, যে ভামটা আপনার বাড়ির সামনে মরে পড়ে আছে, সেটা এ ঘরে মরেছিল, না? আভাস বলেছিলেন, কই, না তো।

তখনই তাঁর সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছিল। তা হলে এই পোকাগুলো আসছে কোথেকে! উনি সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল বার করে থানায় ফোন করলেন বড়বাবুকে। তার পরেই হাঁক পাড়লেন অজয় আর অরুণের উদ্দেশে। বললেন, অ্যারেস্ট আভাস!

আভাস, আভাসের বোন সাস্ত্বনা আর বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে উনি যখন

কসবা থানার দিকে এগিয়ে চলেছেন, তখন আর একবার থানার বড়বাবুকে ফোন করলেন জয়ন্তবাবু। প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আভাসের বাবা-মা জড়িত ছিলেন কি না, তবে তথ্য লোপাট করা এবং পুলিশকে ভুল পথে চালিত করার জন্য তো তাঁদের অন্তত কিছু দিন হাজতবাস করতেই হবে। ফলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওখান থেকে সরে পরার আগে ওঁদেরও পুলিশি হেফাজতে নিয়ে নিতে হবে। আর এই বাচ্চাটিকে এখন কোনও হোমে পাঠিয়ে দিতে হবে। কারণ, এ-ই তাঁদের প্রধান এবং একমাত্র সাক্ষী।

গাড়ি চলতে লাগল। হঠাৎ বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে জয়ন্তবাবুর মনে হল, এই মেয়েটি তাঁদের কাছে এখন তুরূপের তাস। ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। তার পরে নিজের মনেই বললেন, না না, ইম্পর্ট্যান্ট না। ‘আই’। ওর মায়ের ভাষায় ইংরেজির বড় অক্ষরের শুধু একটা ‘আই’।



## ডাব বাবা

তখন মধ্যদুপুর। স্টেশন থেকে বেরিয়েই একটা টাঙা নিয়ে নিয়েছিল শীর্ষ। যত দূর আসা যায়, এসে, দূরে আঙুল দেখিয়ে টাঙাওয়ালা বলেছিল, এই মাঠের উপর দিয়ে সোজা চলে যান, ডাব বাবার ডেরা পেয়ে যাবেন।

এই ইন্টারনেটের যুগে সারা পৃথিবীতে খবর ছড়াতে যে মাত্র কয়েক মুহূর্তই যথেষ্ট, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে বহু বছর আগেই। কোথায় কোন পাথরের গণেশ নাকি দুধ খাচ্ছে, চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চার দিকে গণেশকে দুধ খাওয়ানোর ধুম পড়ে গিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে, যেখানেই গণেশ বাবাজির মূর্তি, সেখানেই দুধ খাওয়ানোর জন্য মা মাসি পিসি ঠাকুমার সে কী লম্বা লাইন! সবাই স্নানটান করে পাথরের বাটি, কাঁসার বাটি, স্টিলের বাটি, কেউ কেউ আবার কাচের পাত্র করেও দুধ নিয়ে এসে হাজির। যে দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু এক ফোঁটা দুধের জন্য ছটফট করে, দুধ জোটাতে না পেরে বাবা-মায়েরা জঙ্গল থেকে শটি তুলে এনে সেদ্ধ করে খাওয়ায়, সে দেশেই সে দিন যে কত লক্ষ কোটি লিটার দুধ নর্দমা দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, তার কোনও হিসেব নেই। তবে জানা গিয়েছিল, শুধু এ দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র— সে আমেরিকাই হোক, মিশরই হোক বা আলাস্কাই হোক, যেখানে ভারতীয়, সেখানেই নাকি গণেশকে দুধ খাওয়াবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এবং এখানকার এ-পাড়া ও-পাড়ায় রটার আগেই নাকি সারা বিশ্ব জেনে গিয়েছিল এই খবর। এবং তা জেনেছিল মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমেই।

তবে না। এই ডাব বাবার খবর ইন্টারনেটের মাধ্যমে নয়, শীর্ষ পেয়েছে তার বাড়ির কাজের মাসির কাছ থেকে। যেখানে ডাব বাবার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর এক ধর্মভাই নাকি সেই গ্রামেই থাকে। কী একটা দরকারে কলকাতায় এসে তাঁর বাড়িতে দু'দিন ছিল। অত দূর থেকে কলকাতায় এসেছে অথচ



কালীঘাটে পুজো দেবে না, চিড়িয়াখানায় ঘুরবে না, অন্তত বাইরে থেকে এক ঝলক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখবে না, তা হয়?

কথায় কথায় দ্বিতীয় দিন সেই ধর্মভাই কাজের মাসিকে বলেছিলেন এই ডাব বাবার কথা। এই ডাব বাবার নাকি অসীম ক্ষমতা। অসাধ্যসাধন করতে পারেন। যে-কোনও অসুখ এক দিনে সারিয়ে দিতে পারেন। মামলা-মকদ্দমার নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন মাত্র ক’দিনেই। যে-কোনও বিপদ কাটিয়ে দিতে পারেন মুহূর্তে। মোদ্দা কথা, সব সমস্যা সমাধানের মন্ত্র আছে তাঁর কাছে।

কাজের মাসির কাছে ডাব বাবার কথা শুনে শীর্ষ জিজ্ঞেস করেছিল, উনি কি তান্ত্রিক?

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বার করে নিজের নাক-কান মুলে তিনি বলেছিলেন, না না, তান্ত্রিক কি গো? উনি তো তান্ত্রিকের বাবা।

— তান্ত্রিকের বাবা! ও, ওঁর ছেলে তান্ত্রিক?

— না না, আমি তা বলিনি। আমি বলছি, এক হাজার তান্ত্রিক অনেক সাধ্য সাধনার পরেও যা করতে পারে না, উনি তা এক নিমেষেই করে দিতে পারেন। বড় বড় তান্ত্রিকরা তো ওনার পায়ের কাছেই হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে গো...

— ও। উনি বুঝি খুব ছোটবেলা থেকেই সাধনা করতেন, না?

— না না। সাধনাটাধনা নয়, উনি নাকি ওই গ্রামের একজন খুব সাধারণ মানুষ। কী যেন নাম! কী যেন নাম! ও হ্যাঁ, রাঘব। ওনার নাম রাঘব ঘড়াই। তা, আমার ধর্মভাই তো বলল, উনি নাকি আগে পাতকুয়োর কাজ করতেন। কিন্তু কুয়োর কাজ তো আর রোজ রোজ পায় না। কাজ না করলে খাবে কী? তাই কারও কোনও দামি গয়না, সে গলার হারই হোক বা নাকের নাকছাবি, পুকুর বা কুয়োয় পড়ে গেলে, এক ডুব দিয়ে উনি সেটা ঠিক তুলে নিয়ে আসতেন। এ কাজে ওনার খুব নামডাক ছিল। তাতে উনি যা পেতেন, ওনার সংসার কোনওমতে চলে যেত। সংসার আর কী, বিয়ে-থা তো করেননি। তিনি আর ওনার মা।

— সে ঠিক আছে। কিন্তু উনি ডাব বাবা হয়ে উঠলেন কী করে?

— সেটাই তো বলছি। একদিন গ্রামের এক গভীর কুয়োতে কার নাকি একটা পেতলের বালতি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল। যৌতুক হিসেবে বিয়েতে আর যা যা সে পেয়েছিল, রেডিও, সাইকেল, ঘড়ি— সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

শুধু বেঁচে ছিল ওটা। তাই ওটার জন্য তাঁর যত না আফসোস, তাঁর বউয়ের আফসোস তার দ্বিগুণ। সে তো প্রায় কেঁদেকেটে একশা— একে একে সবই গেছে। কিছুই তো আর অবশিষ্ট নেই, যে ভাবেই হোক, তুমি আমাকে ওটা তুলে এনে দাও। ওটা আমার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।

কিন্তু তুলে এনে দাও বললেই তো আর তুলে এনে দেওয়া যায় না। অত গভীর কুয়োয় নামবে কে? অগত্যা ডাক পড়ল সেই রাঘব ঘড়াইয়ের। যে কোনও হারানো জিনিস এক ডুব দিয়েই যিনি তুলে আনতে পারেন। তিনি ওই কুয়োতে যে দিন নামলেন, সে দিন যেন উঠতেই চান না। অনেকক্ষণ পর যখন উঠলেন, তখন ওই বালতি তো আনলেনই, সঙ্গে আনলেন বালতি ভর্তি করে হিরে, জহরত, মণি মানিক্য, সোনাদানা। যারা কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে ভিড় করে মজা দেখছিল, তারা তো একেবারে থ'। তাদের মধ্য থেকেই কে যেন তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এগুলো কোথা থেকে পেলেন?

না। উনি নাকি কোনও উত্তর দেননি। বালতিটা দিয়ে, পারিশ্রমিকও নেননি। সোনাদানা হিরে জহরত গামছায় বেঁধে চুপচাপ বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

লোকটাকে অত হিরে জহরত কুয়ো থেকে তুলতে দেখে পাড়ে দাঁড়ানো অনেকেই চোখ চকচক করে উঠেছিল। কারও কারও মনে হয়েছিল, বালতি ভরে যখন নিয়ে এসেছে, তার মানে ওখানে আরও আছে। তাই অন্য কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই, তারক নামে গ্রামের এক মাতব্বর নাকি সঙ্গে সঙ্গে দড়ি বেয়ে ঝটপট কুয়োয় নেমে গিয়েছিল। দশ মিনিট গেল, পনেরো মিনিট গেল। আধ ঘণ্টাও পার হয়ে গেল। কিন্তু কুয়ো থেকে তাকে উঠতে না দেখে আশপাশের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। ফের খবর দেওয়া হল রাঘবকে। তিনি যখন কুয়ো থেকে তাকে তুললেন, তার সারা গায়ে সবুজ শ্যাওলা আর ঝাঁঝরি গাছে মোড়া। পেট ফুলে ঢোল। কোনও হুঁশ নেই। এ আসে। ও আসে। সে আসে। নানা পরামর্শ দেয়। টোটকা বলে। কিন্তু কিছুতেই আর জ্ঞান ফেরে না তার। তখন রাঘবই নিজে থেকে বললেন, একটা ডাব আনো তো দেখি...

সঙ্গে সঙ্গে তারকের বড় ছেলে তরতর করে গাছে উঠে একটা ডাব পেড়ে আনল। ডাবটার মুখ কেটে দিল একজন। রাঘব সেই ডাবের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে কী একটা বলে, বাঁ হাতে একটু ডাবের জল ঢেলে, ডাবটা উপুড় করে বাকি জলটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। তার পর বাঁ

হাতের সেই জল তারকের মুখে ছিটিয়ে দিতেই কয়েক পলকের মধ্যে সে চোখ মেলে তাকাল। আস্তে আস্তে করে বলল, আমি কোথায়? এত লোক ভিড় করে আমাকে দেখছে কেন? কী হয়েছে আমার?

সে সব প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। ছোট্ট একটা ডাব দিয়ে যে প্রায় মরে-যাওয়া লোকের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে, সে তো যে-সে লোক নয়। তাঁর বিশাল ক্ষমতা।

অনেক সাধুবাবা দেখেছি জীবনে, কিন্তু এ রকম ডাব বাবা এই প্রথম দেখলাম। কথাটা কে যেন বলেছিল কে জানে, তার পর থেকেই রাঘবকে সবাই ‘ডাব বাবা’ বলে ডাকতে শুরু করল। শুধু ডাব নয়, ডাবের সঙ্গে কুয়োরও একটা সম্পর্ক আছে, তাই মৃত্যুর একেবারে দোরগোড়া থেকে ফিরে আসা তারক আর তার ছেলের উদ্যোগেই চাঁদা তুলে কুয়োর পাশে দরমাটরমা দিয়ে একটা চালাঘরও বানিয়ে দিল গ্রামের লোকেরা। উনি এখন সেখানেই থাকেন। কারও কোনও সমস্যা হলেই, একটা ডাব নিয়ে চলে আসে তাঁর কাছে। তিনি সেই একই ভাবে মন্ত্র পড়ে বাঁ হাতে একটু ডাবের জল নিয়ে বাকি জলটা উপুড় করে ঢেলে দেন কুয়োর, তার পর ছিটিয়ে দেন তার মুখে, ব্যসা।

শুধু এ গ্রামেই নয়, আশপাশের সব গ্রামে তো বটেই, বহু দূরে দূরেও ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। প্রথম প্রথম শনি মঙ্গলবার, অমাবস্যা পূর্ণিমায় উনি বসতেন। এখন প্রত্যেক দিন এত ভিড় হচ্ছে যে, সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। রোজই বসতে হচ্ছে। নিজের জন্য আর সময় পাচ্ছেন না তিনি। তাই সকাল আর সন্ধ্যায় টাইম বেঁধে দিয়েছেন। এত ডাব লাগছে যে, এলাকায় আর কোনও গাছে ডাব নেই। মুচি হতে না হতেই ডাব বাবার কাছে চলে আসছে। আমদানি করতে হচ্ছে বাইরে থেকে। সেগুলোরও দাম আকাশ-ছোঁয়া।

লোকেরা বলছে, এমনি রোগ তো কোন ছার, ডাক্তার-কবিরাজ ফেল পড়ে গেছে, সে রোগও ভাল হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার জবাব দিয়ে-দেওয়া মৃত্যুপথযাত্রীও এখানকার মন্ত্রপূত ডাবের জলের ছিটে নেওয়ার পরই, ব্লাড টেস্ট, এক্সরে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এমনকী বায়োপসি করেও দেখেছে, ক’দিন আগে টেস্ট করা রিপোর্টের সঙ্গে কিছুই মিলছে না। সব কিছুই নাকি ঠিকঠাক আছে। পুরো সুস্থ। নতুন রিপোর্ট দেখে ডাক্তাররাও থ’। অনেকেই বলছে, এখানে যখন কোনও চাকরিপ্রার্থীর মুখে ডাব বাবা ডাবের জলের ছিটে

দেন, তখন নাকি কোনও না কোনও কোম্পানিতে তার নামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার লেখা হতে থাকে। কেউ কেউ বলে, এখানকার ডাবের জলের ছিটেয় নাকি ভাঙা সংসার শুধু জোড়াই লাগে না, সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে।

কাজের মাসি এ সব গল্প করলেও শীর্ষর যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। আজকের দিনে আবার এ রকম হয় নাকি! তাই ডাব বাবার কেরামতি দেখার জন্য সে উসখুস করতে লাগল। কী ভাবে ডাব বাবার কাছে যাওয়া যায়। কাজের মাসির কাছে বলতেই, তাঁর ধর্মভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই গ্রামে যাওয়া এবং থাকার সব ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। সেই সুবাদেই তার এখানে আসা।

ফাঁকা ধু ধু মাঠ। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। তালগাছের শুকনো পাতা একটার সঙ্গে একটার ঘষা লেগে খড়খড় খড়খড় আওয়াজ হচ্ছে। উড়তে উড়তে ডাক দিয়ে যাচ্ছে এক-আধটা নাম না-জানা পাখি। আলপথের দু'ধারের সদ্য ধান-কাটা মাঠে ঘুঘুপাখিরা কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ক'হাত দূর দূর এ-পাশে ও-পাশে ছোট ছোট ডোবা। হঠাৎই এ পাশ থেকে আলপথের ও-পাশে ঐক্যেবঁকে চলে গেল মস্ত বড় একটা দাঁড়াশ সাপ।

কতটা এসেছে সে, খেয়াল নেই। দূর থেকেই চোখে পড়ল ডাবের পাহাড়। এখানে এত ডাব আসবে কোথেকে! না। ওগুলো নিশ্চয়ই ডাব নয়। ডাবের খোসা। তার মানে সে ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে। হাঁ, ওই তো সেই চালাঘর! যে চালাঘরের কথা সে তার কাজের মাসির কাছে শুনেছিল। পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দেখে, চালাঘরের দরজা হাট করে খোলা। ও সেখানে উঁকি মেরে দেখে, ভিতরে একটা চৌকির ওপরে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। ওর বুঝতে অসুবিধে হল না, এই-ই সেই ডাব বাবা। ও মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ভেতরে আসব বাবা?

— কে?

— আমি।

— আমি কে?

— শীর্ষ।

— শীর্ষ কী?

— চক্রবর্তী।

— কী চাই?

— আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

— আমি এ সময় কারও সঙ্গে কথা বলি না। এখন আমার বিশ্বাসের সময়। সন্দের পরে কিংবা কাল সকালে এসো।

— আমি বহু দূর থেকে এসেছি বাবা।

— তো? আমি কী করব?

— রোদের মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি বাবা, ভীষণ তেষ্ঠা পেয়েছে। একটু জল পাওয়া যাবে?

— জল? জল তো আমি খাই না।

— তা হলে কী খান?

— ডাবের জল।

— তাই দিন।

— ঠিক আছে, দাঁড়া। বলেই, খাটের ও দিকে একটু ঝুঁকে নীচ থেকে একটা ডাব বার করে আনলেন তিনি। মুখটা কাটা। চামচের পেছনের দিকটা গায়ের জোরে গেঁথে দিয়ে এক পাক ঘোরাতেই খানিকটা চলটা উঠে এল। তার পর ডাবটা শীর্ষর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। শীর্ষ বলল, দিলেনই যখন, একটু মন্ত্র পড়ে দিন না...

— মন্ত্র? ও বুঝেছি। তুইও নিশ্চয়ই কোনও মনোবাঞ্ছা নিয়ে এসেছিস, না?

— আপনার কাছে কী আর লুকোব বাবা? আপনি তো অন্তর্যামী।

— আমি কেউ নই রে, আমি কেউ নই। সব তেনারা...

তেনারা! বড় খটকা লাগল শীর্ষর। তেনারা আবার কী! লোকেরা তো বললে বলে, আমি কেউ নই রে, সব তিনি। তিনি মানে ঈশ্বর। দেবতা। ভগবান। আর ভূত পেতনির গল্প পড়তে পড়তে ও যতটা জেনেছে, তাতে তো তেনারা মানে— ভূত। তবে কি গুঁর যা ক্ষমতা, তার মূলে রয়েছে ভূত! সবটাই ভৌতিক!

মাথার মধ্যে হাজার রকম প্রশ্ন জট পাকাতে লাগল শীর্ষর। কী জট, ডাব বাবা জানেন না। তিনি বললেন, আশা করে যখন এসেছিস, চল বেটা, চল। তোর মুখে যখন ডাবের জল ছেটাব, তুই যা চাস, সেটা মনে মনে চাইবি, কেমন? তা হলেই হবে, চল বেটা, চল।

ঘর থেকে বেরিয়েই ডান হাতে কুয়ো। বুক অবধি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার সামনে দাঁড়িয়ে ডাবের কাটা মুখের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বললেন ডাব বাবা। তার পরে কাত করে বাঁ হাতের তালুতে একটুখানি ডাবের জল নিয়ে, বাকি জলটা উপুড় করে ঢেলে দিলেন কুয়োয়। খালি খোলটা পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে জমে থাকা খোলগুলির দিকে ছুড়ে ফেললেন। তার পরে শীর্ষর মুখে জলের ছিটে দিতেই শীর্ষ মনে মনে বলল, কুয়োয় নামার পরে এমন কী ঘটেছিল যে, একজন অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষ রাঘব থেকে ‘ডাব বাবা’ হয়ে উঠলেন, সেটা আমার এক্ষুনি জানতে ইচ্ছে করছে বাবা।

ডাব বাবা ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, আয়। ভিতরে আয়। বলে, নড়বড়ে একটা টুল এগিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, বস। ও তাতে বসল। উনি উঠে গেলেন চৌকির ওপরে। আসনপিঁড়ি করে বসে, দু’মিনিট চোখ বন্ধ করে বললেন, এতই যখন জানার ইচ্ছে, তা হলে শোন— সে দিন কুয়োর দেওয়ালের খাঁজে পা রেখে রেখে নামছি। বুঝতে পারিনি, নীচের দিকের দেয়ালে এত শ্যাওলা ছিল। হঠাৎ পা হড়কে পড়ে গেলাম নীচে। ছপাৎ করে উঠল জল। কোমরে খুব জোর লাগল। বুঝতে পারলাম, এই কুয়োর জল তলানিতে এসে ঠেকেছে। দাঁড়িয়ে দেখি, হাঁটুর নীচে জল। মাথার উপরে তখন চিঁ চিঁ করে ডানা ঝাপটাচ্ছে ঝাক ঝাঁক চামচিকে। একেই ভিতরে অন্ধকার। যেটুকু আলোর রেশ আসছিল, সেটুকুও ওদের ডানায় ঢেকে গেল। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে যখন ওই লোকটার পেতলের বালতিটা খুঁজছি, কে যেন নাকি সুরে বলে উঠল, বাঁলতি নিঁচ্ছ নাঁও। জঁল কিঁস্তু এঁক ফোঁটাও নিঁও নাঁ।

আমি ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি না। মুহূর্তের জন্য মনে হল, কেউ বুঝি মশকরা করছে। কিন্তু তার পরেই আবার মনে হল, এখানে, এই কুয়োর মধ্যে, মশকরা করতে আসবে কে! তাই বললাম, কুয়ো থেকে লোকে জল নেবে না তো কি মণিমাণিক্য নেবে?

ফের সেই গলা নাকি সুরে বলল, কেন? নিঁলে অঁপরাঁধ কোঁথায়? মণি মাঁনিক্য যাঁ চাঁও দাঁতে পাঁরি। কিঁস্তু বাঁপু, এঁক ফোঁটাও জঁল দাঁতে পাঁরব নাঁ। আঁমাদের এঁখানে এঁইটুকুনিই আঁছে।

— তার মানে, তোমাদের এখানেও জলের অভাব?



— অভাব মানে? মঁহা অভাব। কেঁউ যদি আমাদের এক কাঁপ করেও রোজ জল দেয়, তা হলে তাকে আমরা সোনাদানা দিয়ে মুঁড়ে রাখতে পারি।

— সোনা দিয়ে? চমকে উঠলাম আমি। হঠাৎ আর একটি গলা পাশ দিয়ে বলে উঠল, শুঁধু সোনা কেন? সোনাদানা হিরে-জহরত মণি মানিক্য যাঁ চাইবে, তাই দিতে পারি। আমাদের শুঁধু একটু জলের ব্যবস্থা করে দাও। জলের জন্য আমাদের বুক শুঁকিয়ে যাচ্ছে। গলা শুঁকিয়ে যাচ্ছে। জিভ শুঁকিয়ে কাঁঠ। জানি না, আর ক'দিন পরে কী হবে...

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আর একটি গলা ভেসে এল, সে একবার খেঁয়েছিলাম বঁটে, ডাবের জল। আমার মাসতুতো বোনপো থাকত ডাব গাঁছের মাথায়। আমাদের এখানে বেঁড়াতে আসার সময় কটা ডাব নিয়ে এসেছিল। আঁহা, কী তাঁর স্বাদ! কী তাঁর গন্ধ! এখনও যেন জিভে লেগে আছে।

— ডাবের জল! হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। যে ভাবে গ্রামেগঞ্জেও পলিউশন ছড়িয়েছে, তাতে ওটাই এখন একমাত্র পরিশুদ্ধ জল!

— না না না। সে আগে ছিল। আজ থেকে কয়েক দশক আগেও ছিল। কিন্তু তোমাদের মোবাইল আর ইন্টারনেটের ঠেলায় সেটাও গেছে। আগের মতো সবুজ মসৃণ গা-ওঁয়ালা ডাব কি আর একটাও দেখতে পাও? দেখবে, মাথা কুটলেও পাবে না। সব কটার গায়েই কেমন জ্বলে যাওয়া পোড়া পোড়া দাগ।

— হ্যাঁ, তাই তো!

— তবু, ওটা মন্দের ভাল। ওই জল যদি দিতে পারো, তা হলে তুমি যাঁ চাইবে, সব দেবো, সব।

আমি বললাম, সব নিয়ে আমি কী করব! আমার তো ছেলেপুলে নেই। সংসার বলতে আমি আর আমার মা। দু'জনের জন্য আর কত কী লাগে! কথা শেষ হল না। আবার সেই নাকি সুরে কথা ভেসে এল, কেন? তোমার গায়ের লোঁকেরা বুঁঝি তোমার আপনজন নয়? প্রিয় লোক নয়?

আমি বললাম, কিন্তু তাদের জন্য আমি কী করতে পারি?

— যারা রোঁগে ভোগে তাদের রোঁগ দূর করতে পারো। যাদের অভাব অনটন আছে, তাদের অভাব মেটাতে পারো। যারা দুঃখী, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারো...

আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল ওরা। আমি বললাম, কী ভাবে?

তখন ওদের মধ্যে থেকেই একজন বলল, একটা কাজ করো, যাঁরা তোঁমার কাঁছে সমস্যা নিয়ে আঁসবে, তুমি তাঁদের একটা করে ডাব আঁনতে বঁলবে। সেই ডাবের মুঁখ কেঁটে, তাঁর কাঁছে মুঁখ নিয়ে তুমি শুঁধু একটা মঁত্ৰই উঁচ্চারণ করবে— হেঁ, ভুঁতরাঁজ, এঁ যাঁ চাঁয়, সৈঁটা য়েঁন পাঁয়। বঁলেই, ডাবের জঁলটা বাঁ হাঁতের তাঁলুতে দুঁ-তিন ফোঁটা টেঁলে নিয়ে, বাঁকি জঁলটা আঁমাদের কুঁয়োর ওঁপরে উঁপুড় করে টেঁলে দেঁবে। তাঁর পঁর বাঁ হাঁতের জঁলটা তাঁর মুঁখে ছিঁটিয়ে দেঁবে, বাঁস। তাঁ হঁলে তুমিও তোঁমার প্রঁতিবেঁশী, আঁয়ীযস্বঁজনদের সেঁবা করতে পাঁরবে, আঁর আঁমরাঁও ডাবের জঁল পেঁয়ে তুঁপু হব... বলেই, উধাও হয়ে গেল ওরা। বালতি তুলতে গিয়ে দেখি, সোনাদানা, হিরে, জহরতে ভর্তি। ওরা ভালবেসে দিয়েছে, আমি তো ফেলে দিতে পারি না। তাই নিয়ে এলাম। আসার সময় ওদের কাউকে দেখতে পেলাম না। তবু ওদের শুনিয়েই চিৎকার করে বলে এলাম, যা দিয়েছ, দিয়েছ। আমাকে আর কখনও এ সব দিয়ে না। তোমরা যে মন্ত্ৰ আজকে আমাকে দিলে, তা যদি সতিই কাজ করে, তা হলে গোটা পৃথিবীর সব ধনরত্ন এক জায়গায় জড়ো করলেও তার কাছে নসি হয়ে যাবে...

— সেই হিরে-জহরতগুলি কোথায়?

— ওগুলো দিয়ে আমি কী করব! তা ছাড়া ওগুলো বাড়িতে থাকলে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। কখন চোর আসে, ডাকাত আসে। দু'দণ্ডের জন্যও নিশ্চিত হতে পারব না। তাই পরদিন খুব ভোরে কাকপক্ষী ওঠার আগেই আমি ওগুলো সেই কুয়োতেই ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। যাতে কেউ টের না পায়। পেলেই গুগোল। ফেলার পরে সে কী শাস্তি!

— তার পর?

— তার আবার পর কী? ওই ভাবেই চলছে।

— আর কত দিন চলবে?

মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে ডাব বাবা বললেন, আর এক দিনও নয়। আজই সব শেষ হয়ে গেল।

— সব শেষ হয়ে গেল মানে?

— ওরা বলেছিল, এই ঘটনাটা যেন আমি কাউকে না বলি। বললেই নাকি আমার এই মন্ত্ৰের গুণ সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে।

— তা হলে বললেন কেন?

— কোনও উপায় ছিল না।

— মানে?

— ওদের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আমি যখন ডাবের কাটা মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলব, হে ভূতরাজ, এ যা চায়, সেটা যেন পায়। তার পর ডাবের জল কুয়োয় ঢেলেই যার মুখের উপরে বাঁ হাতে রাখা ডাবের জলটা ছিটিয়ে দেব, সে তখন মনে মনে যা চাইবে, তা-ই পাবে। এমনকী আমার মৃত্যুকামনা করলে, আমার মৃত্যুই ঘটবে। আর তুমি তো জানতে চেয়েছিলে, কুয়োয় নামার পরে এমন কী ঘটেছিল যে, একজন অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষ রাঘব থেকে ‘ডাব বাবা’ হয়ে উঠলেন। তাই না? ফলে বলতে বাধ্য হলাম।

— তা হলে এখন কী হবে?

— ও কুয়োয় শুধু ডাবের জল কেন? ঝরনার জল, তালশাঁসের জল, মিছরির জল, এমনকী ঘড়া ঘড়া লসিয় ঢাললেও আর কোনও দিন কোনও কাজ হবে না। আমাকে মেরে ফেললেও না। তোমাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার যাবতীয় কেরামতি নষ্ট হয়ে গেছে...

কথাগুলি বলার সময় ছলছল করে উঠল ডাব বাবার চোখ। এ রকম যে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারেনি শীর্ষ। একদম বাকরুদ্ধ হয়ে গেল সে। মনে মনে বলল, এ কী করলাম আমি! এ কী করলাম!



## আবুলিশ

মেরের উপরে শতরঞ্চি পাতা। তার উপরে গোল হয়ে বসে চোর-পুলিশ খেলছে চার বন্ধু। তাদের একজন, দু'হাতের মুঠোয় ঝাঁকিয়ে চার ভাঁজ করা কাগজের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিতেই, ওরা প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিল এক-একটা কাগজ। আর, কেউ যাতে দেখতে না পায়, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আড়াল করে খুলতে লাগল সেই কাগজের ভাঁজ। যেই একজন দেখল, তার কাগজে বড় বড় হরফে লেখা— চোর। অমনি মুহূর্তের মধ্যে সূর্য উধাও। কিচিরমিচির করতে করতে ঝাঁক ঝাঁক পাখি দল বেঁধে ফিরতে লাগল বাসায়। একটা বাড়ির উল্টো দিকে অন্ধকারের মধ্যে বসে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল সে— কখন ওই বাড়ির লোকজন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়।

তার পাশের জন চুপি চুপি কাগজটা খুলে যখন দেখল, তার কাগজের টুকরোটায় লেখা— ডাকাত। অমনি তার সঙ্গে জুটে গেল ষণ্ডামার্ক কতকগুলো ছেলে এবং বুক চিত্তিয়ে একটা ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়ল তারা। সোজা গিয়ে হাজির হল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সামনে। তার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে সে বলল, চাবিটা দে।

তার উল্টো দিকে বসেছিলেন যিনি, তিনি কাগজটা খুলে যখনই দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে— মন্ত্রী। অমনি টানটান করে শতরঞ্চির উপরে সেই কাগজটা রাখলেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ডায়ে বাঁয়ে, সামনে পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ল কতকগুলো দেহরক্ষী। গাড়ির সামনে ছুটার বাজিয়ে ছুটতে লাগল এসকট ভ্যান। মুখের সামনে জড়ো হল হাজার-একটা টিভি চ্যানেলের বুম। এ জানতে চায় ওটা, সে জানতে চায় সেটা।

— আপনি কি জানেন গোটা দেশ এখন চোরে চোরে ছেয়ে গেছে?

— আপনার কাছে কি এখনও খবর এসে পৌঁছয়নি যে, মধ্য শহরের একটা ব্যাঙ্ক এখন ডাকাতদের কবলে?

— চার দিকে যে ভাবে দুর্নীতি বাড়ছে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আপনারা কী কী করছেন?

একের পর এক প্রশ্ন। মন্ত্রী সব শুনলেন। তার পরে ডান দিকে একটু ঘাড় ঘোরালেন তিনি। তাঁর ঘাড় ঘোরানো দেখেই সচকিত হল সে। যে একটু আগেই তাঁর সঙ্গে খেলছিল। যার কাগজের টুকরোটায় লেখা ছিল— পুলিশ। এবং ‘পুলিশ’ দেখেই সবার সামনে কাগজটা মেলে ধরেছিল সে। আর তার পরমুহূর্তেই পৌঁছে গিয়েছিল থানায়।

মন্ত্রী ইশারা করতেই সে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির। মন্ত্রী নির্দেশ দিলেন, যাও, এফুনি গিয়ে ডাকাত ধরে নিয়ে এসো।

মন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ামাত্র পুলিশ ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে সেই ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে দলবল নিয়ে তখন সবেমাত্র ডাকাতরা বেরোচ্ছে। পুলিশকে দেখেই, তারা তাদের লুঠ করা ব্যাগের ভিতর থেকে কিছু টাকার বান্ডিল ছুড়ে দিল তার দিকে। পুলিশ সেটা কুড়িয়ে নিল। টাকা পেয়েই সে মহাখুশি। থুতু দিয়ে টাকা গুনতে লাগল। গুনতে গুনতে সে ভুলেই গেল, কী জন্য সে এখানে এসেছিল। ততক্ষণে ডাকাত তার দলবল নিয়ে হাওয়া।

খবরটা গিয়ে পৌঁছল মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী তো রেগে কাঁই। সঙ্গে সঙ্গে তলব করলেন পুলিশকে। তলব পেয়েই, গতকাল ডাকাতদের ছুড়ে দেওয়া টাকার ক’টা বান্ডিল সুদৃশ্য মোড়কে মুড়ে ফেলল পুলিশ। তার পর সেটা নিয়ে সোজা মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী কিছু বলার আগেই সে সেটা রেখে দিল মন্ত্রীর টেবিলে। ওটা রাখতে দেখে, মন্ত্রী তাকালেন তার দিকে। চোখে চোখে কী কথা হল কে জানে! মন্ত্রী সেটা হাতে নিয়ে বললেন, থুড়ি, ডাকাত নয়, যাও, চোরকে গিয়ে ধরো।

পুলিশ ছুটল চোর ধরতে। তখন সকাল হয়-হয়। মালপত্র বোঁচকা বেঁধে চোরটা তখন সে-বাড়ির দরজা অল্প ফাঁক করে, চার দিক ভাল করে দেখে টেখে নিয়ে, সব পা রাখতে যাচ্ছে রাস্তায়, খপ্ করে তাকে ধরে ফেলল পুলিশ।— এই ব্যাটা চোর, পালাচ্ছিস কোথায়?

— না বাবু, পালাচ্ছি না।

— তবে?

— আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম হজুর।

— আমার কাছে!

— হ্যাঁ হুজুর। এত মাল কি আমি একা নিতে পারি? এই নিন আপনার জিনিস। বলেই, চোরটা তার বোঁচকা থেকে এটা-ওটা-সেটা বের করে পুলিশটার হাতে ধরিয়ে দিল। তার পর যখন বোঁচকাটা তুলে কাঁধে নিতে যাবে, পুলিশটা তখন বোঁচকাটার দিকে একবার তাকাল, আর একবার তাকাল তার নিজের হাতে ধরা জিনিসগুলোর দিকে। তার পরে বলল, মাত্র এইটুকু!

— আপনাকে অর্ধেকেরও বেশি দিয়েছি হুজুর।

— নামা দেখি, আর কী আছে...

— হুজুর, আজকের দিনটা ছেড়ে দিন। সকাল হয়ে আসছে। কাল আপনাকে পুষিয়ে দেব।

— ঠিক বলছিস?

— জবান, জবান। ভদ্রলোকের এক কথা।

— ঠিক আছে। তা হলে মাথাটা একটু ম্যাসাজ করে দে। বড় বিষমিষ্ণু করছে... বলেই, একটা বাড়ির রকে বসে পড়ল পুলিশটা। চোর তার মাথা ম্যাসাজ করতে লাগল। এ দিকে সকাল হয়ে এসেছে। লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। অনেকেই পুলিশটাকে চেনে। চোরটাকেও চেনে। দু'জনের ওই কীর্তি দেখে লোকজন দাঁড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়। এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। এটা-ওটা বলছে। এ দিকে, ম্যাসাজ নিতে নিতে আরামে দু'চোখ বুজে এসেছিল পুলিশের। হঠাৎ চোখ খুলে যেই দেখল, লোকজন দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা জটলা তৈরি হচ্ছে। তাদের দেখে কী সব বলাবলি করছে, অমনি, রে রে করে উঠল সে। এই, কী চাই? কী চাই এখানে? বলেই তেড়ে গেল।

মন্ত্রীরা কাছে এই খবর পৌঁছতেও সময় লাগল না। তিনি ফের ডেকে পাঠালেন পুলিশটাকে। পুলিশটা এসেই মন্ত্রীর টেবিলের উপরে রাখল একটা টিফিন ক্যারিয়ার। এই টিফিন ক্যারিয়ারটা নিশ্চয়ই সে দিন ওই বাড়ি থেকেই চোরটা নিয়েছিল। না হলে চোরটা তাকে যা যা দিয়েছিল, তার মধ্যে এটা এল কোথা থেকে!

— এটা কী? চোখমুখ কুঁচকে, নাক সিটকে প্রশ্ন করলেন মন্ত্রী।

— খুলেই দেখুন না স্যার। আপনার জন্য যৎসামান্য...



— কী? বলতে বলতে টিফিন ক্যারিয়ারটার ঢাকনাটা খুললেন তিনি। কী রে এটা? পায়ের, না ক্ষীর!

— আজে, যা বলবেন স্যার। আপনার বউমা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।

মন্ত্রীর মুখ খুশিতে গদগদ হয়ে উঠল। একটা আঙুল টিফিন কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে জিভে ঠেকালেন।— বাঃ, দারুণ তো! তোর বউ তো খুব ভাল রান্না করে রে। মাঝেমাঝে একটু-আধটু খাওয়াতে পারিস তো...

— ঠিক আছে স্যার, আনবখ'ন। কিন্তু আমাকে তলব করেছেন কেন স্যার? যদি জানতে পারতাম...

— তলব! কাকে!

— আমাকে স্যার।

— কে বলল?

— আপনার পেয়াদা স্যার।

— তাই নাকি? কবে?

— আজকেই সকালে স্যার।

— কী জানি, আমার তো মনে পড়ছে না! বলেই, টেবিলে রাখা অফিস বেলটা দু'বার বাজাতেই ঘরে ঢুকল পেয়াদা।

— কী রে, আমি কি ওকে তলব করেছিলাম?

— আজে, হ্যাঁ হুজুর। ওই যে, চুরির মালের ভাগ নেওয়ার জন্য ওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ জমা পড়েছে...

— জমা পড়েছে বুঝি!

— হ্যাঁ হুজুর।

— চোপ! মন্ত্রীর চিংকারে গোটা ঘর থরথর করে কেঁপে উঠল। ওকে দেখে কি মনে হয়, ও চুরির মালের ভাগ নিতে পারে?

— আজে, আপনি হুকুম করেছিলেন দেখেই স্যার...

— আমার কোনও হুকুম নেই। আব্বুলিশ।

‘আব্বুলিশ’ শব্দটা উচ্চারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব উধাও। আবার সেই ঘরের মেঝে। আবার সেই শতরঞ্চি। আবার সেই চার বন্ধু। এবং আবার সেই চার ভাঁজ করা কয়েকটা কাগজের টুকরো।

## ৪৫

### গুপ্তধন

পাঁচমাথার মোড়ে এসে আবার থমকে দাঁড়াল চাঁদ আর সূর্য। ওরা দুই ভাই। এই নিয়ে কত দিন যে এখানটায় এসে ওরা থমকে দাঁড়িয়েছে এবং সযত্নে পকেটে রাখা শতচ্ছিন্ন চিরকুটটা বার করে সামনে মেলে ধরেছে, তার সিক নেই। কিন্তু এর পরে তারা কোন দিকে যাবে ত নিয়ে প্রতি বারের মতো এ বারও দু'ভাইয়ের মধ্যে সমস্যা দেখা দিল। চাঁদ ডান দিকে যাওয়ার কথা বললে, সূর্য বাঁ দিকে যাওয়ার কথা বলে। চাঁদ এই পথ ধরতে বললে, সূর্য ওই পথের দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

আসলে এত দিন পরে যে চিরকুটটা ওরা উদ্ধার করেছে, সেটা একটা মানচিত্র। এবং তা অর্ধেক। বাকি অর্ধেকটা যে কোথায়! সেটা থাকলে আর এই সমস্যা হত না। এই অর্ধেক মানচিত্রটা দেখে দেখে এই পাঁচমাথার মোড় পর্যন্তই আসা যায়। তারা যে রাস্তা ধরে এসেছে, তাদের বাড়ির সেই রাস্তা বাদ দিলেও একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে ভাঙা মন্দিরের দিকে। ভাঙা মন্দির মানে এতটাই ভাঙা যে, সেটাকে ভগ্নস্তুপ বলা যেতে পারে। কবে যে ওটা তৈরি হয়েছিল কেউ বলতে পারে না। যায়ও না কেউ সে দিকে। ঝোপঝাড়ে ভর্তি। ভেঙেচুরে ক্ষয়ে গিয়েও যেটুকু আছে, তা দেখেই বোঝা যায়, এক সময় খুব যত্ন নিয়ে এটা করা হয়েছিল। মন্দিরের সারা গায়ে কারুকার্য ভরা। এখন এ কানিশ সে কানিশ থেকে বট অশ্বথ মাথা তুলেছে। সাপখোপের রাজত্ব।

এর পাশেই রয়েছে আর একটা পথ। সেটা চলে গেছে পরিত্যক্ত কবরখানার দিকে। একদম শূন্যশান রাস্তা। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে। বিশেষ কোনও দরকার না হলে কেউ ও-দিকে পা মাড়ায় না।

তার পাশের রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে একটা জলায়। সেখানে হাজার হাজার শাপলা ফুটে থাকে। কত রকমের পাখি আসে। একটুখানি চোখ রাখলেই

মনে হয়, এই ফুলের রংগুলিই বুঝি ডানা মেলে আকাশে উড়ে গিয়ে রামধনু হয়ে যায়। চোখ ফেরানো যায় না।

তার পরের রাস্তাটা চলে গেছে মোহনপুরের দিকে। মোহনপুরটা যে আদতে কোথায়, সেটা গ্রাম না শহর, বা ওই নামে আদৌ কোনও জায়গা আছে কি না, কেউ তা জানে না। কারণ, এই পথ দিয়ে একটু গেলেই খাঁ খাঁ মাঠ। মাঠ আর মাঠ। সে মাঠ পেরোতে যে কত দিন লেগে যাবে কে জানে! কেউ যায়ওনি কোনও দিন। গেলে কারও না কারও মুখে সে কথা নিশ্চয়ই শোনা যেত। তবে যুগ যুগ ধরে এখানকার লোকেরা বলে আসছে, ওই রাস্তাটা নাকি সোজা চলে গেছে মোহনপুরের দিকে।

এ রকম একটা পাঁচমাথার মোড়ে এসে ওরা দু'ভাই সামনে মেলে ধরা মানচিত্রটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এ বার কোন দিকে যাবে তারা! কোন দিকে!

ওরা যখন ছোট ছিল, ওদের ঠাকুর্দা দুপুরবেলায় ওদের ঘুম পাড়াতে পাড়াতে দারুণ দারুণ সব গল্প বলতেন। একবার কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, তাঁদের এক পূর্বপুরুষের কথা। তিনি নাকি জমিদারের সামান্য লাঠিয়াল থেকে শুধু বুদ্ধির জোরে, ছলে বলে কৌশলে কী করে যেন পুরো জমিদারিটাই হাতিয়ে নিয়েছিলেন। জমিদার হওয়ার পরে যেমন তাঁর লোভ আরও বেড়ে গিয়েছিল, তেমনই বেড়ে গিয়েছিল সেই মারকুটে, গায়ের জোরে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার স্বভাব। তাই সারা দেশ ঘুরে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বেছে বেছে তিনি নিয়ে এসেছিলেন দাগি দাগি সব অপরাধী। তাদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন লুঠেরা বাহিনী। সে বাহিনী যেমন রাতের অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করত, তেমনই নদীর বুকে বজরা ছুটিয়ে মানুষের মনে ভ্রাস সৃষ্টি করত। শোনা যায়, সেই বাহিনীতে নাকি এমন এমন সব লোক ছিল, যারা হাসতে হাসতে যে কোনও লোকের মুণ্ড তরবারির এক কোপে নামিয়ে দিত। তার পরে সেই মুণ্ড নিয়ে ফুটবল খেলত। ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে সেই আগুনে ছুড়ে ছুড়ে ফেলত বাড়ির লোকদের। তবে হ্যাঁ, এই জমিদারির ত্রিসীমানার মধ্যে ওরা কিছু করত না। যা-ই করত, সবই অন্য জমিদার বা অন্য রাজার এলাকায় গিয়ে করত। তার পর ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে কোথায় যে ওরা মিলিয়ে যেত, কেউ দেখতে পেত না।

এদের নাম শুনলেই সবাই ভয়ে কাঁপত। কিন্তু এই লুঠেরা বাহিনী যে কার, সেটা ঘূণাক্ষরেও কেউ টের পেত না। এমনকী তাঁর বউও জানতেন না সে কথা। বরং, ওই বাহিনীর তাণ্ডবের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে কত দিন তিনি তাঁর স্বামীকে বলেছেন, আমার তো ভয়ই করে, ওরা না আবার এই গ্রামে এসে লুঠপাট চালায়। ওরা এলে যা চায়, দিয়ে দিয়ে। কারও প্রাণ যেন না যায়।

বউয়ের মুখে ভয়ের ছায়া দেখে তিনি বলেছিলেন, তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমি তো আছি। আমার কোনও প্রজার কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না।

তাঁর এই আশ্বাসবাণী পৌঁছে গিয়েছিল ঘরে ঘরে। ফলে সবাই তাঁর নামে ধন্য ধন্য করত। তাঁর আর একটা কারণ, আড়ালে তিনি যা-ই করুন না কেন, সবার সামনে কিন্তু প্রচুর দানধ্যান করতেন। কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কে লেখাপড়া করতে পারছে না, কার বাড়ি ঝড়ে পড়ে গেছে, খবর পেলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি টাকা পাঠিয়ে দিতেন। আসলে তাঁর একটা হিসেব ছিল। তাঁর লোকেরা লুঠপাট করে যা আনত, তার দশ শতাংশ তিনি বিলিয়ে দিতেন। যাতে তাঁর সম্পর্কে মানুষের মনে একটা ভাল ধারণা জন্মায়। কারও মনেই কখনও কোনও সন্দেহ না জাগে। এমনকী তাঁর বউয়ের মনেও।

তাঁর বউ ছিলেন তাঁর একদম বিপরীত। তিনি সারা দিন বইপত্র নিয়ে পড়ে থাকতেন। পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করা ছিল তাঁর একটা নেশা। তিনি আবার জ্যোতিষচর্চাও করতেন। আশপাশে কারও বাচ্চা হলেই তার বাবা-মায়েরা তাঁর কাছে চলে আসত কোষ্ঠী করতে। তিনিও হাসিমুখে তা করে দিতেন। তাঁর একটা বিশাল ঘরই ছিল পুরনো দিনের নানা পঞ্জিকায় ভরা। মাঝে মাঝেই তিনি সেগুলো নিয়ে বসতেন। কী সব আঁকিবুঁকি কাটতেন। জমিদারের বউ বলে কথা, তবু তাঁকে নাকি কেউ কোনও দিন ভারী কোনও অলঙ্কার পরতে দেখেনি। এ ব্যাপারে কেউ কিছু বললেই তিনি বলতেন, আমার অলঙ্কার তো আমার বই।

সারা দিন বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন বলে তিনি কোনও দিন টের পাননি, তাঁর স্বামী জমিদার হওয়ার পর এ বার হাত বাড়িয়েছেন গোটা রাজ্যের উপরে। শুধু জমিদারি তাঁর আর ভাল লাগছে না। তাঁকে যেন তেন প্রকারেণ রাজা হতে হবে। রাজা। তাই তার জন্য যা যা করণীয়, সবই করছিলেন তিনি।

অন্য জমিদারদের নানা উপটৌকন পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন। তাঁদের মারফতই তাঁর রাজ্যের রাজার নামে বানিয়ে বানিয়ে নানা কথা বলে নবাবের কান ভারী করছিলেন। তাঁর রাজ্যের রাজা নাকি নবাবের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। গোপনে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করছেন। ইতিমধ্যে বিশাল অশ্ববাহিনী, হস্তিবাহিনী এবং প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের জড়ো করেছেন। লোকজনদের উসকাচ্ছেন।

এগুলো অতি সাবধানে করছিলেন তিনি। কিন্তু রাজাও যে চার দিকে এত চর ছড়িয়ে রেখেছেন, তা তিনি বুঝতে পারেননি। তাই তাঁর এই খবর রাজার কানে পৌঁছে গিয়েছিল ঠিক সময়ে। খবর পাওয়া মাত্র তিনি সিপাইদের নির্দেশ দিলেন তাঁকে বন্দি করার জন্য। এবং অন্য রাজাদের সঙ্গেও শলা-পরামর্শ করতে লাগলেন, কী করা যায়!

এ দিকে রাজা যে সব জেনে গেছেন এবং তাঁকে বন্দি করার জন্য যে সিপাইও পাঠিয়ে দিয়েছেন, সে সংবাদও মুহূর্তে পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অমনি সঙ্গে সঙ্গে এত দিন ধরে যত ধনসম্পদ তিনি লুণ্ঠ করেছিলেন, সে সব বোঁচকা বেঁধে খানতিরিশেক ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তিনি হঠাৎ কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কয়েক জন অনুচর।

ফিরে এলেন গভীর রাতে। একদম একা। বিধ্বস্ত। পোশাক-আশাক রক্তাক্ত। আগের জমিদারের ছিল পাঁচ মহলা বাড়ি। তিনি সেটাকে বাড়িয়ে ন'মহলা করেছিলেন। পাঁচ মহলাটা উপহার দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। সেখানে কোনও রকমে টলতে টলতে এসে বউয়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা চিরকুট। বললেন, সাবধানে রাখো।

স্বামীকে এমন অবস্থায় দেখে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। তখনও তাঁর স্বামী বলে যাচ্ছেন, সমস্ত ধনসম্পদ আমি একটা গোপন জায়গায় রেখে এসেছি। যেখানে রেখেছি এটা তার মানচিত্র। খুব সাবধানে রাখবে। কেউ যেন না জানে। তুমি এখান থেকে এফুনি পালাও। অন্য কোথাও গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকো। আমি যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে, কেমন?

— কী বলছ? আমি তো তোমার কথার কোনও মাথামুণ্ডুই বুঝতে পারছি না।

— তোমাকে অত বুঝতে হবে না। হাতে একদম সময় নেই। আমাদের

সামনে এখন খুব বিপদ। যা বলছি মন দিয়ে শোনো। এই মানচিত্রটা সাবধানে রাখো। এটার কথা কাউকে বোলো না।

— আমি নাহয় কাউকে বলব না, কিন্তু তোমার সঙ্গে যারা গিয়েছিল তারা তো জানে।

— যাদের নিয়ে গিয়েছিলাম, তারা কেউ আর বেঁচে নেই। ফেরার পথেই আমি তাদের সব খতম করে দিয়েছি।

— খতম! কী বলছ তুমি?

— কথা বাড়িয়ে না, তুমি এখন পালাও।

স্বামী-স্ত্রীতে যখন এই সব কথা হচ্ছে, ঠিক তখনই সব ক'টা মহলা ঘিরে ফেলল রাজার সিপাইরা। গোপন পথ দিয়ে পালাতে গিয়েও আর পালাতে পারলেন না। বন্দি হলেন তিনি। পাশের কক্ষের ঘুলঘুলি থেকে সবই দেখলেন তাঁর স্ত্রী। স্বামীর যে কী শাস্তি হতে পারে, মনে মনে আন্দাজ করে একছুটে তিনি চলে গেলেন ভিতরে। তাঁকে এক্ষুনি এই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটাই সেই সময়। তিনি জানতেন, এমন একটা অঘটন ঘটবে, কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি এবং এই ভাবে, এটা তিনি ভাবতেই পারেননি। এত দিন ধরে এত লোকজনের ভবিষ্যৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, কী ঘটতে পারে তার বিচার করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের ভবিষ্যৎটাই তাঁর দেখা হয়নি।

তিনি ঢুকলেন সেই ঘরে। যেখানে থরে থরে রাখা আছে বই আর বই। পঞ্জিকা আর পঞ্জিকা। পুঁথি আর পুঁথি। তিনি তার থেকে একটা পুস্তিকা বার করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কোন সময়টা ভাল!

তার পরে রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে। সঙ্গে নিয়ে নিলেন কিছু মোহর, কয়েকটি বাক্সপ্যাঁটরা, কিছু বাসনপত্র, বেশ কিছু বই আর পুরনো কয়েকটা পঞ্জিকা, ব্যস।

যাওয়ার সময় কাউকেই বলে গেলেন না, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। না, তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাঁদিকেও নয়। এর ক'দিন পরেই লোকমুখে তিনি জানতে পারলেন, তাঁর স্বামীর মৃত্যুদণ্ডের খবর। আর সে খবর ছড়িয়ে পড়তেই নাকি তাঁদের ন'মহলায় চলেছে নিবিবাদের লুঠপাট। কারা যে লুঠপাট করছে কিছু বোঝা গেল না। কেউ কেউ বলল, বাইরের লোকেরা যা নিয়েছে, তার থেকে বেশি নিয়েছে মহলার কর্মচারীরাই। কথাটা কতটা সত্যি কে জানে! এত বড়



ক্ষতি, তবু তিনি মনে মনে বললেন, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে তখন এই সব বইপত্র, পুঁথি আর পঞ্জিকাগুলো নিয়ে এসেছিলাম!

শোনা যায়, পরে ওই রাজ্যের রাজা নাকি ওই মহলা আর জমিদারি, সব কিছুই পুরনো সেই জমিদারকেই ফিরিয়ে দেন, যার কাছ থেকে এই পূর্বপুরুষ এক সময় এই সব হাতিয়ে নিয়েছিলেন।

তা, সেই পূর্বপুরুষের মৃত্যুর পরে যখন তাঁর স্ত্রীকে আর কোথাও দেখা গেল না, দেখা গেল না তাঁর কোনও ছেলেমেয়েকেও। তখন অনেকেই ভেবে নিলেন, তা হলে এটা নিশ্চয়ই ওই রাজারই কাজ। জনসমক্ষে জমিদারের মৃত্যুদণ্ড দিলেও তলে তলে লোক লাগিয়ে আসলে ওই পরিবারের বাকিদেরও তিনি শেষ করে দিয়েছেন। এ খবর পূর্বপুরুষের সেই বউয়ের কাছেও পৌঁছেছিল। আর তাতেই তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন, যাক, রাজার চরেরা তা হলে তাঁকে বা তাঁর ছেলেমেয়েদের আর কোনও খোঁজ করবে না। তাই তিনি সারা জীবন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এবং পালিয়ে গিয়ে যেখানে উঠেছিলেন, সেখানেই কোনও রকমে ছাউনি তুলে আর-পাঁচটা হতদরিদ্র মানুষের মতোই থাকতে শুরু করেছিলেন।

ছেলেমেয়েরা তখনও সব ছোট ছোট। তাই তাদের হাতে তাদের বাবার দিয়ে যাওয়া মানচিত্রটা তিনি তুলে দিতে পারেননি। তবে তাদের কাছে গল্প করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে সেটা কোথায় রেখেছেন, কাউকে, এমনকী নিজের ছেলেমেয়েদেরও ভরসা করে বলতে পারেননি। এইটুকু-টুকু বাচ্চা, কখন মুখ ফসকে কাকে বলে দেবে!

এর ক’দিন পরেই পুজোর ফুল তুলতে গিয়ে সাপের ছোবল খান তিনি। যন্ত্রণায় এতই কাতরাচ্ছিলেন যে, মরার আগে কাউকেই আর বলে যেতে পারেননি সেই মানচিত্রটা তিনি কোথায় রেখে দিয়েছেন।

দুই ছেলে এবং মেয়ে, পরে ছেলের বউরা এবং জামাই, সবাই মিলে সারা জীবন ধরে শুধু ছুটে বেরিয়েছেন ওই মানচিত্রের খোঁজে। শুধু তাঁরা নন, তার পর থেকে তাঁদের ছেলেমেয়েরা, সেই ছেলেমেয়েদের ছেলেমেয়েরা এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ওই মানচিত্র খুঁজে বার করা। যা পেলেই উদ্ধার করা যাবে তাঁদের পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া যাবতীয় ধনসম্পদ। কম সম্পদ! খানতিরিশেক ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া সোনাদানা, হিরে জহরত, মণিমাণিক্য!

না, তাঁরা কেউ সে মানচিত্র পাননি। তাই সোনাদানা তো দূরের কথা, তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাইটুকুও পাকা হয়নি। শুধু খড়ের ছাউনির জায়গায় টালি, টালির জায়গায় টিন, আর তারও পরে টিনের জায়গায় অ্যাসবেস্টস। আর মাঝেমাঝে কেবল এ-দেওয়াল সে-দেওয়াল ফেলে নতুন করে মাটির দেওয়াল তোলা। উন্নতি বলতে এইটুকুই। যে বংশের ছেলেমেয়েরা বংশানুক্রমে গুপ্তধনের মানচিত্র খুঁজে বেরায়, সেই বংশের উন্নতি হবে কী করে!

এই সত্যটা বুঝতে পেরে চাঁদ সূর্যর বাবা সেই মানচিত্রের পিছনে না ছুটে, ছুটেছিলেন দুটো পয়সা রোজগারের পিছনে। তার জন্য কী না করেছেন তিনি, হাটে জামাকাপড় নিয়ে বসা থেকে শুরু করে জমির দালালি। বাগান লিজে নেওয়া থেকে শুরু করে মধু চাষ। ছেলেদেরও নামিয়েছিলেন সেই ব্যবসায়। সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু কী কৃষ্ণগেই যে তাদের ঠাকুরদা গল্প করতে করতে তাদের কাছে একদিন বলে ফেললেন সেই মানচিত্রের কথা!

বাস। তার পর থেকেই যত গণ্ডগোল। চাঁদ আর সূর্য, দুই ভাই ব্যবসা-বাণিজ্য ভুলে উঠে পড়ে লাগল সেই মানচিত্রের খোঁজে। এত কম পরিশ্রমে এত বিপুল সম্পত্তি! ভাবা যায়! এটা না খুঁজে তাদের বাবা কিনা গেছেন ব্যবসা করতে! ছিঃ! বাবাটা না কী বোকা! সত্যি!

ওদের বাবা তখন বাড়িতে হাত দিয়েছেন। শুধু পাকাই নয়, পাকার পাশাপাশি দোতলা তুলবেন। ভিত কাটা শুরু হয়েছে। ছেলেদের বলে বলে আর পারছেন না। তাঁকে একাই সব দেখাশোনা করতে হচ্ছে। এমন সময় দুই ছেলে এসে বলল, বাবা, কাল থেকে তোমাকে আর বাড়ির কাজ দেখতে হবে না। ওটা আমরাই দেখব।

বাবা ঙ্গ কোঁচকালেন। তার পরে ভাবলেন, যাক, তা হলে এত দিনে ঠাকুর তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালেন! ছেলেদের সুমতি হল!

ছেলেরা বাড়ি ছেড়েই আর নড়ছে না। এই তাক দেখে, ওই আলমারি দেখে, এখানে হাতায়, ওখানে হাতায়, কোথায় থাকতে পারে মানচিত্র! কোথায়!

বাড়ির কাজ ধীরে ধীরে উঠছে। কিন্তু কবে যে শেষ হবে, কে জানে! বাড়ি শেষ হলেই একসঙ্গে দুই ছেলের বিয়ে দেবেন ওদের বাবা, তেমনই সব ঠিক করা আছে। ও দিকের ঘর দুটোয় উঁই করা জিনিসপত্র। বাবা এলেই,

সেগুলো হাতে হাতে গোছাচ্ছে দুই ভাই। প্রচুর আজীবাজে জিনিস আছে এখানে। তালপাতার পুঁথি থেকে তুষার যুগের পঞ্জিকা। প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া কারুকার্যখচিত অজস্র খোপের চন্দনকাঠের বাস্র। কী নেই? অনেক কিছুই আছে। কিন্তু সবই লজঝড়ে। অথচ এত দিনেও কেউ কিছু ফেলেনি। এগুলো সবই নাকি পূর্বপুরুষের সেই স্ত্রীর সঙ্গে করে নিয়ে আসা জিনিস। ওদের বংশের অনেকের ধারণা, ভাগ্যে না থাকলে নাকি কেউ গুপ্তধন পায় না। কার ভাগ্যে যে ওটা আছে! যে পাবে সে তো তাদেরই বংশের একজন। তাই কেউ এগুলো এত দিন ফেলেনি। এ বার ফেলতে হবে। শুধু শুধু আজীবাজে জিনিসে ঘর বোঝাই করে রেখে তো কোনও লাভ নেই। নতুন ঘরে নতুন ভাবে জীবন শুরু করবে ওরা। তাই যেগুলো ফেলে দেওয়ার সেগুলো এক দিকে ডাঁই করছে, আর যেগুলো রেখে দেওয়ার, সেগুলো আর এক দিকে জড়ো করছে। ঝেড়েমুছে তুলছে। বই-পুঁথিটুথি যত ঝাড়ছে, ততই শুকনো কী সব পাতাটাতা পড়ছে। তখন তো ন্যাপথলিন বা এখনকার মতো এত অত্যাধুনিক কীটনাশক ছিল না। পোকামাকড় থেকে বাঁচাতে তখনকার লোকেরা বোধহয় গাছের এই সব পাতাই বইয়ের ভাঁজে রাখত। ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ দেখে হাজার নোংরার মধ্যে একটা কাগজ। ছেঁড়া। শতচ্ছিন্ন। কিন্তু রংটা অদ্ভুত। আর এই রঙের জন্যই অত কাগজের মধ্য থেকেও আলাদা করে তাদের চোখে পড়েছে এটা। এটার মধ্যে আবার কী সব আঁকিবুঁকি। কী এটা! চাঁদ তুলে সূর্যকে দেখাতেই চমকে উঠল সূর্য। আরে এটাই তো সেই মানচিত্র!

তার পর ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওরা নিশ্চিত হল। হ্যাঁ, এটাই সেই মানচিত্র। এটাই সেই পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া গুপ্তধনের চাবিকাঠি। দু'ভাই লাফিয়ে উঠল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই মানচিত্র নিয়ে বেরিয়ে এই পাঁচমাথার মোড়ে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল। এর পর কোন দিকে যাবে তারা! কারণ মানচিত্রের ছেঁড়া যে অংশটা ওদের কাছে আছে, তার পথ-নির্দেশ অনুযায়ী এই পর্যন্তই আসা যায়। এর পরে কোন দিকে যেতে হবে, তার হদিশ হয়তো পরের অংশটায় আছে। কিন্তু সেই অংশটা কোথায়!

পূর্বপুরুষের সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই মানচিত্রটা ভাঁজ করে রেখেছিলেন। এত দিন ধরে ওই ভাবে ভাঁজ হয়ে থাকতে থাকতে সেই ভাঁজ থেকেই ছিঁড়ে

পড়েছে এটা। তার মানে এই অংশটা যেখান থেকে বেরিয়েছে, বাকি অংশটা সেখানেই আছে।

তাই বাড়ি দেখাশোনার নাম করে টানা দু'দিন ধরে নাওয়া-খাওয়া ভুলে তন্নতন্ন করে প্রত্যেকটি পঞ্জিকার প্রতিটি পাতা, পৃথির পাতা, যেখানে যা ছিল, সব, সব ভাল করে দেখতে লাগল দু'ভাই। যেগুলো দেখা হয়ে যেতে লাগল, সেগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখে যেগুলো বাকি আছে, সেগুলো অতি যত্নে গুছিয়ে রাখল পরদিন দেখার জন্য। যে ভাবেই হোক, বাকি অংশটা তাদের খুঁজে বার করতেই হবে। না, সে দিন ওরা যতগুলো দেখেছিল তার মধ্যে পায়নি। তার পরদিন যতটা দেখেছিল, তার মধ্যেও না। তার পরের দিন বাকিটা দেখতে গিয়ে ঘুরে ঢুকে দেখে, তাদের দেখা এবং না দেখা, পুরনো যা কিছু ছিল, কিছু নেই। কোথায় গেল ওগুলো?

খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারল, যে রাজমিস্ত্রিরা বাড়িতে কাজ করছে, তাদের নাকি ওগুলো বস্তায় ভরে জলায় গিয়ে ফেলে আসতে বলেছিলেন ওদের বাবা। সেই মতো ওরা ওগুলো সব ফেলে দিয়ে এসেছে। শুনে তো ওদের মাথায় হাত! কখন ফেলেছে ওগুলো? যখনই ফেলুক, ওগুলো নিশ্চয়ই এতক্ষণে ভিজে-গলে কাদা হয়ে গেছে। তা হলে উপায়!

উপায় একটাই। পুরো মানচিত্র নেই তো কী হয়েছে? অর্ধেকটা তো আছে। সেটা নিয়েই এগোতে হবে। তাই চাঁদ আর সূর্য সকাল হলেই প্রতিদিন বেরিয়ে পড়ে পূর্বপুরষের রেখে-যাওয়া ওই গুপ্তধনের খোঁজে। আর এই পাঁচমাথার মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ায়।

যেমন আজ এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে মেলে ধরা সেকাঁ পাঁপড়ের মতো শতচ্ছিন্ন মুড়মুড়ে মানচিত্র। একটু চাপ দিলেই যেন ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে। সে দিকে তাকিয়ে তারা ভাবতে লাগল, এর পরে কোন দিকে! কোন দিকে! কোন দিকে!

ওরা দুই ভাই অনেক দোনামোনা করে ভাঙা মন্দিরের দিকে হাঁটা দিল। যেতে যেতে চাঁদ বলল, শুনেছি, ওখানে নাকি প্রচুর সাপখোপ আছে। বিষাক্ত বিষাক্ত সব কাঁকড়াবিছে। যাবি? আর তা ছাড়া, ওখানেই যে সোনাদানা রাখা আছে, তার তো কোনও প্রমাণ নেই। তার চে' বরং চল, আগে কবরখানার দিকে যাই।

সূর্যর মাথা কাত করা দেখে চাঁদ বুঝল দাদার মত আছে। এই জায়গাটা

ভারী অদ্ভুত। এই রাস্তার মাঝখান থেকে নেমে, শটকাটে মাঠের ভেতর দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া যায় না। কারণ, পথের দু'পাশেই কাঁটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি। তাই ওরা পায়ে পায়ে আবার পাঁচমাথার মোড়ে এসে কবরখানার পথ ধরল। কিছুটা যেতেই ওদের কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। সূর্য বলল, ভাই, আগে কবরখানায় যাবি? সেই পূর্বপুরুষ তো আর কবরের বেদির উপরে থরে থরে হিরে জহরত বিছিয়ে রেখে যাননি। রাখলে, মাটির তলাতেই রেখেছেন। আমরা তো কোনও কোদাল-টোদাল কিছুই আনিনি। আর উনি হিন্দু হয়ে কি কবরখানায় মণিমাণিক্য রাখতে যাবেন? তোর কী মনে হয়? আমার তো মনে হয়, না। তার চেয়ে বরং চল, আমরা আগে জলার দিকে যাই। বলে, দুই ভাই আবার পাঁচমাথার মোড়ে ফিরে এল। এবং জলার দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে চাঁদ বলল, অত বড় জলা, জলার কোথায় রাখতে পারে বল তো! জলের তলায়? ওখানে নাকি প্রচুর জেঁক। এই বড় বড়। লোকজনের গন্ধ পেলেই তরতর করে সব ছুটে আসে। আর ওখানে নাকি পাখির মতো এক-একটা মশা। ঝাঁক বেঁধে ছেঁকে ধরে। একবার ধরলে আর ছাড়াতে পারবি না। সব রক্ত শুষে নেবে। আগে জলায় যাবি? না, ওই রাস্তায়?

— ওই রাস্তায়? চল, তাই চল।

চাঁদ আর সূর্য ফের পাঁচমাথার মোড়ে ফিরে এসে মোহনপুরের দিকে এগোতে লাগল। এগোচ্ছে তো এগোচ্ছে, এগোচ্ছে তো এগোচ্ছে। সামনে ধু ধু মাঠ। মাঠ আর মাঠ। কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুপুর হয়ে গেছে।

খাঁ খাঁ করছে রোদ্দুর। ঘেমেনেয়ে একশা। আর হাঁটতে পারছে না। পা টনটন করছে। ওরা দু'জনে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল। খিদেও পেয়েছে খুব। সেই কোন সকালে দুটো রুটি আর একটু তরকারি খেয়ে বেরিয়েছে। এতক্ষণ পেটে থাকে! ফুরফুর করে বেশ হাওয়া দিচ্ছে। সূর্য বলল, আর কতটা পথ বল তো! যত দূর চোখ যায়, চার দিকে তো শুধু মাঠ আর মাঠ। কোন দিকে যাব! সবই তো এক রকম লাগছে! কোন দিকটা মোহনপুর বল তো!

সূর্য যেমন জানে না কোন দিকটা মোহনপুর। চাঁদও জানে না। চাঁদ বলল, এত বড় ফাঁকা মাঠ, যেতে যেতে আমরা হারিয়ে যাব না তো!

চমকে উঠল সূর্য। সত্যি তো! যদি তারা হারিয়ে যায় বাড়ি ফিরবে কী

করে! কাকে জিজ্ঞেস করবে! এতটা পথ ভেঙে এল। কই, এ পথে তো একটা লোকেরও টিকি দেখা গেল না! আর তা ছাড়া, এর আগে তাদের গ্রামের কেউ এ দিকে এসেছে বলেও তো তারা শোনেনি। ফলে ওরা জানে না মোহনপুরটা ঠিক কোন দিকে! বোঁকের মাথায় চলে এসেছে। এখন উপায়! সূর্যর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, আমিও তো তাই ভাবছি। যদি সন্ধ্যাবেলায় আমরা দু'জনে এই বিশাল মাঠের মধ্যে হারিয়ে যাই! তখন!

— আমি বলছি কী দাদা, চল। আমরা বরং আলো থাকতে থাকতে যে পথ দিয়ে এসেছি, চিনে চিনে সেই পথ ধরে বাড়ি ফিরে যাই।

— যাবি বলছিস? তা হলে গুপ্তধন?

— আমার দরকার নেই। হারালে ওটা হারাক। আমি নিজে হারাতে চাই না।

— ভাবতে পারিস, তিরিশখানা ঘোড়ার পিঠে বোঝাই সোনাদানা, হিরে-জহরত, মণি-মাণিক্য!

— আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। বাড়ি চল। বলেই, হাওয়ায় ওড়া চুল ঠিক করতে লাগল চাঁদ।

— সে তো আমারও পেয়েছে। কিন্তু পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া... সূর্যর মন খচখচ করতে লাগল।

— দ্যাখ, ওই অজানা সম্পত্তির পিছনে ছুটতে গিয়ে কিন্তু বাবার আগের প্রজন্মের লোকগুলোর কিছু হয়নি। দেখেছিস? অথচ বাবা, এ সবার পিছনে ছোট্টিন বলেই আজ যেটুকু করেছেন, সেটুকু তো করতে পেরেছেন। আমরা যদি বাবার আগের প্রজন্মদের মতোই গুপ্তধনের পিছনে ছুটি, আমাদেরও কিন্তু ওই একই দশা হবে। আর আমরা যদি বাবার মতো পরিশ্রম করে কিছু করার চেষ্টা করি, তা হলে অত সম্পত্তি না হোক, তার একটা কণা তো হবে। চল, আমরা বরং বাবার কাঁধে গিয়ে কাঁধ মেলাই।

— বলছিস?

— হ্যাঁ বলছি। চল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। তেষ্টাও পেয়েছে খুব।

— ঠিক আছে, তুই যখন বলছিল... চল। কী সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, না!

চাঁদ আর সূর্য পিছন ফিরে হাঁটা শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে আবারও তারা পাঁচমাথার মোড়ে এসে দাঁড়াল। যে রাস্তা দিয়ে ওরা এখানে প্রায়ই আসে, আজও এসেছিল, সেই রাস্তা দিয়েই বাড়ির দিকে হাঁটা দিল



ওরা। কিছুটা যাওয়ার পরে সূর্য পিছন ফিরে ওই পাঁচমাথার মোড়ের দিকে তাকাল। ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে চাঁদ সেটা দেখতে পেয়ে বলল, দাদা, পিছন ফিরে তাকাস না। গুপ্তধন বড় ভয়ঙ্কর। তাকালেই হাতছানি দেবে। সে হাতছানি উপেক্ষা করা বড় কঠিন। দাঁড়া, একটা কাজ করি। বলেই, সযত্নে পকেটে রাখা মানচিট্রাটা বার করে দাদার হাতে আলতো করে দিয়ে বলল, দে তো, এই ফুরফুরে হাওয়ায় এটা উড়িয়ে দে। সেটা পুরো একটা বংশকে অকেজো করে রেখেছিল। দে, উড়িয়ে দে। এর সঙ্গে উড়ে যাক আমাদের ফালতু সব কর্মনাশা দিনগুলো।

— উড়িয়ে দেব? সূর্য তখনও দোনামোনা করছে দেখে চাঁদ আবার বলল, দে। উড়িয়ে দে।

সূর্য দু'আঙুলে কাগজটার একটা কোণ ধরে ছেড়ে দিল হাওয়ায়। ভাসতে ভাসতে কিছুটা গিয়ে মাটিতে পড়তেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেটা। তার পরে দমকা বাতাসে সেগুলো উড়ে উড়ে দূরে, আরও দূরে সরে যেতে যেতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল। আর ওরা দু'ভাই সেটা দেখে ফের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। কেউ আর পিছন ফিরে তাকাল না। চাঁদ না, সূর্যও না।



## বুকের ভিতর অচিন পাখি

অমৃত দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্দের শিয়ালদহ স্টেশন তখন জনসমুদ্র। চার দিক থেকে লোকের ঢল এসে নেমেছে। ছুটছে ট্রেন ধরতে। অমৃতও যাচ্ছিল। দক্ষিণ শাখার দিকে। কাজ করে একটা কাপড় ছাপার কারখানায়। সেই কারখানায় মূলত কাঠের ব্লকেই কাপড় ছাপা হয়। যথেষ্ট নামডাক আছে। সরকারি এবং বেসরকারি নামীদামি নানা সংস্থায় অর্ডার সাপ্লাই করে। তবে তাদের নিজস্ব কিছু ডিজাইনও আছে। সেটাই ধরে রেখেছে ওই কারখানার সহযোগী সংস্থা ‘রূপসী’ শো-রুমের অভিজাত্য।

অমৃত সেখানকার রং মাস্টার। শেড মিলিয়ে মিলিয়ে রং বানায়। মাইনে পায় আঠাশশো টাকা। এ ছাড়া ডিউটি আওয়ার্সের মধ্যেই যখন তার কোনও কাজ থাকে না, তখন ধরে ধরে কাপড় ছাপে। না। সে কোথাও কাপড় ছাপার তালিম নেয়নি। শিখেছে শুধু রং বানানো। তবে যে সব মেয়ে যোধপুর পার্কের নারী সেবা সংঘ থেকে এক বছরের কোর্স করে এসেছে, এখানে ফুরনে কাজ করে। এক রঙে ছাপা হলে যা পায়, তিন রঙে ছাপা হলে পায় তার থেকে একটু বেশি। শুধু পাড় আর আঁচল ছাপলে যা পায়, গোটা বডি ছাপলে তার চেয়ে পায় অনেক বেশি। বেশি মানে রেটটা ওঠা নামা করে কাপড় পিছু তিন টাকা থেকে চার টাকা। সে পাঁচ মিটারই হোক বা সাড়ে পাঁচ মিটার। ওদের দেখে দেখেই শিখেছে। তাতেও মাইনে ছাড়া মাসে অন্তত সাত-আটশো টাকা হয়ে যায়। কিন্তু ওর চালচলন দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না, ও এত টাকা রোজগার করে। চলাফেরা থেকে খাওয়া, থাকা, সব মিলিয়ে অমৃতের খরচ সারা মাসে বড়জোর হাজার দুয়েক। আসলে ও প্রতি মাসে কিছু না হলেও হাজার দেড়েক করে জমায়। এবং সেটা সব সময় সঙ্গেই রাখে। তা দিয়ে কেনে এক-একটা সাবেকি জিনিস। এর কোনওটা বাঁকুড়ার বড় ঘোড়া, কোনওটা চোঙওয়ালা গ্রামাফোন, আবার কোনওটা কুচকুচে

কালো রঙের বার্মা-সেগুনের মাঝারি আলমারি অথবা ড্রেসিং টেবিল কিংবা নকশা করা বড় ফুলদানি, নয়তো এক-মানুষ সমান লম্বা ল্যাম্পস্ট্যান্ড।

অমৃত যেতে যেতে এ-দিকে ও-দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখল, একটা ঠেলাগাড়ির উপরে কানা উঁচু থালার আদলে বড় বড় তিন-তিনটে ঝুড়ি। পর পর রাখা। গোটা ঠেলাগাড়ি জুড়ে। কয়েক জন সেটা থেকে কী সব বাছাবাছি করছে। ও সে-দিকে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল। পায়ের প্লাস্টিকের চটিটা কোলাপুরির মতো দেখতে। হাঁটতে হাঁটতে গোড়ালির ভারে খেঁতলে ধারগুলো ফেটে ফেটে গেছে। প্যাটের রং ধূসর। কোনও দিন ইস্ত্রি করা হয়েছে বলে মনে হয় না। আকাশি রঙের জামাটায় ঘাড় থেকে নীচ অবধি টানা একটা রঙের দাগ। হয়তো জং-ধরা তারে শুকোতে দিয়ে হয়েছে। পাঁচটা বোতামের তিনটির রং তিন রকম। আকারও তিন রকমের। তাও আবার যখন যে সুতো হাতের কাছে পেয়েছে, সেই সুতো দিয়েই সেলাই করা। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ছিপছিপে গড়ন। লম্বা। হাঁটলে হাত দুটো বেশি দোলে।

কাছে গিয়ে অমৃত দেখল, সোনালি বর্ডার-টর্ডার দেওয়া, ঝাউপাতা, ফুলটুল আঁকা চিনে মাটির কাপ-ডিশ। কারুকার্য করা ফুলদানি, দুধ-সাদা টি-পট, নানা নকশার অ্যাশট্রে। বেশ পাতলা। যেন বেঙ্গল পটারির তৈরি। তবে নিখুঁত নয়। কোনওটার গায়ে চুলের মতো সরু কালো রঙের ফাটল। কোনওটা আবার একটু-আধটু চলটা ওঠা। এ জন্যই দামটা এত কম। অমৃত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ওর মধ্যেই যেগুলো সবচেয়ে ভাল, বেছে বেছে সেগুলোকে একটা জায়গায় জড়ো করতে লাগল। একটা টি-পট বেশ পছন্দ, কিন্তু ঢাকনাটা একেবারে যাচ্ছেতাই। দোকানদার একটু অন্যমনস্ক হতেই চোখের পলকে ঝট করে ও সেই টি-পটের ঢাকনাটা অন্য একটা টি-পটের ওপর লাগিয়ে, ওই টি-পটের ঢাকনাটা পছন্দ হওয়া টি-পটটার উপরে বসিয়ে ওর বেছে রাখা জিনিসগুলোর মধ্যে রাখল। দোকানদার ডিশ ক'টা কাগজে মুড়ে, কাপগুলো দড়িতে মালার মতো গোঁথে তুলে দিল ওর হাতে। ও কাঁধের ঝোলায় ডিশগুলো আর পটটা রেখে কাপগুলো ঝুলিয়ে নিল হাতে, তার পরে পা রাখল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার চত্বরে।

ও বারুইপুরে যাবে। শিয়ালদহ থেকে এগারো-বারোটা স্টেশন। শুধু একজনেরই যেতে আসতে লাগে ছয়-ছয় বারো টাকা। অমৃত যখন বারুইপুরে

ঘর নেয়, তখন ট্রেনের মাস্থলি ছিল বিয়াল্লিশ টাকা। তার পর ধাপে ধাপে এক বছরে সেটা বেড়ে যে কতয় দাঁড়িয়েছে, দুম করে জিজ্ঞেস করলে ও ঠিক মতো বলতে পারবে না। তবে যাতায়াতের পথে কাউকে কাউকে আক্ষেপের সঙ্গে বলতে শুনেছে, এ বার যা বাড়িয়েছে, আর মাস্থলি করা যাবে না। বিনা টিকিটেই যেতে হবে।

মাস্থলির দাম যত দিন ছেচল্লিশ ছিল, ও অবশ্য তত দিন করেছে। দামটা বাহান্ন হতেই মাস্থলি করা ছেড়েছে। এখন তো একশো কত টাকা যেন! প্রথম প্রথম চেকারের ভয়ে বাসে করে পার্ক সার্কাসে গিয়ে ট্রেন ধরত। আসতও সেই ভাবে। ওই স্টেশনটা বেশ নিরাপদ। কোনও চেকার-টেকারের বালাই নেই। কিন্তু সব ট্রেনই তো আর ওই স্টেশন ধরে না। তাই...

স্টেশন চত্বরে ঢুকে গেটের ও-পারের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই ও বুঝতে পারল, আজ আর গলে যাওয়া যাবে না। এ সময় প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোনো যাত্রীদের চেয়ে ট্রেন ধরতে ঢোকা যাত্রীদের টিকিট বেশি চেকিং হয়। টিকিট কাউন্টারের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল অমৃত। দু'টাকার একটা নোট গলিয়ে দিয়ে বলল, বাঘাযতীন। বলেই, একটু থতমত খেল। শিয়ালদহ থেকে বাঘাযতীন পর্যন্ত একই ভাড়া। দূরের ফাঁকিবাজ যাত্রীরা ওই অবধি কেটে বাকিটা পথ বিনা টিকিটে যায়। বিকেলের পর তো আর কোনও স্টেশনে সে ভাবে চেকার থাকে না। ভয় কীসের? সেটা টিকিট কাউন্টারে বসা ওই লোকগুলোও জানে। তাই যে দিন বাধ্য হয়ে টিকিট কাটতে হয়, অমৃত সাধারণত ঢাকুরিয়া বা যাদবপুর বলে। তবু কেন যে আজ...

টিকিটটা হাতে নিয়ে ও কোলাপসিবল গেট পেরোল। মনে মনে চাইল অন্তত একজন চেকার তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিক। একবার ট্রেনে উঠে গেলে তো এটার আর কোনও দামই নেই। ধীরে ধীরে ও এগোতে লাগল। কিন্তু ওর দিকে কোনও চেকার ফিরেও তাকাল না। কী করে যে ওরা বোঝে কে টিকিট কেটেছে আর কে কাটেনি, জানতে পারলে যারা টিকিট কাটে তাদের মতো অভিনয় করে বেরিয়ে যাওয়া যেত।

প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগের চাতালে তখন সিনেমা হচ্ছে। উপরে বসানো বেশ বড় মাপের একটি টিভি-তে। কিছু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। স্টেশন চত্বরে যে সব ভিথিরি থাকে, তারা এখানে সেখানে শুয়ে বসে আছে। তাদেরও কারও কারও চোখ টিভির দিকে। অমৃতও দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা

বাংলা ছবি হচ্ছে। উত্তম-সুচিত্রার। একটু দেখার পরেই ওর মনে হল ছবিটা ওর দেখা। আগে কখনও কোথাও দেখেছে। কী যেন নাম ছবিটার! কী যেন নাম!

নাম মনে না পড়লেও ছবিটার গল্প মনে পড়ে গেল। ছোট থেকেই নায়ক নায়িকার প্রেম। ওদের মধ্যে হঠাৎ আর এক পুরুষ এসে হাজির। সেই পুরুষটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনই পয়সাওয়ালা। মেয়েটি ভালবেসে ফেলল তাকে। বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু এক মাস কাটতে না কাটতেই মেয়েটি বুঝতে পারল, সে ভুল করে ফেলেছে। তার স্বামী আসলে মাতাল, লম্পট, অত্যাচারী। রাতের পর রাত বাড়ি ফেরে না। বড় একা হয়ে পড়ে সে। সে সময় আচমকা একদিন রাস্তার মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার পুরনো প্রেমিকের। এড়িয়ে যেতে গিয়েও পারল না। কথা বলে জানতে পারল, সে তার এই অবস্থার কথা সব জানে এবং সেই একই রকম ভাবে এখনও তাকে ভালবাসে। প্রেমিকটি আরও বলল, আমার দরজা তোমার জন্য চিরকাল খোলা থাকবে। যে দিন মনে হবে, চলো এসো।

মেয়েটি সত্যিই একদিন সেই প্রেমিকের কাছে ফিরে এল। কিন্তু সেখানকার সংসারও তার সুখের হল না। প্রেমিকের বাড়ির লোকেরা তাকে মেনে নিতে পারল না। এর ফলে মেয়েটি শেষে আত্মহত্যা করল। আর সেটা দেখে প্রেমিকটি উন্মাদের মতো বেরিয়ে পড়ল পথে।

প্রেমিকা আসামাত্র ছেলেটি যদি তাকে নিয়ে অন্য কোথাও সরে যেত, তা হলে নিশ্চয়ই এ রকম পরিণতি হত না। অমৃত ভাবল, তার লক্ষ্মীও তো ফিরে আসবে বলেছে। তার নিজের বাড়ির লোকেরা তখন যদি তাকে মেনে নিতে না পারে, যদি ওই সিনেমাটার মতো ওরও ওই দশা হয়... তা হলে? আগে অত কিছু ভাবতে পারেনি ও। ঘরবাড়ি বন্ধুবান্ধব সব ছেড়েছুড়ে চলে এসেছিল। মনে হয়, এই তো সে দিনের কথা।

ও তখন ক্যানিংয়ে থাকত সে। পাক্সা সাড়ে চার বছর মেলামেশার পর তার লক্ষ্মী হঠাৎ চৌধুরীদের বাড়ি নিয়ে হঠাৎ খুব মাতামাতি শুরু করল। মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বা কখনও পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসে সে বলত, জানো, ও বাড়ির মাসিমা বাঘের ছালে বসে পূজো করেন। ওদের বসার ঘরে না, কী বিশাল একটা পিয়ানো। দেওয়ালে ঝোলানো ইয়া বড় বড় দু'খানা তলোয়ার, কতকগুলো হরিণের মাথা। শুনলাম, ওদের কলকাতার

বাড়িটা নাকি সারানো হচ্ছে। ছোট ছেলেটা, ওই যে গো, কার্তিকদা, ও তো গত সপ্তাহে এসেছে। ক'টা দিন বোধহয় এখানেই থাকবে। কী দারুণ দারুণ গল্প করে, ভাবতে পারবে না। কেউ বলবেই না যে, ও ওই বাড়ির ছেলে। কোনও অহংকার নেই। কী মিশুকে জানো...

সে সময় জানতে পারেনি অমৃত। যখন জেনেছিল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্যানিং ছেড়ে পালিয়েছে ওরা দু'জন। কিছু দিন পরে অবশ্য চৌধুরীদের সেই ছেলেটাকে দেখা গিয়েছিল। মাত্র ক'টা দিন। তার পরেই যে সে কোথায় গেল! তবে লোকে বলে, ও নাকি এখন ওদের কলকাতার বাড়িতে থাকে। নতুন বিয়ে করেছে। সে বউ দেখতে কেমন, কোথাকার মেয়ে, সবই কানাঘুষোয় জানতে পারে অমৃত। শুধু জানতে পারে না তার লক্ষ্মীর কথা। না জানলেও ও বিশ্বাস করে, লক্ষ্মী আছে। যে কোনও দিন, যে কোনও সময় ও চলে আসবে। ও তো নিজেই কথা দিয়েছে।

লক্ষ্মী কথা দিয়েছিল।

গ্রীষ্ম মন্দিরের লাগোয়া পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসেছিল ওরা। ভব সন্ধ্যাবেলায়। পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। মাঝে মাঝেই লক্ষ্মী বলছিল, 'এই, এ বার তা হলে উঠি।' আর প্রতিবারই অমৃত ওকে আটকাচ্ছিল, 'আর দশ মিনিট', 'আর পাঁচ মিনিট', 'আর একটু'— এই বলে। এক সময় লক্ষ্মী উঠে দাঁড়াল। আর নয়, হাট থেকে বাবার ফেরার সময় হয়ে গেছে। বাড়িতে এসে যদি আমাকে না দেখে... কথা শেষ হওয়ার আগেই জোর করে ওর হাত টেনে বসিয়েছিল অমৃত। আর একটু থাকো না... দিন দিন তুমি যেন কেমন দূরে সরে যাচ্ছ। অনেক দূরে... কথাটা শুনে তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে ছিল লক্ষ্মী। তার পর পুকুরের জলে পা দোলাতে দোলাতে বলেছিল, দূরে সরে যাচ্ছি? তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? আমি তো তোমারই।

— সত্যি?

— সত্যি। সত্যি। সত্যি। এই তিন সত্যি করলাম।

সে দিনের ঘটনাটা অমৃতের বারবার মনে পড়ে। তাই ও বিশ্বাস করে লক্ষ্মী আছে। যে কোনও সময় সে চলে আসবে। তাই সে যেগুলোর কথা বলত, যেগুলো তাকে মুগ্ধ করেছিল, সে সব জিনিস একে একে খুঁজে নিয়ে আসে ও।



আজ যেমন বেছে বেছে কাপ ডিশ নিয়ে যাচ্ছে। নতুন কেনার সামগ্রী নেই ওর, তাই অফিস ফেরত পথে টুঁ মারে পুরনো বাজারগুলোতে। কখনও শিয়ালদহের বৈঠকখানা বাজারে, কখনও আবার রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড আর মার্কুইস স্ট্রিটের ক্রসিংয়ে। ছুটিছাটার দিনে চলে যায় ভবানীপুরের ঘোড়ার আড্ডায়, গোপালনগরের চোরবাজারে। বেছে বেছে তুলে আনে কাঁটাচামচ, শীতে পরার দস্তানা, বেতের টুপি, ঝকঝকে তকতকে বই, সে যে-কোনও বিষয়েরই হোক না কেন, পড়ার জন্য তো নয়, তাক সাজানোর জন্য।

একটা হুইসল বেজে উঠতেই অমৃত তাকাল প্ল্যাটফর্মের দিকে। দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা ট্রেন তখন ছেড়ে যাচ্ছে। কিছু লোক পিছু পিছু ছুটছে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। ও-ও ছুটতে যাচ্ছিল, হাতের ঝোলানো কাপগুলো একটার সঙ্গে আর একটার ধাক্কা লেগে টুং টাং শব্দ হতেই ও থেমে গেল। এই রে, এফুনি ভাঙত!

টিভি-তে তখন জমাটি সিন। দেখতে গেলে ফের এই একই অবস্থা হবে। পরের ট্রেনটাও মিস হবে। তাই আর না দাঁড়িয়ে সোজা বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ঢুকল সে। সেখানে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। তাতে লোকজন উঠছে। প্রথম কামরার প্রথম জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ও জিজ্ঞেস করল, কোন ট্রেন?

লোকটা কোনও উত্তর দিল না। দ্বিতীয় বার ওই একই প্রশ্নে নিরুত্তর দেখে তৃতীয় বার অমায়িক ভঙ্গিতে অমৃত জিজ্ঞেস করল, দাদা, এটা কোন ট্রেন?

— জানি না। শব্দ দুটো বলেই লোকটা নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে রইল অন্য দিকে। অমৃত এগোতে লাগল। লোকটাকে নিশ্চয়ই আরও কয়েক জন এই একই প্রশ্ন করেছে। বারবার একই উত্তর দিতে দিতে লোকটা বিরক্ত হয়ে ছিলেন। তাই হয়তো শুনেও শুনছিলেন না। এমনটা তারও হয়। জানালার ধারে বসার এই হল একটা ঝামেলা। হাজার লোকের হাজার রকম প্রশ্নের উত্তর দাও। কী ট্রেন, কখন ছাড়বে, অমুক স্টেশন ধরবে কি না, তমুক স্টেশন যেতে কতক্ষণ লাগবে, এর আগে কোন ট্রেন আছে— এত প্রশ্ন, শেষে আর ধৈর্য থাকে না। হয়তো সে রকমই কিছু ঘটছে লোকটার সঙ্গে। কিন্তু... তবে যে বলল, জানি না। তার মানে এমনও হতে পারে, উনি বালিগঞ্জে নামবেন। তাই কোন ট্রেন না জানলেও চলে। যে-কোনও একটায় চেপে বসলেই হল।

কারণ, এখানকার সব ট্রেনই বালিগঞ্জ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হলে তো গেটের কাছাকাছি থাকা উচিত। মাত্র সাত-আট মিনিটের তো পথ। অমৃত আরেকটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেই একই ভাবে জিজ্ঞেস করল, দাদা, এটা কোন ট্রেন?

— লক্ষ্মীছাড়া।

কথাটা শুনেই ও পা বাড়াল সামনের দিকে। উঁকি মারতে লাগল একটার পর একটা জানালায়। ‘লক্ষ্মীছাড়া’ মানে লক্ষ্মীকান্তপুর। বারুইপুর হয়ে যাবে। কামরাগুলো ফাঁকা ফাঁকা। সিটও রয়েছে প্রচুর। কিন্তু জানালার ধারগুলো ভরা। যে ক’টা খালি, সে ক’টাই উল্টোমুখো। কয়েকটা কামরার পর ও দেখল, ও দিককার একটা জানালার ধার ফাঁকা। ও সোজা উঠে গিয়ে ওই রো-টা আর জানালাটা ভাল করে দেখল। এ রকম মনের মতো সিট পোলে কেন যেন ওর মনে হয়, জায়গাটা নিশ্চয়ই নোংরা। কেউ বমিটমি করে গেছে। অথবা জানালায় কাচ নেই কিংবা খোলে না, বন্ধ হয় না। কোনও না কোনও একটা গুণ্ডগোল আছেই। কিন্তু তেমন কিছু ওর নজরে পড়ল না। জানালা ঘেঁষে ও বসে পড়ল।

দেখতে দেখতে কামরা ভরে উঠল। ভিতরে হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যায়, তবু দরজাটা একেবারে ঠাসা। ওদের ভিতরে ঢুকতে বললেই বলবে, সামনে নামব। এই ‘সামনে’টা কারও কারও কাছে যে শেষ স্টেশন, সেটা মাত্র দিন কতক ট্রেনে চড়েই ও বুঝে গিয়েছিল। ঠেলে ঠেলে দু’-একজন মাঝেমধ্যে উঠছে। ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। জানালা দিয়ে হু হু করে আসা বাতাসের তোড়ে ওর চুলগুলো পিছন দিকে প্রায় শুয়ে তিরতির করে কাঁপতে লাগল। চোখ পিটপিট করতে লাগল ও। এক সময় জানালা থেকে মুখ সরিয়ে কামরার ভিতরে তাকাতেই ও দেখল, ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসছেন তার পাড়ার হরিহরবাবু। আসতে আসতে একদম তার রো ঘেঁষে দাঁড়ালেন। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একগাল হেসে বললেন, আইজও কিছু কিনলেন নাকি?

— তেমন কিছু না। ওই ক’টা কাপ।

— বাড়ি পাইলেন?

— খুঁজছি তো...

— সে তো অনেক দিন ধইরাই খুঁজতাহেন। তা, কেমন বাড়ি চান?

কথাটা এমন ভাবে বললেন, যেন বলামাত্রই উনি তেমন একটা বাড়ি জোগাড় করে দেবেন।

অমৃত বলল, মোটামুটি, থাকার মতো। কথা ক'টা মুখে বললেও মনে মনে বলল, আমি চাই এমন একটা বাড়ি, যেখানে পর্যাপ্ত আলো ঢোকে, ঘরে বসেই টের পাওয়া যায় সকাল হয়েছে। যেখানে বুক ভরে দু'দণ্ড শ্বাস নেওয়া যায়। যেখান থেকে উপরে তাকালে, যত কমই হোক, একটু আকাশ দেখা যায়। যেখানে দু'-একটা বন্ধুকে অনায়াসে আসতে বলা যায়। ইচ্ছে করলে দরজা খোলা রেখে জ্যোৎস্না রাতে হেঁটে যাওয়া যায় অন্তত বেশ খানিকটা পথ।

— মনে রাইখেন কিন্তু আমার কথাটা। মাইয়ারে নিয়া তো জামাই আলাদা হইব। ঘরের লাইগা পারতাছে না। যদি আপনার ঘরখান দেন তো, আমার কাছাকাছি মাইয়া-জামাইটা থাকতে পারে... হাড় জিরজিরে লোকটার মুখে অদ্ভুত আকৃতি।

— হ্যাঁ, মনে আছে। ও বলল।

— শুনলাম কালীও নাকি আপনারে ধরসে...

— হ্যাঁ, বলছিল...

— আপনে কিন্তু আমারে দেইখেন। মাইয়াটা আমার স্বশুরবাড়িতে খাটতে খাটতে আধখান হইয়া গ্যাসে। আপনে নিজের বুন মনে কইরা...

— ঠিক আছে, বললাম তো... একটু রক্ষ স্বরেই বলল। কারণ, ট্রেনের মধ্যে এ সব কথা তার ভাল লাগছিল না। যাতে ফের তাঁর সঙ্গে আর কোনও কথা বলতে না হয়, সে জন্য ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল অমৃত।

হঠাৎ অন্ধকার। নরেন্দ্রপুর থেকে সোনারপুর স্টেশনের মাঝখানে এইটুকু অংশে পাওয়ার থাকে না। দিনের বেলায় বোঝা যায় না। সন্ধ্যা হলেই মালুম হয়। মাত্র মিনিটখানেক। তারই মধ্যে ও দিক থেকে এক মহিলার গলা শোনা গেল, ঠিক হয়ে দাঁড়ান। অসভ্যের মতো...

ততক্ষণে কে যেন একটা টর্চ জ্বালিয়ে কামরার সিলিংয়ে আলোটা ফেলল। ঠিকরে আসা আলোয় জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না মনে হতে না হতেই আবার আলো জ্বলে উঠল। বারুইপুর স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে হরিহরবাবু অমৃতকে বললেন, আপনে আগান, আমি আইতাছি।

অমৃত দু'নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে রেললাইন পেরিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে লাগল। গেট থেকে বেরোবার মুখে একটা গুমটি। সোডার জল বিক্রি হয়। খোলার সময় ফটাস করে আওয়াজ হয় বলে এটার নাম ফটাস জল। দু'রকমের হয়। জিনজার যাট পয়সা আর এমনি সোডার জল পঞ্চাশ। নামী দামী বিভিন্ন সফট ড্রিংকসের বোতলে ভরা। একমাত্র সাউথ সেকশনেই এই জল পাওয়া যায়। নর্থ সেকশনে যে ক'জনের কাছে পাওয়া যায়, তারা কিন্তু এই সাউথ সেকশনেরই হকার। বরফ-ঠান্ডা হলে দশ পয়সা করে বেশি। নুন-লেবু দিয়ে গ্লাসে শরবত করে দিলে আর একটু বেশি। পকেট হাতড়ে একটা আধুলি আর সিকির মতো দেখতে নতুন ছোট্ট একটা দশ পয়সা এগিয়ে দিয়ে অমৃত বলল, একদম ঠান্ডা দেখে, আওয়াজ হয় যেন।

কেউ কেউ বলে জোরে শব্দ না হলে নাকি জলটা ভাল হয় না। এ কথা শুনে কাঁধের ব্যাগে বোতল নিয়ে ফেরি করতে থাকা এক জলওয়ালা একদিন বলেছিল, আওয়াজ শুনবেন, না জল খাবেন? এটা সূর্যপুরের জল...

চাবি দিয়ে ফটাস করে খুলে অমৃতর দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিল দোকানদার। বেশির ভাগ লোকই বোতলের মুখটা মুখে পুরে মুখ উঁচু করে ঢকঢক করে খায়। না হলে নাকি তৃপ্তি হয় না। অমৃত দোকানদারকে বলল, একটা পাইপ দিন না...

দোকানদার ওর দিকে একটা সবুজ রঙের স্ট্র এগিয়ে দিল। জল খেতে খেতে অমৃতের চোখ পড়ল ও পারের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এ রকমই একটা গুমটির সামনে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছেন হরিহরবাবু। গুমটির বড় বাল্বটার আলো তাঁর উপর এমন ভাবে পড়েছে, এত দূর থেকেও তাঁকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে।

তা হলে কি এই জনাই উনি 'আসছি' বলে কেটে গেলেন! ভেবেছেন, সঙ্গে থাকলে ভদ্রতাবশত আমাকেও যদি খাওয়াতে হয়! সত্যিই কী ছোট মন এঁদের, না!

অমৃত পা বাড়াল বাড়ির দিকে। বাড়িটা মল্লিকপুর আর বারুইপুরের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। ও যখন ঘর নেয়, তখন শুনেছিল, কিছু দিনের মধ্যেই এখানে একটা স্টেশন হচ্ছে। সামনেই ভারতিয়া কোম্পানি। রেলের চাকাটাকা বানায়। তিন শিফটে প্রায় হাজার তিনেক লোক কাজ করে। ওই কোম্পানিই নাকি স্টেশন করার জন্য অনেকটা জমি ছেড়ে দিচ্ছে। এখন বাকি

শুধু নির্ধারিত কিছু মাস্থলি টিকিট হোল্ডার শো করা। ক্রসিংয়ের জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে এখানে গাড়ি দাঁড়ায়। ফেরার সময় হলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে অমৃত। নামতে দেখে আরও দু’-দশ জনকে।

‘খাড়ান’। পিছনে হরিহরবাবুর গলা শুনে অমৃত দাঁড়িয়ে পড়ল। ও পিছন ফিরতেই উনি বললেন, এক লগে যাই। আমার টর্চটা আবার... ব্যাটারিগুলান কাইলকা রোদে না দিলে... বলতে বলতে এগিয়ে এলেন হরিহরবাবু। অমৃত এমনিই হাঁটছিল। দু’পাশে গাছের কাঁকড়া মাথাগুলোতে এতক্ষণ বুঝি ঘাপটি মেরে ছিল অন্ধকার। উনি টর্চের কথা বললেই, ঝুপ করে তা পথের উপরে নেমে এল। অমৃত ব্যাগ হাতড়ে পেনসিল টর্চটা ধরাল। আলোর বৃত্তের পিছু পিছু এগোতে লাগল ওরা দু’জন।

বাড়ি যাওয়ার পথে বাঁ হাতে একটা মুদিখানা দোকান। সেটার দাওয়ায় একটা বস্তা পেতে কতকগুলো ছেলে রোজকার মতোই তাস খেলছে। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট আছে। কিন্তু আলো জ্বলে না। ওদের আসতে দেখে ওই ছেলেগুলোর কেউ কেউ মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করল, কারা আসছে।

অমৃত মুড়ি কেনার জন্য দাওয়ায় উঠল। ওর রাতের খাবার বলতে, হয় পাউরুটি, নয় মুড়ি। একটু চিনি হলেই হল। কোনও কোনও দিন তাও লাগে না। এমনিই খায়। হরিহরবাবু নীচে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মুড়ির ঠোঙাটা ব্যাগে পুরে ও নীচে নেমে আবার হাঁটতে শুরু করল। সঙ্গে হরিহরবাবুও।

অমৃতের দুটো বাড়ির আগেই হরিহরবাবুর বাড়ি। উনি বললেন, আলোটা এটু দেহান দেখি, তুইক্যা পড়ি।

অমৃত সরু গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে টর্চটা তুলে ধরল। আলোটা অত দূর পৌঁছল না। তার আগেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু উনি না ঢোকা পর্যন্ত টর্চটা ও ধরেই রইল।

দুটো বাড়ির মাঝখানে হাত তিনেক চওড়া মেঠো পথ। সেটা ধরে কিছুটা এগোলেই পরপর বেশ কয়েকটা ঘর। টালির ছাউনি। প্রত্যেকটার সামনেই একটু করে বারান্দা। রান্নার জন্য। সেখানে দরজা নেই। তার পরে ঘর। এ রকমই একটা ঘরের ভাড়াটে অমৃত।

চার দিকে ঘুরঘুরি অন্ধকার। এই অঞ্চলে কারেন্ট এলেও ওদের বাড়িতে এখনও বিদ্যুৎ ঢোকেনি। কারণ, ও যে বাড়িটায় ভাড়া থাকে, সেখানে যাওয়ার অনেকগুলো পথ থাকলেও কোনওটাই ও-বাড়ির পথ নয়।

আসলে এই জায়গাটা ছিল চাষের জমি। আশপাশের জমির দাম হু হু করে চড়তেই চাষের জমিও বাস্তুজমি হিসেবে বিক্রি করা শুরু হয়েছিল। যারা কিনেছিল, জমির মালিকরা তাদের বলেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এ জমির রাস্তা আছে। আরে বাবা, বাড়ি-ঘরদোর হওয়া শুরু হোক না... তখন দেখবেন ঠিক রাস্তা বেরিয়ে গেছে।

রাস্তা যে বেরোয়নি তা নয়, তবে সব জমির রাস্তা বেরোয়নি। যেমন তাদেরটা। হয় এর বাড়ির পিছন দিয়ে যেতে হয়, নয়তো ওর বাড়ির উঠানের উপর দিয়ে।

না। কেউ আপত্তি করে না। আপত্তি করেছিল, যখন ওদের বাড়িওয়ালা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ থেকে কারেন্ট আনার জন্য যাতায়াতের ওই পথের ধারে খুঁটি পুঁততে গিয়েছিল। ফলে, না। ওদের বাড়িতে আর কারেন্ট আসেনি। এলেও যে বিশাল কিছু হত, তাও নয়। কারণ, যাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে, তারা যখন রাত্রিবেলায় আলো জ্বালায়, সে আলো এত টিমটিম করে জ্বলে যে, তা দেখার জন্য হারিকেন নিয়ে যেতে হয়। তার উপর ঘনঘন লোডশেডিং তো লেগেই আছে।

অমৃত পা বাড়াল বাড়ির দিকে। না। কোনও সাড়াশব্দ নেই। বেশি রাত অবধি জাগলে শুধু শুধু কেরোসিন পোড়ে। তাই এখানকার লোকেরা সন্ধ্যার পরেই শুয়ে পড়ে। ওঠে খুব সকালে। কারখানারই এক বন্ধু ওকে এই বাড়ির হদিশ দিয়েছিল। দেখেই পছন্দ হয়েছিল তার। বারুইপুর তো নিউ কালকাটা। ক’দিন পরেই চিড়িয়াখানা উঠে আসছে এখানে। কালকাটা ইউনিভার্সিটিও আরও বড় আকারে এখানে গড়ে উঠছে। মানুষ এ ভাবেই এগোয়। এর পরে খোদ কলকাটা।

কাপগুলো পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে ঘরের তালা খুলল অমৃত। হাতড়ে হাতড়ে চিমনি-বাতিটা জ্বালল। দেওয়ালগুলো যেন দাঁত বার করে হাসছে। ইটের ফাঁক থেকে জমট পুরু সুরকি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘরময় স্তুপ করা জিনিসপত্র। এ দেওয়ালে ঠেস দেওয়া খুলে-রাখা পালঙ্ক, তো ও দেওয়ালে লটকানো শিংওয়ালা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া হরিণের মাথা। দেওয়াল ঘেঁষে ভাঁই করে রাখা বড় বড় বেশ কয়েকটা বোঁচকা। আচমকা এলে মনে হবে থিয়েটারে ভাড়া খাটানোর সাজ-সরঞ্জামের কোনও গোড়াউন। ও দিকটায় শুধু বই আর বই। দরজার বাঁ হাতেই একটা সাবেকি ড্রেসিং



টেবিল। নতুন কেউ এলে ঠিক মতো পা ফেলতে পারবে না। চলাফেরা করতে গেলে পাঞ্জাবির পকেট আটকে যাবে খোঁচা হয়ে বেরিয়ে থাকা লম্বা কোনও কিছুতে অথবা কনুইতে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে দারুণ নকশা করা বড় ফুলদানি কিংবা টাল খেয়ে পড়ে যাবে এক মানুষ সমান লম্বা ল্যাম্পস্ট্যান্ড।

নিজেকে নিংড়ে ও এগুলো কিনেছে। শুধু কেনাই তো নয়, নিয়ে আসাটাও যে কত হ্যাপার, সেটা কেবল ও-ই জানে। কখনও চেকারের হাতে দু’-পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে ট্রেনে তুলেছে, কখনও ম্যাটাডরে চাপিয়েছে কারও সঙ্গে শেয়ারে। কখনও আবার পেয়ারা বা লিচুর সিজনে বারুইপুর-শিয়ালদহ যাতায়াত করা জানাশোনা ট্রাক বা টেম্পেয়ায় তুলে নিয়ে এসেছে সামান্য খরচে। যাতে চোট না লাগে, কী ভাবেই না বুকে আগলে এনেছে এ সব। এই কান ছাড়া বাঁকুড়ার বড় ঘোড়া, ও-দিককার ওই চোঙওয়ালা গ্রামোফোন কিংবা কুচকুচে কালো রঙের ওই মাঝারি আলমারিটা। আনতে কত কষ্টই না হয়েছে। যত কষ্টই হোক, ঘরে একবার ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে সে যে কী আনন্দ, কী তৃপ্তি। কেবলই থেকে থেকে মনে হয়, কী যেন একটা পেয়েছি। কী যেন একটা পেয়েছি।

কাপগুলো একটা কোণে রেখে ব্যাগ থেকে ও বের করল মুড়ির ঠোঙাটা। নামিয়ে রাখল টি-পট আর প্লেটগুলো। তার পর আলনা থেকে একটা লুঙ্গি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল অমৃত। ওর এক বন্ধু মাঝে মাঝেই স্নান না করে কাজে আসে। তার মুখে ও কত বার শুনেছে কলকাতায় তাদের জলের কষ্টের কথা। এখানে সে বালাই নেই। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, বাড়ি ফিরে বারো মাসই ও গা ধোয়। সে যত রাতই হোক না কেন।

অমৃত গা-টা মুছে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়াল। ড্রয়ার থেকে দাঁত ভাঙা চিরুনি বের করে চুলে বসিয়ে সামনে টানতে লাগল। আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ ঞ্চ কুঁচকে গেল ওর। কপালে দু’-তিনটে ভাঁজ দেখা দিল। চিরুনি নামিয়ে পেতে-আঁচড়ানো চুল থেকে কয়েকটা চিমটি কেটে তুলে ধরল। আয়নায় দেখে দেখে খুঁজতে লাগল এক ঝলক দেখা সাদা রঙের চুলটা। একটা দুটো করে বাদ দিয়ে দিয়েও আলাদা করতে পারল না সেটাকে। আয়নায় ভাল করে তাকিয়ে দেখল, সব ক’টার রংই কেমন যেন ধূসর ধূসর। ছাই ছাই। এত দিন খেয়ালই করেনি, গাল একদম ভেঙে গেছে। চোখ দুটো

চুকে গেছে কোটরে। চামড়াগুলো কেমন যেন কুঁচকে কুঁচকে গেছে। হঠাৎ ওর মনে হল, ভুল দেখছি না তো! কী দেখছি আজ! বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। গলার কাছটায় কী যেন একটা দলা পাকিয়ে আটকে গেল। এরই মধ্যে এই! তা হলে আর নতুন জীবন শুরু করব কবে! এখনও তো কিছুই জোগাড়যন্ত্র হল না!

দরজা জানালা বন্ধ করে একটা বোঁচকা টেনে বের করল অমৃত। একে একে বের করতে লাগল জামা, প্যান্ট, রাতের পোশাক। একটা একটা করে পরে আয়নার সামনে দাঁড়াতে লাগল। নিজেকে ভারী অদ্ভুত লাগল ওর। সেই কবে এ সব বানিয়েছিল। ঠিক ছিল, নতুন বাড়িতে উঠে গিয়ে পরবে। কিন্তু এ কী! সেই বুক, সেই দেহ তার কই! আর এ কী কাটছাঁট! আজ এগুলো কেউ পরে বেরোলে লোকে তাকিয়ে থাকবে। ভাববে, পুরনো পোশাকের ফ্যাশন শো-য়ে যোগ দিতে যাচ্ছে।

হাঁটুর কাছটা অসাড় হয়ে আসতে লাগল। গায়ে আর জোর নেই। যেন এফুনি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে শরীরটা। তা হলে কি অনেক দিন হয়ে গেল! লক্ষ্মী আর আসবে না! কিন্তু ও যে এই সে-দিন কথা দিল! ত্রিমাত্র মন্দিরের লাগোয়া বাঁধানো ঘাটে বসে পুকুরের জলে পা দোলাতে দোলাতে বলল, আমি তো তোমারই।

বলেছে যখন, তখন সে আসবেই। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে যদি তার ডাক শুনতে না পাই! এসে যদি ফিরে যায়! তড়িঘড়ি উঠে ঝটপট করে ঘরের সব ক'টা জানালা আর দরজাটা হাট করে খুলে দিল অমৃত। ঘরের এক কোণে গুটিয়ে দাঁড়-করানো ছিল মাদুর। সেটা উঁই করা বোঁচকাটার পাশে, এক চিলতে সরু জায়গায় বিছিয়ে ও শুয়ে পড়ল। ব্যাগ থেকে বের করে রাখা মুড়ির ঠোঙাটা হাতের কাছে টেনে নিল। অন্যান্য দিনের মতোই খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়বে। দু'-এক মুঠো মুখেও দিল।

কোমরটা যেন ভেঙে যাচ্ছে। বুকের ভিতরটা কেমন করতে লাগল। বড় বড় কয়েকটা শ্বাস নিল অমৃত। ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগল এলোপাথাড়ি দমকা বাতাস। চোখ বুজে এল ওর। দেখল, তিরতির করে সেই বাতাস বয়ে যাচ্ছে একটা ধানখেতের উপর দিয়ে। ও পারে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মী। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে। ঘোরের মধ্যেই ও চোঁচিয়ে উঠল, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি...

হঠাৎ ডানা ঝাপটানোর শব্দে ওর তন্দ্রা কেটে গেল। মনে হল, একটা বিশাল বড় পাখি বেরোবার জন্য ঘরময় ছটফট করছে। কোনও রকমে চোখ মেলে তাকাল ও। চিমনিটায় ততক্ষণে কালি পড়েছে। শিখাটা তেরচা ভাবে উঠে দপদপ করছে। পাখিটা কোথায়! উপরে চোখ তুলে দেখল, বাতাসের দাঁপটে দেওয়ালে অনবরত আছাড় খাচ্ছে কয়েক বছরের পুরনো একটা ক্যালেন্ডার। হাতের কাছে যে মুড়ির ঠোঙাটা ছিল, সেটাও কখন কাত হয়ে পড়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। এলোপাথাড়ি বাতাসে তারই কিছু কিছু উড়ছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অমৃতের মনে হল, ওগুলো মুড়ি নয়, সাদা খই। শুধু সাদা খই।

## ৪৫ মুখোমুখি

— চ্যাটার্জি চ্যাটার্জি... এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে বার কতক জোরে জোরে ডাকার পর রিসিভারের মুখটা ডান হাতে চেপে উঠে দাঁড়াল রজত। অর্ধেক শরীর বেঁকিয়ে মোটা থামের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে কি না দেখার চেষ্টা করল। না। চ্যাটার্জি কোথাও নেই। সামনের টেবিলে অন্য একজনের সঙ্গে দাশকে গল্প করতে দেখে জিজ্ঞেস করল, আই দাশ, চ্যাটার্জি কোথায় রে?

— এই তো দেখলাম। নীচে গেছে বোধহয়... ওর মোবাইলে ফোন করে দ্যাখ না...

— আরে, ওর মোবাইলটা সারাতে দিয়েছে না... তিন দিন হয়ে গেল, এখনও নাকি ঠিক হয়নি... কাদের কাছে যে সারাতে দেয় কে জানে! ঠিক আছে, দেখছি, বলেই উঁকিঝুঁকি মেরে রজত দেখার চেষ্টা করল চ্যাটার্জি কারও সঙ্গে মশগুল হয়ে গল্প করছে কি না। বুকসমান উঁচু ছোট ছোট কেবিন হলেও, উঠে দাঁড়ালে গোটা ফ্লোরের কে কোথায় আছে, সবাইকেই দেখা যায়। শেষ প্রান্তের কেবিনগুলিতে বেঁটে কেউ বসে থাকলে তাঁর কাঁধ না হলেও, অন্তত মাথাটা চোখে পড়ে। আর চ্যাটার্জির যা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পিছন দিক থেকে দেখলেও ঠিক চেনা যায়। তাই শেষ বারের মতো টো-য়ের উপরে ভর দিয়ে যতটা পারা যায় শরীর টান টান করে ও আপ্রাণ দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু না, তাকে কোথাও দেখা গেল না। তাই রিসিভার কানে নিয়ে বলল, না, দেখছি না তো... কিছু বলতে হবে?, ও, তাই নাকি? সে কী কথা! পড়ে গেছেন? কখন? না না, ঠিক আছে। আমি ওকে এক্ষুনি খবর দিচ্ছি। রিসিভার ক্রেডেলে রেখে রজত খুঁজতে বেরোল চ্যাটার্জিকে। চ্যাটার্জি মানে কুশল চ্যাটার্জি। এই অফিসে আছে বছর সাতেক। লম্বা, ছিপছিপে, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বিয়ে হয়েছে চার মাসও হয়নি। সিরিটিতে বাড়ি। মা, দাদা, বউদি আর ওদের একটা বাচ্চা। সবাই একসঙ্গে থাকে। বাড়িটাড়ি সব

কিছু ওর বাবাই করে দিয়ে গেছেন। কুশল এমনিতে ভীষণ দায়িত্ববান। দশটা মানে খুব বেশি হলে দশটা দশ। আর পাঁচটায় ছুটি মানে পাঁচটাই। বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে আসে। সচরাচর অফিসের বাইরে খুব একটা বেরোয় না।

কিন্তু বিয়ের পর থেকেই ওর একটার পর একটা সমস্যা লেগেই আছে। বিয়ের দু'সপ্তাহের মাথাতেই বউ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, টানা তিন দিন ওকে ছুটি নিতে হল।

তিন দিন কেন, দশ বারো, এমনকী তারও বেশি ছুটি একটানা অনেকে নেয় ঠিকই, কিন্তু ওদের অফিসে কাজের ধরনটা এমনই যে, যে-ই ছুটি নিক না কেন, তার তত দিনের কাজ তাকেই আগাম তুলে দিয়ে যেতে হয়। কিংবা কোনও সহকর্মীকে ম্যানেজ করে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হয়, যাতে প্রয়োজন হলে তার কাজ সে করে দিতে পারে। কারও কোনও অসুবিধে না হয়।

এই পরের কাজ বুঝে-নেওয়া সহকর্মীর কাজটাই এত দিন ধরে যেচে করে এসেছে কুশল। যে যত দিন ছুটি নিয়েছে, তার যাবতীয় কাজ সে হাসিমুখেই করে গেছে। কিন্তু ও নিজে ছুটি নিয়েছে, এমন নজির আছে বটে, তবে তা খুবই বিরল।

সেই কুশলের এ কী হল! গত চার মাসে কম করে বারো-চোদ্দো দিন অফিসে আসতে পারেনি। আজ বউয়ের শরীর খারাপ। কাল মায়ের এই হয়েছে। পরশু শাশুড়ির সেই হয়েছে। লেগেই আছে।

সহকর্মীরা ওকে কিছু বলতে পারে না। এত দিন যখন যার যা অসুবিধে হয়েছে, ও তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে ও না এলে ওর কাজ আজ এ তুলে দেয় তো কাল সে তুলে দেয়। আর নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে, সত্যি, কুশলের ভাগ্যটা না... এমন একটা বিয়ে করল যে, গোটা বাড়িটাই হাসপাতাল হয়ে উঠল। বউটা ভীষণ অপয়া।

এর মধ্যে কবে যেন অফিসেরই কে একজন বলছিল, কুশলের বউ যে অপয়া, সেটা ওর বিয়ের দিনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। সারা দিন কোথাও কিছু নেই, ছুটির একটু আগেই অফিস থেকে সবাই মিলে হইহই করে বেরিয়েছি। তিনটে ট্যাক্সি নিয়ে যখন ওর বাড়ি পৌঁছলাম, ঠিক তখনই শুরু হল কী বীভৎস ঝড় বৃষ্টি। সব উড়িয়ে নিয়ে যায় আর কী। খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল। আমরা সব দূরে দূরে যাব। কোনও রকমে নাকেমুখে কিছু খাবার গুঁজে ওই ঝড় জল মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

বিয়ের আগের কুশল আর বিয়ের পরের কুশলের মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল ফারাক। কারও কিছু হলে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ত, আবার যাকে যখন ভাল লাগল, জোর করে টেনেহিঁচড়ে বাড়ি নিয়ে যেত। অথচ এখন! এই তো ক'দিন আগে খবর এল, ওর দাদার প্রেশার ফল করেছে। এফ্‌সুনি নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে। এ কথা শুনে দ্বৈপায়ন, কৃষ্ণেন্দু, শমীক, এমনকী অফিসের কারও কোনও ব্যাপারেই যে থাকে না, অফিসে আসে, কাজ করে, চলে যায়; কথাও বলে খুব কম, বললেও একেবারে কাট কাট, সেই চক্রবর্তী পর্যন্ত সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের থামিয়ে দিয়ে কুশল বলেছিল, কী দরকার! তেমন বুঝলে পাড়ার কাউকে সঙ্গে নিয়ে নেব।

ওর এই আচরণ দেখে, যারা ওর বিয়েতে যায়নি তারা, যারা ওর বিয়েতে গিয়েছিল তাদের কাছে জানতে চেয়েছিল, ওর বউ কি খুব সুন্দরী? না হলে বিয়ের আগে যে যেচে যেচে সবাইকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইত, গেলে ছাড়তে চাইত না, সে কিনা এখন কাউকে বাড়িতেই নিয়ে যেতে চায় না। কেন?

কেউ আবার জানতে চেয়েছিল, ওর বাড়ি-ঘরদোর কেমন রে? ও ঠিক কোথায় থাকে? আসলে অনেকেই আছে, যারা নিজের বাড়ি বা এলাকার পরিবেশ নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। একদম আপন জনকেও বাড়িতে নিয়ে যেতে লজ্জা পায়, ওরও কি সে রকম কোনও ব্যাপার আছে নাকি?

কে যেন বলেছিল, না না, ওদের বাড়ি খুব বড়। নীচের তলায় ওর দাদা বউদি আর মা থাকে, দোতলায় ওরা। বেশ বড় বড় ঘর। প্রচুর আলো-বাতাস ঢোকে। তা ছাড়াও বেশ সাজানো-গোছানো। অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে যা যা থাকে, সবই আছে। না। এলাকাটাও তো খারাপ না। মাঝেমধ্যে একটু-আধটু বোমাবাজি টাজি হয় ঠিকই, সে তো সব জায়গাতেই হয়। ওদের আশপাশে কত বড় বড় বাড়ি উঠেছে। নতুন নতুন কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। দারুণ জায়গা। সে সব নয়, আমার মনে হয়, ওর অন্য কোনও প্রবলেম আছে।

— অন্য কোনও প্রবলেম মানে? পাশ থেকে কে যেন নিষিদ্ধ কোনও কিছুর গন্ধ পেয়ে জুলজুল চোখে কথার মধ্যে নাক গলিয়েছিল।

— তা আমি কী করে বলব? খোঁজ নাও।

কিন্তু কে আর কার খোঁজ নেয়। টিফিনের সময়টুকুই এই সব যা একটু



কথাবার্তা হয়, বাকি সময় তো শুধু মুখ গুঁজে কাজ আর কাজ। পাঁচটা বাজলেই যে যার বাড়ির দিকে।

কে কতটা বদলে যাচ্ছে, কেন বদলে যাচ্ছে, কী তার সমস্যা— এ সব নিয়ে ভাবার কারও কোনও অবকাশই নেই। কিন্তু অনেকে এটা নিয়ে ভাবিত। কেননা, লোকটার নাম কুশল। দ্য গ্রেট পরোপকারী।

কুশলের কথা শুনে ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল দীপ। মানে অর্ঘ্যদীপ। সবাই ওকে দীপ বলেই ডাকে। কুশলেরই বয়সি। দীপকে একদিন ভীষণ মনমরা হয়ে থাকতে দেখে নিজের থেকেই ওর সঙ্গ নিয়েছিল কুশল। ওর সঙ্গে বামাপুকুর লেন ধরে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কলেজ স্কোয়ারে। সেখানে সুইমিং পুলের পাশে বসে এটা ওটা দু’-চার কথার পর কুশল ওর কাছে জানতে চেয়েছিল, কী হয়েছে রে তোর?

দীপ তো কিছুতেই কিছু বলবে না। অনেক জোরাজুরি করে তবে ওর মুখ খুলিয়েছিল সে। দীপ বলেছিল, যে-মেয়েটাকে ও ভালবাসে, প্রায় বছর তিনেক ধরে চুটিয়ে প্রেম করেছে, যাকে ছাড়া ও কিছু ভাবতেই পারে না, সেই মেয়েটা বোধহয় অন্য কারও সঙ্গে মিশছে। না হলে দিনকতক ধরে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন!

কথাগুলো বলার সময় দীপের চোখ ছলছল করছিল আর গলাটাও কাঁপছিল। কুশল সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতেই একদম ভেঙে পড়েছিল দীপ। কোনও ছেলে যে এ ভাবে হাউহাউ করে কাঁদতে পারে, কুশল জানত না। ওর কান্না দেখে কুশল বলেছিল, তোর চোখে জল! যে একটা মানুষের জন্য এ ভাবে কাঁদতে পারে, সে তো গোটা পৃথিবীটাকেই জয় করতে পারে রে। দেখবি, আমি বলছি, ওই মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তোর কাছেই ফিরে আসবে। আসবেই। মিলিয়ে নিস।

কুশল যে মিথ্যে বলেনি, তার মাত্র ক’দিনের মাথাতেই টের পেয়েছিল দীপ। দীপ সে কথা বলেওছিল ওকে। বলেছিল, ওর দাদা ছুট করে আলাদা হয়ে যায়। তার ফলে ও খুব মানসিক চাপে ছিল। আর সে জনাই...

তার পর থেকে দীপ ওকে অন্য চোখে দেখে। সেই দীপও চিন্তিত ওকে নিয়ে। ছেলেটার উপর দিয়ে একটার পর একটা যে কী ঝড় যাচ্ছে! আজ আবার এই ঘটনা। ফোনের খবরটা রজতের কাছ থেকে শুনে কুশলকে খুঁজতে বেরোল দীপ। ও যে মাঝে মাঝে কোথায় যায়! আচ্ছা, অন্য কারও

কাছে খবর পেয়ে ও আবার বাড়ি চলে যায়নি তো! যদি গিয়েই থাকে, তা হলে ছুটির পর একবার ওর বাড়ি যাব। বাড়িতে কেউ না কেউ তো থাকবেই। ওর দাদা, বউদি, বউ সবাই ওকে চেনে। ওর বউটা অবশ্য একটু বেশি কথা বলে।

কুশলের বিয়ের পর কী একটা দরকারে দীপ একদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিল। তখনই অনুষ্কার সঙ্গে ভাল করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল কুশল। বিয়ের দিনে ভিড়ভাটার মধ্যে আলাপটা তো আর আলাপ নয়। তখনই দীপের মনে হয়েছিল ওর বউটা বড্ড খোলামেলা, হাসিখুশি এবং প্রাণবন্ত। এত সুন্দর করে কথা বলে এবং অনর্গল কথা বলে যে, ওর সামনে আর যারা থাকে, তারা সব চুপ মেরে যায়। কেউ আর কিছু বলতে পারে না।

অনুষ্কা যখন কথা বলছিল, মাঝে মাঝেই কুশল ওর দিকে তাকাচ্ছিল। আর যত বারই তাকাচ্ছিল, তত বারই অনুষ্কা যেন একটু থমকে যাচ্ছিল। আবার চোখ সরাতে না সরাতেই ফের যে কে সেই।

কুশল যে ওর বউয়ের দিকে তাকাচ্ছে এবং সেই তাকানোটা যে আসলে একটা ইঙ্গিত, সেটা বেশ বুঝতে পারছিল দীপ। আর দীপ যে সেটা বুঝতে পারছে, তাও টের পাচ্ছিল কুশল। যখন মাঝে মাঝে দীপের চোখে চোখ পড়ে যাচ্ছিল কুশলের, তখন মনে হয় একটু লজ্জাও পাচ্ছিল সে।

কিন্তু সেই লজ্জাটা কীসের? কুশল যে অনুষ্কাকে একটু কম কথা বলার জন্য বা থামতে বলার জন্য ইঙ্গিত করছে, সেটা দীপ আঁচ করতে পেরেছে বলে; না কি ওর বউ ঘরের খবর, বাপের বাড়ির হাঁড়ির খবর, এমনকী অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও অবলীলায় বলে যাচ্ছে দেখে— তা অনুমান করতে পারেনি দীপ। তবে কুশল যে একটু অস্বস্তিতে পড়েছে, সেটা খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিল।

আর এ কারণেই বুঝি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা প্লেটে নামাতে নামাতে দীপ একবার ‘উঠি’ বলতেই সঙ্গে সঙ্গে কুশলও উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ঠিক আছে, চল। তোকে তা হলে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

সেই ঘটনার পর দীপকে আর একদিনও কুশল বলেনি তার বাড়ি যাওয়ার কথা। কথাটা মনে পড়তেই হঠাৎ দীপের মনে হল, কুশলের কি একটু সন্দেহবাতিক আছে! না হলে বিয়ের আগে যে তার বাড়িতে প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে যেত, না গেলে রাগ করত, বিয়ের পর সেই ছেলেটাই

কিনা একবারও বলল না, তার বাড়ি যাওয়ার কথা! উল্টে সে যখন নিজে থেকে গেল, তার বউ একটু হেসে হেসে কথা বলছিল দেখে, তার কত অস্বস্তি! না, থাক। ওর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। বরং খবর নিয়ে দেখি, ওর মাকে কোথায় নিয়ে গেছে। রজতদাটা এমন, ফোনটা ধরল, একটু ডিটেলসে খবরটা নেবে তো! যতই হোক সহকর্মীর মা বলে কথা, তা নয়, দুম করে ফোনটা ছেড়ে দিল। পড়ে গিয়ে কি হাত ভাঙল না পা ভাঙল! মাথায় চোট লাগেনি তো! এখন তো আবার একটু চোট লাগলেই সিটি স্ক্যান করো, হ্যান করো, ত্যান করো। তার পর চিকিৎসা। চিকিৎসা তো নয়, হাড়িকাঠে মাথা দেওয়া। আচ্ছা, ওর মায়ের ঘর তো নীচের তলায়! দোতলায় উঠতে গিয়েছিল কেন! ওর বউয়ের কাছে কি! না কি ছাদে ভেজা জামাকাপড় মেলতে! কী দরকার এই বয়সে ও সব করার। আজকালকার বউরাও হয়েছে তেমন। নিজেরাও তো দু'দিন পর শাশুড়ি হবে, তখন বুঝবে। ওর মাকে নিয়ে কোথায় গেছে জানতে পারলে সেখানে যাওয়া যেত! ওর দাদাকেও নিশ্চয়ই ওরা এতক্ষণে খবর দিয়েছে! এ সব ব্যাপারে তো আবার পাড়ার ছেলেরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে সবার আগে। আর যদি সত্যিই ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকে, তা হলে কী হবে! কুশল যা সন্দেহপ্রবণ। ওর বউয়ের কপালে আজ আছে!

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে গোটা ফ্লোরটা চষে ফেলার পর, এই করিডর ওই করিডর, চার তলা, তিন তলা, দোতলা হয়ে নীচে নামল সে। কোথাও কুশল নেই। হঠাৎ দেখে, রাস্তা দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে হেলতে দুলতে ও অফিসের দিকে আসছে। ওকে দেখেই লম্বা লম্বা পা ফেলে সে একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল।— তুই কোথায় গিয়েছিলি? কখন থেকে খুঁজছি। এফুনি বাড়ি যা।

— কেন? কৌচকাল কুশল।

— তোর বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল। তোর মা নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন।

— সে কী! কখন?

— এই তো একটু আগে ফোন এসেছিল, পরে কথা বলবি। আগে বাড়ি যা।

কুশল কবজি উল্টে ঘড়ি দেখল।

— ঘড়ি দেখছিস কী? বসকে বলে বেরিয়ে যা।

— হ্যাঁ। কোনও রকমে শব্দটা উচ্চারণ করে পা চালান কুশল। পিছু পিছু দীপ।

ওদের সেকশনে ঢুকতেই এ-দিক ও-দিক থেকে হইহই করে উঠল সবাই। কার আগে কে খবরটা দেবে তাই নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা।

কুশল হাত তুলে খুব শাস্ত ভঙ্গিতে বলল, আমি শুনেছি। তার পর গুটিগুটি পায়ে বসের ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই বস বললেন, একদম দেরি করবেন না। চলে যান। সঙ্গে টাকাপয়সা আছে তো? কী হল জানাবেন কিন্তু। কোনও দরকার হলে বলবেন... কোনও হেজিটেট করবেন না...

দীপ বলল, একদম চিন্তা করিস না। আমি যাব?

— না, থাক। বলেই, নিজের টেবিলে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে ড্রয়ারে তালি লাগিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মায়ের এ রকম হয়েছে। চিন্তা করতে করতে যাবে। যদি রাস্তাঘাটে কিছু একটা হয়ে যায়! বড়রাস্তার গিয়ে ট্যাক্সি ধরে দেওয়ার জন্য দীপ ওর সঙ্গে নিয়েছিল। কিন্তু ও তাকে চোখের ইশারায় বলল, আসতে হবে না। বলেই ছুঁমুঁ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। দীপ ওর নেমে যাওয়ার দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে ফিরে গেল সেকশনে।

দোতলায় নেমে পিছন ফিরল কুশল। না, দীপ আসছে না। একতলার দিকে পা না বাড়িয়ে দোতলার করিডরের দিকে এগিয়ে গেল সে। ডান হাতে ওয়াশরুম। সেখানে বারবার জলের ঝাপটা মেরে মুখটা খুব ভাল করে ধুলো। রুমাল দিয়ে মুছেটুছে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াল। প্যান্টের বেল্ট খুলে জামাটা ভাল করে গুঁজে নিল। তার পর আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখল। ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আগে তিন তলার সিঁড়িটা দেখে নিল, তার পর এক তলার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই তড়িঘড়ি সিঁড়ি ভাঙতে লাগল নীচে।

রাস্তায় বেরিয়ে ঘড়ি দেখল। দুটো পাঁচ। মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মহাজাতি সদনের সামনে এসে মেট্রো স্টেশনে ঢুকল। ওর কাছে স্মার্ট কার্ড আছে। তাই সোজা প্লাটফর্মে নেমে গেল ও। বেশ গরম লাগছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল কালো চৌকো খোপগুলো কোথায়। যেখান থেকে ঠান্ডা হাওয়া নামে। সামনেই তিন-চার জন দাঁড়িয়ে। তাদের চুল উড়ছে। সে দিকে এগিয়ে গেল কুশল। বেশ ঠান্ডা হাওয়া। সামনের ডিজিটাল

ঘড়ি জানিয়ে দিচ্ছে পরবর্তী ট্রেনের সময়। টালিগঞ্জের ট্রেন আসতে এখনও তিন মিনিট।

ও রোজ এখান থেকেই মেট্রো ধরে। টালিগঞ্জে নেমে অটো করে সিরিটির মোড়। সেখান থেকে দু'পা হাঁটলেই বাড়ির গেট।

দেখতে দেখতে ট্রেন চুকে পড়ল। এ সময় মেট্রোটা ফাঁকাই থাকে। কুশল উঠে একটা সিটও পেয়ে গেল। ভাবতে লাগল, অনুষ্কা ঠিক কী বলেছে!

ট্রেনে প্রচণ্ড আওয়াজ। যতীন দাস পার্ক থেকে ট্রেন ছাড়তেই উঠে দাঁড়াল ও। কালীঘাট স্টেশনে নেমে চলমান সিঁড়িতে করে রাসবিহারী মোড়ে গিয়ে উঠল। গড়িয়াহাটের অটোগুলো বেশ ফাঁকাই যাচ্ছে।

দেশপ্রিয় পার্ক ছাড়তে না ছাড়তেই পেছন থেকে চালকের পিঠ আলতো করে ছুঁয়ে বলল, ভাই আস্তে।

অটো থেকে নেমে পয়সা মেটাল কুশল। ঘড়ি দেখল দুটো সাতচল্লিশ। দ্রুত ক'পা হেঁটে প্রিয়া হলের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ ভিড়-ভিড়। এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগল। না, অনুষ্কাকে দেখতে পেল না। তা হলে কি ও এখনও এসে পৌঁছয়নি! উফ্, মেয়েটার সাজতে-গুজতেই সারা বেলা। কী যে এত সাজে! আমি অত দূর থেকে চলে এলাম! অথচ তার পান্তা নেই। আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। এর আগেও দু'-দু'বার এ রকম কাণ্ড করেছে। এত টেনশন বাড়িয়ে দেয় না... এসেই ফিরিস্তি দেবে, কী করব, বেরোতে যাচ্ছি এমন সময় ফোন। কিংবা একটাও বাস নেই। কী অবস্থা, আমি যে কী করে এসেছি, সে একমাত্র আমিই জানি। আজ আবার কী সাফাই দেয় দেখি! সত্যি, ওকে নিয়ে বেরোনো না... অদ্ভুত মেয়ে! নিজেই তাল তুলবে, অথচ... একটা ফোন করে দেখব! দেখেই বা কী করব... ও কি আর এখন বাড়িতে আছে! নিশ্চয়ই রাস্তায়। নাঃ, মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। এ বার ওকে একটা মোবাইল কিনে দিতেই হবে। ও যতই বলুক, ফালতু ফালতু অতগুলো টাকা খরচা করে মোবাইল কেনার কোনও মানেই হয় না। আমি তো কোথাও যাই না। বাড়িতেই থাকি। দরকার হলে ল্যান্ড নাম্বারে ফোন করবো। নাঃ। ওর কথা আর শুনব না। টেনশনে ছটফট করতে করতে আবার হাতঘড়ি দেখল কুশল। সিনেমা শুরু হতে আর কয়েক মিনিট বাকি। এত দিক সামলে এসেও যদি প্রথম থেকে দেখতে না পাই, কোনও মানে হয়! ধ্যাত।

একটার পর একটা বাস এসে দাঁড়াচ্ছে। কুশল উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা

করছে অনুষ্কা নামছে কি না। নাঃ, এর পর এলে আমি আর সিনেমায় ঢুকছি না। ছিঃ। আমি অফিস থেকে ঠিক সময়ে চলে এলাম। আর সে বাড়ি থেকে এটুকু আসবে, তাতেই দিন কাবার! আর কোনও দিন কোথাও যাওয়ার কথা বলে দেখুক... কী রে বাবা, তিনটে বারো হয়ে গেল, এখনও আসার নাম নেই! নাঃ, একটা ফোন করেই দেখি...

রাস্তা পার হল কুশল। সামনেই বুথ। ডায়াল করে দেখল ফোনটা এনগেজড। আবার ডায়াল করল। এনগেজড। আবার। আবার। আবার। নাঃ, ফোনটা এতক্ষণ এনগেজড থাকতে পারে না। নির্ঘাত সেই দিনের মতো রিসিভারটা ও ঠিক মতো ক্রেডেলে রাখেনি। সত্যি, মেয়েটাকে নিয়ে না আর পারা যায় না!

নাঃ, আর সিনেমা দেখার কোনও মানে হয় না। টিকিটটাকে কি বেচে দেব! কে নেবে! অনেকক্ষণ সিনেমা শুরু হয়ে গেছে। যারা দেখার তারা ঠিক ঢুকে পড়েছে। তার উপর আবার হাউসফুলও হয়নি। রাস্তা পার হয়ে ও-ফুটে গেল কুশল। ওই তো এস ডি ফোর বাই ওয়ান। ও দ্রুত উঠে পড়ল বাসে।

ডোর বেল টিপতেই দরজা খুলল অনুষ্কা। ওকে দেখেই ও জিজ্ঞেস করল, কি গো, এত দেরি হল কেন?

— দেরি মানে? তোমার তো হলের সামনে দাঁড়ানোর কথা। বলতে বলতে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল কুশল। পেছনে পেছনে অনুষ্কা। ঘরে ঢুকেই কুশল জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

অনুষ্কা পেছন দিকে তাকিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। তার পর খুব কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, মা ফোন করেছিল, আজ বাবা নাকি হঠাৎ সুইসাইড করতে গিয়েছিল।

— সে কী! কেন?

— আমার বিয়ের সময় নাকি প্রচুর টাকা ধারদেনা করেছিল। আমাদের কিছু বলেওনি। এখন পাওনাদারদের তাগাদায় ভেঙে পড়েছে। মা বলেছে, আমাদের একবার যেতে। বাবাকে বোধহয় সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে। তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। চলো, যত তাড়াতাড়ি পারি বেরিয়ে পড়ি। আমি এখানে এখনও কাউকে কিছু বলিনি। মা জিজ্ঞেস করছিল, কার ফোন। আমি এড়িয়ে গেছি। নাও, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও...



— সে না হয় হলাম। কিন্তু তুমি হলের সামনে এলে না কেন?

— যা ববাবা! এ রকম একটা ঘটনা শোনার পর কোনও মেয়ে সিনেমায় যেতে পারে?

— না পারার কী আছে? সিনেমা দেখেও তো তোমাদের বাড়িতে যাওয়া যেত, নাকি? তেমন তো কিছু হয়নি। শুধু শুধু আমাদের সিনেমা দেখাটা মাটি করে কী লাভ হল বলো তো? দুটো টিকিট নষ্ট হল।

— তার মানে? অনুষ্কা অবাক হয়ে গেল।

একটু থেমে কুশল বলল, না, তা বলছি না। বলছি, এই ফোনটা সত্যি তো? না কি মাঝে মাঝেই রেস্টোরাঁয় খেতে যাওয়ার জন্য, কিংবা বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দেওয়ার জন্য, অথবা নিছকই গঙ্গার ধারে একটু ঘুরে বেড়ানোর জন্য তুমি যে রকম নানা ছলের আশ্রয় নাও... আমাকে মোবাইলটা বাড়িতে রেখে যেতে বলো। অথচ শিখিয়ে দাও, আমি যেন অফিসে গিয়েই কলিগদের বলে রাখি, ভুল করে মোবাইলটা বাড়িতে ফেলে এসেছি। আর যে সময় থেকে যে সময় পর্যন্ত আমাকে সিটে থাকতে বারণ করো, ঠিক সেই সময়েই অফিসের ল্যান্ড লাইনে ফোন করে আমার সহকর্মীদের এমন এক-একটা পিলে চমকানো বিপদের কথা বলো, যাতে আমি ডিপার্টমেন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আমাকে জোর করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এটা আবার সে রকম কোনও কেস নয় তো? এত দিন বাড়ি যাওনি দেখে তোমার মা হয়তো তোমার মতোই...

কথাটা শুনে অনুষ্কা থ' হয়ে গেল। কুশল এই প্রথম দেখল, ওর চপলমতি বউ কেমন বোবা হয়ে গেছে।



## দেখা হবে

ওর দেখা পাব তো!

বাস থেকে নেমে নীরেন্দু হনহন করে হাঁটা দিল সাগরের দিকে। আশপাশে শুধু লোক আর লোক। সবাই চলেছে এক দিকে। সঙ্গে একটা-দুটো করে বোঁচকা। কারও মাথায়। কারও কাঁধে। ব্রিফকেস বা বাক্স-প্যাটারার বালাই খুব একটা নেই। নীরেন্দুর কাঁধে কেবল একটা তিন ধাপের ট্রাভেল ব্যাগ। তত ভারীও নয়। তবু কিছুক্ষণ পর পর একবার এ-কাঁধ একবার ও-কাঁধ করছে। পিচরাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরতেই কানে আসতে লাগল দূর থেকে ভেসে আসা মাইকের আওয়াজ। সেটা ফিকে থেকে ক্রমশ জোরে হতে লাগল। আর যত জোরে হতে লাগল, লোকের পা-ও যেন তত লম্বা লম্বা পড়তে লাগল।

বেশির ভাগ লোকই দঙ্গল বেঁধে এসেছে। প্রায় প্রতিটি দলের একদম সামনে রয়েছে মুরব্বি গোছের কেউ। তার কাঁধে বাঁশ বা লাঠি। সেটার মাথায় গামছা, শাড়ি বা কাপড়ের টুকরো বাঁধা। ওটা ওই দলের চিহ্ন। এই চিহ্ন লক্ষ করেই সেই দলের লোকেরা এগোচ্ছে। কোনও কোনও দল আবার নিজেদের লোকজনদের দড়ি দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। যাতে কেউ দলছুট হয়ে না যায়।

একা একা বোধহয় কেউ এখানে আসে না। নীরেন্দুর মতো দু'-একটা পাগল ছাড়া। মেলা চত্বরে ঢুকেই নীরেন্দু এ-দিকে ও-দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল খিদিরপুরের সেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটাকে। কী যেন নাম ওদের! যাদের ডেরায় লম্বা বাঁশের মাথায় পতপত করে ওড়ে সাদার উপর নীল রঙের ডোরা কাটা ত্রিভুজাকৃতি পতাকা।

পেয়েও গেল খুব সহজে। সেখানে একটা আড়ালে দাঁড়িয়ে পোশাক

আশাক ছাড়ল। দলামোচা করে নিয়ে-আসা লাট হওয়া ময়লা লুঙ্গি আর অজস্র ফুটোফাটা একটা গেঞ্জি বার করে কোনও রকমে গলিয়ে নিল গায়ে। তার পর ছাড়া পোশাকগুলো ব্যাগে পুরে ছোট্ট একটা টিপতালা লাগিয়ে ওদের কাছে গচ্ছিত রাখল। ওরা একই নম্বরের একটা চাকতি ব্যাগের হাতলে ঝুলিয়ে অন্যটা তুলে দিল নীরেন্দুর হাতে। নীরেন্দু সেটা কোমরের কারের সঙ্গে বেঁধে নিল।

এ ধরনের কোনও ব্যবস্থা যে এখানে আছে, নীরেন্দু সেটা জানত না। গত বার একদম শেষ মুহূর্তে কী মনে হয়েছিল, দুম করে রাত দশটা নাগাদ সময়ে রওনা হয়েছিল গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে। সঙ্গে তেমন পয়সাকড়িও ছিল না। বাস রিজার্ভ করে দলে দলে লোক যাচ্ছিল। মোমিনপুরের মোড়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে হাত দেখাতেই দ্রুত বেগে ছুটতে থাকা যে ছোট বাসটা হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সেটায় লোক বলতে সর্বসাকুল্যে ছিল জনা পাঁচেক। নীরেন্দু তাতে উঠে পড়েছিল। কথায় কথায় জেনেছিল, রিকিউজিশন আসায় ওষুধপত্র নিয়ে কচুবেড়িয়া যাচ্ছে ওরা।

তার পর লঞ্চে করে, বাসে করে এসে ওরা পৌঁছেছিল সাগরে। ততক্ষণে বহু যাত্রী ফিরতে শুরু করেছে। যদিও স্নানের পুণ্যলগ্ন তখনও শেষ হয়নি। তাই যারা আসছে তারা আর কালবিলম্ব না করে সঙ্গে আনা পোঁটলা-পুঁটলি কোনও রকমে এক জায়গায় ফেলেই হইহই করে সোজা নেমে পড়ছিল জলে। পরপর ডুব দিচ্ছিল।

এই স্নানের জন্য নীরেন্দু এখানে আসেনি। এমনিই এসেছে। ও ভাবত, কত লোক কত দূর-দূরান্ত থেকে যায়। কী আছে ওখানে! আগে নাকি গঙ্গাসাগরে গেলে অনেকে ফিরতই না। ওখানে মৃত্যু হলে লোকে ধন্য হয়ে যেত। এত মাহাত্ম্য! অথচ এত কাছে থেকেও সে একবারও যায়নি। দেখিই না গিয়ে— এ ভাবে চলে এসে নীরেন্দুর তখন মনে হয়েছিল, এই সময়ের মধ্যে একবার ডুব দিলে সত্যিই যদি পুণ্য অর্জন হয়, নাহয় একবার ডুব দিলামই। কিন্তু এই জামাপ্যান্ট পরে ব্যাগসুদ্ধ তো জলে ডুব দেওয়া যাবে না। আর পাড়ে রেখে গেলেই যে ডুব দিয়ে উঠে সেগুলো ফেরত পাব, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।

তখনই ওর চোখে পড়েছিল পাড়ে বসে বহু লোক নাপিতের কাছে ন্যাড়া

হচ্ছে। কেউ কেউ স্বর্গলাভের আশায় গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হচ্ছে। আবার কত লোক পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে মেয়েদের স্নান করা দেখছে। কাপড় ছাড়া দেখছে। নীরেন্দ্র মুখ দিয়ে অশ্রুতে বেরিয়ে এসেছিল— ছিঃ, এরা তীর্থ করতে এসেছে।

তবু তাদেরই একজনের পায়ের কাছে ব্যাগটা নামিয়ে ঝটপট জামা প্যান্ট ছেড়ে গামছা পরে ‘দাদা, একটু দেখবেন? ডুবটা দিয়েই আসছি।’ কোনও রকমে কথা ক’টা ছুড়েছিল। লোকটা মাথা কাত করেছিল না ‘না’ করেছিল, সে দিকে ফিরেও তাকায়নি নীরেন্দ্র। সোজা ছুটেছিল সাগরের দিকে। থিকথিক করছিল লোক। কোমরজল অবধি হেঁটে ঝপঝপ করে তিনটে ডুব দিয়ে উঠে দেখেছিল, লোকটা যে ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ভাবেই আছে, ও যে ব্যাগটা রেখে এসেছে এবং তাকে যে ওটা দেখতে বলে এসেছে, সে সব বোধহয় লোকটা খেয়ালই করেনি। কেউ তুলে নিয়ে গেলে টেরও পাবে না। নীরেন্দ্র তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্যাগটা সামলেছিল।

কাঁধে ব্যাগ নিয়ে আর কত ঘোরা যায়! লোকে বলে সাগরে নাকি খুব শীত। তাই কাঁথা, কশল, লেদার জাকেট, সোয়েটার, মাফলার, মাস্কি টুপি, এমনকী হাতের গ্লাভস পর্যন্ত— ঘরে যা যা ছিল, সবই ব্যাগে পুরে নিয়ে এসেছে। তখন তো আর জানত না, লোকের মুখে শোনা ওই প্রচলিত বাক্যটা কত মিথ্যা।

নীরেন্দ্র ভেবেছিল মেলা উপলক্ষে সরকারের করে দেওয়া এ প্রাস্ত থেকে ও প্রাস্ত সারি-সারি টানা চালাঘরগুলোর কোনও একটায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নেবে। ঠিক তখনই মাইকে শুনল খিদিরপুরের এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ঘোষণা। ইচ্ছে করলে যে-কেউ ওদের হেফাজতে বাস্ক-পাঁটরা গচ্ছিত রাখতে পারে। কোনও টাকাপয়সা লাগে না। শুধু রাখার সময় যে টোকেনটা দেয়, সেটা যত্ন করে রাখতে হয়। কারণ, ওটা দেখিয়েই গচ্ছিত জিনিস ফেরত নিতে হয়।

ব্যাগটা ওদের ওখানে রেখে ঝাড়া হাত-পায়ে নীরেন্দ্র বেরিয়ে পড়েছিল মেলা দেখতে। ঘুরতে ঘুরতে দেখেছিল পশরা সাজিয়ে বসা লোকজনদের পাশাপাশি কত লোক যে যত্রতত্র শিব, কৃষ্ণ, কালীর মূর্তি পরপর বসিয়ে প্রণামীর জন্য সামনে একফালি কাপড় কিংবা থালা পেতে রেখেছে, তার কোনও হিসেব নেই। ঠিক এই একই রকম ভাবে কাপড় বা থালা-বাটি পেতে

সার দিয়ে বসে রয়েছে কত ভিথিরি। যাত্রীরা পুণ্যার্জনের লোভে তাতে চাল-ডাল, কেউ কেউ আবার খুচরো পয়সা ফেলতে ফেলতে এগোচ্ছে। নীরেন্দ্র দেবে কী, টিউশন করে চলে। ঝাঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে যা রয়েছে তাতে তার নিজেরই চলবে না।

হঠাৎই ওর নজর পড়ল ফুটফুটে একটি মেয়ের দিকে। কোনও মেয়ের পা যে এমন ঝকঝকে মোলায়েম হতে পারে, তা ওর ধারণা ছিল না। টানা টানা নাক চোখ। গায়ের রং কাঁচা হলুদের মতো। ছিপছিপে, বার্বি ডলের মতো গড়ন। কে বলবে ও ভিথিরি! ওকে কি এখানে মানায়!

পকেট হাতড়ে দুটো এক টাকার কয়েন বার করে তার সামনে রাখা টোল খাওয়া অ্যালুমিনিয়ামের থালায় দিয়ে নিচু হয়ে নীরেন্দ্র জিঙেস করল, তুমি কোথায় থাকো?

মেয়েটি আঙুল তুলে পেছনের দিকে হোগলা পাতার একটা ছাউনি দেখিয়ে দিল।

— তুমি একা থাকো?

মেয়েটি উপর নীচে মাথা দুলিয়ে জানাল, হ্যাঁ। ততক্ষণে একটা হিন্দুস্তানি বুড়ি আঁচলের পুঁটলি থেকে মেশানো চাল ডাল দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। সে এই ভাবে মেয়েটির সামনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকলে মেয়েটির থালায় উনি কিছু দিতে পারবেন না, এটা ভেবে সরে দাঁড়াল সে। ভেবেছিল, বুড়িটা চলে গেলে মেয়েটার সঙ্গে একটু কথা বলবে। এ কিছুতেই ভিথিরি হতে পারে না। কিন্তু সোজা হয়ে এ-দিকে ও-দিকে তাকাতেই আশপাশের ভিথিরিগুলোর তির্যক চাহনি দেখে ও বুঝল, মেয়েটার সঙ্গে ওর এই যেচে কথা বলাটা ওরা কেউই ভাল চোখে নিচ্ছে না।

ঠিক করল বিকেল গড়িয়ে গেলে আসবে। দরকার হলে ওর ছাউনিতে গিয়ে টাকা মারবে। তাই ওখানে আর না দাঁড়িয়ে মেলায় ঘুরতে লাগল নীরেন্দ্র। এক প্যাকেট নকুলদানা কিনে কপিল মূনির আশ্রমের দিকে এগোল। পূজো দিয়ে বুঝল, যতটা পূজোর জন্য দেওয়া হচ্ছে, ঠাকুরমশাইরা তার থেকে কিছু কিছু রেখে দিচ্ছেন। পরে সেগুলোই মন্দিরের সামনে ভিড় করে থাকা ভক্তদের দিকে ছুড়ে দিচ্ছেন। হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে তখন। কেউ পাচ্ছে পলিপ্যাকে মোড়া বাতাসার প্যাকেট, কেউ গোটা কলা, কেউ আবার অর্ধেক নারকেল বা আস্ত আপেল কিংবা শশা।

নীরেন্দ্র লাফিয়ে বাঁপিয়ে কিছু ফল লুফে নিল। তার পর ভিড় থেকে একটু সরে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সেগুলো খেল। ঠিক করল, দুপুরের খাওয়াটা একটু বেলা করেই খাবে। যাতে রাতে আর খেতে না হয়। সাড়ে চারটে নাগাদ নীরেন্দ্র হোটেলের দিকে গেল। পরপর অনেকগুলো হোটেল। সব ক'টাই নিরামিষের। ডাল ভাত আর একটা সবজি। পেট চুক্তি খাওয়া। সব দোকানেই এক দাম। সাত টাকা। খাওয়াদাওয়া সেরে এ-ধার ও-ধার ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ভাবল, এ বার মেয়েটার কাছে যাবে।

কিন্তু পাড়ে গিয়ে দেখল সব ওলটপালট। সাগরের জল সেই কোথায় ছিল, এখন উঠে এসেছে এতটা। যারা পশরা সাজিয়ে বসেছিল, ভিক্ষা করছিল, হোগলা পাতার ছাউনি গেড়েছিল, তারা সে সব সরিয়ে নিয়েছে। কোথায় যে সরিয়েছে! কাকে জিজ্ঞেস করবে সে!

গোটা মেলা তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওই মেয়েটির দেখা পেল না। কোথায় গেল মেয়েটা! যে হেঁটে গেলে মাটি ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা, যে সামনে এলে বেল জুঁই হাসনুহানারও লজ্জায় মুখ লুকিয়ে নেওয়ার কথা, যাকে এক বলক দেখার জন্য কচি কচি ঘাসেদের সারা রাত মুখ তুলে চেয়ে থাকার কথা, সে কি এই সব এলেবেলে লোকেদের ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারে!

মেলায় এই এলাকাটুকু ছাড়া এখানে আর কী কী আছে, যেখানে ও যেতে পারে! একটা চায়ের দোকানে খোঁজ করে নীরেন্দ্র জানতে পারল, এই মেলা চত্বরের আশপাশে অনেকগুলো আশ্রম আছে। রাতের দিকে তারা থিচুড়ি খাওয়ায়। দীন দরিদ্রদের পাশাপাশি অনেক অবস্থাপন্ন লোকও লাইন দিয়ে সেখানে খায়। যদি ওই সব আশ্রমের কোনও একটায় ও গিয়ে থাকে!

নীরেন্দ্র সব ক'টা আশ্রম ঘুরল। কিন্তু কোথায় সে! পরদিন সকালে মেলা ভাঙতে শুরু করেছে। ভিড়ও পাতলা হয়ে এসেছে। সবাই প্রায় ঘরমুখো। ঘরমুখো হল নীরেন্দ্রও। সাগর এই ভাবে এতটা এগিয়ে এসে প্রতারণা না করলে সে অবশ্যই ওই মেয়েটার দেখা পেত।

এ রকম চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া মেয়ে সে খুব কমই দেখেছে। জীবদ্দশায় নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আরেক বার তার দেখা হবে। হবেই। এ বছর না হলে কী হয়েছে, সামনের বছর তো আছে। সে বছর না হলে তার পরের বছর। কারণ, ও জানে, সমুদ্র কখনও কিছু নেয় না। যা নেয়, তা আবার ফেরত দিয়ে



দেয়। ওই মেয়েটিকেও নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে। কেবল ওই মেয়েটার জন্যই নীরেন্দু বারবার গঙ্গাসাগরে আসবে। বারবার...

এ বারও এসেছে। ভাল পোশাক পরে মেয়েটার সামনে গেলে ভীষণ বেমানান লাগবে। তাই সঙ্গে নিয়ে আসা লাট হওয়া ময়লা লুঙ্গি আর অজস্র ফুটোফাটা গেঞ্জিটা পরে নিল সে। এই বার ওর আশপাশের লোকেরা নিশ্চয়ই তার দিকে আর ওই রকম দৃষ্টিতে তাকাবে না।

নীরেন্দু পা বাড়াল।



## ডালপালা

বাজ পড়ার বিকট শব্দে কেঁপে উঠলেন শ্রীহরি। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আশি বছরে পা দিয়েও এতটুকুও খাটো হয়নি কান। শুনতে পেলেন বাতাসের উথালিপাথালি। বুঝতে পারলেন ঝড় উঠল বলে।

আর শুয়ে থাকতে পারলেন না। খাটে হাঁটু মুড়ে জবুথবু হয়ে বসলেন। জানালার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল, সন্ধে হয়ে গেছে। মনে করার চেষ্টা করলেন, তবে কি তন্দ্রা এসেছিল চোখে! না-এলে ফাঁকি দিয়ে বিকেলটা গড়িয়ে গেল কী ভাবে! এমনিতে তো ঘুমই আসে না।

আগে অবশ্য বিছানায় শরীর মেললেই দু'চোখ বুজে আসত। 'হ্যাঁ গো', 'কী হল', 'ঘুমোলে নাকি?', 'শুনবে তো...' গোছের ডাকাডাকিতেও বিরক্ত হতেন। অন্য দিকে পাশ ফিরে শুতেন। খুব বেশি হলে 'উঁ' 'আঁ' করে উঠতেন। ব্যস, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

অথচ একদিন ছিল যখন এই শ্রীহরিই রাতের পর রাত গল্প করে কাটিয়ে দিতেন। পাশাপাশি শুয়ে এই জানালা দিয়ে আকাশের তারা দেখতে দেখতে কখন যে সকাল হয়ে যেত টেরও পেতেন না।

এখন সে নেই। কত দিন হয়ে গেল। যাওয়ার সময় যাদের বলে গিয়েছিল 'তোরা তোদের বাপকে দেখিস', তারা শ্রীহরিকে দেখছে। দেখছে মানে, দেখাশোনার জন্য একটা কাজের মেয়ে রেখে দিয়েছে। সে সকালে আসে, সন্ধে নাগাদ যায়। রাতের খাবার খাইয়েদাইয়ে।

আকাশে মেঘ করায় সে বুঝি আজ তাড়াতাড়ি চলে গেছে। এখন তো বর্ষার সময়। এলোপাথাড়ি বৃষ্টিতে জানালা দিয়ে জলের ছাঁট আসে। তাই যাওয়ার আগে সে ভাল করে জানালাগুলো লাগিয়ে দিয়ে যায়। ভেতর থেকে দরজাটা আটকে দিতে বলে। আজ আকাশের অবস্থা দেখে তাড়াহুড়ায় সে হয়তো এ সব বেমালুম ভুলে গেছে।

মাঝে মাঝেই জানালা দিয়ে দমকা বাতাস আসছে। আসছে ইতিউতি বজ্রপাতের পৃথিবী-কাঁপানো শব্দ। বিদ্যুতের ঝলকানি। শ্রীহরি ভাবলেন, জানালার বাঁপটা ফেলে দেবেন, কিন্তু ওঁর উঠতে ইচ্ছে করল না। কেমন শীত শীত করছে। গায়ে জড়ানো বিছানার চাদরটায় মাথা মুড়ি দিয়ে নিলেন তিনি। জানালাটা দিয়ে দেব! দিয়েই বা কী হবে? ওখান দিয়ে আসা জলের ছাঁটটা যদি ঘর ভাসিয়েও নিয়ে যায়, তা হলেই বা ক্ষতি কী? কার কথা ভেবে আগলাব এ সব? ওরা কি আর কখনও এ-মুখো হবে!

যখন ওরা ছিল তখন তো জীবন দিয়ে আগলেছেন এ সব। হঠাৎই মনে পড়ে গেল সে বারের কথা। তখনও ছোট ছেলেটা হয়নি। চার ছেলেকে শুইয়ে খাটের একদম ধারে গুটিসুটি মেরে পড়ে ছিল ওদের মা, লতা। নীচে মাদুর বিছিয়ে শ্রীহরি। আচমকা মাঝরাতে সে কী পাগল করা বৃষ্টি। ঝড় জল। তখন তো অভাবের সংসার। ভাইদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় হবে এক জামাকাপড়ে বেরিয়ে এসেছেন বাপ-ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে। কোনও রকমে বারাসতের এই কলোনিতে তিন কাঠা জমি কিনে একটা মাটির ঘর তুলেছেন। দরমার জানালা। হোগলাপাতা দিয়ে ঘিরে করেছেন একচিলতে বাথরুম। চালের বস্তা পরদার মতো টাঙিয়ে চালাচ্ছেন দরজার কাজ। তখন চোরটোর কোথায়! খা খা জমি। চাষবাস হয়। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো বাড়ি। সবার অবস্থা একই রকম। আর চোরটোর থাকলেও তাঁদের ঘরে নেওয়ার মতো কিছু ছিল না। কেউ যদি চুরি করতে ঢুকত, তা হলে হয়তো সে নিজেই লজ্জায় পড়ে উল্টে কিছু রেখে যেত। ছিল না কলটলের বালাইও। জল বলতে ক'হাত দূরের ওই পুকুর। শাক-সবজি যতটা না কিনে পারা যায় শ্রীহরি টুকটুক করে ঘরের আশপাশে লাগিয়েছেন ধনেপাতা, গাজর, লঙ্কা। কঞ্চি দিয়ে টালির চালে তুলে দিয়েছেন লাউগাছ, উচ্ছেগাছ, শিমগাছ। সে সব পাড়তে চার ছেলের যাকে যখন সামনে পেতেন তুলে দিতেন উপরে। ছেলেরা অতশত বুঝত না, শ্রীহরি ওদের টালির জোড়ায় জোড়ায় পা দিতে বললেও, ওরা প্রায় প্রতিবারই এক-আধটা করে টালি ভাঙত।

বৃষ্টির সময় সেই ভাঙা টালি বেয়ে জল চুঁইয়ে আসত। আঙুল দিয়ে সেই জলের রেখা টেনে শ্রীহরি পাঠিয়ে দিতেন তার নীচের সারির টালির উপরের খাঁজে। সে বার টানা তিন-চার দিন ধরে এমন প্রবল বৃষ্টি হল যে, ঘরের প্রায় সব জায়গা দিয়েই জল পড়তে লাগল। বাটি, মগ, হাঁড়ি বসিয়েও কুলোনো

গেল না। শেষে তুলতে হল বিছানা জুড়ে পাতা পলিথিন শিট। বড়টা হওয়ার পর শ্রীহরি ভেবেছিলেন একটা অয়েলক্লথ আনবেন। পরপর দু'মাসেও পেরে ওঠেননি। পরে ডাকবাংলোর মোড় থেকে কিনে এনেছিলেন সেই পলিথিন সিট। তখন ডাকবাংলোর মোড় এত জমজমাট ছিল না। বিকেলের দিকে ছোট ছোট চালার নীচে দোকানিরা নানান পশরা সাজিয়ে বসত। হারিকেন লক্ষ্মর টিমটিমে আলোয় বেচাকেনা হত। সেই পলিথিন শিটটা একটু বড়ই ছিল। বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল চাদরের নীচে। বাকিটা গোঁজা থাকত চার দিক দিয়ে। মাঝেমাঝে বিছানাপত্র রোদে দেওয়ার সময় সেটা বেরিয়ে পড়ত। সেটায় শুধু বড়ই নয়, কাটিয়ে দিয়েছিল তার পরের তিন ভাইও।

এক টানে সেটা বের করে টন সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন টালির নীচের চেলা-বাঁশগুলোতে। যাতে বউ বাচ্চাগুলো আর না ভেজে। কিন্তু কখন যে একটু একটু করে ওটায় জল জমে ভারী হয়ে গিয়েছিল উনি বোঝেননি। হঠাৎ একটা কোণের সুতো ছিঁড়ে ঝপাত করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। লাফ দিয়ে উঠল ওদের মা, লতা। দেখল, একটুর জন্য ওরা ভেজেনি। তবে বিছানার একটা দিক ভিজে একেবারে একশা।

অগত্যা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ওদের মা কোনও রকমে খাটের নীচে গিয়ে মাথা গুঁজল। আর শ্রীহরি ওই ঝড়-জলের মধ্যেই গামছা পরে নেমে পড়লেন উঠানো। একটা একটা করে কুড়িয়ে এনে তুলে রাখলেন জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া বীজ দানাগুলো। সদ্য মাথা-তোলা চারাগুলোর ওপর চাপা দিয়ে দিলেন কাঁনা-উঁচু থালা। একটু বড়, যেগুলো হেলে পড়েছিল সেগুলো কঞ্চি দিয়ে, কাঠি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জমির সীমানা বরাবর পোঁতা দু'-চার হাত লম্বা লম্বা আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, সুপারি গাছগুলোর গোড়াতেও দলা দলা মাটি তুলে দিলেন, যাতে পড়ে না যায়। এক সময় বৃষ্টি থেমে গেল। চারাটারা সব ক'টাই টানটান হয়ে দাঁড়াল। বীজ দানাগুলো বোনা হল আবার। কিন্তু শ্রীহরি পড়লেন ধুম জুরে। জুরে ক'দিন তিনি মাথাই তুলতে পারলেন না।

তখন পারতেন। মনে জোর ছিল। ভাবতেন, ছেলেরা আছে। আর তো ক'টা দিন। এর পরেই ওরা হাল ধরবে। যাতে ওরা শক্ত করে হাল ধরতে পারে, যাতে টালির চাল ফেলে দিয়ে ঢালাই ছাদ দিতে পারে, যে ক'টা পোস্ট বসাতে হয় হোক, যাতে সেই মোড় থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে

বিজলি বাতি, যাতে মাটির তুলসী মঞ্চের জায়গায় তুলতে পারে টাইলস বসানো ছোট মনোরম মন্দির; সে জন্য কীই না উনি করেছেন।

ছোট কোম্পানির অল্প মাইনের চাকরি। তাতে ভাল মন্দ না হলেও, বাচ্চাদের মুখে কোনও রকমে দু'বেলা দু'মুঠো তুলে দেওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তার বাইরে আর কিছু করা যায় না। তাই একে-তাকে ধরে ডাকবাংলোর মোড়ের দোকানিদের পাশে একটু জায়গার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে উনি অফিস থেকে ফিরে বাচ্চাদের খেলনাপাতি নিয়ে বসতেন। হাতা, খুন্তি, দা, ছোটখাটো বাসনপত্রও রাখতেন। তার মধ্যেই জমি-বাড়ির দালালি করতেন। ছুটিছাটার দিনেও কিছু না কিছু করতেন। কখনও চুপচাপ বসে থাকেননি তিনি।

নিজেকে নিংড়ে যে দুটো পয়সা পেয়েছেন, সবটুকুই ঢেলে দিয়েছেন ছেলেদের পিছনে। কলকাতার হস্টেলে রেখে তাদের লেখাপড়া করিয়েছেন। কখনও বুঝতে দেননি দশটা পয়সা বাসভাড়া বাঁচাতে শিয়ালদহ থেকে ক'মাইল হেঁটে উনি তাদের কাছে যান। কখনও জানতে দেননি তাঁরা দুটিতে শুধু মুড়ি চিবিয়ে কী ভাবে কাবার করে দেন কত রাত। শ্রীহরির চোখে এখন মাঝে মাঝেই ভেসে ওঠে সে-সব দিনের ছবি।

সে দিন শ্রীহরিকে ভাত বেড়ে দিয়ে লতা মুড়ির বাটি নিয়ে বসেছেন। সঙ্গে গোটা চারেক লক্ষা। শ্রীহরি বাটির দিকে তাকিয়ে বউকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভাত কোথায়?

— ভাত আছে। শরীরটা ভাল লাগছে না। থেকে থেকেই জ্বর আসছে। তাই... লতা বলছিলেন। শ্রীহরি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই লতার কথা মাঝপথে আটকে গেল। শ্রীহরি শুধু বললেন, অ।

খেয়েদেয়ে উঠে লতার গায়ে হাত দিয়ে শ্রীহরি দেখলেন জ্বর নেই। পর দিনও তাই। তার পরের দিনও তাই।

শ্রীহরি বললেন, এটা তো ঠিক ভাল ঠেকছে না। প্রত্যেক মাসেই শেষের দিকে দেখি তোমার এমন হয়। তুমি একবার তা হলে শিবু ডাক্তারকে...

— তোমার না... হয়েছে একটু জ্বর, তা নিয়ে আবার ডাক্তার কবিরাজ! এমন জ্বর সবারই হয়। লতা বললেন।

— না না, অনেক দিন তো হল, রোগ নিয়ে ছেলেখেলা করো না। এর পর বিছানায় পড়লে... সংশয় প্রকাশ করলেন শ্রীহরি।

— মেয়েদের জান কই মাছের প্রাণ, বুঝলে? সহজে যায় না। দুটো দিন ভাত না খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এর জন্য আবার শুধু শুধু দু'-তিন টাকার ধাক্কা।

তখন শিবু ডাক্তারের ফি, ওষুধপত্র নিয়ে দু'-তিন টাকাই ছিল। তাও দেখাতে চাইতেন না লতা। কেন দেখাতে চায় না লতা? অনেক পরে সেটা একদিন আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীহরি। আসলে জ্বরটর কিছু নয়। মাসের শেষের ক'টা দিন চালে একটু টানাটানি চলে, তখন তো আর দুম করে বলা যায় না চাল বাড়ন্ত, তা ছাড়া শ্রীহরি ভাতের পোকা। পারলে দু'বেলাই ভাত খান। তাই সব দিক সামলাতে লতার এই বাহানা। বুঝতে পেরে বউকে একটু ধমকেই ছিলেন শ্রীহরি, চাল বাড়ন্ত হলে আমাকে বলবে, তা বলে না খেয়ে কাটাবে?

জোরে কথা বললে খতমত খেয়ে যান লতা। ছলছল চোখে মুখ নামিয়ে বলেছিলেন, বাইরে খিদে পেলে তুমি কী খাও, আমি জানি না? তুমি ওদের জন্য এত করতে পারো, আর আমি একটু করলেই... কথা শেষ করতে পারেননি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন লতা। শ্রীহরি কাছে গিয়ে লতাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

ছেলেদের জন্য গুঁরা এ ভাবেই করেছেন। ছেলেরাও একে একে পাশটাশ করে যে যার মতো দাঁড়িয়ে গেছে। বিয়ে-থা করেছে।

এক-একটা ছেলে বিয়ে করেছে। বউ নিয়ে এসেছে। আর বুড়োবুড়ি নড়েচড়ে উঠেছেন। এ বার বুঝি বাড়ির হাল ফিরল। ছোট ছোট কচিকাঁচায় ভরে উঠল ঘর। উঠোন। দামালপনায় ঠাঁদের মতিয়ে রাখল সারাক্ষণ।

শাশুড়িরা বুঝি এমনটাই চান। তিনিও একদিন নতুন বউ হয়ে এসেছিলেন। সেই ঘটনাটা মনে পড়লে হাসি পেত বহু দিন পর্যন্ত। বিয়ে হয়েছে তখনও ছ'মাস হয়নি। কী একটা কাজে ক'দিনের জন্য শ্রীহরি গেছেন কোথায়। রাতে তাঁর শোওয়ার জায়গা হয়েছে শাশুড়ির কাছে। শুয়ে শুয়ে নানা কথা হয় শাশুড়ির সঙ্গে। তত দিনে অনেকটা সহজ হয়ে গেছেন লতা। কিন্তু সেই কথাটা শুনে তাঁর সে কী লজ্জা। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যান আর কী।

কর্তা ফিরতেই গদগদ হয়ে বলেছিলেন, তোমার মা কী বলেছেন জানো? ডালপালা ছড়াতো। বলেই, ঠোঁট কামড়ে হাসতে শুরু করেছিলেন। হাসতে হাসতে ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।



শাশুড়ির সেই কথা তিনি রেখেছিলেন। পাঁচ-পাঁচটা ডাল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এ-পাশে ও-পাশে। তাই নিজে শাশুড়ি হওয়ার পর নিজের মেয়ের মতো করে বউদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন। শাশুড়ির কাছ থেকে উনি যা যা পেয়েছেন, তাই উজাড় করে দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, সেই কথাটিও। তখন কি আর বুঝেছিলেন, সেই দিনকাল আর নেই। মানুষও বদলে গেছে অনেক। ছোট বউ তো মুখের ওপর বলেই দিয়েছিল, সেই যুগ আর নেই মা। এখন হাম দো হামারা দো। একটাকেই মানুষ করতে লোকে হিমশিম খাচ্ছে, আর আপনি বলছেন... মার্কেট প্রাইস জানেন?

মার্কেট প্রাইস সত্যিই জানতেন না লতা। তাই তো যখনই এক-একটা ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি উঠেছে, তখনই নতুন আশায় বুক বেঁধেছেন। আর প্রতিবারই তা ভেঙে খানখান হয়ে গেছে।

ভেঙে গেছে দেহ। ভেঙে গেছে মন। ভেঙে গেছে স্বপ্ন।

ছেলেরা যাতে ঠিক মতো শিক্ষা পায়, নিজের বুদ্ধি দিয়ে চটজলদি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে, সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠে, সে সবার দিকে নজর দিতে গিয়ে ছেলেগুলোর দিকে তাকানোরই ফুরসত হয়নি শ্রীহরির। কী করে যে ওই ফুটফুটে শিশুগুলো হঠাৎ এত বড় হয়ে গেল, টের পাননি। তাই সাধ হয়েছিল, নাতি-নাতনিদের কাছে রেখে, ওরা একটু একটু করে কী ভাবে বেড়ে ওঠে, তা দু'চোখ ভরে পরখ করার। কিন্তু তা আর হল কোথায়!

বড় ছেলে কাজ করে মেকনে। সাহেবি ফার্ম। সকাল ন'টায় অ্যাটেনডেন্স। কলকাতায় না থাকলে হয়! মেজ ছেলে ওর বউয়ের ওপরে কিছু বলতে পারে না। বউমা নাকি বিয়ের আগেই ছেলেকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, আমি বাবা ওই পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারব না। একটু বৃষ্টি হলেই যা পাঁচপেচে কাদা।

সেজ ছেলে আবার খুব হিসেবি। সে হিসেব কষে দেখেছে, এখানে থাকলে তার যাতায়াতে যে সময় লাগবে, সেই সময় সে যদি কোনও কোম্পানির হিসেব-নিকেশ দেখে দেয়, তা হলে যা পাবে, তাতে ভবানীপুর, সল্টলেক না হলেও গড়িয়া বা সিঁথির কাছে দু'-তিন কামরার ফ্ল্যাট অনায়াসেই ভাড়া নেওয়া যায়। সুতরাং কে আর শুধু রাতে শোওয়ার জন্য এই ধকল সহ্য করে।

সেজ ছেলের এই হিসেব শ্রীহরির মাথায় ঢোকে না। গড়িয়া বা সিঁথি থেকে যদি যাতায়াত করা যায়, বারাসত থেকে করা যায় না? এখন তো শুনি আরও সুবিধে হয়েছে। ধর্মতলা থেকে নাকি দু'মিনিট পরপরই লাক্সারি বাস। একটু দাঁড়ালে সিটও পাওয়া যায়। ছু ছু করে ছোটো। ডাকবাংলোর মোড়ে আসতে কতক্ষণই বা লাগে! না কি এখানে না থাকার অন্য কোনও কারণ আছে! তখন শুধু আর টাকা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। প্রতিদিন বোঝা বহিতে হবে। না কি অন্য ভাইরা না ভাবলেও তাদের বউরা ভাবতে পারে বাড়ির লোভে আছে, সেই ভয়ে, না কি সে তার বউ-বাচ্চা নিয়ে নিজের মতো করে থাকতে চায়। শ্রীহরি এখন বসে বসে এই রকম এক-একটা কারণ হাতড়ে হাতড়ে বের করেন। অথচ কোনওটাকেই বিশ্বাস করতে মন চায় না। তার ছেলেরা এমন হতে পারে না।

সেজর পরের জনের তো আবার নাগালই পাওয়া যায় না। আজ দিল্লি, কাল মুম্বই, পরশু চেন্নাই করে বেড়াচ্ছে। অফিস থেকেই ফ্লাট পেয়েছে। ষোলোশো স্কোয়ার ফুটের। একদম ঝাঁ-চকচকে। ওর মাকে একবার নিয়ে গিয়েছিল। পরদিনই ফিরে এসে ওর মা বলেছিলেন, কী কষ্টে আছে গো ওরা, এতটুকু উঠোন নেই। জামাকাপড় শুকোতে দেবে কোথায়?

আর ছোট ছেলে? সে তো নাক সিঁটকোয়। এটা একটা জায়গা? একটা ভাল স্কুল নেই। মেশার মতো লোকজন নেই। দশটা বাজতে না বাজতেই শুয়ে পড়া। এটা কোনও লাইফ? এখানে বাচ্চাকাচ্চা রাখলে সে রকমই হবে। যত দিন মা-বাবা আছে...

মা-বাবা আছে দেখেই তারা আসে। ছোট আসে। ন' আসে। সেজ আসে। মেজ আসে। বড় আসে। আগে ঘনঘন আসত। যত দিন যাচ্ছে ওদের আসাটাও তত কমছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে থাকার সময়ও। শ্রীহরি বুঝতে পারেন, যে ছেলে যেখানে আছে, সেখানে তাদের শিকড়বাকড় ঢুকে গেছে এত গভীরে যে, ছুটহাট করে আর আসতে পারে না আগের মতো।

তবু যে ছেলেই আসে শ্রীহরি জিজ্ঞেস করেন, একা কেন রে? বউমা এল না? কেউ বলে, দেখো না বেরোতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বউ-বাচ্চা নিয়ে ছোট শালা এসে হাজির। কী করি? একাই আসতে হল। তোমার বউমা তো কবে থেকেই এখানে আসার জন্য... যে দিনই রেডি হই, একটা না একটা...

কেউ বলে, তোমার দাদুভাইয়ের সামনে পরীক্ষা তো, এখন ওদের যা চাপ...

আবার কেউ বলে, সপ্তাহে এই একটা দিনই তো ও ছুটি পায়। সংসারে হাজার রকম কাজ থাকে। একসঙ্গে দু'জন বেরোলে...

শ্রীহরি চুপচাপ শোনেন। শোনেন নাতি-নাতনিদের কথা। তারা কে সাঁতার শিখছে। কে কোন 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে প্রাইজ এনেছে। কে এ বারও ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। কার নাচের প্রোগ্রাম হয়ে গেল কলামন্দিরে।

শুধু শোনেনই। শুনে শুনেই আন্দাজ করেন তাঁর সেই ছোট্ট ছোট্ট দাদুভাই দিদিভাইরা এত দিনে কত বড় হল। কেবল ন'য়ের মেয়েটা বাদে। তাকে উনি চোখেই দেখেননি। মুখেভাতের সময় খুব করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ওরা। উনি যেতে পারেননি। অসুস্থ ছিলেন। ডাক্তার বারণ করেছিল। ন'য়েরও আর সময়-সুযোগ হয়নি ওকে নিয়ে আসার।

মাঝে মাঝে শ্রীহরির মনে হয়, ওদের আসাটাসার মধ্যে হৃদয়ের সেই টান আর নেই। আছে শুধু কর্তব্য। লোকে কী বলবে! কিংবা না এলে নয়, তাই এই আসা-যাওয়া।

ওদের এই আসা-যাওয়া আরও কমে গেছে, ওদের মা মারা যাওয়ার পর থেকে। বড় ছেলে অবশ্য ওঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। উনিই রাজি হননি।

যে ছাউনির তলায় যার সঙ্গে উনি এত কাল কাটিয়েছেন, সে চলে যেতেই সেই ছাউনি ছেড়ে কি তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব? এখানকার প্রতিটি ধূলিকণার মধ্যেই যে সে রয়েছে। রয়েছে কত কথা, কত ভালবাসাবাসি, কত স্মৃতি। যেতে গেলে এগুলো কি লতাগুল্ম হয়ে পায়ে পায়ে জড়াবে না?

ওর মা থাকতেই মেজ ছেলে চেয়েছিল বাড়িটা পাকা করে দিতে। শ্রীহরি রাজি হননি। বলেছিলেন, আর ক'দিনই বা আছি... শুধু শুধু... কী দরকার...

মা মারা যাওয়ার পর সেজ ছেলে বলেছিল, এখানে তুমি একা একা থাকবে কী করে? তুমি বরং আমার কাছে চলো...

সে কথাও উনি খারিজ করে দিয়েছিলেন। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, একটা মহীরুহকে এক জায়গা থেকে অন্য নতুন কোনও জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালে সে কি বাঁচে? বাঁচে না। আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এই চার দেওয়ালের মধ্যে যা আছে, সেগুলো নিয়েই উনি এখন বেঁচে থাকতে চান।

তাঁর সেই থাকতে চাওয়ার ইচ্ছেটা একটু একটু করে আবও বাড়িয়ে দিয়ে যায় মাসে মাসে এক-একটা ছেলে আর কখনওসখনও বউমা নাতি নাতনিরা এসে। যাওয়ার সময় হাতে গুঁজে দিয়ে যায় কিছু টাকা। যে টাকা ওরা পাঁচ ভাই মিলে দেয়। পালা করে নিয়ে আসে একেক মাসে এক-একজন। আর যে আসে, সে-ই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে যায় মরুভূমির বৃকে মরীচিকার মতো টলটলে জলের পুষ্করিণী। বলে, আমরা তো আছি। যখনই তোমার কোনও দরকার হবে, শুধু একটু খবর দিয়ো, ব্যস। খবর দেওয়ার জন্য সব ক'টা ছেলেরই ফোন নম্বর রয়েছে তাঁর কাছে। মোবাইলের তো বটেই। ল্যান্ড নম্বরও রয়েছে।

কিন্তু কে খবর দেবে! তাঁকে তাঁর বড় ছেলে যে-মোবাইলটা কিনে দিয়ে গেছে, সেটার বোতাম টিপতে গিয়ে কোনটার জায়গায় কোনটা টিপে ফেলেন, অন্য লোকের কাছে ফোন চলে যায়। ছেলেরা করলেও, কানে চেপে ধরেও সব সময় সব কথা ঠিক মতো শুনতে পান না। যেটুকু শুনতে পান, তার অনেকটাই বুঝতে পারেন না। বাইরে বেরিয়ে যে কাউকে দিয়ে ফোন করাবেন, তারও কি উপায় আছে! এমনিতেই শরীর চলে না। তার উপরে এই ঝড়-জলের মধ্যে তিনি বাইরে যাবেন কী করে! আচ্ছা, এখানে যে এত ঝড়-জল হচ্ছে, ওরা কি জানতে পারছে না... ওরা তো টিভি দেখে... ওরাও তো ফোন করতে পারে... খবর নিতে পারে, বাবা বেঁচে আছে কি না...

শ্রীহরির আফসোস হয় ছেলেদের কথা ভেবে, ওরা ভাবে টাকাপয়সাই সব। আর, দরকার ছাড়া কেউ কারও কথা ভাবে না। চোখের সামনে কেমন বদলে গেল পৃথিবীটা, না!

বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল ওঁর। এই যে একটু আগে তাঁর জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু বিছানার চাদরের মুড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করল না, ফলে দরমার ঝাঁপটা খোলাই পড়ে রইল, যদি ওই পাঁচটার একটাও থাকত, তা হলে কি জানালাটা এখনও এই ভাবে হাঁ করে থাকত? একটা হাঁক দিয়ে বললেই কি, কেউ এসে ঝাঁপটা ফেলে দিয়ে যেত না?

অথচ তাঁর ছেলেরা যখন একে একে চাকরি পাচ্ছে, তখন তাঁর সহকর্মীরাই বলতেন, তোর আর চিন্তা কী? এ বার তো তুই পায়ের ওপর পা তুলে খাবি। এত দিন যেমন কষ্ট করেছিস, এখন ভোগ করবি। ছেলে তো নয়, পাঁচটা রত্ন।

আত্মীয়স্বজনও সে কথা বলত। সামনে এ কথা বললেও ঠিক বিপরীত কথাই তাঁর কাছে আসত নানা কান ঘুরে। তাঁর ছেলেরা নাকি টাকা দিয়ে ডিগ্রি কিনছে। ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢুকছে। কেউ নাকি স্বশ্রুরের পয়সায় ছড়ি ঘোড়াচ্ছে। আরও কত কী! প্রথম প্রথম উনি খেপে যেতেন। প্রতিবাদ করতেন। বোঝানোর চেষ্টা করতেন, ব্যাপারটা তা নয়। আস্তে আস্তে ওঁর মনে হয়েছে, যারা ওগুলো বলে, তারা ঈর্ষা থেকে বলে। তিনি তাঁর ছেলেদের চেনেন। জানেন। বোঝেন।

তঁাকে যখন ওরা বলেছে, আমরা আছি— উনি জানেন ওরা আছে। সত্যিই আছে। যে-কোনও দিন, যে-কোনও সময় একটা খবর পাঠালেই ওরা ছুটে আসবে। যে-কোনও বিপদে বাঁপিয়ে পড়বে। বুক দিয়ে আটকাবে সমস্ত বাধা। সমস্ত বিপত্তি।

কিন্তু ওদের খবর দিল কে! না হলে, ঝড় তো অনেকক্ষণ শুরু হয়েছে। যেমন তাগুবনৃত্যের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে, তাতে তো অনেক আগেই এই টালির চালটাল উড়ে যাওয়ার কথা। সামনের একচিলতে বারান্দাটা তছনছ হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ জানালা দিয়ে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে তো মনে হচ্ছে সব ঠিকই আছে। তবে কি পাঁচ জন এসেই বুক পেতে দাঁড়িয়েছে? আগলাচ্ছে তাদের পৈতৃক ভিটে?

ইচ্ছে করল ওদের ডাকতে। কিন্তু যত জোরেই ডাকুন না কেন, ঝড় জলের শব্দ ছাপিয়ে তাঁর গলার স্বর যে উঠোনে, তাঁর ছেলেদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে না, এটা উনি এই বয়সেও অনুমান করতে পারলেন।

শীত শীত লাগছিল দেখে বিছানার চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছিলেন গায়ে। সেটা খুলে খাটের ওপর রেখে, নীচে রাখা জলচৌকিটায় পা দিয়ে শ্রীহরি নেমে পড়লেন মেঝেয়। ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে দেওয়াল ধরে ধরে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরে। চারিদিকে তখন তুমুল ঝড় জল। অথচ দামাল বাতাস একবারও আছড়ে পড়ল না তাঁর ওপর। তাঁর বাড়ির ওপর।

একসঙ্গে পাঁচ ছেলেকে তিনি বহু দিন দেখেননি। দেখার জন্য মনটা ভারী ব্যাকুল হয়ে উঠল। আলো-আঁধারি উঠোনের দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলেন তিনি। যে দিকেই চোখ গেল, দেখলেন, মাথা তুলে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীহরি ভাবলেন, ওরা তো মাত্র পাঁচ জন! এত হল কী করে! কাউকেই

যে চেনা যাচ্ছে না। কাকে ডাকবেন প্রথমে? ভাল করে চেনার চেষ্টা করলেন। আর তখনই বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। তারই এক ঝলক আলোয় উনি দেখলেন, কী বিশাল বিশাল তাদের দেহ। ইয়া ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথা। বাড়ির সীমানা জুড়ে প্রাণপণে তারা আগলাচ্ছে এই ভিটে। ঝড়ের দাপটে উথালিপাথালি খাচ্ছে।

শীতল বাতাসে শরীরটা শিরশির করে উঠল। তবু শ্রীহরির ঘরে যেতে ইচ্ছে করল না। কেবল অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন, চারাগুলো কেমন গাছ হয়ে গেছে!





## অন্ধের ও পিঠে

কী হল শুনবে তো, তখন থেকে খালি আসছি আসছি...

হঠাৎ তিন-চারটে থালা পড়ার শব্দ। থালাগুলো সেল্ফে দাঁড় করানো থাকে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় একটা পড়তেই বাকিগুলোও পিছলে পড়ল। — আরে বাবা, হাতের কাজটা সেরে আসব তো... রান্নাঘর থেকে ঝাঁজিয়ে উঠল রতি।

পান থেকে চুন খসলেই হল। গলা ফাটিয়ে বাড়ি মাথায় তুলবে সানাই। ‘কেন এটা হয়েছে’, ‘কই, ওটা হল না তো’, ‘মাথায় একদম কিস্যু নেই’, ‘অন্য বউদের দেখো’ আর মেজাজ চড়ে গেলে তো কথাই নেই, ‘ওহ্, কী ভুল করে যে বিয়েটা করেছিলাম’, ‘তোমরা প্রত্যেকটা ভাই-বোন সমান, সব এনার্জি নিংড়ে বাড়িতে দিয়ে এসেছ’, ‘তোমার মা-বাবা কিছুই শেখায়নি?’ আরও কী কী যে বলবে, আর তার মধ্যে যদি রতি কিছু বলে, ব্যস আগুনে ঘি। ‘তোমার জন্য আমাকে ট্রেনে গলা দিতে হবে’ কিংবা ‘একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে পালিয়ে যাব, তখন বুঝবে, বুঝলে?’ অথবা ‘অনেক হয়েছে আর নয়, এই যে যাচ্ছি, জেনে রাখো এটাই আমার শেষ যাওয়া’ গজগজ করতে করতে হাঁটা ধরবে রাস্তার দিকে। তখন রতি তার পথ আগলে দাঁড়াবে, একটু ধাক্কাধাক্কি হবে, তার পর দিব্যি-কাটাকাটি। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা যাবে আবার সব আগের মতো।

— কী হল? কথা কানে যাচ্ছে না? সানাই বেশ রুক্ষ স্বরেই কথাটা বলল। আর তখনই আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল রতি, এত চিৎকার করছ কেন?

— কেন বুঝতে পারছ না? ও তো কিস্যু জানে না।

— কী জানে না?

— কী জানে না মানে? ও তো কোনও কিছুই জানে না। বাইশটা অঙ্ক

দিয়েছি, তার মধ্যে তিনটেই ভুল। ওকে বিল সাম্ শেখাওনি?

খাটের ওপরে ছড়ানো-ছেটানো বইপত্র। তার মধ্যে ছেলে বসে। মায়ের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ছেলের মুখোমুখি খাটের সামনের চেয়ারে সানাই। মাঝখানে অঙ্ক বই আর খাতা।

রতি ঙ্গ কুঁচকে এগিয়ে এল ওদের কাছে। শেখাব না কেন, ও সবই জানে, ওই ভাবে চৈচামেচি করছ দেখে ও ঘাবড়ে গেছে। ওকে ধীরেসুস্থে করতে দাও, দেখবে, ও ঠিক পারবে।

— পারবে মানে? দিলাম তো, পারল কই? কী যে শেখাও কে জানে! ধুস্, তোমার উপর বিন্দুমাত্র ভরসা করা যায় না। কোনও যোগ্যতা নেই। সবই যদি আমাকে করতে হয়... অন্য বাড়ির বউদের গিয়ে দ্যাখো, সব করে, আমার কপালটাই এ রকম...

— আবার কপালের কী হল?

— কী হল যদি বুঝতে, তা হলে আমার আর এই দশা হত না। ধুর ধুর...

— আচ্ছা বাবা, তোমাকে পড়াতে হবে না, আমি দেখছি। তুমি বাজারে যাবে নাকি?

— বাজারে? মুখ ভ্যাংচাল সানাই। — বাজারটাজার কিস্যু হবে না। আজ শুধু পড়া।

— ঠিক আছে পড়া হবে। তুমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো তো... খুব শান্ত ভঙ্গিতে রতি কথা ক'টা বলল।

— হাঁ করে দেখছিস কী? নে, পরের এক্সারসাইজটা বের কর। ছেলেকে বলে রতির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল। তার পর দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল।

সানাই নাকি আগে এ ভাবে কথাবার্তা বলত না। এ কথা সানাইয়ের বাবা-মায়ের কাছেই রতি শুনেছে। তাঁদের ধারণা, ওর এই রুক্ষ মেজাজের জন্য দায়ী ওর ওই চাকরি। সানাই কাজ করে খবরের কাগজের অফিসে। বেলা বারোটা থেকে দু'-তিন ঘণ্টা পরপর এক-একটা শিফট হলেও ও প্রত্যেক দিন রাতেই করে। রাত মানে আটটা থেকে দুটো। এই ডিউটিতে নাকি ওর খুব সুবিধে। সারাটা দিন পাওয়া যায়। এ ছাড়া মেয়েদের ক্ষেত্রে রাত দশটা থেকে হলেও, ছেলেদের ক্ষেত্রে এগারোটোর পর ছুটি হলেই ওদের কোম্পানি

কলকাতার লোকেদের তো বটেই, শহরতলির সমস্ত স্টাফকেও গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। ও অবশ্য একটু আগেই বেরিয়ে পড়ে। একটা-দেড়টার মধ্যে বাড়ি এলেও ওর শুতে শুতে সেই দুটো-আড়াইটে হয়ে যায়। আবার সকাল হতে না হতেই ছেলেকে নিয়ে স্কুলে ছোটা। এ দিক সে দিক ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে একেবারে ছেলেকে নিয়ে ফেরা।

দুপুরে অবশ্য খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়। তবে বাপ-মায়ের ধারণা, রাতে ঠিক মতো ঘুম হয় না বলেই ওর মেজাজ দিনকে দিন এ রকম হয়ে যাচ্ছে। না হলে বিয়ের দু'মাসও কাটেনি, উকিলের উপর রাগ করে কেউ বউকে অমন কথা বলতে পারে!

কী একটা মামলা চলছিল। উকিল হিসেবে সানাই ঠিক করেছিল পাড়ারই একটা মেয়েকে। মেয়েটা মাত্র কয়েক বছর ধরে প্র্যাকটিস করছিল। কথা দিয়েছিল, সানাইকে সে জিতিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, সানাই সেই কেসে একেবারে গো-হারান হেরে গেল। যে দিন হেরে গেল, সে দিনই ও খবর পেল; যার সঙ্গে ওর কেস চলছিল, এই উকিল মেয়েটি তাদেরই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। তলে তলে যোগসাজশ হয়েছিল।

এর জেরে চলেছিল বেশ কয়েক দিন ধরে। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ হঠাৎই একা একা গজগজ করত। কেউ কিছু বলতে গেলেই খঁকিয়ে উঠত। সে দিনও বকবক করছিল, ঠিক তখনই বউ কী একটা বলতে গেছে, ব্যস। সেই যে শুরু করল, যেন সব দোষ তার বউয়েরই। আজ একে বিয়ে না করে ও যদি একটা উকিলকে বিয়ে করত, তা হলে কি সে তার সঙ্গে এ রকম করতে পারত! এই জন্য দেখেশুনে বিয়ে করতে হয়। একটা উকিলকে বিয়ে করতে না পারার আফসোস তার পরেও ওর বেশ কয়েক দিন ছিল।

— তা হলে অন্য মেয়েকেই তো বিয়ে করে পারতে। আমার সঙ্গে মিশতে গিয়েছিলে কেন?

— ভুল করেছি। ভুল। মহা ভুল। সানাইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল রতি। শ্বশুর আসেন। শাশুড়ি আসেন, কত বোঝান— জানোই তো ও কেমন। যখন মাথা গরম হয়, মুখে যা আসে বলে। আবার আধ ঘণ্টা পরেই সব ঠিক। বিয়ের আগে এত দিন মিশেছ, বোঝোনি?

রতির সঙ্গে সানাইয়ের আলাপ হয়েছিল বিয়ে হওয়ার প্রায় বছর আটেক আগে। তখনও সানাই চাকরি পায়নি। বিভিন্ন কাগজে ফ্রিল্যান্স করত। ফ্রিল্যান্স

বলতে বুক রিভিউ, ছোটখাটো সাক্ষাৎকার, কারও লেখায় তথ্য জোগানো বা অ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সমালোচনা। তেমনই একটা অফিসের বাৎসরিক প্রোগ্রাম কভার করতে গিয়ে রত্নির সঙ্গে ওর আলাপ। রত্নি ওর বাবার অফিসের ওই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিল। গান করে এসে বসেছিল সামনের রো-য়ে, সানাইয়ের পাশের সিটে। সানাই তখন উসখুস করছিল উদ্যোক্তাদের কাউকে ধরার জন্য। কারণ, অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই ও কেটে পড়বে। একটা অনুষ্ঠান সৃষ্টি দরকার। তাই রত্নিকেই বলেছিল— একটা ব্রোশিয়র পাওয়া যাবে?

ব্রোশিয়র মানে কী, সেটাই বুঝতে পারছিল না রত্নি। ও প্রথমে ভেবেছিল ব্রেসিয়ার। কিন্তু কোনও ছেলে যে অপরিচিত কোনও মেয়ের কাছে এ ভাবে ব্রেসিয়ার চাইতে পারে না, তার উপর এ রকম একটা অনুষ্ঠানে, এটা বুঝতে পেরেই সে নিশ্চিত হয়েছিল, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। তাই সে বোঝার চেষ্টা করছিল, ও ঠিক কী চাইছে, কেন চাইছে, সেটা দিয়ে কী করবে, আর এ রকম দু’-একটা কথাতেই পরিচয়টা বেশ সড়গড় হয়ে গিয়েছিল। সানাই দিয়েছিল তার ফোন নম্বর। ওর নম্বরটাও নিয়েছিল। তার পর একদিন ফোন। আবার একদিন ফোন। মাঝে মাঝে ফোন। এবং অবশেষে একদিন সাক্ষাৎ।

সানাইয়ের বাবা জানার পর বলেছিলেন, এখন যা বাজার, একজন চাকরি করে সংসার চালানো খুব কঠিন। একটা চাকরি করা মেয়ে পছন্দ করতে পারলি না?

বাবার মুখের উপরে কথা বলতে পারেনি সানাই। মাকে বলেছিল— বিয়ে যদি করি, ওকেই করব। মা অনেক বুঝিয়েছিল, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। মেয়ের বাড়ি থেকেও মৃদু আপত্তি উঠেছিল। ও কবে চাকরি পাবে, তার পর বিয়ে করবে। তুই কি অত দিন আইবুড়ো হয়ে বসে থাকবি? আর ছেলে পেলি না? রত্নিও গোঁ ধরেছিল, এত দিন মেশার পর... আর হয় না।

মাঝেমধ্যে এ ধরনের প্রসঙ্গ উঠলেও শেষ পর্যন্ত দু’বাড়িই মেনে নিয়েছিল ওদের মেলামেশা। দু’বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয়েছিল প্রায় বছর চারেক পর। যখন সানাই চাকরি পেল।

তখন পূজোর সময় রত্নিদের বাড়িতে আসে মায়ের জন্য শাড়ি, বাবার জন্য ধূতি, মেয়ের জন্য কসমেটিক সেট, সানাই আবার আলাদা করে গোপনে দেয় সোনার কানের দুল, আংটি, এটা-সেটা। এ-বাড়িতে কোনও ভাল খাবার

হলে, টিফিন ক্যারিয়ারে করে যায় ও-বাড়িতে। খালি পাত্র দিতে নেই, তাই দু'-চার দিন পর ওরা আবার ভালমন্দ করে কিছু পাঠায়। তখন কচুর লতি মাংসের চেয়েও ভাল, লোটে মাছ দিয়েই সব ভাত খাওয়া যায়। এ সব কথা সানাই-ই বলত।

ওদের বাড়ির বউদিরা ঠাট্টা করে সানাইকে বলত— তা হলে বিয়ের পর তো তোমার কোনও খরচাই নেই গো... ওই থোড়, শাক, ডাঁটা, পাতাতেই তোমার পেট ভরে যাবে। তুমি তো ঢাকার কুমির হয়ে যাবে গো। তখন এই বউদিদের কথা মনে থাকবে তো?

সানাই কোনও রা করত না। তখন রা করত না বলেই বোধহয় এখন সুদে আসলে উশুল করে নিচ্ছে। একটু এ-দিক ও-দিক হলেই, ব্যসা। এই তো সে দিন, অত রাতে অফিস থেকে ফিরে খেতে বসেই হাঁকডাক শুরু করে দিল।

প্রথম প্রথম সানাইয়ের জন্য রতি জেগে থাকত। সোয়েটার বুনত, কাঁথা সেলাই করত, বই পড়ত। কোনও কোনও দিন ঘুমিয়ে পড়ত। ও এলে দু'জনে মিলে খেত। কিন্তু বাচ্চাটা পেটে আসার পর রতির স্বশুর-শাশুড়িই রতিকে বারণ করলেন অত রাত অবধি জেগে থাকতে। — ওর কাজ থাকে তাই ও রাত করে। তুমি অত রাত অবধি না-খেয়ে বসে থাকবে কেন? হজম হবে? ওর তো অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমি ওর জন্য খাবার বেড়ে ঢাকা দিয়ে রাখবে। ও খেয়ে এঁটো তুলে কোনায় রেখে দেবে। তুমি সকালে ধুয়ে নেবে।

কথাটা শুনে প্রথমে গাঁইগুঁই করেছিল রতি, কিন্তু সানাই যখন বাবা-মায়ের কথাতেই সায় দিল, তখন থেকে শুরু হল নতুন নিয়ম। সানাই কখন আসে, হাতমুখ ধোয়, খায়, ও টেরও পায় না। টের পায় বিছানায় এলে।

সে দিন হঠাৎ সানাইয়ের হাঁকডাকে লাফ মেরে উঠল রতি।

— এটা কী করেছ, রুটি?

— অঁ্যা, কী হয়েছে?

— কী হয়েছে মানে? এ তো পুরো চামড়া। ছেঁড়াই যাচ্ছে না। এটা রুটি? সত্যি, তুমি রুটিও করতে জানো না? ধূস, একেবারেই যাচ্ছেতাই। সে দিন এমন মাংস রান্না করেছ মুখেই তুলতে পারলাম না, এমন ঝাল। বাপরে বাপ। এই তো কবে যেন লাউ-চিংড়িটা পুরো বাটি ধরে ফেলে দিতে হল। নুনে পোড়া। বলতে গেলেই... ধূর ধূর ধূর... আর সব বাড়ির বউদের দ্যাখো। এই

তো অবনীর বউ, একেক দিন একেক রকম টিফিন করে দেয়...

— তুমি কি টিফিন নাও? নিলেই করে দিতাম।

— না থাক। একটা রুটি পর্যন্ত করতে পারো না, আবার বড় বড় কথা! আরে বাবা, মেয়ে হয়ে জন্মেছ, আর কিছু না পারো, অন্তত মুখে দেওয়া যায় এ রকম রান্না তো করবে? নাঃ, এ বার দেখছি আমাকেই রান্না শিখাতে হবে। দেখি, কালকেই একটা রান্নার বই কিনে আনব।

দরজার পাশ্চাত্য হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল রতি। হঠাৎ চড়া গলায় সানাই বলে উঠল, হাঁ করে দেখছ কী? যাও। তার পর বিড়বিড় করতে লাগল, এ ভাবে চললে আমাকে না খেয়েই মরতে হবে। এর থেকে যদি একটা কাজের মেয়েকেও বিয়ে করতাম, অন্তত দু'বেলা পেট পুরে খেতে পারতাম। কী হল কী? তোমাকে যেতে বললাম না? পড়তে সে রকম ছেলের পাশ্চাত্য, বুঝতে। সুকান্ত ন'টায় অফিস যায়, ওর বউ রাত থাকতে উঠে রান্নাবান্না সেরে মেয়েকে নিয়ে সাঁতারে যায়। সাঁতার থেকে ফিরে স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে অফিসে পাঠায়। তার পর মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যায়। ওখান থেকেই সোজা নাচের ক্লাসে। ছুটিছাটার দিনেও রেহাই নেই। মেয়েকে নিয়ে যায় আঁকা শেখাতে। সেও কি এখানে? সেই কোন ধ্যাধধেড়ে গোবিন্দপুরে। সুকান্ত তো ফেরে সেই রাতে। বাজারহাট সব ওর বউই সামলায়। ওদের দ্যাখো, হতে পারবে ওদের মতো?

— দরকার নেই আমার অমন বউ হওয়ার। কথাটা বলতে বলতেই রতি একবার পিছন ফিরে দেখে নিল স্বশুর-শাশুড়ির ঘরের দিকটা।

— তা হবে কেন? একটা গাধা পেয়েছ তো, খাটিয়ে নাও। খাঁকখাঁক করে উঠল সানাই।

— তোমার সারা দিন ফাঁকা, তাই করো। না পারলে বলবে, সব করব। চিৎকার কোরো না। সুকান্তের বউয়ের মতো বউ হবে! ছিঃ, তোমার কপালে ও রকম একটা জুটলেই ভাল হত। গজগজ করতে করতে চলে গিয়েছিল রতি।

এমনিতে রতির মুখে রা নেই। এই ক'বছরে সানাইকে ও অনেকটাই বুঝেছে। ও দেখেছে, সামান্য একটা ভুল হলেই কথায় কথায় কী ভাবে সানাই টেনে আনে দুনিয়ার কথা। ছেলেকে কবে পড়াতে পড়াতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়িতে আসা সেল্‌সম্যানের কাছ থেকে রাখা প্যান্টের পিস প্রথম



ধোওয়ার পরেই কেমন এক বিঘত ছোট হয়ে গিয়েছিল। কার কথা মতো সানাইয়ের বিপদ কাটাতে কোন সাধুবাবার হাতে তুলে দিয়েছিল দু'গাছা চুড়ি। কবে ও এমন ভাবে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছিল যে, ঢাকনা খুলে দেখে ভিতরে তিন-চারটে আরশোলা। পর পর মুখস্ত বলে যায়। কিছু বাদ যায় না। উফ বাবা, মনেও রাখতে পারে...

সে বললেও রতি কিছু বলে না। কিন্তু সেটা যখন চড়তে চড়তে সানাই বলতে শুরু করে— ওকে বিয়ে করে ঠেকেছে। এর থেকে একে বিয়ে করলে ভাল হত, তাকে বিয়ে করলে ভাল হত। তখন রতি আর ঠিক থাকতে পারে না। ও-ও কথার পিঠে কথা বলে ফেলে।

প্রথম দিকে অবশ্য ও এমন ছিল না। তখন চুপচাপ চোখের জল ফেলত। রাতে সানাইয়ের উল্টো দিকে পাশ ফিরে শুত। সানাই কাছে টানতে গেলেও শক্ত হয়ে থাকত। জোর করে কাছে নিয়ে আদর করতে গেলেই ডুকরে কেঁদে উঠত।

সেই সে বার। ছেলের বয়স তখন সবে আড়াই কি তিন বছর। ধুম জ্বর। ডাক্তার চলছে। জলপাট্টি চলছে। সানাই যতক্ষণ বাড়ি থাকছে, সারাক্ষণই ছেলের পাশে। সানাইয়ের বাবা-মা'ও দু'চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। নাতির পাশে বসে থাকছেন। জোর করে ঘুমোতে পাঠালেও দফায় দফায় দেখে যাচ্ছেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ। কখনও একসঙ্গে দু'রকম। কখনও আবার একটা ওষুধের চার ভাগের এক ভাগ। তাই কখন কোন ওষুধ কতটা খাওয়াতে হবে, তার তালিকা করে সামনে টাঙিয়ে দিয়েছে সানাই। বউকে বলে দিয়েছে একেবারে ঘড়ি দেখে মিলিয়ে মিলিয়ে ওষুধ খাওয়াতে। এ সব ব্যাপারে সানাই খুব খুঁতখুঁতে। তাই ফিরে এসে চেক করে সব ঠিকঠাক মতো খাওয়ানো হয়েছে কি না। দ্বিতীয় দিন মেলাতে গিয়ে দেখে একটা ওষুধ বেশি। হিসেব করে দেখে, গতকাল দুপুরের একটা ওষুধ বাদ পড়ে গেছে। এটা দেখে তো সানাইয়ের সে কী তোলপাড়! মুখে যা এল তাই বলল। বলল, তুমি কি মা? ছি ছি ছি ছিঃ... ছেলের অসুখ। লিস্ট করে দিয়েছি। দেখে দেখে খাওয়াবে, তাও পারো না। কী পারো তুমি? কোনও গুণ নেই? উফ, যে দিকে চোখ না-দেব... এই জন্য না... আর ছেলেও হয়েছে তেমনই। একদম মায়ের মতো। অন্য সব বউকে দ্যাখো, কী সুন্দর! আর আমারটা! আজ দাঁতে পোকা, কাল পায়ে ব্যথা, পরশু বুক ধড়ফড়। একটা না একটা

লেগেই আছে। সব অসুখ কি পুষে রেখে দিয়েছিলে? যন্ত্রাসব। আরে বাবা, বিয়ের আগে ঝড়ি-কে-ঝড়ি ফুচকা নিমেষে হাওয়া। কোথায় চুরমুর, কোথায় আলুকাবলি, তখন তো কিছু হয়নি। এখন এগারোটার জায়গায় বারোটায় ভাত খেলেই তার মুঠো মুঠো অ্যান্টিসিড লাগে। একটা দিন ছেলেকে স্কুলে নিয়ে গেলে বাড়িতে ফিরেই চিংপটাং। একদম রোগের ডিপো। আর এত স্নো যে, নড়তে-চড়তে সারা বেলা।

ধূর ধূর ধূর... কী ভুল যে করেছি... সমীরের মতো আমিও যদি একটা নার্সকে বিয়ে করতাম!

এতক্ষণ ধরে চুপচাপ শুনছিল সানাইয়ের বকবক। নার্সকে বিয়ের কথা উঠতেই রতি ঝট করে সানাইয়ের দিকে তাকাল। সানাইয়ের মুখটা তখন বিরক্তিতে একশা। এর পর যখনই বউয়ের যত ভুল ধরা পড়েছে, সানাই একটার পর একটা বন্ধুর বউ, অফিস কলিগ কিংবা পাড়ার কোনও মেয়েকে সামনে তুলে ধরেছে। মুষড়ে পড়েছে এই রকম একটা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য। আর আফসোস করেছে ওই রকম একটা মেয়েকে বিয়ে করতে না পারার জন্য।

এখনও করে। রতির এখন এ সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই রতিও আজকাল মাঝে মাঝেই মুখ খোলে।

— যাও না, একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো।

সানাই মুখ বেঁকিয়ে রতির দিকে তাকাল। তার পর আবার ছেলের দিকে ফিরে বলল, কী হল? শুনতে পাচ্ছিস না? আরে বইটা খোল। এ অদ্ভুত ছেলে তো। হাঁ করে বসে থাকে। এমন থাবড়া দেব না...

— তুমি এ রকম করছ কেন? ও তো ঘাবড়ে যাচ্ছে।

— কোনও কথা বলবে না! সারা বছর কি গাব জ্বাল দিয়েছ? যখনই জিজ্ঞেস করেছি, হ্যাঁ, ও পড়ছে। আর এখন পড়াতে গিয়ে দেখছি... তুমি আমাকে ঠকিয়েছ।

— এ সব কথা বলছ কেন? বাঁধ থেকে খানিকটা জল যেন ছিটকে পড়ল।

— তোমাকে ভাল কথা বলছি, কোনও অঘটন ঘটান আগে চোখের সামনে দিয়ে সরে যাও। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।

— তা তো এখন পারবেই না। তোমাকে বোধহয় কেউ কিছু করেছে।

— একদম ফালতু কথা বলবে না। একটা বাচ্চাকে পড়াবে, সেটুকুও পারো না। আবার বড় বড় কথা। গোটা পাড়া ঘুরে এসো তো, দ্যাখো, ক্লাস টুয়ের একটা বাচ্চার জন্য কে মাস্টার রেখেছে। যত এদের করা যায়, ততই... ওঃ, কী ভুল যে করেছি। লোকে এই জন্যই একটু পড়াশোনা জানা মেয়ে বিয়ে করে। শিখা এখন স্কুলে পড়ায়। ওর বাড়ির লোকেরা কত করে মাকে ধরেছিল। তখন যদি বুঝতাম, তা হলে কি আজ আমার এই দশা হত!

— কে তোমাকে বারণ করেছিল? করলেই পারতো। রোজ রোজ এক কথা ভাল লাগে না। আমিও তো বলতে পারি, তোমার বন্ধু রতনদাকে দ্যাখো, বউ যা বলে সেটাই শেষ কথা। আজ গলার হার করে দিচ্ছে, কাল কনের দুল করে দিচ্ছে, পরশু হাতের বাউটি করে দিচ্ছে। বউকে মাথায় করে রেখেছে। তোমার মতো বউকে কে এত জ্বালায় বলো তো?

আগুনে যেন ঘি পড়ল। সপাটে বউয়ের দিকে ঘুরল সানাই। — কী বললে? এত বড় কথা! রইল তোমার সংসার। সানাই দুম করে চেয়ার ছেড়ে উঠে আলনা থেকে এক ঝটকায় পাজামা-পাঞ্জাবি নামিয়ে পরতে লাগল। ছেলেটা একবার বাবার দিকে দেখতে লাগল আর একবার মায়ের দিকে।

রতি আর সানাইয়ের প্রায়ই ঝগড়া হয়। কিন্তু ওদের ঝগড়ার সময় শ্বশুর বা শাশুড়ি কেউই আসেন না। নাতিটাকে শুধু বলে দিয়েছেন, যখনই দেখবি তোর বাবা-মা ঝগড়া করছে, তখনই আমাদের ঘরে চলে আসবি। ছেলেটা আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে ধীরে ধীরে দরজা অবধি গিয়ে এক ছুট লাগাল ঠাকুমার ঘরের দিকে।

ছেলের পিছু পিছু সানাইও পা বাড়াল দরজার দিকে। রতি এতক্ষণ দেখছিল। এ বার দরজা আগলে দাঁড়াল। — তোমার লোক হাসাতে খুব ভাল লাগে, না?

— তুমি আমাকে যেতে দেবে? ধমক দিয়ে উঠল সানাই।

— কোথায় যাচ্ছ?

— জাহান্নামে।

— তাড়াতাড়ি ফিরো।

— আবার এখানে? মাথা খারাপ? অনেক হয়েছে। আর না।

— তুমি কী বলো তো, ছেলে বড় হচ্ছে। ও সব বুঝতে পারে। ও যদি রোজ রোজ এই সব দেখে...

— দেখুক তার মা কেমন। বলতে বলতে বাঁ হাত দিয়ে এক ঝটকায় রতিকে সরিয়ে সানাই বাইরে বেরিয়ে গেল।

মাথাটা দপদপ করছে। কোন দিকে যাবে সে! মাকেরহাট ব্রিজের দিকে! না শ্মশানের দিকে! পিছন ফিরে তাকাল বার কতক। তার পিছু পিছু রতি আবার রাস্তায় বেরিয়ে আসেনি তো...

না। রতি আসছে না। আসছে একটা অটো। হাত দেখিয়ে ও তাতে উঠে পড়ল। ও দিকের ধারে বসতে বসতে সানাই দেখল, বাস স্টপেজে সুকান্ত দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যাচ্ছে ও! এটা তো ওর অফিস যাওয়ার সময় নয়! সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল আজ শনিবার। শনিবার তো ওর অফ ভে। প্রত্যেক সপ্তাহে এই দিনটা ও ওর দেশের বাড়ি যায়। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আসে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। সংসারের কাজ বলতে সারা সপ্তাহে এই একটাই। আর কোনও দায় নেই ওর। সতি, ভাগ্য করে জন্মেছে ছেলেটা! আর তার কপাল দ্যাখো! কোনও স্কুলের একটা টিচারকেও যদি সে বিয়ে করত, তা হলে আর কিছু না হোক, অন্তত ছেলের পড়াশোনার দায়িত্বটা তার উপরে ছেড়ে দেওয়া যেত। রতনের বউ তো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ায়। রতনের কথা মনে পড়তেই ওর মনে পড়ে গেল সে দিনের সেই ঘটনাটা।

রতনের বাড়ি গিয়ে দেখে, রতন ওর মেয়েকে পড়াচ্ছে। ওদের ওই একটাই বাচ্চা। ক্লাস ফোরে পড়ে। ওকে পড়াতে দেখে সানাই জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে, তুই পড়াতে বসিয়েছিস?

রতন বলেছিল, হ্যাঁ, আমিই তো পড়াই।

— তোর বউ?

— ও তো স্কুল আর টিউশন নিয়েই আছে। ভীষণ বাস্তব। একদম সময় পায় না। তাই আমিই ওকে নিয়ে বসি। মাঝে মাঝে অবশ্য ও দেখিয়ে দেয়।

রতনের এই ঘটনাটা মনে পড়তেই একটু দমে গেল সানাই। তা হলে কি শিক্ষিকাকে বিয়ে করেও লাভ নেই! নার্সকে বিয়ে করলে সেও কি শুধু হাসপাতাল আর নার্সিংহোমের রোগীদের জন্যই ছোট্টাছুটি করবে! ভাল রাঁধুনি হলেও কি তার হাত শুধু বাইরের লোকজন এলেই খুলবে! উকিলকে

বিয়ে করলে সে কি তার স্বামীর হয়ে সওয়ালের সময় ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে মনে করে গাফিলতি করবে!

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সানাই হঠাৎ খেয়াল করল, ও বাসন্তী দেবী কলেজের কাছে চলে এসেছে। ভেবেছিল শ্মশানে গিয়ে একটু বসবে। ইলেকট্রিক চুল্লি হওয়ার পর কাঠের শ্মশানটায় ভিড় এখন অনেক কম। আগে নানান ঝামেলায় কোণঠাসা হয়ে পড়লে ও শ্মশানে গিয়ে বসত। চোখের সামনে একটার পর একটা মৃতদেহকে পুড়ে যেতে দেখে অদ্ভুত একটা নির্লিপ্ত ভাব জেগে উঠত। পৃথিবীতে কেউই থাকবে না। কিছুই থাকবে না। মাত্র ক'দিনের জন্য এসেছি, তা হলে এত দ্বন্দ্ব কীসের? কীসের এত রেষারেষি!

কিছুক্ষণ বসলে মন শান্ত হয়ে যেত। শ্মশানে যে কী শান্তি! যারা যায় তারা জানে। সেই শ্মশানেই যাবে ভেবেছিল, কিন্তু কখন যে এতটা পথ চলে এসেছে ও বুঝতে পারেনি। তাই ঠিক করল, লেকের দিকে যাবে। শ্মশান যা পারে, প্রকৃতিও তাই পারে। চোখের সামনে গাছপালা, দিঘি, পাখির কিচিরমিচির, এ-দিকে ও-দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েকে দেখলে মনে হয়, এত সুন্দর এই পৃথিবী, এত ভালবাসাবাসি যেখানে— সেখানে ঝগড়া করে, রাগারাগি করে, একে-তাকে দুঃখ দিয়ে সময় নষ্ট করতে যাব কেন? এসেইছি যখন, সব উপভোগ করে যাই। যাই, জলাশয়ের পাশে বসে দু'চোখ ভরে একটু প্রকৃতি দেখি...

হেলতে দুলতে সানাই দিঘির দিকে এগোল। এখনও রোদ তেমন চড়া হয়নি। সন্ধ্যাবেলায় কেন যে মেজাজটা গরম হয়ে গেল! বাঁ দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা সাঁতারের ক্লাব। এখানে নাকি সাঁতার শেখার খুব ভাল ব্যবস্থা আছে। সুকান্ত একদিন বলেছিল। ওর মেয়ে বোধহয় এখানেই সাঁতার শেখে। ওর বউই নিয়ে আসে। সত্যি, এই একটা বউ বটে। সেই ভোর থাকতে উঠে রান্নাবান্না সেরে মেয়েকে নিয়ে এখানে আসে। যতক্ষণ মেয়ে শেখে ঠায় বসে থাকে। তার পর মেয়েকে নিয়ে ফিরেই স্বামীকে অফিসে পাঠানোর তোড়জোড়। স্বামী বেরিয়ে যেতেই আবার মেয়ের স্কুল। সুকান্তর মুখেই সানাই শুনেছে, স্কুল ছুটি হলে যে দিন টিউশন বা নাচটাচ থাকে না, সে দিন ওর বউ মেয়েকে নিয়ে একেবারে সোজা বাড়ি ফেরে। আবার নাচটাচ থাকলেও যে দিন ধোওয়া কাচা থাকে, সে দিনও কোনও রকমে মেয়েকে স্কুলে ঢুকিয়েই ফিরে আসে। হাতের কাজ সেরেই ফের ছোট্ট মেয়েকে আনতে। যে বউ

এতটাই সিনসিয়ার, সেই বউ সম্পর্কে রতি বলে কিনা, দরকার নেই অমন বউ হওয়ার! তা হবে কেন? হলে যে খাটতে হবে! স্বামীকে একটু রিলিফ দেওয়া হবে, তাই না?

সানাই লেকের পাড়ে বসার জন্য এগোতে গিয়ে দেখল, ডান দিকের গাছের আড়ালে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। মেয়েটার পরনে স্কুলের পোশাক। এই বয়সেই স্কুল কেটে প্রেম করতে শিখে গেছে। বাবা-মা নিশ্চিত, মেয়ে আমার স্কুলে গেছে।

যতটা চোখ যায়, এ গাছ ও গাছের নীচে জোড়ায় জোড়ায় সব বসে আছে। ওই তো, ওই বেঞ্চটা বোধহয় ফাঁকা। পরীক্ষার থাকলে হেলান দিয়ে বসা যাবে... ভাবতে ভাবতে কাছে যেতেই যেন ভূত দেখল সানাই। গাছের গুঁড়ির পাশ দিয়ে যতটা মুখ দেখা যাচ্ছে তাতেই ও চিনে ফেলেছে সুকান্তর বউকে। কিন্তু তার কাছ ঘেঁষে যে বসে আছে, তার শুধু পিছনটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে সেই জামা। ওই জামাটা সানাইয়ের খুব চেনা। 'তোর জামাটা বেশ সুন্দর তো' বলায় সুকান্ত বলেছিল, এটা ওর বউ কিনে এনেছে।

ওরা অবশ্য ওকে খেয়াল করেনি। দেখলে কী ভাবত! ছিঃ। মুহূর্তে পিছন ফিরে যে দিক দিয়ে এসেছিল, সে দিকেই হাঁটা দিল সানাই। কিন্তু তার পরেই ওর মনে হল, সুকান্ত এখানে আসবে কোথেকে! ও তো ওকে বাসস্টপেজে দেখে এসেছে। প্রত্যেক শনিবারের মতো আজও ও দেশের বাড়ি যাচ্ছে। তা হলে! কাছে গিয়ে দেখব! না, থাকা। যদি সুকান্তর বদলে অন্য কেউ হয়! কিন্তু জামাটা... এমনও তো হতে পারে, ওর বউ একই রকম দুটো জামা কিনে একটা দিয়েছে স্বামীকে আর একটা... এই জনাই কি রতি সে দিন বলেছিল, তোমার কপালে ও রকম একটা জুটলেই ভাল হত!

হাঁটতে হাঁটতে সানাইয়ের হাত উঠে গেল কপালে। — ভাগিাস, ও রকম একটা জোটেনি। যাই, এতটা যখন এসেইছি, বরং বাজারটা করে নিয়ে যাই। কিন্তু ব্যাগ! ওফ্, মেয়েটার না কোনও গুণ নেই। দেখল বেরোচ্ছি, বাজারের ব্যাগটা তো হাতে দিয়ে দেবে; তা নয়, সতি, একে দিয়ে কিস্যু হবে না। কিস্যু না।





## আবির যে দিন

আমাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে চিলেকোঠার ঘরে খিল তুলেছিল তোনি। আমি তো তখন রংচং মেখে ভূত। ছুটে গিয়েছিলাম ওর পিছু পিছু।

দোলের সময় আমরা প্রতিবারই মাসির বাড়ি যেতাম। মাসির বাড়ির সামনেই, রাস্তার উপরে দোলের আগের রাতে কাঠকুটো খড়টড় দিয়ে একটা টিপি মতো করা হত। লোকে বলত ‘বুড়ির ঘর’। আশপাশের লোকেরা পুজোও দিতে আসত সেখানে। অনেক রাত অবধি খোল-করতাল নিয়ে হিন্দুস্তানিরা গান করত স্যারা রা রা... স্যারা রা রা... তার পর একটা সময়ে ওটায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। সারা রাত ধরে ওটা জ্বলত। আমরা ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। আসতে ইচ্ছে করত না। তবু বড়রা প্রায় জোর করেই নামিয়ে নিয়ে আসত। ইচ্ছে করত চুপি চুপি পা টিপে টিপে ছাদে চলে যাই। কিন্তু ছাদের ছিটকিনি খুলে দেবে কে! আমরা কি অত উঁচুতে হাত পাই! বিছানায় শুয়ে শুয়েই কান খাড়া রাখতাম। আসলে মাসির বাড়ির এত কাছে ওই বুড়ির ঘরটা পোড়ানো হত যে, কাঁচা বাঁশ ফাটার ফটাস ফটাস শব্দও ঘর থেকে স্পষ্ট শোনা যেত। কী ভাল যে লাগত!

কাউকে ডাকতে হত না। দোলের দিন আমরা নিজেরাই সকাল সকাল উঠে পড়তাম। আমরা মানে, আমি আর আমার মাসতুতো ভাই ঋতপ্রভ আর ওর বোন শ্রবন্তী। আমার নিজের কোনও বোন ছিল না, শ্রবন্তীই ছিল আমার নিজের বোনের মতো। সকাল থেকেই রং গোলাবর্ণ ধূম পড়ে যেত। কোনও বালতিতে লাল রং তো প্লাস্টিকের বড় কোনও গামলায় নীল রং। আটটা বাজতে না বাজতেই আমরা নেমে পড়তাম। আমাদের যার যখন ইচ্ছে হত পিচকারিতে রং ভরে ছুটে যেতাম। যত দুষ্টমিই করি না কেন, ওই দিনটা আমাদের কেউ বকাঝকা করত না।

আমাদের সঙ্গে জুটে যেত সবস্তীর এক বন্ধু তৌনি। আমার চেয়ে বছর দুই-তিনেকের ছোট। মাসিদের কয়েকটা বাড়ির পরেই ছিল ওদের বাড়ি। দোল ছাড়া এমনিতেও যখন যেতাম, ও ঠিক চলে আসত। আমারও খুব ভাল বন্ধু হয়ে গিয়েছিল ও। শুধু কি বন্ধু! শুধু বন্ধুর জন্য কি কারও মন এমন ছটফট করে! শুধু বন্ধুকে ছোঁওয়ার জন্য কি কারও আঙুল এত নিশপিশ করে! রং দেওয়ার যে আনন্দ, তার চেয়েও যেন অনেক বেশি ছিল রং দিতে গিয়ে ওকে ছোঁওয়ার আনন্দ। তাই ওকে দেখেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম। ও-ও আমার হাত থেকে বাঁচার জন্য ছুট লাগিয়েছিল। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছিল ছাদে। চিলেকোঠায় ঢুকেই খিল তুলে দিয়েছিল।

আমি যতই দরজা ধাক্কাই আর বলি, রং নয় রে, দাখ, শুধুই আবিব। তবু কে শোনে কার কথা। তৌনির সেই একই ভাঙা রেকর্ড— না না না না।

আমিও নাছোড়বান্দা। ওকে রং না দিয়ে আমি এক পা-ও নড়ব না। আমি ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ করে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে ফের পা টিপে টিপে নিঃশব্দে উপরে উঠে এলাম। দরজার পাশে এমন ভাবে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম, যাতে ওর মনে হয় আমি চলে গেছি। কিন্তু না। অনেকক্ষণ কেটে গেলেও দরজা খুলল না ও। আমি বুঝতে পারলাম, ও-ও ঘাপটি মেরে বোঝার চেষ্টা করছে আমি সত্যিই চলে গেছি কি না।

এই রকম করে যখন অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে, ও বুঝতে পেরেছে আমি ছাড়ার পাত্র নই। তখন ও আমায় দিবা কাটিয়ে নিয়েছিল, ঠিক আছে, তা হলে একগাদা নয়, একদম একটুখানি দিবি। আগে কথা দে। তার পর দরজা খুলব।

আগে তো খলুক। আমি ওর কথাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। ও আস্তে আস্তে দরজার পাল্লা ফাঁক করে বেরিয়ে এসেছিল। তার পর চুপটি করে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমিও মুঠো থেকে আলতো করে দু'আঙুলে তুলে ওর মাথায় দিয়েছিলাম লাল আবিব। ও-একদম হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। ও বোধহয় ভাবতেও পারেনি আমি এত ধীর স্থির ভাবে ওকে রং দেব। অমন চাহনি দেখে আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলেছিলাম, এটা কিন্তু আবিব না, সিঁদুর।

হঠাৎ কী যেন ঘটে গেল। ওর চোখমুখ একেবারে পাল্টে গেল। ওর ও

রকম চেহারা আমি আগে কখনও দেখিনি। নিমেষে আমাকে পাশ কাটিয়ে দুদাড় বেগে নেমে গেল নীচে। ঘোর কাটিয়ে আমিও ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তরতর করে ওর পিছু পিছু নামলাম। ততক্ষণে সদর দরজা পেরিয়ে ও চলে গেছে ওদের বাড়ির দিকে।

ওদের বাড়িটা একতলা। রাস্তার দিকে জানালা। আমি শিক ধরে উঠে সেই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ফাঁকা ঘরে তোনি একা। বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আমি মাসির বাড়ি গেলেই, প্রথম প্রথম অবস্কার সঙ্গে যেতাম ঠিকই, কিন্তু পরের দিকে ওদের বাড়ির সবার সঙ্গে আমার এমন একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল যে, অবস্কার না গেলেও যখন-তখন আমি ওদের বাড়িতে যেতাম। কিন্তু কেন জানি না, ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের বাড়িতে ঢোকার আর সাহস হল না আমার। কে যেন পিছন থেকে আমাকে জাপটে ধরল। দু'পা আটকে গেল মাটির সঙ্গে। কোনও রকমে পা টেনে টেনে আমি ফিরে এলাম।

আমি আসতেই ঋতপ্রভ, অবস্কার থেকে শুরু করে বাড়ির বড়রা পর্যন্ত, সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগল তোনির কথা। তোনি কোথায় গেল! তোনি কোথায় গেল! বড়দের কেউ কেউ ভাবল, আমি বুঝি ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। তাই কে যেন আমাকে দেখিয়ে বলল, নিশ্চয়ই ও কিছু বলেছে, তাই রেগে গেছে। জানিস তো ও ওই রকম। কথায় কথায় রেগে যায়। তবুও... তোরা না পারিস। কথায় কথায় ঝগড়া। বেচারি একা, তাই তোদের সঙ্গে একটু দোল খেলতে এসেছিল। আর তোরা? একটা দিনও কারও সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারিস না?

আমি আর একটাও কথা বলিনি। ওরা কত টানাটানি করল, তবুও আমি আর সে দিন রং খেললাম না। শুধু ভাবতে লাগলাম, তোনি ও ভাবে চলে গেল কেন!

পরদিন খুব ভোরে আমরা চলে এসেছিলাম। সব কিছুই আগের মতো চলতে লাগল। কেবল মাঝে মাঝে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল, দোলের দিন সকালের তোনির সেই হঠাৎ করে পাল্টে যাওয়া মুখ। আর যখনই সেই মুখটা ভেসে উঠত, নিজেকে বড় অপরাধী মনে হত। ইচ্ছে করত একবার ওর সামনে গিয়ে সত্যি কথাটা বলে আসি।

তার পরেও মা কত বার কাজে-অকাজে মাসির বাড়ি গেছেন। আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছেন। আর প্রতিবারই ওর মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে কোনও না কোনও দোহাই দিয়ে 'না' করে দিয়েছি। এমনকী দোলের দিন যে মাসির বাড়ি যাওয়া আমাদের প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, পরের বছর সেই মাসির বাড়িতেও আমি গেলাম না। তার পরের বছরও না।

আসলে দোল এলেই আমার তোনির কথা মনে পড়ে যেত। টুকরো টুকরো নানা স্মৃতি মাথার মধ্যে কিলবিল করত। সেই স্মৃতি একটু একটু করে ফিকে হতে লাগল। আমি স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে কলেজে উঠলাম। কত বন্ধুবান্ধব হল। সবস্ত্রী, ঋতপ্রভরা আসত। ফোন করত। কথা হত। কিন্তু যত কথাই হোক না কেন, ভুল করেও আমি কখনও তোনির কথা তুলতাম না। ওরাও তুলত না। বছরের গোনাগুনতি যে-ক'টা দিন মাসির বাড়ি যেতাম, ওই ভাইফোঁটায়, বিজয়া দশমীতে বা অন্য কোনও উপলক্ষে, যতক্ষণ থাকতাম, একজন অপরাধীর মতো থাকতাম। ভয়ে ভয়ে কাটাতাম, এই বুঝি ও চলে এল! সেই ভয়েই কাঁটা হয়ে থাকতাম। ভুল করেও রাতে থাকতাম না। ঠিক ফিরে আসতাম। সে যত রাতই হোক না কেন।

দেখতে দেখতে মায়ের বয়স বেড়েছে। এখন আর তেমন দৌড়ঝাঁপ করতে পারেন না। ঋতপ্রভ ব্যবসা শুরু করেছে। মাসি তো আগে কোথাও যেতেন না। ছেলে গাড়ি কেনার পর এখন বরং কালভদ্রে বেরোন। আমাদের বাড়িতেও আসেন। মেসোমশাইও আসেন।

সে দিন আমি বাড়িতে। হঠাৎ মাসি-মেসো দু'জনেই একসঙ্গে এসে হাজির। সাধারণত ওঁরা দু'জন একসঙ্গে কখনও আসেন না। ওঁদের দেখেই তাই ওঁদের আসার কারণটা আমার মনের মধ্যে এক বলক উঁকি দিয়ে গেল। আসলে দিন কতক ধরেই শুনছিলাম ব্যাপারটা। তা হলে কি ঠিক হয়ে গেল!

ঠিক যে হয়ে গেছে সেটা নিশ্চিত হলাম যখন মেসোমশাই তাঁর ব্যাগ থেকে নেমস্তন্ন কার্ডটা বের করে বাবার হাতে দিলেন। সবস্ত্রীর বিয়ে। বিয়ের অন্তত দিন কতক আগে থেকেই যেতে হবে। একমাত্র মেয়ে বলে কথা। প্রচুর লোকজনকে বলা হয়েছে। নিজেদের লোক না থাকলে হয়? কে সামলাবে এ সব?

মা কথা দিয়ে দিলেন। বাবাও। আর সবস্ত্রীর বিয়ে, আমি যাব না, তা কখনও হয়! আমি তো যাবই। কিন্তু...

এই ‘কিন্তু’টা আমাকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। আবার সেই মাসির বাড়ি। আবার সেই তোনি! বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তার পর আবার মনে হল, সেই কবেকার কথা, ওর কি আর ও সব মনে আছে! হয়তো আমিই এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি। ও হয়তো কবেই ভুলে মেরে দিয়েছে। তার পরেই আবার মনে হল, ও যদি কোনও কিছুই ভুলে না থাকে! তখন? সামনা সামনি হলে আবার যদি ওর মুখ পাণ্টে যায়! না। সে মুখ আমি কিছুতেই দেখতে পারব না।

তার পর কী মনে হল, ভাবলাম, শ্রবস্তীকে একটা ফোন করি তো। মা তখন ভিতরের ঘরে ভাতঘুম দিচ্ছেন। বাবা বাড়ি নেই। আমি টপাটপ মোবাইলের বোতাম টিপতে লাগলাম।

দ্বিতীয় বার রিং হওয়ার আগেই ও ধরল। দীর্ঘক্ষণ কথা। এটা ওটা সেটা। কিন্তু আমি যার জন্য ফোন করেছি, সেটার ধারকাছ দিয়েও ও যাচ্ছে না। প্রসঙ্গে পাণ্টে যাচ্ছে মুহূর্মুহু। আসলে আমরা যতই পিঠোপিঠি হই না কেন, এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো এতটা খোলামেলা ছিলাম না। ফলে অসুবিধে হচ্ছিল। তাই আমি সরাসরি বিয়ের কথা তুললাম— তোদের বাড়িতে তো প্রথম বিয়ে, তোর সব বন্ধুদের বলেছিস? একেবারে লিস্ট করে নিমন্তন করবি। আসলে কী হয় জানিস, অনেক সময় একদম কাছের লোকই বাদ পড়ে যায়। পরে এত খারাপ লাগে। সেটা খেয়াল রাখিস। তুই লাজলিদের বলেছিস? ও, তোর এক বন্ধু ছিল, তোদের বাড়ির পাশেই থাকত, মনে পড়ছে? ওই যে রে, দোলের সময় যে তোদের বাড়ি আসত, আমরা একসঙ্গে দোল খেলতাম। কী যেন নাম মেয়েটার, কোনি না কি যেন...

— তুই নামটাও ভুলে গেছিস! কথাটা শ্রবস্তী এমন কেটে কেটে বলল, যেন শব্দ নয়, তিরের ফলা ছুড়ে দিল আমার দিকে। আমি আমতা আমতা করে বললাম, না মানে, তা নয়। অনেক দিন হয়ে গেছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, তোনি তোনি...

— এত কষ্ট করে ওর নামটা তোর মনে করতে হল!

— মানে? আমি চমকে উঠলাম।

— ও কিন্তু দেখা হলেই তোর কথা জিজ্ঞেস করে।

— তাই?

— তোর কিছু মনে নেই?

— কী বল তো?

— ও কিন্তু তোকে ছাড়া আর কারও কথাই ভাবে না। ওর বাড়ি থেকে কত বার ওকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ও বারবারই 'না' করে দিয়েছে। বলে দিয়েছে, ও আর বিয়ে করবে না।

— কেন?

— তোর মনে আছে, একবার দোলের সময় তুই ওকে আবিরের নাম করে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলি, তাই ও আর কারও সিঁদুর নাকি সিঁথিতে তুলবে না।

হঠাৎ আমার শরীরে এক শিহরন খেলে গেল। এ আমি কী করেছি! আমি তো ওকে মিছিমিছি বলেছিলাম। আসলে তো ওটা আবিরই ছিল। আর ও কিনা...

ও প্রাস্ত থেকে আরও কী কী সব বলে যাচ্ছে শ্রবস্তী, আমার কানে কিছুই ঢুকছে না। আমি শুধু সামনের কালেন্ডারটায় দেখেছি দোল আসতে আর কত দিন বাকি। এ বার দোলে আবার আমি মাসির বাড়ি যাব। যাবই। আর শুধু আবির নয়, আবিরের সঙ্গে একটু সিঁদুরও নিয়ে যাব। কিন্তু সে দিনের মতো তোনি আবার দৌড়ে গিয়ে চিলেকোঠার ঘরে খিল তুলে দেবে না তো!





চা

ঠকাস করে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে গজগজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল রোশনি— খালি চা, চা আর চা। উফ... একটা লোক রাখো, বুঝলে! তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা চা বানিয়ে দেবে।

পবন কথাগুলো শুনতে শুনতে খবরের কাগজটা টেবিলের উপর রেখে কাপটা তুলে নিল। ও কিছুতেই বুঝতে পারে না, চা করায় রোশনির এত অ্যালার্জি কেন। অথচ এফ্ফুনি বলো, দুম করে স্যাভুইচ বানিয়ে দেবে, এমন পকোড়া করবে মনে হবে পেট পুরে খাই। আর ওর হাতের আলুর পরোটার তো জবাবই নেই।

অথচ চায়ের সময়!

পবন চা-টা একটু বেশিই খায়। সকালে বিছানা ছড়ার আগে। তার পর মুখ ধুয়ে। খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে। বাজার করতে যাওয়ার আগে। বাজার থেকে এসে। এ-কাজ ও-কাজ করার ফাঁকে। স্নান করতে যাওয়ার আগে। আর যে দিন অফিস ছুটি থাকে সে দিন তো কথাই নেই, ঘণ্টায় ঘণ্টায়। যত দিন যাচ্ছে চায়ের প্রতি পবনের আসক্তি যেন ততই বাড়ছে। আসলে পান বিড়ি তো ছোঁয় না, নেশা বলতে ওই একটাই।

আরেকটা নেশা অবশ্য আছে, সেটা হল নাটক। শখেই করে। পাড়ায় একটা দলও গড়েছে। নিজেও চেষ্টা করে নাটক লেখার। সেই সুবাদে দু’চার জন আসে। কেউ কেউ আবার ঘরের লোকই হয়ে গেছে।

তেমনই একজন শিলাজিৎদা। সে দিন শিলাজিৎদার তাড়া ছিল। দুটো কথা বলেই চলে যাবে। কিন্তু খালি মুখে যেতে দেবে কে? রোশনি? মুহূর্তে এক কাপ চা নিয়ে এসে হাজির।

— ও খাবে না? চায়ের স্প্রেট হাতে নিতে নিতে প্রশ্ন করল শিলাজিৎদা।

— ওই তো কাপ। এফ্ফুনি খেল। এখনও বোধহয় গলা থেকে নামেনি।

— আরে, দেবে দেবে। তুমি চুমুক মারো না... মাঝখানে ফোড়ন কেটেছিল পবন।

— না, সত্যিই করিনি। পবনের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কথাটা উচ্চারণ করেছিল রোশনি। মুহূর্তে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল পবন। বোকার মতো একবার রোশনির দিকে একবার শিলাজিৎদার দিকে তাকাচ্ছিল।

— ঠিক আছে বউদি, একটা কাপ নিয়ে আসুন, আমরা ভাগ করে খাই। এই বেলায় এতটা চা খাব না।

— না না, থাক। পবন বললেও শেষ পর্যন্ত ভাগাভাগি করেই দু'জনে মিলে ওই চা খেয়েছিল। কথায় কথায় সে দিন শিলাজিৎদার কাছে রোশনি অভিযোগ করেছিল পবনের এই ঘনঘন চা খাওয়া নিয়ে।— ক'দিক সামলাব বলুন তো। একটা রান্না যে ঠিক মতো করব, তারও উপায় নেই। এই চা...

— বারবার করেন কেন? একেবারে বেশি করে বানিয়ে ফ্লাস্কে রেখে দেবেন। যখন দরকার হবে নিজেই ঢেলে নেবে। আপনার বউদি তো তা-ই করে।

— তাতে লাভ নেই। তখন দেখবেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা করে ফ্লাস্কে ভরতে হচ্ছে। এত চা খায়... নিজের ভালমন্দও বোঝে না। দেখুন কত চুল পেকে গেছে...

এমন করে বলল, যেন ঘনঘন চা খাওয়ার জনাই ওর চুল পেকে যাচ্ছে। না। শুধু শিলাজিৎদাই নয়, বিভিন্ন সময়ে আরও অনেকেই বলেছে ফ্লাস্কে চা করে রাখার কথা। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ফ্লাস্কে ও চা করে রাখবে না। আবার কয়েক বার করার পর, ফের চা করতে বললেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে আছড়ানো দাপড়ানোয়।

যেমন আজ হয়েছে। পবন মাঝে মাঝে ভাবে, সংসারে যদি একটা বাচ্চাকাচ্চা থাকত, তা হলে হয়তো... কিন্তু কী করা যাবে! দেখতে দেখতে বিয়ের দশ দশটা বছর কেটে গেল। তখন যদি দুম করে আলাদা না হতাম! ভাবতে ভাবতে পবন চুমুকে চুমুকে চা-টা শেষ করে তড়িঘড়ি ব্যাগটা নিয়ে বাজারের দিকে পা বাড়াল। ঠিক করল, বাজারে যাওয়ার সময় রোশনি যেগুলো আনার কথা ওকে রোজ বারবার করে বলে এবং যথারীতি ও

ভুলে যায়, আর তা নিয়ে কথা শুনতে হয়, সেগুলো ও আজ আগে আগেই কিনবে। সেই মতো ডালের বড়ি, লেটুস পাতা, গ্রামগঞ্জ থেকে আসা বউদের কাছে ঘুরে ঘুরে বকফুল আর নুরুল কেনার পর বউয়ের লিখে দেওয়া ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে ও বাজার শুরু করল।

ব্যাগ উপড় করার পর রোশনি কি আর চা না করে পারবে! পাখাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে হেলান দিয়ে চেয়ারে বসল পবন। এমন সময় রান্নাঘর থেকে কানে এল— আর দিন পেল না, আজই নিয়ে এল একগাদা বকফুল। এতগুলো ভাজাভুজি করেছে, থাকবে? যোগ নেই জিজ্ঞাসা নেই, দুম করে আনলেই হল? আমার কী? আমি করে দিচ্ছি। খাও, আর মুঠো মুঠো অ্যান্টাসিড খাও।

পবন দেখল আবহাওয়া খারাপ। স্নান করতে চলে গেল।

অফিসের কাজটুকু তুলে দিয়ে ও সোজা চলে যায় রিক্রিয়েশন ক্লাবে। ক্লাব মানে অফিসের মধ্যেই ষোলো বাই আঠারো স্কেয়ার ফুটের একটা ঘর। দেওয়াল লাগেয়া দুটো আলমারি। বড় একটা ক্যারাম বোর্ড। ক্যারাম বোর্ডটায় বিকেলের দিকে ছেলেছোকরারা খেললেও, মেঝের উপরে শতরঞ্চি বিছিয়ে প্রায় সারাক্ষণই একদল বয়স্ক লোক তাস খেলে যায়। যাদের বাড়ি ফেরার কোনও তাড়া নেই, গেলেও হয়, না গেলেও হয়। তবে এই সময়টা কেউ থাকে না। কারণ, সবাই জানে, এটা পবনের সময়। পবন রোজ এই সময়ই যায়। আজও গেল। চারটে থেকে নাটকের রিহর্সাল। কিন্তু নায়িকার রোলটা যে করছে সে একদম আনকোরা। নতুন জয়েন করেছে অফিসে। ওর সেকশন উপরে। চার তলায়। ও তিনটির মধ্যে নেমে আসে। না, কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নয়, সত্যিই ওর পাটটা ও ঠিকঠাক মতো করতে চায়। যাতে কেউ হাসাহাসি না করে। তাই অন্য কেউ আসার আগেই পবনের কাছে খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো ও জেনে নেয়।

মাত্র ক’দিনের আলাপেই বেশ খোলামেলা হয়ে গেছে মেয়েটা। একই দৃশ্য নানা ভাবে করার চেষ্টা করছিল সে। আর বারবার জানতে চাইছিল কোন ভাবে করলে ভাল হয়। কিন্তু ও দিকে একদম মন ছিল না পবনের। মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ মেয়েটাকে বলল, একটা কাজ করো তো, একটা কাগজে আমাকে দুটো লাইন লিখে দাও...

— কী লিখব?

— বলছি... বলেই, উঠে গিয়ে দেওয়াল-আলমারি থেকে তাসের পয়েন্ট লেখার খাতটা বের করল পবন। ভেতর থেকে একটা পাতা টান মেরে ছিঁড়ে, পাতাটা খাতার ওপরে রেখে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল। বুক পকেট থেকে বার করে দিল পেন। তার পর বলল, চিঠির আকারে লিখবে, বুঝেছ?

— কী লিখব? মুখ তুলল মেয়েটি।

— লেখো, পবন, পরশু ঠিক তিনটেয়, মনে থাকে যেন। লিখে নীচে নাম আর ডেট দিয়ে দাও।

মেয়েটি লিখতে লিখতে বলল, কী করবেন এটা দিয়ে?

— লেখোই না, পরে বলব।

ঝটপট করে লিখে সেই পাতা-সহ খাতা আর কলমটা পবনের দিকে বাড়িয়ে দিল মেয়েটা, এ বার বলুন।

মাথা নাড়াল পবন। আজ নয়, অন্য দিন। বলতে বলতে কাগজটা ভাঁজ করে বুক পকেটে গুঁজে রাখল।

পবনদের বাড়িতে ধোপা আসে রোববার রোববার। রোশনি তখন হাতড়ে হাতড়ে এ-আলনা ও-ওয়্যারড্রব থেকে শাড়ি, জামা, প্যান্ট টেনে টেনে নামায়। পকেটটকেট দেখে গুনে গুনে এগিয়ে দেয়।

সে দিন জামার পকেট দেখতে গিয়ে রোশনির হাতে উঠে এল ভাঁজ করা সেই পাতাটা। যেটা অফিসের ওই মেয়েটিকে দিয়ে পবন লিখিয়েছিল।

একমাত্র রোববার দিনই ওরা একসঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসে। এবং একনাগাড়ে বকবক করে যায় রোশনি। কিন্তু আজ পবনের কথায় হ্যাঁ, হুঁ, না— উত্তর দেওয়া ছাড়া প্রায় মুখই খুলল না সে।

রাতে বিছানায় উঠেও খুব একটা কথাবার্তা বলল না রোশনি। পবনও অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। তার পর পাশ ফিরে একটা হাত টানটান করে রোশনির বুকের উপরে তুলে দিল সে।

— আবার আমার দিকে কেন? ডান হাত দিয়ে পবনের হাতটা সরাতে চাইল রোশনি।

— কী হল? বুকের উপর রাখা হাতটা দিয়েই রোশনিকে আলতো চেপে ঝাঁকি দিল পবন।

— কিচ্ছু না। বলে, উল্টো দিকে পাশ ফিরল রোশনি।

— কিচ্ছু না মানে? পবন নিজের দিকে জোর করে ফেরাতে চাইল ওকে।

— যাদের কাছে যাওয়ার, তাদের কাছে যাও। নড়েচড়ে শক্ত হল রোশনি।

— হ্যাঁ, সেই জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি।

— ছাড়ো, আমি সব বুঝি। ভেবেছ, ডুবে ডুবে জল খাবে, কেউ টের পাবে না, না?

— কী বলছ? আমি তো কিচ্ছুই বুঝতে পারছি না।

— এখন তো কিচ্ছুই বুঝতে পারবে না। কাল তিনটের সময় কোথায় যাচ্ছ?

— কোথায়?

— কোথায়, না? সুশ্রী কে?

— সু...শ্রী...

— এখন তো চিনতে পারবে না। চিঠিটা দেখাব?

— ও... কাল তিনটের? তাই বলো... হ্যাঁ, সুশ্রী, আমাদের অফিসের ওই নতুন মেয়েটা গো... আসলে আমি ঘনঘন চা খাই তো, তাই কাল বলছিল, সোমবার দিন আপনাকে আমি চা খাওয়াব। দেখি, ক'কাপ খেতে পারেন। তা আমি বললাম— তুমি তো আবার চার তলায়। চা খাওয়ার জন্য অত সিঁড়ি ভাঙতে পারব না। তখন ও বলল, ঠিক আছে, আপনি রিক্রিয়েশন ক্লাবে ঢোকান আগে ওই বিহারিটার দোকানে চলে আসুন না... ঠিক তিনটের, আমি থাকব। তা আমি বললাম, যদি মনে থাকে... তখন ও বলল, এটুকু মনে থাকবে না? রুমালে একটা গিট দিয়ে নিন। আচ্ছা দাঁড়ান, একটা চিরকুট লিখে দিই। তা হলে মনে থাকবে তো? বলেই, খসখস করে ওটা লিখে দিল। কী করব? ওর সামনে তো আর ফেলা যায় না, তাই পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। আর তুমি ভাবছ...

পবনের দিকে পাশ ফিরল রোশনি। — না। তুমি ওর সঙ্গে চা খেতে যাবে না।

— কেন?

— না। বলেই পবনের বুকে মুখ গুঁজল সে।

— আসলে চা-টা তো...

— আমি তোমাকে করে দেব। যখন চাইবে, যত কাপ খেতে চাইবে, আমি করে দেব। তাও তুমি ওর সঙ্গে চা খেতে যেতে পারবে না।

— ঠিক আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো করে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল পবন। তার পর বলল, তুমি যখন বলছ... বলতে বলতে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল রোশনিকে। পবন টের পেল, বুকের ওপর একটা-দুটো জলের ফোঁটা পড়ল। সঙ্গে ঘনঘন গরম নিশ্বাস। মনে হল, রোশনি এম্বুনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে।





## মায়া-কাজল

কলিংবেল বাজতেই দরজার কাছে দৌড়ে গেল রিমি— বাবা এসেছে, বাবা এসেছে...

গোড়ালি উঁচু করে সামনের আঙুলগুলোর ওপর ভর দিয়ে লম্বা হয়ে নব ঘোরাল। দরজার একটা পাল্লা খুলতেই ও আঁতকে উঠল। চিৎকার করে দু'হাতে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে দৌড়— বাঘ বাঘ বাঘ...

দৌড় তো দিল, কিন্তু সে এখন যাবে কোথায়? ঘরে মা ছিলেন। মায়ের কোলের মতো নিরাপদ জায়গা আর কোথায় আছে! কিন্তু সেই মা-ই তো তাকে সাজাতে সাজাতে হঠাৎ হরিণ হয়ে গেছেন।

বাঘের চেয়ে হরিণ অনেক ভাল। তাই ছুটে এসে সেই হরিণকেই জাপটে ধরল সে। তার পিছু পিছু ঢুকলেন সেই বাঘটা। জুতো না খুলেই সোজা ঘরে ঢুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রিমি, ও ভাবে দৌড়ে এলে কেন?

— তুমি এসে গেছ, দ্যাখো না, সেই তখন থেকে... কথা শেষ করতে পারলেন না রিমির মা। গলা জড়িয়ে এল। জাপটে থাকা রিমির মাথায় পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন।

এর কাছ থেকে তার কাছে, তার কাছ থেকে ওর কাছে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল রিমির খবর। যে-ই তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাকেই নাকি সে কোনও না কোনও জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখির আদলে দেখছে।

আস্তে আস্তে রিমিকে দেখতে ভিড় জমতে লাগল বাড়িতে। এল পাড়া পড়শি আত্মীয়স্বজন, এমনকী তার বাবার অফিসের লোকজনও। বাবার অফিসের বস্কে দেখে ওর মনে হয়েছিল একটা ধূসর রঙের ঘোড়া। রাঙামাসিকে মনে হয়েছিল পেখমমেলা ময়ূর। পাশের বাড়ির প্রিয় বন্ধু বৃষ্টিকে মনে হয়েছিল প্রজাপতি।

কেউ কোনও কথা বললেই চোখ মুখ কঁচকে দু'হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরছে কান। কারও কথা তার কাছে মনে হচ্ছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ, কারও কথা কোকিলের কুহু কুহু, আবার কারও কথা মনে হচ্ছে সাপের হিস্ হিস্। রিমির খাওয়াদাওয়া বন্ধ। ঘুম বন্ধ। বন্ধ করে দিতে হয়েছে স্কুলও। সারাক্ষণ কী একটা ভয়ে সে সিঁটিয়ে থাকছে। আর যত দিন যাচ্ছে ততই তাকে দেখতে ভেঙে পড়ছে গোটা পাড়া। এ পাড়া, ও পাড়া, সে পাড়া। ভিড় উপচে পড়ছে বাড়িতে। সামাল দেওয়া দায়।

রিমিকে তার মা একটা ঘরে সামলাচ্ছেন। ঘরটা রাস্তার ধারে। সেই ঘরের জানালায় টানটান করে টেনে দেওয়া হয়েছে পরদা। পরদটা একটু খাটো। নীচের দিকে সরু এক চিলতে ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে ওকে দেখার জন্য সে কী ছড়োছড়ি। যেন রিমিকে নয়, একটা আজব জীব দেখতে এসেছে ওরা।

এ বলছে হাওয়া লেগেছে। ও বলছে জিনে পেয়েছে। সে বলছে মসজিদ থেকে জলপড়া এনে খাওয়াতে।

রিমির মা ইতিমধ্যেই গঙ্গাজলের ছিটে দিয়েছেন কত বার হিসেব নেই। স্নান করিয়েছেন বেশ কয়েক বার। ঠাকুরের আসনের ঘট থেকে ফুল নিয়ে সেটা ধুইয়ে খাইয়েছেন বার কতক। যে যা বলছে তা-ই করছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

অবশেষে ডাকা হল হরিপদ ওঝাকে। মেয়ে তখন ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে। ওর দু'পাশে দু'-তিনটে করে বালিশ দিয়ে উঁচু করে দেওয়া হয়েছে। যাতে পাশ ফিরতে গিয়ে পড়ে না যায়। তাকে পাহারা দিচ্ছে মাসি, পিসি, কাকি, মামি ছাড়াও পাড়ার মেয়ে বউ বুড়িরা। বয়স্ক দু'-চার জন পুরুষও রয়েছেন তাদের মধ্যে।

ফিসফাস কথায় আর শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘরটা যেন কেমন হয়ে উঠেছে।

পাশের ঘরে তখন কেবল রিমির মা বাবা আর হরিপদ ওঝা। চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি জানতে চাইলেন, এটা কখন থেকে শুরু হয়েছে।

এ ক'দিনেই একদম ভেঙে পড়া দিশেহারা রিমির মা বলতে শুরু করলেন, ওকে স্নান করিয়ে এনে জামাকাপড় পরাচ্ছিলাম, তা জামাকাপড় পরানোর আগে পাউডার-টাউডার দিয়েছি। টিপ-ফিপ পরিয়েছি, তখনও কিছু না; চোখে কাজল দিতেই ও যেন কেমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর ও রকম চাহনি আমি কোনও দিন দেখিনি। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই

এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে ও বলল, হ... রি... ণ। সেই থেকেই ও আমাকে হরিণ দেখছে। বাবাকে বাঘ দেখছে। ওকে এটা দেখছে। তাকে সেটা দেখছে। রিমির মা বেশ গুছিয়েই কথাগুলো বললেন।

— ওই কাজল পরানোর পর থেকেই? ওঝা ফের প্রশ্ন করলেন।

— হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

— ওটা কীসের কাজল? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন ওঝা।

— কীসের মানে... আসলে ওটা তো আমি পাতিনি। দিনকতক আগে এক বেদেনি এসেছিল। তার সঙ্গে কয়েকটা ঝাঁপিটাপি ছিল। সাপটাপ ছিল। মা মনসার নামে সিধে চাইল। তা আমি একটু চাল, দু'-তিনটে আলু আর একটু সরষের তেলও দিলাম। ও শিকড়বাকড় মাদুলিটাগুলি দিতে চাইছিল, আমি নিতে না চাওয়ায় ঝোলা থেকে বাটির মতো দেখতে একটা সমুদ্রের ফেনা বার করল। কচুপাতা দিয়ে ঢাকা। সেটা থেকেই একটা ছোট সামুদ্রিক ঝিনুক করে তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই কাজলটুকু রাখে। রিমি তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখিয়ে বলল, ওকে পরিয়ে। এ কাজল আর কোথাও পাবে না। বারো ভূতের মেলায় অপঘাতে মরা ডোম কন্যার খুলিতে মাহেন্দ্রক্ষণে পাতা কাজল। এ কোথাও পাবে না গো, এ কোথাও পাবে না। এটা পরালে ওর চোখ খুলে যাবে। যার চরিত্র যেমন, ও তাকে সে রকমই দেখবে। তার গলার স্বরও সেই রকমই শুনবে। তখন কি আর বুঝেছিলাম যে, এ রকম হবে... শেষের কথাগুলো কেমন কেঁপে কেঁপে গেল। আঁচলের কোণ দিয়ে চোখের কোল মুছতে লাগলেন রিমির মা।

— কোথায় সেটা? দেখি। ওঝা চাইতেই রিমির মা তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন ড্রেসিং টেবিলের কাছে। বেদেনির দিয়ে যাওয়া কাজলের ঝিনুকটা ড্রয়ার থেকে বার করে এনে ওঝার হাতে দিলেন।

ওঝা ঝিনুকটা এ দিক ও দিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলেন। তার পর তিন বার ফুঁ ফুঁ করে বাঁ হাতে ঝিনুকটা ধরে ডান হাতের মাঝের আঙুলটা তিন বার কাজলে ঠেকিয়ে নিজের চোখে দিলেন। চোখে দিয়ে হাত নামাবার সময়টুকুও পেলেন না। কয়েক বার পিটপিট করেই বড় বড় হয়ে উঠল তাঁর চোখ। একবার রিমির বাবার দিকে তাকালেন, একবার মায়ের দিকে। রিমির বাবাকে ওঝার মনে হল মোরগ। মাকে খরগোশ। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ঝোলাবুলি ফেলেই দ্রুত হাঁটা দিলেন সদর দরজার

দিকে। যেতে যেতে বাঁ দিকের ঘরে চোখ পড়ল তাঁর। লোক নয়, ওঝার মনে হল, গভীর জঙ্গল থেকে একটা একটা করে জন্তু-জানোয়ার তুলে আনা হয়েছে এখানে। আর এক মুহূর্ত নয়, দরজা হাট করে খোলাই ছিল, বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দড়াম করে পাল্লা দুটো টেনে তিরবোগে ছুটতে লাগালেন তিনি।

ওঝার পিছু পিছু ছুটে গেলেন রিমির বাবা। তার পিছু পিছু রিমির মা। পাশের ঘরে ছিল যারা, দৌড়াদৌড়ি দেখে তারাও বেরিয়ে এল পথে। ওঝা ততক্ষণে অনেক অনেক অনেক দূরে চলে গেছেন। ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ওঁর সঙ্গে ছুটে কি আর রিমির বাবা-মা পারবেন? কিছুটা গিয়ে ফিরে আসতে লাগলেন ওঁরা। আর ভাবতে লাগলেন, ওঝার হাতেই তো রয়ে গেল কাজলের সেই ঝিনুকটা। তবে কি এই কাজলটার জন্যই এত কিছু? এখন তো রিমি ঘুমিয়ে আছে, তা হলে কি আলতো হাতে আশু আশু করে ওর চোখের কোল থেকে মুছে দেবেন কাজল?

ভাবতে ভাবতেই রিমির ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন ওঁরা। রিমির বাবার বুকে তখন কাঁটার মতো খচখচ করে বিধছে একটা সংশয়, ওঝার হাতের ওই ঝিনুকটা যদি পড়ে যায় কিংবা ওঝা নিজেই যদি ফেলে দেয় ছুড়ে আর সেটা কুড়িয়ে পেয়ে আবার যদি কেউ চোখে দেয়? তখন?



## ডাক্তার প্রবুদ্ধ আর জংলি

তড়িঘড়ি তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন ডাক্তার প্রবুদ্ধ। পরনে আলখাল্লা গাউন। গাউনের পকেটে কতকগুলো ব্ল্যাক্স ক্যাসেট আর বুকের সঙ্গে চেপে ধরা একটা নতুন হ্যান্ডিকাম ক্যামেরা। কিন্তু যার জন্য সন্ধ্যাবেলায় এই ঘরে আসা, সেই জংলিই নেই। তার শুকনো ঘাসপাতার বিছানাটা ওলটপালট। তিনি না ডাকলে তো ও কখনও দরজা খোলে না। তা হলে এত সকালে ও গেল কোথায়!

ডাক্তার প্রবুদ্ধ খুব নামকরা ডাক্তার। তবে তিনি যত বড় ডাক্তার, তার চেয়েও বড় গবেষক। গবেষণার জন্য বহু বার তিনি জীবন বাজি রেখেছেন। প্রচণ্ড খামখেয়ালি। কেউ কেউ আড়ালে তাঁকে পাগলা ডাক্তারও বলেন। ফলে কে আর তাঁর সঙ্গে ঘর করবেন! তাই সারা জীবন বিয়েই করলেন না তিনি। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া এই বিশাল দোতলা বাড়িটায় তিনি একাই থাকেন। সব সময়ের কাজকর্মের জন্য একজন আছে ঠিকই, তবে সে থাকে নীচতলার একটা ঘরে। ঝাড়পোছ বা খাবারদাবার দেওয়ার সময় ছাড়া উপরে খুব একটা দেখা যায় না তাকে। কারণ, তার গৃহকর্তা দিনের বেশির ভাগ সময়ই মেতে থাকেন গবেষণার কাজে। নতুন নতুন কী ওষুধ আবিষ্কার করা যায়, এই মুহূর্তে পৃথিবীর যা আবহাওয়া, আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছর পরে সেটা আরও কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, আর তা থেকে কী কী রোগের উৎপত্তি হতে পারে; সেই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আগাম কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এবং সেই রোগে কেউ আক্রান্ত হলে, তাকে কী ওষুধ দিলে সে সেরে উঠতে পারে, এ সব নিয়েই মশগুল থাকেন তিনি। আর এর জন্য তিনি কোথায় না যান! যান অত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ে। পাহাড়ি ঘাম চৈছে তুলে আনার জন্য। যান ঝরনার উৎপত্তিস্থলে। সেখানে পাহাড় ভেদ করে যে বুদ্ধ বেরোয়, তাতে ভেসে বেড়ায় এক ধরনের পাহাড়ি

ফুলের গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা রেণু। তিনি সেটা ছেকে তুলে নিয়ে আসতে যান। যান গভীর জঙ্গলে। খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসেন দুর্মূল্য সব শিকড় লতাগুল্ম। এ সব দিয়ে তৈরি করার চেষ্টা করেন নিত্যনতুন ওষুধ। এবং তাঁর এই গবেষণা ফলাও করে ছাপাও হয় দেশ-বিদেশের নামকরা সব মেডিক্যাল জার্নালে।

খুব ছোটবেলায় তিনি একবার একটা বইতে পড়েছিলেন, আমাদের ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবাদপুরুষ ধন্বন্তরির কথা। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ চরক সংহিতার কথা। তাতে তাঁর মনে হয়েছিল, এঁরা যখন ওই সময়েই এত দূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন, তা হলে তাঁদের আগের প্রজন্ম, অর্থাৎ এঁদের যাঁরা পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁরাও তো খুব একটা কম কিছু নন। তাঁরাও নিশ্চয়ই অনেক কিছু করেছিলেন।

পরে, অনেক পরে, যখন তিনি ডাক্তার হয়ে গেছেন, তখন হঠাৎ একদিন কোথা থেকে যেন তাঁর মাথার মধ্যে আবার উদয় হল সেই ভাবনাটা। তখনকার চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন ছিল! তখনও নিশ্চয়ই অপারেশন করা হত! কিন্তু কী দিয়ে! সেগুলো কি কেউই লিখে রেখে যাননি! এটা আবার হয় নাকি! কেউ না কেউ নিশ্চয়ই লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু কে? এবং এখন সেগুলো কোথায়! ওগুলো যদি উদ্ধার করা যায়, তা হলে তো অনেক মারণ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য এগুলো আবার নতুন ভাবে নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে, সেই চিকিৎসা পদ্ধতিকে আজকের উপযোগী করে ব্যবহার করা যায় কি না! কিন্তু সেই পুঁথিগুলো কোথায়!

তিনি যখন এ রকম ভাবছেন, খোঁজখবর করছেন নানা পুরনো পুঁথির, ঠিক তখনই তিনি টের পান, সে সময় চিকিৎসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে ছিল তন্ত্রমন্ত্র, জ্যোতিষ এবং ভবিষ্যদ্বাণী। আর সেই সঙ্গে তিনি খোঁজ পান একটা অদ্ভুত গাছের। এ গাছের শিকড় দিয়ে নাকি একবিংশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর এক হাজার একশটি মারাত্মক অসুখ নিরাময় করা যাবে। সে গাছ দেখতে কেমন, তার পাতার আকার চৌকো না গোল, সে পাতা হাতে নিয়ে ডললে কী রকম গন্ধ বেরোয় এবং সেই গাছ পৃথিবীর কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, তারও একটা তালিকা তৈরি করে ফেললেন ডাক্তার প্রবুদ্ধ।

তবে সে সব পুঁথি থেকে তিনি যে সব দেশ এবং জায়গার নাম পেলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সব নাম বহু আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে, এখন



আমরা যে নামে যে দেশ, নদী বা পাহাড়কে চিনি, এর আগে তার নাম কী ছিল, তার আগে কী ছিল এবং তারও আগে কী ছিল, এই ভাবে খোঁজ করতে করতে তিনি একদিন পেয়ে গেলেন তিব্বিা জঙ্গলের সন্ধান। না, আন্দামানের এই জঙ্গলটির সন্ধান তাঁকে কেউ দিতে পারল না। এমনকী ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারাও না। তারা নাকি এ রকম কোনও জঙ্গলের নাম এর আগে কখনও শোনেইনি। তাই তিনি একাই রওনা হয়ে গেলেন সেই জঙ্গলের উদ্দেশে।

কিন্তু জঙ্গল তো দূরের কথা, লোকালয় ছাড়িয়ে তিনি নির্জন জায়গায় পা রাখতেই তাঁকে আটকালেন সেখানকার প্রহরীরা। সরকারি অনুমতি ছাড়া নাকি ওখানে ঢোকা নিষিদ্ধ। কারণ, পৃথিবী যতই আধুনিক হোক না কেন, ওখানকার বাসিন্দারা নাকি এখনও সেই আদিমই রয়ে গেছে। জঙ্গলেই থাকে। পোশাকআশাক পরে না। জন্তু-জানোয়ার শিকার করে খায়। ওদের উন্নত করার জন্য সরকার থেকে প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

কিছু দিন আগে পাঁচ ছ'জনের একটি দল ওদের অঞ্চলের কাছাকাছি গিয়ে রান্না করা প্রচুর খাবারদাবার, পোশাকআশাক এবং কয়েকটা রেডিও আর টর্চ রেখে এসেছিলেন। দূর থেকে দূরবিন দিয়ে দেখছিলেন কেউ আসে কি না। হঠাৎ দেখলেন, একদল জংলি মানুষ কোথা থেকে ঝপ করে এসে সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিল। এটা দেখছে, ওটা দেখছে। তার পর ড্রামের মুখ খুলে সেই খাবারগুলো মুখে দিল। মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল সব। জামা কাপড়গুলো হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে কেউ দাঁত দিয়ে, কেউ আবার টেনে হিঁচড়ে কুটিকুটি করে ছুড়ে ফেলে দিল। তার পর রেডিওগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটার নব ঘুরে যেতেই সেটা চালু হয়ে গেল। আর সেটা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে মানুষের গলা বেরিয়ে আসতেই ওরা এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তার পর পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে সেটা ভেঙে দেখার চেষ্টা করতে লাগল ভিতরে কত ছোট মাপের মানুষ আছে। কিন্তু সেটা ভেঙেও ভিতরে কাউকে না পেয়ে ওরা রেডিওগুলো ফেলে দিল। আর টর্চ? বোতাম টিপতেই সেগুলো জ্বলে উঠেছিল দেখে ওরা আঁতকে উঠেছিল। সূর্য ওদের আরাধ্য দেবতা। তাকে এ রকম ছোট্ট একটা জায়গায় বন্দি করল কে? সামনে নিশ্চয়ই ঘোরবিপদ। তাই দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য ওরা টর্চগুলোকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল নদীর কাছে। তার পর

সেগুলো ছুড়ে ছুড়ে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল।

ফেরার সময় ওই দলের এক মহিলা আচমকা ওদের সামনে পড়ে গিয়েছিলেন। ওরা ওই মহিলার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল মহিলাটির গায়ে এত সুন্দর ছাপা রং এল কোথা থেকে। শরীরে থাকলেও সেগুলো আবার আলাদা! কী এগুলো! দেখার জন্য ওই মহিলার শরীর থেকে সালোয়ার কামিজ টেনে টেনে ছিঁড়ছিল। এর পরে হয়তো চামড়াও ছিঁড়তে শুরু করবে। এই ভয়ে দলের বাকি লোকগুলো দূর থেকেই পটকার সলতেতে আগুন ধরিয়ে ওদের দিকে ছুড়ে দিয়েছিল। পটকার শব্দে ওদের সে কী দৌড়। ভাগ্যিস ওই মহিলা শীতের ভয়ে একটার উপরে আর-একটা সালোয়ার কামিজ পরে গিয়েছিলেন।

ওরা নাকি এই সভ্যতাকে খুব ভয় পায়, ভয় পায় না ঘৃণা করে কে জানে! ওখানে কেউ গেলে তাঁর জীবন-সংশয় হতে পারে। তার থেকেও বড় কথা, ওদের নিরুপদ্রব শান্তির জগতে এই সভ্য মানুষেরা থাবা বসাস্ছে ভেবে, ওরা খেপে যেতে পারে। আর ওরা খেপে গেলে যে তার পরিমাণ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, সরকারি মহাফেজখানায় তার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা পর্যন্ত ওখানে ঢুকতে সাহস পেত না।

ওদের বিষ মাথানো এক-একটা তিরের ফলা হঠাৎ কোন গাছপালার ফাঁকফোকর থেকে এসে যে বিঁধবে, কে জানে! আর বিঁধলেই অবধারিত মৃত্যু। তাই ওখানে যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের নো পারমিশন।

অনুমতি না পেলে কী হবে, তিনি নাছোড়বান্দা। যাবেনই। ওই শিকড়-বাকড় তাঁর চাইই চাই। অগত্যা প্রহরীদের বুঝিয়েসুজিয়ে হাত করে রাতের অন্ধকারে তিনি ঢুকে পড়লেন সেই জঙ্গলে। কিছুটা যাওয়ার পরেই দেখলেন, ক'হাত দূরেই উজ্জ্বল একটা আলো। আলো মানে ইলেকট্রিকের আলো নয়, আগুনের আলো নয়, এমনকী দিনের আলোর মতো সূর্যের আলোও নয়। এ এক অদ্ভুত মায়াবী আলো। খানিকটা জ্যোতিষ্কের মতো। নরম নীলাভ।

তিনি ছোটবেলায় শুনেছিলেন, সাপের মাথায় মণি থাকে। অনেক সময় গভীর জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে যখন কিছু দেখা যায় না, তখন নাকি সাপেরা তাদের মাথা থেকে সেই মণি বাইরে বার করে আনে। তাতেই চার দিক আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। কথায় আছে, সাত রাজার ধন এক মানিক। ডাঙার প্রবুদ্ধর সন্দেহ হল, তবে কি এটা সে রকম কোনও মানিক!

নীচে কোমর-সমান ঘন জঙ্গল আর উপর থেকে নেমে আসা গাছের ডালপালা সরিয়ে সরিয়ে তিনি যখন ওই আলোর কাছাকাছি পৌঁছলেন, সামনে তাকিয়ে একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। সাপ নয়, বাঘ নয়, এ এক অদ্ভুত জীব। সেই যে ভগবান বিষ্ণুর এক রূপ ছিল— নরসিংহ। সেটা যদি নরসিংহ হয়, তবে এটা নরকুমির। না মানুষ, না কুমির। বিশাল চেহারা। হাতির চেয়েও বড়। গা দিয়ে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। তবে কি এটা ডাইনোসরের কোনও প্রজাতি! এ রকম কোনও প্রাণীর কথা তো তিনি এর আগে কোনও দিন শোনেননি। আর ছবি? নাঃ, এ রকম কোনও প্রাণীর ছবি তিনি সত্যিই কখনও দেখেননি।

কয়েক পলক মাত্র। হঠাৎ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটা। তিনি চিৎকার করে উঠলেন। ওই আলোতেই মনে হল, সামনের প্রকাণ্ড গাছের মাথা থেকে বটগাছের ঝুরি বা কোনও লতানো ডাল ধরে কেউ একজন ঝড়ের বেগে নেমে আসছে। ততক্ষণে ওই অদ্ভুত জীবটা প্রকাণ্ড হাঁ করে ফেলেছে। এম্ফুনি কামড়াল বলে। ভয়ে এক হাতে মুখ ঢেকে, অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। যেন হাত দিয়ে ঠেকানো যাবে তাকে। আর হাত বাড়িয়ে দিতেই কামড় বসিয়ে দিল সে। ছিন্ন হয়ে গেল হাত। এ বার তাঁর মাথা গিলে ফেলার জন্য হাঁ করতেই ঝড়ের বেগে নেমে আসা লোকটা গাছের একটা ডাল নিয়ে তার মুখের সামনে নাড়াতেই সে দৌড় দিল। জঙ্গলের মধ্যে দূরে, আরও দূরে যেতে যেতে গাছ-গাছালির আড়ালে মিলিয়ে গেল আলোটা।

চার দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন তিনি। হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। হাতের দিকে তাকিয়ে উনি দেখলেন কাঁধ থেকে হাতের একটুখানি মাংস ঝুলছে। তার মানে পুরো হাতটাই খেয়ে ফেলেছে ওই জন্তুটা। কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা! কুঁকড়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু আগুনটা ধরাল কে? সামনে তাকাতেই দেখলেন, একটা লোক— না, লোক নয়, ছেলে, বছর সতেরো-আঠারোর একটা ছেলে কতকগুলো পাতা চিবোচ্ছে। সেই চিবোনো পাতাগুলো মুখ থেকে বার করে হাতে নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। কালো কুচকুচে গায়ের রং। সারা মাথা জুড়ে কোঁকড়ানো চুল। পরনে গাছের পাতা। তাঁর দিকে আসতে আসতে নিচু হয়ে কী যেন তুলল সে। কী ওটা! হাত না! হ্যাঁ, হাতই তো! তাঁরই হাত। তা হলে তাঁর হাতটা ওই জন্তুটা দাঁতে কেটেছিল ঠিকই, কিন্তু খাওয়ার আগেই সামনে জলজ্যান্ত আস্ত একটা মাথা দেখতে

পেয়ে সে বুঝি আর লোভ সামলাতে পারেনি। ওই কাটা হাতটা উগড়ে দিয়েই মাথা খাওয়ার জন্য হাঁ করেছিল সে। ছেলেটা অবশ্য ততক্ষণে কী একটা গাছের ডাল ভেঙে তার মুখের সামনে নাড়তেই সে দে ছুট।

ছেলেটা সেই কাটা হাতটা তুলে নিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। আগে তাঁর হাত যেমন ছিল, ঠিক সেই মতো হাতটা কাটা জায়গায় সেট করল সে। তার পর ইশারা করে ডাক্তার প্রবুদ্ধকে অন্য হাত দিয়ে তাঁর কাটা হাতটাকে ওই ভাবেই ধরে রাখতে বলল। ডাক্তার প্রবুদ্ধ ওর কথা মতো হাতটা ধরতেই চিবোনো পাতাগুলো নিংড়ে সে তার রস ফেলতে লাগল হাতের জোড়া লাগানো অংশটায়।

কী করছে ছেলেটা! এত বড় ডাক্তার তিনি। তিনি জানেন, কারও শরীরের কোনও অংশ কেটে একেবারে দুটুকরো হয়ে গেলে তা জোড়া লাগানো কোনও সাধারণ মানুষের কন্ম নয়। তার থেকেও বড় কথা, চার ঘণ্টার মধ্যে হলে হয়তো সম্ভব। কিন্তু তার জন্য দরকার অত্যাধুনিক একটি অপারেশন থিয়েটার। এবং অবশ্যই একজন দক্ষ শল্য চিকিৎসক। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি দেখলেন, ওই পাতাগুলির রস পড়তেই তাঁর বাথা কয়েক মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। এবং আরও অদ্ভুত ব্যাপার, কাটা হাতটাও কী করে যেন জুড়ে গেল। শুধু জুড়লই না, এমন ভাবে জুড়ল, খানিক আগেই যে হাতটা দুটুকরো হয়ে গিয়েছিল, তার কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। এটা কি কোনও চিকিৎসা! না কোনও জাদু। না কি মিরাকল!

সেই প্রথম তিনি দেখেছিলেন ছেলেটাকে। একেবারে জংলি সে। তাই তিনি তার নাম দিয়েছিলেন জংলি। এবং বুঝেছিলেন, এত দিন এত দেশে চিকিৎসার এত কোর্স করে তিনি যা শিখেছেন, তা এই জংলির কাছে নসি। তাই তখনই ঠিক করলেন, এই জংলির কাছেই তিনি এই জংলি চিকিৎসার তালিম নেবেন। একজন অন্য জনের ভাষা না বুঝলেও আকার-ইঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে তারা ভাব বিনিময় করতে লাগল।

পরদিন সকালে যখন জংলির সমাজের লোকেরা দেখল, জংলি একটা সভা মানুষকে ঠাঁই দিয়েছে, তখন ওদের মধ্যে কানাকানি শুরু হল। শুরু হল গুঞ্জন, প্রতিবাদ। ওদের সমাজের প্রধান জানগুর বসলেন দাওয়ায়। সব অভিযোগ শুনলেন। এবং বললেন, সূর্য ডোবার পরে তিনি বিধান দেবেন। বিধান যে কী দেবেন, জংলি তা জানত। তাই সে কথা ডাক্তার প্রবুদ্ধকে

আকার-ইঙ্গিতে বোঝাতেই ডাক্তার প্রবুদ্ধ বললেন, তা হলে কী করা যায় এখন?

জংলি বোঝাল, একমাত্র উপায় পালানো।

— কিন্তু পালাব কী করে?

— তারও পথ আছে। আমি তোমাকে ঠিক লোকালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব।

— আর তুমি?

— আমার জন্য চিন্তা করো না।

— তার মানে? ওরা যখন জানতে পারবে, পালাবার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, শুধু সাহায্য নয়, আমাকে একেবারে লোকালয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছ, তখন কি ওরা তোমাকে ছাড়বে?

— না।

— তবে?

— তা হলে আমি কী করব?

— তুমি আমার সঙ্গে চলো।

— কোথায়?

— আমার বাড়িতে। যেখানে আমি থাকি।

— তোমাদের সমাজ কি আমাকে মেনে নেবে?

— মানবে। খুব মানবে। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

সে দিন দুপুর বেলাতেই জংলির সঙ্গে তিনি গা ঢাকা দিলেন। জংলি সত্যিই জংলি। দরকারি সব জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে ডাক্তার প্রবুদ্ধর ব্যাগে ঠেসেঠুসে কী সব ডালপালা, শিকড়বাকড় ভরে নিল সে। অত ভারী ব্যাগ পিঠে নিয়ে কেউ কি অত জোরে ছুটতে পারে! তবু সে ছুটছে। আর তাঁর তো ঝাড়া হাত পা! তবু তিনি তার সঙ্গে পারছেন না! তিনি পারছেন না দেখে জংলি তাঁকে সতীর মৃতদেহের মতো কাঁধে ফেলে শিবের মতো হাওয়ার গতিতে ছুটে চলল। এ ডাল ও ডাল ধরে খানিকটা শিম্পাজিদের মতোই প্রায় উড়ে উড়ে। ডাক্তার প্রবুদ্ধর প্রাণ যায় আর কী!

অবশেষে রাত থাকতে থাকতেই ওরা লোকালয়ে এসে পৌঁছল। ডাক্তার প্রবুদ্ধ তাঁর হোটেলের রেখে যাওয়া বাস থেকে জামাকাপড় বার করে পরিয়ে দিলেন জংলিকে। তার পর পোর্টব্লেরার হয়ে সোজা দমদম।

যতই পোশাক পরুক আর ডাক্তার প্রবুদ্ধকে দেখে দেখে নকল করার

চেষ্টি করুক না কেন, ডাক্তার প্রবুদ্ধ বুঝতে পারছিলেন, লোকালয়ে আসার পর থেকেই লোকজন তাঁদের দেখছে। বিশেষ করে জংলিকে। আর সেই দেখাটা আরও চোখে পড়ছিল দমদমে নামার পরে। তাই তিনি ঠিক করলেন, ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রথমে কয়েক দিন তালিম দেবেন সভ্য সমাজের মানুষেরা কী ভাবে চলাফেরা করে, কী ভাবে খাওয়াদাওয়া করে, কেমন করে কথা বলে, সে সব।

সেই মতো তাকে কথা শেখাতে গিয়েই যত বিপত্তি। ও যখন মুখ খুলল, সে আওয়াজ এত জোরে হল যে, ম্যাক্সিমাম ভলিউমে মাইক চালালেও সে আওয়াজ ওর কাছে হার মানতে বাধ্য। আশপাশের বাড়ির দোতলা তিন তলার জানালা খুলে গেল। লোকজন উঁকি মারতে লাগল। ঝুলবারান্দায় এসে ভিড় করল লোকজন। দু’-একজন কলিং বেল টিপল। আর ডাক্তার প্রবুদ্ধর কানে এমন তালা লাগল যে, তাঁর মনে হল, বাকি জীবনটা বৃষ্টি তাঁকে কালা হয়েই কাটাতে হবে।

দু’হাতে কান চেপে তিনি বসে পড়তেই জংলির কী মনে হল কে জানে, সে তার জঙ্গল থেকে বয়ে আনা গাছগাছালির কয়েকটা পাতা হাতের তালুতে পিষে তার রস ডাক্তার প্রবুদ্ধর দু’কানের লতিতে মাখিয়ে দিল। আর অমনি ডাক্তার প্রবুদ্ধর চোখ চকচক করে উঠল। কানের তালা লাগা তো ছাড়লই, উপরন্তু তাঁর শ্রবণশক্তি এত বেড়ে গেল যে, দশ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে কেউ ফিসফিস করে কথা বললেও তিনি তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন।

কী পাতা এটা? কোন গাছের? এ সব যদি জংলিটার কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায় তা হলে তো চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা মিরাকাল ঘটিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু আর কী কী জানে ছেলেটা? কী কী? কোন কোন গাছপালা আছে তার সঙ্গে? এ কথা তাকে বোঝাতেই ডাক্তার প্রবুদ্ধকে সে নিয়ে গেল তার ঘরে। যে ঘরটায় ডাক্তার প্রবুদ্ধ তার থাকার ব্যবস্থা করেছেন।

সে ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন, খাটে যেমন বিছানা বালিশ পাতা ছিল, তেমনই আছে। মেঝের এক দিকে কিছু ঘাসপাতা ছড়ানো। ওগুলো কী? ওর কাছে জানতে চাইতেই ও যা বলল, তা শুনে অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তার প্রবুদ্ধ। ও নাকি ওখানেই শোয়। এই গাছপাতার উপরে শুলে নাকি প্রচণ্ড গরমেও মনে হবে শীতকাল। আর যত ঠান্ডাই পড়ুক না কেন, মনে হবে হেমন্ত কাল। না ঠান্ডা, না গরম। আর বালিশ?



জংলির চোখেমুখে বিস্ময়। বালিশ কেন? শোওয়ার সময় শরীর থেকে মাথা যদি একটু উপরেই রাখার দরকার হত, তা হলে যিনি আমাদের বানিয়েছেন, তিনি সে ভাবেই আমাদের তৈরি করতেন। মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম এল, তখন কি সে মাথায় বালিশ দিয়ে শুত। তোমরা মাথার নীচে ও সব দিয়ে শোও বলেই তো তোমাদের শরীরে এত ব্যামো। একটা বয়সের পরেই ঘাড়ে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা। একটু হাঁটুতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ো।

জংলি যখন এ সব বোঝাচ্ছে, ডাক্তার প্রবুদ্ধ তখন গলায় ঝোলানো চশমাটা চোখে লাগিয়ে লতাপাতাগুলোকে ভাল করে দেখছেন। আর তখনই জংলিটা এক লাফে এসে ডাক্তার প্রবুদ্ধের চোখ থেকে চশমাটা ধরে মারল এক টান। দড়ি ছিঁড়ে চশমাটা চলে গেল ওর হাতে। আর সঙ্গে সঙ্গে ও সেটা ছুড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে।

কী হল? ও হঠাৎ এমন খেপে গেল কেন? ওর ভাষা এখনও তিনি সব বোঝেন না। বুঝতে পারেন না মতিগতিও। তবে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন, ওর এই চশমা টেনে ছুড়ে ফেলার কারণ। হ্যাঁ করে তাকিয়ে রইলেন জংলির দিকে। জংলি তখন ঝটপট করে ওই লতাপাতার ভিতর থেকে ক'টা পাতা ছিঁড়ে ডলতে লাগল তালুতে। ডাক্তার প্রবুদ্ধকে ও বোঝাল, বড় বড় করে তাকাতে। তিনি বাধ্য ছেলের মতো তাকালেন। কারণ, একদিনেই তিনি বুঝে গেছেন, এই ছেলেটি যা করতে পারে, তা তাঁর জানা চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইরে। এ বার কী করবে, সেটা দেখার জন্যই তিনি বড় বড় করে তাকালেন। জংলি তখন সেই ডলা পাতাগুলি নিংড়ে তার থেকে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে দু'ফোঁটা রস ফেলল তাঁর চোখে। চোখ পিটপিট করে তাকালেন ডাক্তার প্রবুদ্ধ। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল জংলি। জংলিকে দেখতে দেখতে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল জংলির শিরা উপশিরা। রক্ত মাংস হাড়গোড়। তার পর হাড়গোড় ভেদ করে ওর পিছনে থাকা আলমারি, আলমারি ভেদ করে দেওয়াল। দেওয়াল ভেদ করে বাইরে। এ কী দেখছে সে! সব কিছু যে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এও সম্ভব? এই রসকে যদি ল্যাবরেটরিতে ফেলে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়, আর তা যদি শল্যচিকিৎসকদের চোখে দিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তো তাঁদের আর কোনও এক্সরে মেশিনের দরকারই হবে না। আর তাঁদের অপারেশন? সেটা করা তো তাঁদের কাছে আরও সহজ, আরও নির্ভুল হয়ে যাবে।

আর কী জানে ছেলেটা! সব, সব জানা চাই তাঁর। তিনি যদি এর কাছ থেকে এই সব জেনে নিতে পারেন, তা হলে আর তাঁকে আটকাবে কে! চিকিৎসাশাস্ত্রের নোবেল পুরস্কার তাঁর বাঁধা। তবে হ্যাঁ, কেউ যেন টের না পায়। এর কাছ থেকে সব জেনে নিয়ে একেই সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবী থেকে। যাতে কেউ আর একে কোনও দিন কাজে লাগাতে না পারে।

এই সব ভেবে, জংলি ঘরে ঢুকতেই, তিনি তার ঘরে তালো লাগিয়ে দিয়েছিলেন গত কাল রাতেই। ভেবেছিলেন, সকালে উঠেই হ্যান্ডিক্যাম ক্যামেরা চালু করে একটার পর একটা ক্যাসেটে বন্দি করে নেবেন তাঁর জানা গাছ-গাছালির যাবতীয় গুণাগুণ। কোন গাছের কোন পাতা কী করে কী করলে কোন রোগ সেরে যাবে। কোন শিকড়ে ঘটানো যাবে কোন মিরাকাল। তার পরে এর উপর একটার পর একটা থিসিস লিখে চিকিৎসাশাস্ত্রে ধুমকুমার কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবেন।

সারা রাত ঘুমোতে পারেননি তিনি। তাই ভোর হতে না হতেই সবচেয়ে আধুনিক হ্যান্ডিক্যাম ক্যামেরা আর বেশ কিছু ক্যাসেট নিয়ে এসে উনি তালো খুলেছেন। যে তালো আগের দিন রাতেই তিনি লাগিয়ে গিয়েছিলেন জংলির ঘরে। কিন্তু ও গেল কোথায়! বাইরে থেকে যেমন তালো লাগিয়ে গিয়েছিলেন, তালো তো তেমনই লাগানো ছিল!

তবে কি ও রকমই কোনও পাতার রস চোখে দিয়ে ও হয়ে উঠেছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, তা আন্দাজ করতে পেরেছিল আগেই? না কি এমন কোনও লতাগুল্মের রস ও খেয়েছিল, যা থেকে ও টের পেয়েছিল, তিনি মনে মনে কী ভাবছেন?

না হলে গত কালই তিনি যখন মনে মনে ভাবছিলেন, ওর থেকে সব জেনে নিয়ে ওকে এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবেন, তখনই ওর চোখের কোণে কেন চিকচিক করে উঠেছিল জল? আর তার পরেই সে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল কেন!

কেন, তার থেকেও বড় কথা, কী করে? তবে কি এই লতাপাতার মধোই রয়েছে সেই পাতা? যে পাতার রস মাখলে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়? বা যে কোনও দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া যায়? অথবা একচিলতে বাতাস হয়ে উবে যাওয়া যায়?

কোন পাতা সেটা? কোন পাতা? তিনি পাগলের মতো করতে লাগলেন।

আমাকে বলে দিয়ে যা ভাই, আমাকে একটি বার বলে দিয়ে যা। একটি বার।

আচ্ছা, কোন দিকে যেতে পারে ও! কোন পথে? দরজা দিয়ে? দেওয়াল ভেদ করে? না কি জানালা দিয়ে? হতে পারে! জানালাটা তো খোলা ছিল। ডাক্তার প্রবুদ্ধ জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে রইলেন সামনে। দেখতে লাগলেন এক মনে। সামনে বিশাল বাড়ি। বাড়ি ভেদ করে মাঠ। মাঠ ভেদ করে বাড়ি। বাড়ি আর বাড়ি। সে সব ভেদ করে মাঠ, ঘাট, নালা, নদী পেরিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন ধান খেত। আখ খেত। ধু ধু মাঠ। পাহাড়। জঙ্গল।

জঙ্গলটা কেমন যেন চেনা চেনা। খানিকটা সেই আন্দামানের মতো। সেই জঙ্গলে হঠাৎ একটা আলো। আলোটা যার গা দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে, সে এক অদ্ভুত জীব। এটাকে তিনি যেন আগে কোথায় দেখেছেন! নরসিংহের মতো না-মানুষ, না-কুমির। নিশ্চয়ই এটা কোনও ডাইনোসরের প্রজাতি। আরে, ওটা কী? সামনে দিয়ে ঝড়ের মতো কী যেন একটা উড়ে গেল! কী ওটা! কী! ডাক্তার প্রবুদ্ধ তাকিয়ে রইলেন সে দিকে। এ বার স্পষ্ট দেখতে পেলেন তাকে। না, সে আর কেউ নয়, তাঁর জংলি। জংলি ফিরে যাচ্ছে তার নিজের জায়গায়। নিজের জগতে। ডাক্তার প্রবুদ্ধ ধপ্ করে মেঝের উপরে বসে পড়লেন।



## কাকামণি

ছোটবেলা থেকেই কাকামণির কাছে ওই গল্পটা যে কত বার শুনেছি, তবু এখনও আমরা ভাইবোনেরা এক জায়গায় হলে, আর সেখানে যদি কাকামণি থাকেন; তা হলে আর কোনও কথা নেই, ফের উঠবে সেই অদ্ভুত গল্প এবং আমরা এই বয়সেও মুগ্ধ হয়ে শুনব তাঁর কলেজ জীবনের প্রথম চাকরি করতে যাওয়ার সেই গা ছমছম করা গল্প।

কাকামণি তখন কলেজে পড়েন। হঠাৎ একদিন দাদুকে এসে বললেন, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলাম। এবং হবে কি হবে না, তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়েছিলাম। আর অবাক কাণ্ড, অতগুলো ছেলের মধ্যে থেকে একমাত্র আমিই নির্বাচিত হলাম এই চাকরির জন্য। লোভনীয় চাকরি। দারুণ জায়গা। সব রকমের সুযোগ-সুবিধা আছে। অসুবিধে যা, তা হল একটু দূরে। দূরে বলতে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে নয় ঠিকই, তবু দূরেই। দেশের গণ্ডির বাইরে হলে তাকে তো দূরই বলতে হবে, না কি?

দাদু তো কোনও রকমে রাজি হলেন। কিন্তু ঠাকুমাকে রাজি করানোই হয়ে উঠল দায়। ছোট ছেলে বলে কথা! শুরু হল গাঁসা, কান্নাকাটি, খাওয়াদাওয়া বন্ধ। এমনকী ‘থাকবই না’ গোছের কিছু একটা বলে রাগ করে কা’র না কা’র বাড়িতে গিয়ে কাটিয়ে এলেন একটা গোটা দিন। এ বোঝায়, সে বোঝায়, কিন্তু কে শোনে কার কথা।

কাকামণিও তেমনি। তিনিও অভিমান করে শুরু করলেন অনশন। শেষে অনেক কথা চালাচালি, অনেক চাপানউতোরের পর কাকামণি যে দিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন, তখন আর কোনও উপায় না দেখে ঠাকুমা মত দিতে বাধ্য হলেন। মত দিলেন মানে, প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুটো করে চিঠি দিতে হবে এবং প্রতি মাসে একবার করে বাড়ি আসতে হবে।

প্রতি মাসে! দুটো কেন, প্রতি সপ্তাহে সাতটা করে চিঠি দেওয়া যেতে পারে, তা বলে ওখান থেকে প্রতি মাসে বাড়ি! ওরা বছরে দু'বার বাড়ি যাতায়াতের খরচ দেবে ঠিকই, কিন্তু নিজের পয়সায় বাড়ি আসা মানে তো ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি। তিন মাসের মাইনে জড়ো করলেও এক পিঠের ভাড়া হবে কি না সন্দেহ।

তবু তখনকার মতো ঠাকুমাকে শান্ত করার জন্য কাকামণি তো রাজি হলেন। এবং খিদিরপুরের ডক থেকে জাহাজে চেপে পাড়ি দিলেন সেই অদ্ভুত দেশে।

কাকামণি জানতেন, পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে, যার সঙ্গে আমাদের এই পৃথিবীর অন্য কোনও জায়গার কোনও মিল নেই। বাসে বিক্রি হওয়া দু'টাকার একটা চটি বইয়ে নাকি কাকামণি একবার পড়েছিলেন, এমন একটা জায়গা আছে, যেখানকার প্রত্যেকটা মানুষের হাতের এবং পায়ের আঙুল ছ'টা করে। তাদের কাছে ওটাই স্বাভাবিক। কারও হাতে পাঁচটা আঙুল দেখলে তারা ভিরমি খায়। সেই বইতেই আবার আরেকটা জায়গার কথা পড়েছিলেন, সেখানে নাকি একটাও মেয়ে নেই। সবাই পুরুষ। এমন জায়গা হয়! নিশ্চয়ই হয়, না হলে 'জ্ঞানের আলো', 'জানবার কথা', 'জেনে রাখা ভাল' গোছের বইগুলোতে এগুলোর উল্লেখ থাকবে কেন? কিন্তু সে সব বইতে কাকামণি নাকি ওই দেশের কোনও উল্লেখ পাননি। অথচ ও দেশের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর মনে হয়েছিল, এ দেশের কথা সবার আগে লেখা উচিত ছিল ওই গ্রন্থপ্রণেতাদের। কাকামণি না গেলে আমাদেরও জানা হত না, এমন একটা অদ্ভুত দ্বীপ রয়েছে এই পৃথিবীতেই।

দেশটা অদ্ভুত। খুব ছোট্ট একটা দ্বীপ। সাবুর দানার মতো ধবধবে সাদা মাটি। সূর্যের আলোটা কেমন যেন নীলচে নীলচে। মাটিতে পড়ে ঠিকরে পড়ছে চার দিকে। বাড়িগুলো গোল-গোল। গাছপালা খুব কম। তা-ও যা নজরে পড়ছে, তা এক-দেড় মানুষের বেশি লম্বা কোনওটাই নয়। একদম লিকপিকে কাণ্ড, ডালপালা। পাতাগুলো গাঢ় পিঙ্কি রঙের। রাস্তায় একটাও কুকুর চোখে পড়ল না। শুধু খরগোশ আর গিনিপিগ। আকাশময় বদ্রিকা আর পরিযায়ী পাখি। লোকগুলো বেশ বেঁটে বেঁটে। কিন্তু হাতগুলো বেশ লম্বা। হাঁটু ছাড়ানো। হলদেটে ফরসা। মুখগুলো লম্বাটে ধরনের। খুব খুঁটিয়ে না দেখলে সবাইকে একই রকম লাগে। এ সব তো ঠিকই আছে, তবে সব চেয়ে

আশ্চর্যের বিষয় হল, এখানকার লোকেরা সকলে জন্মসূত্রেই জোতিষী। কেউ মানুষের মাথার একটা চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করে বলে দিতে পারেন, তার আজকের দিনটা কেমন যাবে। কেউ কারও ব্যবহৃত রুমাল দেখে বলে দিতে পারেন তার ভূত ভবিষ্যৎ। কেউ কারও ছায়া দেখে নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারেন, তার শোওয়ার ঘরের খাটটা কোন দিকে রাখলে ফের তার জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। কেউ শুধু কর্ণস্বর শুনেই বলে দিতে পারেন, আগামী দশ বছরের যাবতীয় খুঁটিনাটি। কেউ আবার সদোজাতের হাত-পায়ের গড়ন দেখে বলে দিতে পারেন, বাচ্চাটা ভবিষ্যতে কোন পেশায় যাবে। এবং আশ্চর্যের বিষয় হল, এঁদের নাকি এর জন্য কোনও চর্চাই করতে হয় না। এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টার গুণ তাঁরা এমনি এমনিই অর্জন করে ফেলেন।

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে কাকামণি গিয়েছিলেন, সেটাও বড় অদ্ভুত। কাকামণির কাজ ছিল, প্রতি সপ্তাহে ওখানকার অন্তত পনেরো জন অধিবাসীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের হাত বা পায়ের তালুর ছাপ সংগ্রহ করে দিল্লির মূল অফিসে পাঠানো।

থাকাটাকার ব্যবস্থা এখান থেকেই কোম্পানি করে দিয়েছিল। সেই মতো কাকামণি তো ওই দ্বীপে নেমেই শুরু করে দিলেন কাজ। প্রথম যে লোকটির সঙ্গে আলাপ হল, তিনি এগারোটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। সাতটি ভাষা খুব ভাল করে পড়তে পারেন আর চারটি ভাষায় লেখা পড়া বলা সবেতেই দারুণ তুখোড়। তো, কাকামণি তাঁর সঙ্গে ছেচক্লিশ মিনিটের মধ্যেই বেশ বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললেন। এবং তার পর যখন তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা পাড়লেন, লোকটা আচমকা কাকামণির কপালের কাছে নাক নিয়ে বেশ জোরে একবার ঘ্রাণ নিলেন এবং কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজেই লাফিয়ে উঠলেন। তুমি! তোমার তো সাহস কম না। তুমি এক্ষুনি এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাও।

কাকামণি তো থ'। লোকটা বলে কী! সব চাকরি নিয়ে এসেছেন। এখনও আটক্লিশ ঘণ্টাও কাটেনি। অথচ... লোকটা পাগল নাকি!

কিন্তু ততক্ষণে লোকটা এমন হাইটুগোল জুড়ে দিয়েছেন যে আশপাশে লোক জড়ো হয়ে গেছে। কী সব বলাবলি করছে। ওদের কথা বলার ধরনটা যেন কেমন-কেমন। কাকামণি ঠিক ধরতে পারছেন না। ধরতে না পারলেও এটা বুঝতে পারছেন যে, তাঁকে নিয়েই কথা হচ্ছে। কাকামণি একবার



এর মুখের দিকে তাকান, একবার ওর মুখের দিকে। বোঝার চেষ্টা করেন উদ্বেজিত হয়ে ওরা কী বলাবলি করছে।

এমন সময় একটা লোক কাকামণির হাতটা তুলে নিয়ে ঝপ করে জিভ দিয়ে একটু চেটে নিল। তার পর জিভটা কয়েক বার ভেতর বার করে চোখ পিটপিট করে বলল— চল, তোকে জড়িবুটির কাছে নিয়ে যাই।

কাকামণি কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটা কাকামণিকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। লোকটার গায়ে যে এত জোর, তা তার চেহারা দেখে মালুম করা শক্ত। হইহই করে পিছনে পিছনে আসতে লাগল বাকি লোকগুলো।

ওরা কাকামণিকে নিয়ে যেখানে হাজির হল, সেটা একটা মাচার মতো। সেখানে একটা লতানো গাছ। গাছ জুড়ে ঝিরিঝিরি পাতা। মাঝে মাঝে থোকা থোকা ফুল। কোনও থোকা লাল, কোনও থোকা সবুজ, কোনও থোকা বেগুনি। এক-একটা থোকা এক একটা রঙের। প্রত্যেকটা রংই একদম গাঢ়। লতানো গাছটা মাচা জুড়ে ছড়ানো। আর তার চার দিকে খা-খা শূন্যতা। ওরা কাকামণিকে তার সামনে দাঁড় করাতেই একজন ওই গাছের একটা লতানো ডাল তুলে কাকামণির গায়ে ঠেকাতেই সব ক’টা ফুলই গাছ থেকে ঝরে পড়ল। এবং লোকগুলো সকলেই প্রায় আঁতকে উঠে বিস্ফারিত চোখে কাকামণিকে দেখতে লাগল। যেন আজব কিছু। পৃথিবীর অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসেছেন। আর যাঁর সঙ্গে কাকামণির প্রথম আলাপ হয়েছিল, তিনি বলে উঠলেন, কী? বললাম না, এ-ই সেই লোক।

কাকামণির কেন যেন হঠাৎ মনে হল, ওরা আচমকা মারমুখী হয়ে উঠতে পারে। তাই কোনও দিকে না তাকিয়ে কাকামণি ছুট লাগালেন। ছুট মানে কুকুর ছোটা। আর তাঁর পিছনে হেইহেই করে ছুটতে লাগল ওই লোকগুলো। ওই লোকগুলোর দেখাদেখি রাস্তাঘাটের লোকজনও পিছু নিল। কাকামণি যত ছোটেন, ওরাও তত ছোটো। এবং ক্রমশ বাড়তে থাকে তাদের দল। ছুটতে ছুটতে কাকামণি যখন আর পারছেন না, যে কোনও সময় মুখ থুবড়ে পড়তে পারেন, তখনই তাঁর চোখে পড়ল, সামনেই একটা বিরাট ফুটবল। বিরাট বলতে বিরাট। প্রায় আকাশ ছোঁওয়া। সাত-আট তলার মতো তো হবেই। কাকামণি পিছন না ফিরেও বুঝতে পারলেন ওই লোকগুলো তাঁর পিছু পিছু আসছে। একবার ধরতে পারলে যে কী হবে কে জানে! তাই ছুটতে ছুটতেই ভাবলেন, এর আড়ালে লুকোবেন কি না। সেই মতো ওই

ফুটবলটার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একটু দম নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। ঠিক কোন জায়গাটায় দাঁড়ালে অনায়াসে ফাঁকি দেওয়া যাবে ওদের চোখকে। এ-দিকে ও-দিকে তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ল, ক'হাত দূরে একটা সুড়ঙ্গ। ঈশ্বর সত্যিই আছেন। না হলে এই সময়ে এমন একটা জায়গা তাঁর সামনে খুলে যাবে কেন! কাকামণি প্রাণ বাঁচাতে সেখানে ঢুকে পড়লেন।

ঢুকেই দেখেন সুড়ঙ্গ কোথায়? এ তো অফিস। এখানে-ওখানে টেবিল। টেবিল ঘিরে চারটে, ছ'টা, আটটা করে চেয়ার। আর সেই সব চেয়ারে লোকজন। সকলেই প্রায় বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন।

কাকামণি ঢুকতেই ওঁরা কাকামণির দিকে ফিরে তাকালেন। অনেকেই উঠে এসে কাকামণিকে ঘিরে ধরলেন। সকলেই বেশ শান্তশিষ্ট। সৌম্য চাহনি। একজন বললেন, বোসো।

কাকামণি অবাক। তাঁর মনে হল, লোকগুলো যেন তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। হতে পারে! এখানকার লোক তো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। আগেই সব জেনে যেতে পারেন। তাই বসেই, কাকামণি যে দিক দিয়ে ঢুকেছেন, সে দিকে আঙুল তুলে আমতা আমতা করে বলতে শুরু করলেন, ওরা বলছে, তুমি এক্ষুনি দেশ ছেড়ে চলে যাও।

সামনের লোকটা খুব ধীর স্থির ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ, তুমি চলে যাও।

কাকামণি তখন মরিয়া হয়ে বললেন, আমি নতুন চাকরিতে জয়েন করেছি। এখনও দু'দিন পুরো হয়নি।

লোকটা বললেন, জানি। এবং তুমি যে আসবে আমরা তাও জানতাম। তাই তোমার জন্যই আমরা আজ সকাল থেকে অপেক্ষা করে আছি।

— তার মানে?

— মানে তুমি বুঝবে না। তুমি এক্ষুনি ফেরিঘাটে চলে যাও। ওখানে তোমার জন্য জাহাজ অপেক্ষা করছে। তুমি গেলেই ছাড়বে।

কথাটা একজন বললেন ঠিকই, কিন্তু কাকামণির মনে হল, কথাটা একজনের নয়, কথাটা ওঁদের সবার। এবং কথাটা সম্মোহনের মতো। কাকামণি যেন কেমন হয়ে পড়লেন। পায়ে পায়ে ওখান থেকে বেরিয়ে ফেরিঘাটে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে তখন ভারতের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছে একটা দিনেমার জাহাজ। কাছে যেতেই একজন দৌড়ে এলেন, এই যে আপনার টিকিট। শিগগির উঠে পড়ুন।

— আমার সব কিছু তো ওইখানে।

— না। আমরা নিয়ে এসেছি।

কাকামণির আর কিছু বলার ছিল না। উঠে পড়েছিলেন জাহাজে। এবং যথারীতি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন ক’দিনের মধ্যেই। কাকামণিকে দেখে ঠাকুমার সে কী আনন্দ! চিঠি নয়, চিঠির বদলে স্বয়ং ছেলে এসে হাজির হয়েছে বাড়িতে।

হইহই পড়ে গেল বাড়িতে। হইহই পড়ে গেল পাড়াতে। কিন্তু কেউ কেউ যে ঞ্চ কোঁচকায়নি, তা নয়। এ কী রে বাবা! গেল চাকরি করতে বিদেশে, আর গিয়েই ফিরে এল! এ কেমন চাকরি!

কী হয়েছে, সবাই জানতে চাইল ঘটনাটা। কাকামণিও বললেন। কিন্তু ক’জন বিশ্বাস করল সে কথা, বলা মুশকিল। তবে দাদু নাকি বলেছিলেন, যেমন মা, তেমনই তাঁর ছেলে। কেউই তার জেদ ছাড়বে না। একবার যখন বলে ফেলেছে যাবে, তখন যাবেই। তাই গিয়েছিল। কিন্তু গিয়েই মায়ের জন্য বোধহয় মন কেমন করছিল, তাই ফিরে এসেছে। এখন কী বলবে, তাই ওই সব সাত-পাঁচ গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

গল্প হোক বা সত্যি হোক, কেন জানি না, আমাদের কিন্তু দারুণ লাগত গল্পটা। আরও দারুণ লাগত, যখন কাকামণি বলতেন। সত্যি কথা বলতে কী, ওই ভাবে আর কাউকে কখনও গল্প বলতে শুনিনি।

## ৪৫ বড়কী

না। বড়কীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। ছলছল চোখে শিবকুমার এ কথা বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল তার বউ। আর তার কান্না শুনে বইপত্র ফেলে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে মায়ের কাছ ঘেষে দাঁড়াল তাদের বাকি দুই ছেলেমেয়ে— মঝলী আর ছোটকা।

কান্না জড়ানো গলাতেই শিবকুমারের বউ বলল, তা হলে ও বোধহয় আবার পালিয়েছে। যাও, থানায় যাও। একবার গিয়ে বলো...

এর আগেও চার-চার বার ও পালিয়েছে। প্রথম বার যখন ওকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন গ্রাম থেকে অনেক দূরে, কালিন্দী থানায় মিসিং ডায়েরি করার সময় পুলিশ অফিসারটি বলেছিল, তেরো বছর বয়সেই পালিয়েছে! কার সঙ্গে?

শিবকুমার হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। সেটা দেখে ওই পুলিশটি অফিসারটি বলেছিল, ও তো আর দুধের বাচ্চা নয় যে, কোনও তান্ত্রিক তুলে নিয়ে গিয়ে আর সব বাচ্চাদের মতো ওকেও মায়ের সামনে বলি চড়িয়ে দিয়েছে...

হ্যাঁ, এখানে মাঝে মাঝেই বাচ্চা খোয়া যায়। এবং খুঁজে পাওয়া না গেলে লোকেরা ধরেই নেয়, তাকে কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে দিয়েছে। শোনা যায়, বহু বছর আগে ইংরেজ আমলে ছোট, মেজ, বড়, আরও বড় কর্তাকে বারবার অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও যখন হল না, তখন আশপাশের গ্রামের লোকেরা সবাই এককাটা হয়ে বড় রাস্তায় যাওয়ার একমাত্র বাধা, শীর্ণ নদীটার উপরে কাঠের পোল তৈরি করেছিল, সেটা যাতে ভেঙে না পড়ে এবং টেকসই হয়, সে জন্য নাকি ব্রিজ তৈরির আগেই ভাল দিনক্ষণ দেখে খুঁটি পোঁতা হয়েছিল। সেই খুঁটি পোঁতাকে ঘিরে পুজোআচ্চা, যাগযজ্ঞও হয়েছিল। এবং পূজারির বিধান অনুযায়ীই ধরিত্রী মাকে খুশি করার জন্য নাকি

বিভিন্ন জায়গা থেকে তেরোটি বাচ্চাকে চুরি করে এনে রাতের অন্ধকারে বলি দেওয়া হয়েছিল। এখানকার লোকেদের বিশ্বাস, সেই জন্যই নাকি ওই ব্রিজটা এখনও এত শক্তপোক্ত।

তাই আজও অনেকেই বাড়ি তৈরি করার আগে ভিত পুজোর সময় যেমন পুজো করে, সেটা তো করেই, রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে নাকি নরবলিও দেয়। তাই মাঝে মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যায় এক-একটা বাচ্চা। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আশপাশের লোকেরা তাই সদা সতর্ক। কোনও বাচ্চাকেই একা ছাড়ে না। ছাড়লেও চোখে চোখে রাখে। কারণ কোনও বাচ্চাকে চোখের আড়ালে ছাড়া মানেই নাকি ঘোরতর বিপদ ঘনিয়ে আসা। কিন্তু সে সব বাচ্চার বয়স অনেক কম হয়। চার-পাঁচ কিংবা ছয়। বারো-তেরো বছরের বাচ্চাদের সাধারণত কেউ বলি দেওয়ার জন্য নেয় না। ফলে ওই পুলিশ অফিসারটি ঞ্চ কুঁচকে শিবকুমারকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার কি মনে হয়? ও কার সঙ্গে পালিয়েছে?

শিবকুমার বলেছিল, তা তো জানি না।

— তা হলে যান। গিয়ে খোঁজ করুন আর কে পালিয়েছে...

শিবকুমার বলেছিল, আমি ওর সব ক'টা বন্ধুর বাড়িতেই গিয়েছিলাম। দেখলাম সবাই আছে। শুধু ও-ই নেই। সবাইকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু কেউই বলতে পারল না, ও কোথায় গেছে। ও নাকি কাউকেই কিছু বলে যায়নি।

— তা আবার হয় নাকি? কাউকে কিছু বলে যায়নি? এ সব ব্যাপারে জানবেন বন্ধুরাই সাঁটে থাকে। আচ্ছা বলুন তো, ও কার কার সঙ্গে মিশত?

— ও মিশত... ওই তো... বিন্দি, চান্দি, বুড়িয়া... এই তিন জনই তো ওর বন্ধু।

— আরে, আমি তা বলছি না। বলছি, ও কোন ছেলের সঙ্গে মিশত?

— ছেলে! শিবকুমার একেবারে আকাশ থেকে পড়েছিল।

হ্যাঁ, ওদের গ্রাম থেকে মাঝে মাঝেই ছেলেমেয়েরা পালায়। এই তো ক'বছর আগেই, সতেরো-আঠারো বছরের দু'-দুটো ছেলে বাবার মুদিখানা দোকান থেকে সব টাকাপয়সা নিয়ে, কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই রাতের অন্ধকারে চম্পট দিয়েছিল সুরাটে। অনেক খোঁজখবর করার পরে পুলিশ যখন তাদের

তিন মাস পরে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল— তারা বলেছিল, আমরা ভাগ্যের সন্ধানে গিয়েছিলাম।

পরে জানা গিয়েছিল, কে নাকি তাদের বলেছিল সুরাটে গোলেই চাকরি পাওয়া যায়। পড়াশোনা কিছু লাগে না। ওরাই শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়। প্রচুর টাকা মাইনে। তাই গরিব বাবা-মায়ের হাতে প্রতি মাসে মাসে কিছু টাকা তুলে দেওয়ার জন্যই নাকি ওরা সুরাটে যাওয়ার জন্য পালিয়েছিল। কিন্তু ভুল করে অন্য ট্রেনে উঠে পড়ায় ওরা মজফ্বরপুরে চলে গিয়েছিল। অচেনা-অজানা জায়গায় গিয়ে মহাবিপাকে পড়েছিল। যে ক'টা টাকা ছিল তা দিয়ে চার-পাঁচ দিন কোনও রকমে চলেছিল। কিন্তু তার পরেই দেখা দিয়েছিল বিপদ। কী খাবে, কোথায় থাকবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা ফাস্টফুডের দোকানে কাজে ঢুকেছিল তারা। সেখানে এঁঠো থালাবাসন মাজা, দূরের টিউবওয়েল থেকে জল তুলে আনা বা আনাজ কাটাই শুধু নয়, বাড়ির টুকিটাকি কাজ, মনিবের ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসা, বাজারের ব্যাগ বয়ে নিয়ে আসা থেকে ফাইফরমাস খাটা, কিছুই বাদ যেত না। এমনকী রাত্রিবেলায় যতক্ষণ না মনিব ঘুমিয়ে পড়ত, ততক্ষণ তার হাত-পা টিপে দিতে হত, মাথা ম্যাসাজ করে দিতে হত।

কেবল ছেলেরাই নয়, এই তো কিছু দিন আগে একসঙ্গে দল বেঁধে তেরো-চোদ্দো বছরের চার-চারটে মেয়েও উধাও হয়ে গিয়েছিল। চোখের ঘুম ছুটে গিয়েছিল গোটা গ্রামের। নড়েচড়ে বসেছিল লোকাল থানাও। সে দিনই মধ্যরাতে যখন তাদের রেল স্টেশন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল, তারা বলেছিল, আমরা মুগ্ধই যাচ্ছিলাম। সিনেমায় নামার জন্য।

শুধু কোনও বন্ধুর সঙ্গে কিংবা দল বেঁধেই নয়, একবার তাদের গ্রামেরই যোলো বছরের একটি মেয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে বেমালুম ভানিশ হয়ে গিয়েছিল। থানায় মিসিং ডায়েরি করতে গিয়ে তাদের বাড়ির লোকেরা জানতে পেরেছিল, পাশের গ্রামের বছর উনিশের একটি ছেলেকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখনই পুলিশ দুয়ে দুয়ে চার করেছিল। এবং তখনই জানা গিয়েছিল, পুলিশের সন্দেহ খুব একটা অমূলক নয়। কারণ, বছ লোকই তখন জানিয়েছিল, ওদের দু'জনকে নাকি প্রায়ই এ-দিকে ও-দিকে ঘুরতে দেখেছে তারা। কিছু দিন আগে নাকি দু'জনে মিলে সিনেমা দেখতেও গিয়েছিল। অগত্যা সবাই নিঃসন্দেহ হয়েছিল, ওরা দু'জনে পালিয়েছে। কিন্তু অনেক



খোঁজ করেও আজ অবধি তাদের কোনও হৃদিশ পাওয়া যায়নি।

মেয়ের বাড়ির লোকেরা অবশেষে দু'ক্রোশ দূরের নাবিক গ্রামের এক নামকরা বৃদ্ধ গুনিরের কাছে গিয়েছিল। আলো বাতাস-হীন দমবন্ধ হয়ে আসা একরত্তি ঘরে বসে সেই গুনির নাকি বলেছিল, ওরা আছে। একসঙ্গেই আছে। ভাল আছে। ওদের একটা ফুটফুটে মেয়েও হয়েছে। এই দ্যাখ, বলে, একটা মন্ত্রপূত আয়না বের করে ওদের সামনে ধরেছিল। বলেছিল, সবাই নয়, যে কোনও একজন দ্যাখ। ওদের দেখতে পাবি। ওরা এখন কোথায় আছে। কী করছে। কে দেখবি, তোরা নিজেদের মধ্যে ঠিক কর।

তখন মেয়ের মা বলেছিল, আমি দেখব। আমি।

সেই আয়নায় ছায়া-ছায়া মতো সে নাকি কী একটা দেখেওছিল। স্পষ্ট কিছু দেখা না গেলেও গুনির যখন বলেছে, ওটা তার মেয়ে, তা হলে নিশ্চয়ই ওটা তার মেয়েই। সে উপরের দিকে তাকিয়ে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করে বিড়বিড় করে বলেছিল, ও যেখানেই থাক, ভাল থাক। ওকে ভাল রেখো ঠাকুর। ওকে ভাল রেখো...

ওই মেয়েটা ওই রকমই ছিল। কিন্তু তাদের মেয়ে বড়কী তো ও রকম নয়। সে তো বাচ্চা। সবে সেভেনে পড়ে। ও কি ও সব বোঝে! তবু কেবল নিজেদের গ্রামেই নয়, আশপাশের সব কাঁটা গ্রামে, এমনকী দূর-দূরান্তের স্কুলে গিয়েও শিবকুমার খোঁজ করেছিল, আর কেউ পালিয়েছে কি না...

কিন্তু না। সে রকম কোনও খবর জোগাড় করতে না পাড়ায় ফের থানায় গিয়েছিল সে। এবং থানাও সত্যি সত্যিই খোঁজখবর শুরু করেছিল এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বড়কীকে খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছিল। ও নাকি রেল স্টেশনের একটা বেঞ্চে একা-একা বসেছিল।

তা হলে কি ওই মেয়েটার মতো ও-ও কারও সঙ্গে ট্রেনে করে পালিয়ে যাওয়ার মতলবে ছিল! তাই প্ল্যাটফর্মে বসে কারও জন্য অপেক্ষা করছিল! পুলিশ অফিসারটি অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এবং পুলিশ চলে যাওয়ার পরে তার বাবা-মাও। কিন্তু ও সেই একই কথা বলে যাচ্ছিল। বললাম তো, আমি ট্রেন দেখতে গিয়েছিলাম...

ওর বাবা অনেক বুঝিয়েছিল। বলেছিল, তুই যে ভরদুপুরে একা একা ঘুরে বেড়াস। তুই কি জানিস, এই দুপুরবেলায় বড় বড় গাছের মগডালে ভূত-পেতনি-ব্রহ্মদতিরা মানুষের রক্ত খাওয়ার জন্য কী ভাবে ওত পেতে

বসে থাকে। একবার পেলে একেবারে ঘাড় মটকে খায়, জানিস না? এই ভাবে কাউকে কিছু না বলে একা-একা কেউ বেরোয়? আর কোনও দিন এই ভাবে কোথাও যাস না, বুঝেছিস? বলেই, ওর বাঁ হাতের বালটা দেখিয়ে বলেছিল, যদি না যাস, ভাল ভাবে থাকিস, তা হলে গত বার যেমন তোর নাম খোদাই করা রুপোর এই বালটা বানিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক এই রকম আর একটা বাল তাকে বানিয়ে দেব...

হ্যাঁ, বড়কী বায়না করেছিল বলে বিয়েতে পাওয়া বউয়ের রুপোর টিকলি, গলার মোটা হার আর পাতের গ্রামের রথের মেলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চাদের পায়ের এক পাটি তোড়া ভেঙে গড়িয়ে দিয়েছিল ওটা।

বড়কী বলেছিল, ওটার মধ্যে আমার নাম লিখে দিয়ো। না হলে, ওটা যদি হারিয়ে যায়, তা হলে তোড়া হারানো মেয়েটার মতো আমিও আর ওটা ফেরত পাব না।

ওর বাবা বলেছিল, ঠিক আছে, তাই হবে। স্যাকরাকে বলব, তোর বালার মধ্যে বড় বড় করে ‘বড়কী’ লিখে দিতো। কী? খুশি তো?

বড়কী খুশি হয়েছিল। কিন্তু আজ ও রকমই আর একটা বাল গড়িয়ে দেওয়ার কথা বললেও, বড়কীর মুখে কিন্তু সে রকম কোনও খুশির ঝলক দেখতে পেল না শিবকুমার। শুধু ফ্যালফ্যাল করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

দ্বিতীয় বার যখন ওকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন তার বাবা প্রথমেই গিয়েছিল রেল স্টেশনে। এর আগের বার যেটায় বসেছিল, শুধু সেই বেঞ্চটাতেই নয়, গোটা স্টেশনের এই প্ল্যাটফর্মে ওই প্ল্যাটফর্মে যতগুলো বেঞ্চ ছিল, সিমেন্টের বাঁধানো বেদি ছিল, সব ক’টা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল। কিন্তু না। বড়কীকে সে পায়নি। অগত্যা কোনও উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত থানায় ছুটে গিয়েছিল।

সে বারও থানার লোকেরাই তার মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল। ওকে নাকি একটা পুকরের পাড়ে তন্ময় হয়ে বসে থাকতে দেখেছিল তারা।

— ওখানে কী করছিলি? জিজ্ঞেস করায় ও বলেছিল, আমি কচুরিপানার ফুল দেখতে গিয়েছিলাম। প্রতিটা পাপড়িতে কী সুন্দর ময়ূরের পেখমের মতো রং। চোখ ফেরানো যায় না...

— কচুরিপানার ফুল দেখতে গিয়েছিলি! তুই কি পাগল? জানিস, কত

রকমের লোক ঘুরে বেড়ায়? তারা বাচ্চাদের বস্তায় ভরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে, অন্ধ করে শহরের রাস্তায় রাস্তায় তাদের দিয়ে ভিক্ষে করায়। তুই কি সেই লোকগুলোর খপ্পরে পড়তে চাস? তা হলে? অনেক বুঝিয়েছিল শিবকুমার। তবুও...

তৃতীয় বার যখন পালিয়ে গেল, প্রথমেই শিবকুমার গেল সেই পুকুরের পাড়ে। তার পরে রেল স্টেশনে। তার পর ওর বন্ধুদের বাড়িতে। কোথাও না পেয়ে অবশেষে থানায়।

তখনই পুলিশ অফিসারটা তাকে ধমকে বলেছিল, আপনারা কি ইয়ার্কি পেয়েছেন? আমাদের আর কোনও কাজ নেই? আপনাদের মেয়ে রোজ-রোজ পালিয়ে যাবে, আর তাকে খুঁজে খুঁজে আমাদের নিয়ে আসতে হবে? একটা মেয়েকে সামলে রাখতে পারেন না? যান, নিজেরা খুঁজে নিন।

কাঁচুমাচু মুখ করে থানা থেকে বেরিয়ে এলেও পুলিশ অফিসারটি যে ওগুলো শুধু কথার কথা বলেছিলেন, বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, আসলে সে থানা থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই মেয়েটিকে খুঁজে বের করার জন্য ফোর্স পাঠিয়েছিলেন, সেটা সন্ধে হওয়ার অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল শিবকুমার।

সে বার স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে বাঁদরখেলা দেখার পরে গ্রামের আরও অনেক বাচ্চার মতো সেই বাঁদরওয়ালায় পিছু পিছু সেও নাকি গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকটা পথ চলে গিয়েছিল। কিছুটা যাওয়ার পরে বাকি বাচ্চারা ফিরে এলেও সে আর ফেরেনি। বাঁদরওয়ালায় পিছু পিছু হেঁটেই যাচ্ছিল। সেটা দেখে নাকি বাঁদরওয়ালা বলেছিল, কী রে বেটি, আর কত দূর আসবি? এ বার যা।

বড়কী নাকি বলেছিল, আমি যাব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বাঁদরওয়ালা নিতে চায়নি। তবুও পিছন ছাড়েনি ও। হাইওয়ের উপরে বাস স্টপেজের ধারে একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে আড্ডা মারছিল কয়েকটি স্থানীয় ছেলে। তারা বাঁদরওয়ালায় পিছনে পিছনে স্কুলের পোশাক পরা একটা মেয়েকে ওই ভাবে যেতে দেখে ভেবেছিল, বাঁদরওয়ালাটা নিশ্চয়ই ছেলেধরা। মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা বাঁদরওয়ালাটাকে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, এই মেয়েটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?

বাঁদরওয়ালা বলেছিল, আমি নেব কেন? ও-ই তো আমার পিছু ছাড়ছে না।

ওরা যখন বড়কীকে জিজ্ঞেস করল, তুই কোথায় থাকিস? ও সব বলেছিল। গ্রামের নাম। পাড়ার নাম। বাবার নাম। এমনকী স্কুলের নামও।

তখন ওই ছেলেদের মধ্যে থেকেই একজন তার বাইকে করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক খাতে বরাদ্দ টাকায় সদ্য তৈরি হওয়া কালো পিচের চওড়া হাইওয়েটা যতই মসৃণ হোক না কেন, হুসহাস করে ছুটে যাক না কেন দূরপাল্লার এক্সপ্রেস বাস, মাল-বোঝাই বড় বড় ট্রাক, তার পাশ দিয়ে নেমে যাওয়া গ্রামে ঢোকার সরু রাস্তাগুলি কিন্তু এখনও যে কে সে-ই। খোয়া বিছানো। গর্ত-গর্ত।

দু'ধারে কোথাও বড় বড় গাছ, কোথাও আবার ঝোপঝাড়। জঙ্গল জঙ্গল মতো। সেই রাস্তার পাশেই কোথাও হিন্দুপাড়া, কোথাও মুসলমানপাড়া, কোথাও কৈবর্তপাড়া, নাপিতপাড়া, কোথাও আবার ব্রাহ্মণপাড়া।

এক সময় বেশির ভাগ বাড়িই মাটির ছিল। কিন্তু হাইওয়ে হওয়ার আগে থেকেই শুধু রাস্তার ধারের জমিই নয়, ভিতরের, আরও ভিতরের জমির দামও হু হু করে বাড়তে শুরু করেছিল। বাইরে থেকে লোকজন এসে বাড়িঘর করে বসে পড়ছিল। কেউ কেউ দোতলা-তিনতলাও হাঁকাচ্ছিল। আর তারা বাইরে থেকে এলেও, এখানে বাড়ি করার সময় কিন্তু এখানকার চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ীই কেউ কেউ বলিও চড়াতে শুরু করেছিল।

পিছনে বড়কীকে বসিয়ে সেই রাস্তা দিয়েই ঝাঁকুনি খেতে খেতে ধুলো উড়িয়ে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। কিন্তু তাকে আর বড়কীদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হয়নি। মাঝপথেই দেখা হয়ে গিয়েছিল, বড়কীর খোঁজে বেরোনো কালিন্দী থানারই এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। ওই পুলিশ অফিসারটিই তার জিপে করে বড়কীকে শিবকুমারের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, মেয়েকে দেখে শুনে রাখুন। ভাল করে বোঝান। কখন কোন বিপদে পড়ে যাবে, বলা যায়! সব ছেলে তো আর সমান নয়... দরকার হলে ভাল কোনও সাইকায়াক্লিস্টের কাছে নিয়ে যান। ও কেন বারবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে, কাউন্সেলিং করান। এর পরে ও যদি আবার কোথাও চলে যায়, আমাদের কাছে আর আসবেন না। বুঝেছেন?

শিবকুমার বুঝেছিল। মেয়েকেও বুঝিয়েছিল, তুই কি জানিস এখন কত রকমের লোক রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়? তারা তোর বয়সি ছেলেমেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে কিডনি, চোখ, হাট— সব বের করে বিক্রি করে দেয়। এখনও

সময় আছে। সাবধান হ'। না হলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবি। আর তোর বিপদ মানে আমাদেরও বিপদ। তুই কি তোর বাবা-মাকে কাঁদাতে চাস, বল?

কিন্তু তার মেয়ে বোঝেনি। পরদিন স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছিল। সঙ্গে ছিল তার বোন মঝলী আর ছোট ভাই ছোটকা। ওরা তিন জন একই স্কুলে পড়ে। বড়কী এ বার ক্লাস নাইনে উঠেছে। মঝলী ক্লাস সিন্বে পড়ে আর ছোটকা থ্রি-তে। বাকি দু'জন ঠিক থাকলেও বড়কীটাই যেন একটু কেমন কেমন...

শিবকুমার জোগাড়ের কাজ করে। তার বউ নতুন গজিয়ে ওঠা কয়েকটা বাবুর বাড়িতে কোথাও সপ্তাহে তিন দিন কাপড় কাচার কাজ, কোথাও ঘরদোর মোছা-বাসন মাজার কাজ করে। কোথাও আবার রান্নার কাজ। তাদের কারও কারও বাড়ির মূলত কার্ড এন্ট্রি করার জন্যই রেশন তুলে দেয়। সবার বাড়িতেই গ্যাস আছে। তাই অনেকেই প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে কেরোসিন তোলে না। সেটা সে ধরে। এবং বেশ কিছুটা জমে গেলে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে অনেক বেশি দামে বিক্রি করে। ফলে ফিরতে ফিরতে তার দুপুর গড়িয়ে যায়। এসে রান্নাবান্না করে।

সে দিন রান্নাবান্না করার পর হাতের কাজ নিয়ে বসেছিল। কক্ষনো চুপচাপ বসে থাকতে পারে না সে। গরম যাওয়ার আগেই নানান নকশার সোয়েটার বুনতে শুরু করে। মেয়ের জামায় নানা রঙের সুতো দিয়ে কলকা তুলে দেয়। স্বামীর রুমালে তো বটেই, নিজের রুমালেও চেকনাই সুতো দিয়ে নামের আদ্যাক্ষর লেখে। কারণ রুমালের প্রতি খুব ছোটবেলা থেকেই তার দুর্বলতা। সব সময় কোমরে একটা গোঁজা থাকে।

বড় মেয়েকে কাঁদতে দেখে সে ভেবেছিল, নিশ্চয়ই বোন বা ভাইয়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছে। এফুনি হাতাহাতি লেগে যাবে। তাই হাতের কাজ ফেলে তড়িঘড়ি উঠে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, কী হয়েছে রে?

বড়কী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমি আর স্কুলে যাব না।

মা বলেছিল, এ আবার কী অলক্ষুনে কথা! কেন? স্যার মেরেছে?

— না।

— কেউ কিছু বলেছে?

— না।

— তা হলে?

বড়কী বলেছিল, আমার স্কুলে যেতে ভাল লাগে না। আমি আর স্কুলে যাব না।

— কেন যাবি না, সেটা তো বলবি।

— না। আমি আর স্কুলে যাব না।

ওর মা বলেছিল, তা হলে কি আমার মতো তুইও লোকের বাড়িতে বিয়ের কাজ করবি? তোর বাবা তোদের জন্য মুখে রক্ত তুলে কাজ করে। আর তুই বলছিস... আসুক তোর বাবা।

ওর বাবা বড় মেয়েকে ভীষণ ভালবাসে। শত অন্যায্য করলেও বকে না। বউ মারতে গেলেও আটকায়। সব সময় বলে, বড় হোক। সব ঠিক হয়ে যাবে। সে-ই বাবাও বুঝতে পারছে, এই মেয়ে তার বাকি দুই ছেলেমেয়ের মতো নয়। তাই ওকে কাছে ডেকে আদর করে পাশে বসিয়ে বোঝাতে লাগল, এ রকম করতে নেই মা। তুই কেন বারবার পালিয়ে যাস?

বড়কী বলেছিল, আমার বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না।

— কেন?

কোনও উত্তর না দিয়ে ও চুপ করে ছিল। তাতে আরও মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল শিবকুমারের। তাই গলা চড়িয়ে ফের জিজ্ঞেস করেছিল, কেন? কেন? কেন থাকতে ইচ্ছে করে না তোর?

বড়কী বলেছিল, জানি না।

— তোর ভাইবোনেরা তো এ রকম নয়। তুই এ রকম করিস কেন?

বাবার কথার উত্তর না দিয়ে, উল্টে ও-ই প্রশ্ন করেছিল, সবাইকে কি একই রকম হতে হবে?

— তুই কী চাস?

— যে দিকে দু'চোখ যায়, আমি সে দিকে যেতে চাই।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে শিবকুমার বলেছিল, এ রকম বললে হয় মা, বল? তুই তো মেয়েমানুষ।

— আমি ছেলে মেয়ে বুঝি না। আমার যা মন চায় আমি তাই করব। আর কিছু বলবে?

মেয়ের বেয়াদব কথা শুনে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল শিবকুমারের। মনে হচ্ছিল ঠাসিয়ে একটা চড় মারে। শেষ পর্যন্ত নিজেকে কোনও রকমে সামলে নিয়েছিল। সরে গিয়েছিল ওর সামনে থেকে।



না। সে দিন নয়। তার পরদিনও নয়। তার পরদিন ফের বেপান্তা হয়ে গিয়েছিল বড়কী। সব জায়গায় খুঁজেছিল শিবকুমার। কিন্তু কোথাও পায়নি। বউ বলেছিল, একবার থানায় যাও। ওরা ঠিক আমার মেয়েকে খুঁজে এনে দেবে।

সে বলেছিল, কী করে যাব? এর আগের বার মেয়েকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে উনি কী বলে গিয়েছিলেন তোমার মনে নেই?

— আমার সব মনে আছে। তবু তুমি যাও।

— না। আমি যাব না।

— এই বারই শেষ বার। এর পরে ও গেলেও আমি আর কক্ষনো তোমাকে থানায় যেতে বলব না। যাও।

শিবকুমার গিয়েছিল। সে থানায় ঢুকতেই ওই পুলিশ অফিসারটি বলেছিল, কী হল? আবার থানায় কেন? আপনাকে বলেছিলাম না, থানায় আসবেন না। মেয়ে হারানো ছাড়া অন্য কিছু বলার থাকলে বলুন...

কোনও কথা নয়। ঝপ করে বসে তার পা জড়িয়ে ধরেছিল শিবকুমার। হাউহাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। পুলিশ অফিসারটি বলেছিল, আরে, ছাড়ুন ছাড়ুন। পা ধরছেন কেন? ঠিক আছে ঠিক আছে, বলুন, কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?

শিবকুমার বলেছিল। এবং অবাক কাণ্ড, সে বারও সন্ধে নামার আগেই... না। মেয়েকে পৌঁছে দেয়নি। থানা থেকে লোক পাঠিয়ে তাকে আর তার বউকে ডেকে পাঠিয়েছিল ওই পুলিশ অফিসারটি।

মেয়েকে দেখে শিবকুমারের চোখ আনন্দে চকচক করে উঠেছিল। বলেছিল, কোথায় পেলেন ওকে?

পুলিশ অফিসারটি বলেছিল, আমাদের এক অফিসার গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন। উনি হঠাৎ দেখেন, সুনসান রাস্তার ধারে ঢালু জমির নীচে একটি বাচ্চা কী যেন করছে। বাচ্চাটি কে! দেখতে গিয়ে দেখে— ও।

— কী করছিল?

— উবু হয়ে বসে এক হাত এক হাত করে রাস্তা মাপছিল।

— রাস্তা মাপছিল? শিবকুমার অবাক।

— তা হলে আর বলছি কী... ও নাকি ওই ভাবে হাত মেপে মেপে দেখতে চেয়েছিল আপনাদের বাড়ির সীমানা থেকে হাইওয়েটা কত হাত দূরে।

— সে কী!

— সে কী, সেটা আপনারাই বুঝুন। বলে, তাদের হাতে বড়কীকে সাঁপে দেওয়ার আগে রীতিমত বেশ কড়া ভাষাতেই ধমকেছিল সে। বলেছিল, একটা মেয়েকে দেখে রাখতে পারেন না? দেখুন তো, শুধু আপনারদের গ্রামেই নয়, আশপাশের কোনও গ্রামে এ রকম আর একটাও মেয়ে আছে কি না। তা হলে আপনারদের মেয়ে এ রকম কেন?

সে দিন দু'জনেই পুলিশ অফিসারটিকে কথা দিয়েছিল, এ বার থেকে মেয়েকে চোখে চোখে রাখব। ভাল করে বোঝাব। দরকার হলে দুটো বাড়ির কাজ ছেড়ে দেব। মেয়েকে আর পালাতে দেব না।

বাড়ি নিয়ে এসে মা-বাবা দু'জনেই খুব করে বুঝিয়েছিল। বড়কীকে বলেছিল, তুই যদি এ রকম করিস, তা হলে তোর ভাইবোনরা তোর কাছ থেকে কী শিখবে বল? তা ছাড়া, তুই বড় হয়েছিস। কোন ছেলে কী রকম তুই জানিস? চারিদিকে কত কী হচ্ছে। যদি সে রকম কোনও বিপদ হয়! তখন? তাকে বিয়ে দিতে পারব? না, আমরা কাউকে মুখ দেখাতে পারব? আমরা গরিব মানুষ, মা। এ রকম করিস না।

সে দিন রাতে ওর দুই ভাইবোনকে পাশের ঘরে ঘুম পাড়িয়ে বড়কীকে মাঝখানে শুইয়ে দু'পাশ থেকে দু'জন অনেক বুঝিয়েছিল। বোঝাতে বোঝাতে কখনও কখনও রেগে যাচ্ছিল ওর মা। রাগ সামলাতে না পেরে থেকে-থেকেই মেয়ের উপরে হাত ওঠাতে যাচ্ছিল। আর প্রতি বারের মতোই বউকে বিরত করছিল শিবকুমার। কারণ, আরও দুটো বাচ্চা থাকলেও এই বড় মেয়েটাই ছিল তার প্রাণ।

তবু মেয়েকে আগলে রাখা গেল না। পালিয়ে গেল। না। অনেক খোঁজ করেও তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। ছলছল চোখে শিবকুমার এ কথা বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল তার বউ। আর তার কান্না শুনে বইপত্র ফেলে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে মায়ের কাছ ঘেষে দাঁড়াল তাদের বাকি দুই ছেলেমেয়ে।

ফের কান্না জড়ানো গলায় বউ বলল, যাও না... থানায় গিয়ে একবার বলো না... দরকার হলে হাতে-পায়ে ধরো। আমি যাব?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেও শিবকুমার নিজেকে কোনও রকমে সামলে নিয়ে এই প্রথম বার একটু কড়া গলাতেই বলল, না।

নিজে তো গেলই না। বউকেও যেতে দিল না।

বিকেল হল। সন্কে হল। রাত্রি হল। না। মেয়ে ফিরল না। সারা রাত স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই খাটের উপর ঠায় বসে রইল। সকাল হল। শিবকুমার কাজে বেরোল না। বউও না। এমনকী তাদের যে আরও দুটো বাচ্চা আছে, সে কথাও যেন তারা বেমানুম ভুলে গেল। ভুলে গেল, নিজেদের জন্য না করলেও ওদের জন্য রান্নাবান্না করতে হবে। রেডি করে স্কুলে পাঠাতে হবে।

ছোটকা এসে মাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, মা, দিদি কোথায়?

মঝলী ঘুরে ঘুরে এসেই তার বাবাকে বলতে লাগল, দিদিকে খুঁজতে যাবে না?

কিন্তু কারও কথাই যেন তাদের কানে ঢুকছে না। তারা যেন কেমন পাথর হয়ে গেছে।

সে দিন না। তার পরদিনও না। এমনকী তার পরদিনও তাদের মেয়ে বাড়িতে ফিরল না। চার দিনের দিন এল পুলিশ।

তারা যখন থানায় পৌঁছল, যে তাদের কখনও বসতে বলেনি, বরং দূর দূর করে প্রায় তাড়িয়ে দিত, সেই পুলিশ অফিসারটিই তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করল। টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসতে বলল। তার পর জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মেয়ে কোথায়?

— পেয়েছেন?

— না। আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের মেয়ে কোথায়?

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল।

— কী হল? তাকান আমার দিকে।

ওরা যখন মুখ তুলল, পুলিশ অফিসারটি দেখল, ওদের দু'জনের চোখই ছলছল করছে। তাই একটু থেমে ওদের কাছে জানতে চাইল, কবে পালিয়েছিল?

কাঁদোকাঁদো গলায় বড়কীর মা বলল, আজ চার দিন হয়ে গেল...

— থানায় মিসিং ডায়েরি করেননি কেন?

— আপনি বারণ করেছিলেন, তাই...

ড্রয়ার থেকে একচিলতে কাপড়ে মোড়া একটা পুঁটলি বের করে সামনের

টেবিলে রেখে কাপড়টা খুলতে খুলতে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখুন তো, এটা চিনতে পারেন কি না...

শিবকুমারের বউ দেখল, যেটা সে তার বিয়েতে পাওয়া রূপোর টিকলি, গলার মোটা হার আর পাশের গ্রামের রথের মেলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চাদের পায়ের এক পাটি তোড়া ভেঙে নিজের পছন্দ করা ডিজাইনে গড়িয়ে দিয়েছিল, স্যাকরাকে বলে যার মধ্যে বড় বড় করে 'বড়কী' লিখে দিয়েছিল. এটা সেই বালা! সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, এটা কোথায় পেলেন?

— আমরা আজ রাস্তার ধারের একটা ঝোপের আড়াল থেকে মুণ্ডুহীন একটা লাশ পেয়েছি। বারো-চোদ্দো বছর বছরের একটা মেয়ের। কিন্তু তার মুণ্ডুটা এখনও পাইনি। তল্লাশি চলছে। শরীরটাও এমন ভাবে বলসে গেছে যে, শনাক্ত করা মুশকিল। মনে হচ্ছে, বাচ্চা কাউকে না পেয়ে, একটু বড় বয়সের মেয়েকেই বলি দেওয়া হয়েছে।

— বলি! আঁতকে উঠল স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই।

— হ্যাঁ, বলি। প্রাথমিক তদন্তে সেটাই মনে হচ্ছে। কারণ, ডেডবডির পাশে বিশাল বড় একটা ফুলের মালাই শুধু নয়, অনেক কুঁচো ফুলও পাওয়া গেছে। আর যারা তাকে বলি দিয়েছে, তারা সেই লাশটা যে কে, সেটা যাতে কেউ চিনতে না পারে, সে জন্যই সম্ভবত তার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

শিউরে উঠল শিবকুমার। এই ভাবে একটা বাচ্চাকে মেরেছে...

চোখমুখ কুঁচকে শিবকুমারের বউ জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তার সঙ্গে আমার মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার কী সম্পর্ক?

— কারণ, ওই ডেডবডির হাতেই এই বালাটা ছিল...

দু'জনেই থরথর করে কেঁপে উঠল। শিবকুমারের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, মানে?

— চলুন, মর্গে যাই। দেখুন, আইডেনটিফাই করতে পারেন কি না...

উঠেপড়ে লাগল পুলিশ অফিসারটি। যে ভাবেই হোক এর খুনিকে খুঁজে বের করতেই হবে। সে নানান সোর্স মারফত খবর নিতে লাগল, তিন-চার দিনের মধ্যে কারও বাড়িতে কোনও ভিতপুজো হয়েছে কি না... কেউ কোনও মানসিকের পুজো দিয়েছে কি না... প্রথমে মনে হয়েছিল, যেখানে

মৃতদেহ পাওয়া গেছে, তার আশপাশেরই কোনও বাড়িতে ওকে বলি দেওয়া হয়েছে। কারণ, বলি দেওয়ার পর সেই দেহ বেশি দূর থেকে বয়ে নিয়ে এসে ওখানে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়। তা ছাড়া, দূর থেকে নিয়ে এলে বস্তায় ভরে নিয়ে আসতে হত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয়নি। তবু চার-পাঁচ দিনের মধ্যে পুজো হয়েছে, কাছাকাছি এ রকম একটাও বাড়ি যখন পাওয়া গেল না, তখন খোঁজ শুরু হল এলাকার বাইরেও।

তল্লাশি করতে করতে পাওয়া গেল তিনটে বাড়ি। প্রথম বাড়িটির কর্তার রোগ কিছুতেই সারছিল না। তাকে রোগমুক্ত করার জন্যই বাড়িতে মহাধুমধাম করে যজ্ঞ করা হয়েছে। এবং সেখানে নাকি বলিও দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে থানায় তুলে নিয়ে আসা হল সেই বাড়ির বড় ছেলেকে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, বলি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, তবে নরবলি নয়, এমনকী ছাগবলিও নয়, বলি দেওয়া হয়েছে একটা চালকুমড়োকে।

দ্বিতীয় বাড়িটাতেও পুজো হয়েছিল। ধুমধাম করেই হয়েছিল। তবে সেখানে নাকি কোনও বলিটলি দেওয়া হয়নি।

কিন্তু তৃতীয় বাড়িটার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে সম্ভব হতে পারেনি সেই পুলিশ অফিসারটি। তারা জানিয়েছিল, হ্যাঁ, আমরা বলি দিয়েছিলাম। তবে কোনও প্রাণ নয়, কাম-ক্রোধ-ঈর্ষা-লোভ-ভয়ের প্রতীক হিসেবে মাটি দিয়ে বানানো কয়েকটা পুতুলকে।

ওরা ও-কথা বললেও, পুলিশ অফিসারটির কাছে কিছুতেই যখন সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না, তখন আর এক ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বলল, আচ্ছা, বাড়ির উপরে যে মালাটা পাওয়া গেছে, সেটা কিন্তু সব দোকানে সচরাচর পাওয়া যায় না। অত মোটা গোরের মালা! আমার মনে হয়, অর্ডার দিয়ে বানানো। এখানে তো ফুলের দোকান মাত্র কয়েকটা। হাতে গোনা। একবার খোঁজ করে দেখলে হয় না?

মাথা কাত করেছিল পুলিশ অফিসারটি।

ওরা যখন আলোচনা করছে, তখনই, যেখানে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছিল, তার আশপাশে কাটা মুণ্ডুর তল্লাশি করতে থাকা তদন্তকারী এক অফিসার রাস্তার ধার থেকে কুড়িয়ে পেল একটা লেডিস রুমাল। আর ওটা দেখেই তার সন্দেহ হল, এই খুনের সঙ্গে কোনও মহিলা জড়িত। কোনও মহিলাই তাকে ফুঁসলে নিয়ে এসেছিল। আর সেই মহিলার সঙ্গে ও এসেছিল মানে,

ও তাকে খুব ভাল করেই চিনত। সে তার মায়ের কোনও বন্ধু হতে পারে। কোনও আত্মীয়া হতে পারে। আবার তাদের পরিবারের কোনও পরিচিতাও হতে পারে। তবে যে-ই হোক, সে একজন মহিলাই। কারণ, রুমালটা কোনও পুরুষের নয়, মহিলার।

এ ক’দিন আর রান্নাবান্না হয়নি শিবকুমারের বাড়িতে। মুড়ি খেয়েই কাটিয়েছে বাচ্চা দুটো। কিন্তু কত দিন আর ওদের মুড়ি খাইয়ে রাখা যায়! তাই চুল্লি ধরিয়ে ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ দেওয়ার জন্য আলু ফালি করছিল শিবকুমারের বউ। মেয়ের মৃতদেহ শনাক্ত করে আসার পর থেকে আর বাড়ির বাইরে বেরোয়নি সে। ক’দিন যাবদ বাড়িতেই আছে।

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজার কাছে এসে দেখে শুধু ওই পুলিশ অফিসারটিই নয়, তার সঙ্গে আরও তিন-চার জন পুলিশ। তার মধ্যে দু’জন মহিলা পুলিশও আছে। গলির মধ্যে পুলিশের ভ্যান ঢুকতে দেখে আশপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকজন। এত জন পুলিশ একসঙ্গে দেখে হকচকিয়ে গেল শিবকুমার। জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে বাবু?

— আপনার বউ কোথায়?

— ও তো ভিতরে। রান্না করছে।

ওটা শোনামাত্রই ধূপধাপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল তারা। দু’জন মহিলা পুলিশ রান্নাঘরে ঢুকে শিবকুমারের বউকে বের করে নিয়ে এল।

শিবকুমার আকাশ থেকে পড়ল। হকচকিয়ে গিয়ে পাগলের মতো বারবার একই প্রশ্ন করে যেতে লাগল, কী হয়েছে বাবু, কী হয়েছে? ও কী করেছে? ওকে ধরছেন কেন?

মুখঝামটা দিয়ে উঠেছিল পুলিশ অফিসারটি। কেন? ও একটা খুনি! বড়কীকে ও-ই খুন করেছে।

— না বাবু, না। ও খুন করতে পারে না।

পুলিশ অফিসারটি বলল, আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। বড়কীর মৃতদেহের পাশে যে ফুলের মালা পাওয়া গিয়েছিল, সেটা আপনার বউই কিনে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা ফুলওয়ালার কাছ থেকে জানতে পেরেছি। আর ও-ই যে গিয়েছিল, তার প্রমাণ— ওই মৃতদেহের খুব কাছেই পাওয়া গেছে আপনার বউয়ের একটা রুমাল।

— রুমাল? ওটা যে আমার বউয়েরই, সেটা বুঝলেন কী করে?



— ওটার এক কোনায় ছোট করে লেখা রয়েছে আপনার বউয়ের নামের প্রথম অক্ষর।

— তবু আমি বলছি, ও খুন করেনি। বেশ জোরের সঙ্গেই বলল শিবকুমার।

— ও খুন করেনি?

— না। ও খুন করেনি।

পুলিশ অফিসারটি জিঙেস করল, তা হলে কে করেছে? কে?

শিবকুমার খুব ধীর-স্থির হয়ে বলল, আমি।

থানায় এনে জবানবন্দি নেওয়া হল শিবকুমারের। কেন আপনি মেয়েকে মারতে গেলেন? আপনি তো আপনার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওকেই সব থেকে বেশি ভালবাসতেন?

মাথা নামিয়ে ছলছল চোখে শিবকুমার খুব ধীরে ধীরে বলল, ভালবাসতাম দেখেই তো মেরেছি।

— মানে?

— আপনারা তো সবই জানেন, চারিদিকে কী হচ্ছে। এই তো সে দিন একটা মেয়েকে রাস্তার মধ্যে একা পেয়ে কতকগুলো ছোকরা তুলে নিয়ে গিয়ে কী করল। তার পর তার রক্তমাথা দেহ পাওয়া গেল কাছেরই একটা নির্মীয়মাণ বাড়ির ভিতরে।

তেলেনি পাড়ার একটা বাড়িতে মা-বাবা না থাকার সুযোগে পাড়ারই একজন বাবার বয়সি মানুষ, ঘরে ঢুকে... সে সবাইকে বলে দেবে বলেছিল দেখে, হেঁসো দিয়ে তাকে কোপাতে শুরু করেছিল। তার পর তার চিৎকারে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে আসায় তাকে ওই রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেই সে চম্পট দেয়... পাড়ার লোকেরা ধরাধরি করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পরেই তার মৃত্যু হয়।

বুড়ো বটতলার ঘটনাটা তো আরও ভয়াবহ। মায়ের পাশে ঘুমিয়েছিল একরত্তি মেয়েটা। পরদিন সকালে তার বাবা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখে, সামনের আমগাছে তার মেয়ের দেহ ঝুলছে। পরনে কিচ্ছু নেই। পরে জানা গিয়েছিল, কারা নাকি রাতের অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে তার মায়ের পাশ থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর... পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে নাকি

বলা হয়েছিল, ওকে কয়েক জন মিলে পরপর... ছিঃ... আর তার ফলেই নাকি তার মৃত্যু হয়েছে।

তাই অনেকেই সন্দেহ করেছিল, মরে গেছে বুঝতে পেরেই ওই ছেলেগুলো তার গলায় গামছা বেঁধে ওই ভাবে আমগাছে লটকে দিয়েছিল। কেউ যদি দেখে ফেলে! সেই ভয়ে তাড়াছড়ো করতে গিয়ে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে তারা খেয়ালই করেনি, তার পা মাটি ছুঁয়ে আছে। যা সহজেই বুঝিয়ে দেয়, ওটা আত্মহত্যা নয়, খুন।

এ সব ওকে বলতে পারিনি। নিজের মেয়েকে কি এ সব বলা যায়! তবু নানা রকম ভাবে ভয় দেখিয়েছিলাম। যাতে ও ভুলভাল খপ্পরে না পড়ে। কিন্তু ও শোনেনি।

— কিন্তু ওকে মারলেন কেন? কী হয়েছিল?

— সে দিন ও স্কুলে যাওয়ার সময় দেখি ওর বইয়ের ব্যাগটা একেবারে ঢাউস হয়ে ফুলে আছে। দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাই বেরোবার আগে ও যখন খেতে বসেছিল, তখন চুপিচুপি ওর ব্যাগের চেন খুলে দেখি, তার মধ্যে বেশ কয়েকখানা সালোয়ার-কামিজ। বুঝতে পারলাম, ও আজ পালাবে।

ও বেরোতেই আমিও বেরোলাম। ওর পিছনে পিছনে খানিকটা গেলাম। হঠাৎ ও পিছন ফিরতেই আমাকে দেখে ফেলল। বলল, বাপু, তুমি আমার পিছু পিছু আসছ কেন?

আমি তখন ওকে বললাম, তোর সঙ্গে ক'টা কথা আছে মা। চল, ওই গাছতলায় গিয়ে একটু বসি।

ও বলল, আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।

আমি বললাম, তুই যে স্কুলে যাবি, তোর বইখাতা কোথায়— তোর ব্যাগে তো শুধু ক'খানা সালোয়ার-কামিজ।

ও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি স্কুলে যাব না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

ও বলল, আমার ভাল লাগে না।

আমি জানতে চাইলাম, তা হলে তোর কী ভাল লাগে?

ও বলল, যে দিকে দু'চোখ যায়, সে দিকে চলে যেতে।

আমি ফের জিজ্ঞেস করলাম, তুই চলে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিস?

ও বলল, হ্যাঁ। একেবারে চলে যাওয়ার জন্য। তোমরা কিন্তু আমাকে আর খুঁজো না।

আমি অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললাম, মা, আমার কথাটা শোন...

ও বলল, না। আমি তোমাদের কারও কোনও কথা শুনব না। আমার ভাল লাগে না। দম বন্ধ হয়ে আসে। আমাকে আটকিয়ো না।

আমি আবার জানতে চাইলাম, তা হলে তুই ঠিকই করে নিয়েছিস, চলে যাবি?

ও বলল, হ্যাঁ, চলে যাব। চিরদিনের জন্য চলে যাব।

আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। আমার চোখের সামনে একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল এই বয়সি মেয়েদের উপরে ঘটতে থাকা একের পর এক ন্যাকারজনক ঘটনা। ভাবলাম, মরার যখন জন্যই বেরোচ্ছে, তখন মরুক। আমি ওকে বললাম, যা। যাবিই যখন, যা। চিরদিনের জন্যই যা।

ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ও আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে বলল, যাব?

আমি বললাম, হ্যাঁ। যা। একেবারে যা। বলেই, আমার মধ্যে হঠাৎ কী হল বুঝতে পারলাম না, ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি ওর গলা টিপে ধরলাম।

তদন্তকারী অফিসারটি জিজ্ঞেস করল, গলা টিপে? তা হলে ওর ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা করল কে?

— আমিই।

— কখন?

— মারার পর আমি বুঝতে পারলাম আমি কী করে ফেলেছি। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই। নিজেকে পুলিশের হাতে সঁপে দিতেই পারতাম। কিন্তু দিলে, আমার সংসারটা ভেসে যাবে। আমার আরও ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে। তারা না খেতে পেয়েই মরে যাবে। তাই নিজেকে কোনও রকমে সামলে ঝোপের আড়ালে ওর দেহটা লুকিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে এলাম। বউকে সব বললাম। ও সব শুনে হাউহাউ করে কাঁদল। তার পর ও-ই বলল, পুলিশে ধরা পড়লে মুশকিল হবে। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে তুমি ধরা না পেরো। আমাদের কিন্তু আরও দুটো বাচ্চা আছে।

সে দিনই ঠিক করি, ধড় থেকে ওর মুণ্ডটা কেটে ফেলব। যাতে লোকেরা

ভাবে, আরও অনেক বাচ্চাদের মতো ওকেও কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে দিয়েছে।

— মুণ্ডুটা আপনিই কাটলেন?

— হ্যাঁ। রাত্রিবেলায় ও-দিকে খুব একটা কেউ যায় না। তাই রাতের অন্ধকারে আমিই কাটারি দিয়ে এক কোপে ওর দেহ থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলি।

— তা হলে মুণ্ডুটা কোথায়?

— ওর মুণ্ডু কাটার পর সেই মুণ্ডুটা খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে একটা গর্ত করে তার মধ্যে আমি পুঁতে দিই।

— তা হলে ওর শরীরটা পোড়াল কে?

— ওর মা। মেয়েকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য ওর মা-ই দুপুরবেলায় অর্ডার দিয়ে ওই মালাটা বানিয়েছিল। সন্ধ্যার পর ওটা দিতে গিয়ে দেখে, মেয়ের দেহটা অনেকখানি ফুলে গেছে। কতকগুলো পোকামাকড় ওকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে। ও সেটা সহ্য করতে পারেনি। তাই বেশি দামে বিক্রি করার জন্য তিল তিল করে জমানো দশ লিটারেরও বেশি কেরোসিন ভর্তি জারিকেনটা নিয়ে ও হাঁটা দিয়েছিল। মেয়ের গায়ে পুরোটা ঢেলে দিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে কোনও রকমে ছুটে পালিয়ে এসেছিল।

— ও... তা হলে পালাবার সময়ই বোধহয় ওর রুমালটা পড়ে গিয়েছিল, না?

— হতে পারে। কারণ, ওর শরীরে আগুন লাগানোর সময় শব্দ থাকলেও তার পরেই ও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এসেছিল। এসেই, আমার বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ও ভীষণ কেঁদেছিল। মাঝে মাঝেই আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ মুছছিল। ওর হাতে তখন কোনও রুমাল দেখিনি...

— প্রথমে যখন জেরা করেছিলাম, তখন এগুলো বলেননি কেন?

— বলিনি, কারণ, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না এটা ঘটেছে। এবং আমিই সেটা ঘটিয়েছি। তাই ওই ঘটনাটা আমরা দু'জনেই আমাদের জীবন থেকে একদম মুছে ফেলেছিলাম। এতটাই নিখুঁত ভাবে মুছেছিলাম যে, আমাদের মাথা থেকেই ওটা উবে গিয়েছিল। তাই ওই ঘটনা ঘটার পর দিনই, ও পালিয়ে গেছে মনে করে অন্যান্য বারের মতো ওকে খুঁজতে পর্যন্ত

বেরিয়েছিলাম। এবং তার পরও, প্রতিদিনই, আজ এখানে কাল সেখানে ওকে খুঁজতে বেরোতাম। আর প্রত্যেক বারই বাড়ি ফেরার সময় দেখতাম, মেয়ের জন্য তার মা দরজার সামনে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে আসতে দেখলেই ও ছুটে এসে জিজ্ঞেস করত, ও কোথায়?

আমি ছলছল চোখে বলতাম, না। বড়কীকে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

কেন জানি না, আমার বারবারই মনে হত, এটা একটা দুঃস্বপ্ন। যে কোনও সময় ভেঙে যাবে। ঘুম থেকে উঠে দেখব, বড়কী ছুটতে ছুটতে আমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে... ওই তো বড়কী... ওই তো... ওই তো ছুটতে ছুটতে আসছে... ওই তো...

শিবকুমার যখন জবানবন্দি দিচ্ছে, ওর বউ তখন ভাঙা রেকর্ডের মতো একটাই কথা বারবার বলে যাচ্ছে, সব দোষ আমার... সব দোষ আমার... সব দোষ আমার...



## ছিট ছিট দাগ

রত্নাক্ষ স্নান সেরে এসে দেখল তেরোটা মিসড কল। তেরোটাই ত্রিধার। এই ফোনটারই ভয় পাচ্ছিল সে। অন্যান্য দিনের মতো গতকালও অনেক রাত অবধি কথা হয়েছে ওর সঙ্গে। ও বলেছিল, না। তোকে একা যেতে হবে না। আমিই সঙ্গে করে তোকে ডাক্তার সান্যালের কাছে নিয়ে যাব।

ডাক্তার সান্যাল স্কিনের খুব নামকরা ডাক্তার। তাঁর আপয়েন্টমেন্ট পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার। এখন বারোশো টাকা ভিজিট। তাও ডেট পাওয়ার জন্য তিন মাস আগে থেকে নাম বুক করে রাখতে হয়। তবে হ্যাঁ, নিজের বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে একদিন সকালে ঘণ্টাতিনেক করে বসেন। মায়ের নামে চেষ্টার। মা খুব বর্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়ে হলেও বাবা ছিলেন অত্যন্ত ছাপোষা মানুষ। সামান্য একটা চাকরি করতেন। বাড়ির কেউ রাজি হয়নি দেখে তাঁর বিয়ের জন্য মায়ের রেখে যাওয়া গয়নাগাঁটি নিয়ে এক শাড়িতেই তার বাবার সঙ্গে জামশেদপুর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। একটা কলোনিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। খুব কষ্ট করেই চলতেন তাঁরা। তাঁদের যখন এই ছেলে হল, তখন তাকে তাঁর বাবা-দাদার মতো একজন ডাক্তার করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন তার মা।

নিজেই পড়াতেন। স্বামীর টাকায় কুলোত না। তাই বাড়ি থেকে আনা গয়না থেকে একটা-একটা করে বিক্রি করে তিনি তাঁর ছেলের লেখাপড়ার খরচ চালাতেন। সেটা দেখে তাঁর যে দু'-চার জন বন্ধু ছিলেন, তাঁদের একজন বলেছিলেন, কী রে, গয়না বিক্রি করে ছেলেকে মানুষ করছিস? তোকে শেষ বয়সে ছেলে দেখবে তো।

তিনি বলেছিলেন, আমি তো গয়না বিক্রি করছি না। আমি গয়না গড়াচ্ছি।

সত্যিই তাঁর ছেলে তাঁর অলস্কার হয়ে উঠেছিল। দুর্দান্ত ভাল রেজাল্ট করে



ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছিল। আর চান্স পেয়েই আধুনিক চিকিসা নিয়ে ও এত মেতে উঠেছিল যে শুধু সহপাঠীদেরই নয়, অনেক সিনিয়রকেও মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল।

সেই মা আর নেই। ডা. সান্যালও অনেক বড় হয়েছেন। যথেষ্ট টাকাপয়সা রোজগার করেছেন। বিশাল একটা প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়েছেন। সেই বাড়ির নাম রেখেছেন মায়ের নামে। যত কাজই থাক, প্রতি সপ্তাহে একেবারে নিয়ম করে সেখানে বসেন। আগে থেকে নাম লেখানোর কোনও ব্যাপার নেই। আগে আসার ভিত্তিতে প্রথম দশ জনকে তিনি দেখেন। না। বিনে পয়সায় নয়। তিনি মনে করেন, বিনে পয়সায় কিছু হয় না। সামান্য হলেও কিছু দাও। তাই টিকিটের দাম রেখেছেন এক টাকা। ফলে সকাল থেকে নয়, তাঁকে দেখাবার জন্য আগের দিন রাত থেকেই লাইন পড়ে যায়।

এই ডাক্তারের সঙ্গে রত্নাকর খুব ভাল সম্পর্ক। সম্পর্ক ভাল হওয়ার কারণ, ডাক্তার সান্যালের মা। তিনি ওকে খুব পছন্দ করতেন। ভালও বাসতেন। ডাক্তার সান্যাল তো তাঁর ডাক্তারি নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। তাই তাঁর ইচ্ছে থাকলেও মাকে খুব একটা সময় দিতে পারতেন না। তাঁর মা শনিবার-শনিবার উপোস করে বড় ঠাকুরের পূজা দিতে যেতেন পাশের পাড়ায়। টুকিটাকি জিনিস কিনতে যেতেন এ-দিকে ও-দিকে। কোনও কোনও দিন বাচ্চাদের একটা অনাথ আশ্রমে যেতেন ফলমূল দিতে।

এর পাশাপাশি তাঁর আর একটা শখ ছিল, ফুলগাছের। প্রায়ই সার আর চারা গাছ কেনার জন্য এ নার্সারি ও নার্সারিতে ঢুঁ মারতেন। তখন তাঁর সঙ্গে যেত এই রত্নাকর। রত্নাকর কোলেই মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তিনি। না। ডাক্তার ডাকার কোনও সুযোগ দেননি। চলন্ত গাড়িতে হঠাৎ বৃকে ব্যথা, ব্যাস। সব শেষ। সেই সুবাদেই ডাক্তার সান্যালের সঙ্গে রত্নাকর এত ভাল সম্পর্ক।

রত্নাকর সঙ্গে সেই ছোটবেলা থেকেই এক স্কুলে পড়ত ত্রিধা। ক্লাস এইট পর্যন্ত ওই স্কুলেই ছিল। তার পর ত্রিধারা বাড়ি কিনে চলে যায় বাইপাসের ধারে, পঞ্চগন্ধ্য গ্রামে। বহু দিন কোনও যোগাযোগ ছিল না। এত দিন বাদে আবার নতুন করে দু'জনের দেখা। ভাল লাগা।

এই নতুন আলাপ তখন সবেমাত্র তিন দিন গড়িয়ে চার দিনে পড়েছে। প্রেম হব হব করছে। তখন একদিন গড়িয়াহাট মোড়ের 'আলোয়া'য় সিনেমা

দেখতে গিয়েছিল ওরা। হল থেকে বেরিয়ে দু'জনে সবে রাস্তা পার হতে যাবে, হঠাৎ তাদের সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা ঝকঝকে অডি গাড়ি। পেছনের সিটের জানালার কালো কাচ নামিয়ে মুখ বার করে রত্নাক্ষকে গাড়ির সওয়ারি জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিকে যাবি?

রত্নাক্ষকে কথা বলতে দেখে ত্রিধা একটু সরে দাঁড়াল। লোকটাকে সে চেনে না। দু'জনকে পাশাপাশি দেখলে কী ভাববে কে জানে! যদি ওদের বাড়ির কেউ হয়! যদি কেউ নাও হয়, ওদের দেখে অতি উৎসাহী হয়ে যদি ওদের বাড়িতে গিয়ে বলে দেয়! সব জানাজানি হয়ে যাবে না! ওদের নিজেদের মধ্যেই এখনও সে রকম কিছু গড়ে ওঠেনি। রত্নাক্ষর সমস্যা হবে না! তবু লোকটাকে আড়চোখে দেখার চেষ্টা করতে লাগল ত্রিধা। গাড়িঘোড়ার শব্দের মধ্যেও কান খাড়া করল, উনি কী বলছেন, যদি শোনা যায়!

রত্নাক্ষ জানে লোকটার বাড়ি ফার্ন রোডে। তাই সে বলল, আমি সোজা যাব। রুবির দিকে।

— রুবি? চলে আয়। আমি তো রুবি হয়েই যাব।

এই রে, সেরেছে... নিজের মনেই বিড়বিড় করল রত্নাক্ষ। কেন যে রুবির দিকে বলতে গেলাম!

— কী ভাবছিস? উঠে আয়। বলেই, গেটের লক খুলে সিটের ও দিকে সরে গেলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে আলতো করে দরজা ঠেলে জানালার কাছে মুখ নিয়ে রত্নাক্ষ বলল, তার আগে আমাকে একবার ভারত সেবাশ্রম সংঘে যেতে হবে। তাই...

— ও... ঠিক আছে, যা তা হলে। ভাল আছিস তো?

— হ্যাঁ। আপনি?

— এই তো... অনেক দিন তো আসিস না। মা নেই বলে কি আমরাও নেই? একদিন চলে আয় না...

— হ্যাঁ, যাব। এর মধ্যেই যাব। এখন আছেন তো?

— হ্যাঁ, এই মাসটা আছি। তার পর চার মাসের জন্য একটু বাইরে যাব।

পেছনে পরপর কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। তারা ঘনঘন হর্ন বাজাচ্ছে। অটোগুলো পাশ কাটিয়ে গাড়ির ও পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে তাদের দিকে বিরক্তিসূচক চাহনি ছুড়ে দিচ্ছে। তাই রত্নাক্ষ বলল, ঠিক আছে,

ঠিক আছে... এর মধ্যেই যাব। বলেই, জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিল।

গাড়িটা জানালার কাচ তুলতে তুলতে হুস করে চলে গেল। গাড়িটা যেতেই ত্রিধা বলল, ইনি ডাক্তার সান্যাল না?

— হ্যাঁ। কেন? তুমি চেনো?

— না না। আমি চিনব কী করে! আমি বলছি, উনি নিজে থেকে গাড়ি থামিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বললেন!

— হ্যাঁ, না বলার কী আছে! উনিও মানুষ। আমিও মানুষ।

গদগদ হয়ে ত্রিধা বলেছিল, উনি কত বড় ডাক্তার, জানো?

— উনি কত বড় ডাক্তার, আমি জানি না। তবে উনি কত বড় মাপের মানুষ, সেটা আমি জানি।

— তোমাকে খুব ভাল করে চেনেন, না?

রত্নাক্ষ বলেছিল, কেউ যদি কোনও ভাইকে জিজ্ঞেস করে, তার দাদা তাকে খুব ভাল করে চেনে কি না, সেই প্রশ্নটা যেমন হবে, তোমার এই প্রশ্নটাও ঠিক সেই রকম...

— উনি তোমার দাদা?

— না। ঠিক দাদা নন। দাদার মতো। তবে দাদার চেয়েও বেশি...

ওটা শুনেই ত্রিধা বলেছিল, তাই? তা হলে ওঁর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্সড করিয়ে দাও না...

— অ্যাপয়েন্টমেন্ট! কেন? কার জন্য?

— এই দ্যাখো না, গালের এই ছিট ছিট দাগটা... আগে এইটুকুনি ছোট্ট একটা তিলের মতো ছিল। এত গাঢ়ও ছিল না। যত দিন যাচ্ছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে। এই ক'বছরে এত বেড়ে গেছে না... কারও সামনে যেতে বড় লজ্জা করে।

— কোনও ডাক্তার দেখাওনি?

— কত ডাক্তার দেখিয়েছি। প্রথমে আমাদের পাড়ার এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে দেখাতাম। কমছে না দেখে কে যেন বলেছিল, কোনও কবিরাজকে দেখাতে। সে-ই বোধহয় কারও নাম-ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিল। বেশ কিছু দিন সেই কবিরাজকেও দেখিয়েছিলাম। কিন্তু যে কে সে-ই। কোনও লাভ হয়নি।

— তার পর?

— আমার বাবাকে তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, ওই সব কবিরাজিটাজি,

হোমিওপ্যাথিট্যাথি ছাড়। মেয়েকে ভাল কোনও ডাক্তার দেখা।

— তার পর?

— আমাদের ওখানকার একজন বেশ নামকরা ডাক্তারকে দেখালাম। তিনিই দেখেটেখে রেফার করে দিলেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ট্রপিক্যাল। সেই সকালবেলায় যেতে হত। ওরা প্রথমে ভেবেছিল, আমার বুঝি কুষ্ঠ হয়েছে। তার পর ওখানকারই একজন বড় ডাক্তার বললেন, না না, কুষ্ঠ না। এটা একটা মামুলি চর্মরোগ। তবে অনেক দিনের পুরনো তো... গেড়ে বসেছে। সারতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু অত সময় কার আছে! তাই বাবা বললেন, মেয়ে বলে কথা। গালে ও রকম দাগ থাকলে কেউ বিয়ে করবে? যত টাকা লাগুক রঞ্জিত পাঁজাকে দেখাব। উনি তখন স্কিনের এক নম্বর ডাক্তার। যে দিন বাবা আমাকে নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন, তার আগের দিন রাত্রেই শুনলাম, তিনি মারা গেছেন। আমি তখন কত ছোট...

— তার পর?

— তার পর আর কী? একের পর এক প্রচুর ডাক্তার দেখিয়েছি। পাতার পর পাতা ওষুধ খেয়েছি। এ মলম লাগিয়েছি। সে মলম লাগিয়েছি। কিন্তু যে কে সে-ই। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি।

— ট্রপিক্যালের আর যাওনি?

— নাঃ।

— কেন?

— রোজ রোজ কে নিয়ে যাবে?

— নিয়ে যাওয়ার কী আছে? তুমি কি বাচ্চা নাকি, কোলে করে নিয়ে যেতে হবে? একাই যাবে।

— ও বাবা, মেয়ে না! আমাদের বাড়ি থেকে ছাড়বেই না। ভীষণ স্ত্রিষ্ট।

— তার পর?

— তার পর এই তো কিছু দিন আগে একটা চ্যানেলে এই ডাক্তারকে দেখলাম। তখনই জানতে পারলাম এঁর কথা। শেষ চেষ্টা হিসেবে এঁকে একবার দেখাব ঠিকও করলাম। অনেক খুঁজেপেতে ওঁর ঠিকানাও জোগাড় করলাম। যোগাযোগও করলাম। কিন্তু যা শুনলাম! তিন মাসের আগে ওঁর কোনও ডেটই পাওয়া যাবে না...

— তুমি দেখাতে চাও?

হাতের মুঠোয় যেন স্বর্গ পেয়েছে, এমন ভাবে ত্রিধা বলল, দ্যাখো না, যদি একটা ডেট পাওয়া যায়...

— ডেট পাওয়ার কী আছে? কবে যেতে চাও বলবে, নিয়ে যাব।

— আগে তো জানতে হবে উনি কোথায় কোথায় বসেন?

— তোমাকে নিয়ে গেলে কি আর ওঁর চেম্বারে নিয়ে যাব?

— তবে?

সহজ ভঙ্গিতে রত্নাক্ষ বলল, ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাব।

— বাড়িতে!

— হ্যাঁ। আরে বাবা, আমার সঙ্গে কি আজকের সম্পর্ক নাকি?

সে দিনই ত্রিধা বলেছিল, তা হলে তুমি ডাক্তার সান্যালের সঙ্গে কথা বলো না... উনি যদি কাছাকাছি কোনও একটা ডেট দিয়ে দেন...

— ডেট নেওয়ার কী আছে? তুমি যে দিন যেতে চাও বলবে, নিয়ে যাব।

— না... উনি কবে থাকবেন, না-থাকবেন...

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রত্নাক্ষ বলল, ঠিক আছে। আমি কালই কথা বলে নেব। চলো।

কিন্তু না। সেই কাল আর কোনও দিনই আসেনি রত্নাক্ষর। অবশ্য আসেনি বললে ভুল হবে, ও-ই চায়নি। ডাক্তার দেখালে... না। থাক।

কিন্তু কত কাল আর এ ভাবে ওকে এটা-সেটা বানিয়ে বানিয়ে বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়! যত বার ত্রিধা জিজ্ঞেস করে, কী গো, ডাক্তার সান্যালের সঙ্গে কথা হয়েছে? তত বারই কোনও না-কোনও একটা অজুহাত তুলে ধরে ও। আজ ফোনে পাইনি। কিংবা উনি মিটিংয়ে ছিলেন। বা অপারেশনে ছিলেন। নয়তো, কয়েক দিনের জন্য উনি একটু বাইরে গেছেন। অথবা যত বারই করেছি, শুধু এনগেজড আর এনগেজড...

কিন্তু না। কাল আর কোনও অজুহাত খুঁজে পায়নি ও। বাইপাসের ধার ঘেঁষে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ত্রিধা এমন করে বলছিল যে, ডাক্তার সান্যালকে ফোন না করে ও আর পারেনি। বাধ্য হয়ে তার সামনেই ফোন করেছিল। রিং হতেই না-হতেই ত্রিধা বলেছিল, স্পিকারটা অন করো না...

অন করো... অন করো...

ওর কোনও উপায় ছিল না। স্পিকার অন করে দিয়েছিল। অন করতেই, ও প্রান্ত থেকে ভেসে এসেছিল, হ্যালো...

— আমি রত্নাক বলছি।

— হ্যাঁ, বল...

— বলছিলাম, আমার পরিচিত একটি মেয়ে আপনাকে দেখাতে চায়, তাই একটা ডেট...

— আরে, তোর পরিচিত লোককে নিয়ে আসবি, এতে এত হেজিটেট করার কী আছে! নিয়ে আয়।

— কবে যাব?

— কাল সকালে তো আমি বাড়িতে বসব। চলে আয়।

— সে তো দশ জনের বেশি দেখেন না।

— না-হয় তোর জন্য কাল এগারো জনকে দেখব, কী আছে, চলে আয়।

— ঠিক আছে।

এত সহজে যে আপয়েন্টমেন্টটা হয়ে যাবে, ত্রিধা ভাবতেই পারেনি। সে একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তার পরে যতক্ষণ দু'জনে একসঙ্গে ছিল, আর অন্য কোনও কথা নয়, শুধু ডাক্তারকে নিয়েই কথা হয়েছিল।

রাত্রেও তাই। ফোন ছাড়ার আগে ত্রিধা জিজ্ঞেস করেছিল, তা হলে কাল কখন বেরোব?

রত্নাক বলেছিল, সকালে।

— সে তো জানি। কিন্তু সকালে মানে কত সকালে? ক'টা নাগাদ? আমাদের যেতেও তো সময় লাগবে।

— ওই বেরিয়ো না... তোমার সুবিধে মতো... বেরোবার আগে আমাকে শুধু একটা ফোন করে নিয়ো।

মুখে এ কথা বললেও, রত্নাকর একদম ইচ্ছে নয়, ত্রিধাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার। কারণ, এই ডাক্তার সান্যালদা চর্মরোগের ক্ষেত্রে একেবারে ধন্যন্তরী। তাঁর বিশ্বাস, একবার গেলেই উনি এমন ওষুধ দেবেন যে, দু'-চার দিনের মধ্যেই ত্রিধার গালের ওই ছিট ছিট দাগগুলো একবারে মিলিয়ে যাবে। আর ওটা মিলিয়ে গেলেই, সে মুখ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। শুধু সুন্দর হলে



না-হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, যে মুখ নিয়ে আর পাঁচ জনের সামনে যেতে তার লজ্জা করে, যে মুখ নিয়ে সে হীনস্বন্যতায় ভোগে, কারও সামনে যেতে চায় না— সে সব একেবারে চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে। তখন!

ও ত্রিধাকে বলেছিল, বেরোবার আগে আমাকে শুধু একটা ফোন করে নিয়ো। কিন্তু না। একটা নয়, রত্নাক্ষ স্নান করে এসে দেখল, তার মোবাইলে তেরোটা মিসড্ কল। তেরোটাই ত্রিধার। এই ফোনটারই ভয় পাচ্ছিল সে। এখন উপায়! কিছু তো একটা বলতে হবে! কিন্তু কী বলবে ও! কী!

না। ত্রিধাকে নয়। ও ফোন করল ডাক্তার সান্যালকে। যত বার ফোন করল, প্রত্যেক বারই এনগেজড টোন। আর যত এনগেজড টোন পেতে লাগল, ততই ও অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তার পরেই ও আবার যখন ফোন করল, তখন একটা রিং হতে না-হতেই ফোন ধরলেন উনি। সঙ্গে সঙ্গে ও বলল, হ্যালো, আমি রত্নাক্ষ। বলছিলাম কী, আজকে যাকে নিয়ে আপনার ওখানে যাওয়ার কথা ছিল, সে এখন ফোন করে জানাল, তার মা নাকি গতকাল রাতে হঠাৎ করেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে হয়েছে। সারা রাত নাকি ওরা ওখানেই ছিল। ফলে আজ ওর পক্ষে যাওয়া...

— ঠিক আছে। অন্য দিন নিয়ে আসিস। ও.কে।

ডাক্তার সান্যাল লাইন কাটতেই রত্নাক্ষ ফোন করল ত্রিধাকে। ও কিছু বলার আগেই ত্রিধা বলল, কী হল, তখন থেকে ফোন করছি। কোথায় ছিলে?

— ডাক্তার সান্যালের বাড়িতে।

— ডাক্তার সান্যালের বাড়িতে!

— তা হলে আর বলছি কী। এই তো ওঁর বাড়ি থেকে এলাম।

— কী হয়েছে?

— না। ওঁর কিছু হয়নি। হয়েছে ওঁর বাবার। আসলে আজ ভোররাতে উনি নাকি বাথরুমে পড়ে গেছেন। পড়ে গিয়েই একটা মাইল্ড স্ট্রোকের মতো... বয়স হয়েছে তো...

— সে কী! এখন কেমন আছেন?

— এখন বিপদটা গেছে। ভার্গিস উনি বাড়িতে ছিলেন। না-হলে যে কী হত, কে জানে! উনি অবশ্য রিস্ক নেননি। সঙ্গে সঙ্গে নার্সিংহোমে নিয়ে

গিয়েছিলেন। বড় বড় ডাক্তাররা তো সবই ওঁর বন্ধুবান্ধব। তাঁরা নাকি বলেছেন, এ যাত্রা উনি বেঁচে গেলেন... তবে ডাক্তাররা ও কথা বললেও, ডাক্তার সান্যাল কিন্তু খুব টেনশনে আছেন। তারই মধ্যে কে যেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাড়িতে আপনার জন্য পেশেন্টরা তো সব বসে আছেন, কী করবেন? উনি তখন আমার সামনেই তাঁকে ফোন করে বাড়িতে জানিয়ে দিতে বললেন, আজ আর উনি বসবেন না... কেউ যেন অপেক্ষা না করেন...

— ও... তাই...

— তোমাকে অন্য কোনও দিন নিয়ে যাব। কেমন?

— না না। সে ঠিক আছে। অন্য দিন যাবখন। আমি সেটা বলছি না। বলছি, তুমি বরং পারলে বেলার দিকে একবার গিয়ে ওঁকে দেখে এসো। বুঝেছ? তুমি ফোন ধরছ না দেখে আমি তো ভাবলাম তোমার আবার কী হল...

— আরে, তাড়াছড়োর মাথায় বেরিয়েছি তো... ফোন নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

— ও... এখন কী করছ?

— এই তো সবে ওখান থেকে এলাম। এখনও হাতমুখ ধুইনি।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাও। ফ্রেশ হয়ে নাও। পরে কথা হবে।

অন্য সময় হলে ইনিয়ে-বিনিয়ে রত্নাক্ষ আরও কিছুক্ষণ কথা বলত। কিন্তু না। আজ আর একটাও কথা বাড়াল না ও। কী বলতে কী বলে ফেলবে, তখন আর এক কলেঙ্কারি। কোনও মিথ্যেকে ও বেশিক্ষণ টেনে নিয়ে যেতে পারে না। ধরা পড়ে যেত। সে জন্যই তাড়াতাড়ি ফোনটা ছেড়ে দিল।

ফোন ছাড়ার পরেই তার মনে হল, এটা কি ও ঠিক করল! ও যে ভয়টা করছে... গালের দাগগুলো মিলিয়ে গেলে সে আরও দেখতে সুন্দর হয়ে যাবে। অনায়াসে এখানে-ওখানে যাবে। এর-তার সঙ্গে আলাপ হবে। আর সে রকম কোনও ছেলে পেয়ে গেলেই আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব থেকে মেলামেশা। মেলামেশা থেকে ঘনিষ্ঠতা। ঘনিষ্ঠতা থেকে নিবিড় সম্পর্ক। আর অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠলেই আস্তে আস্তে তাকে দূরে সরে যেতে হবে... এটা তো অমূলকও হতে পারে। পারেই। তা হলে!

আমি কি তাকে ডাক্তার সান্যালের কাছে নিয়ে যাব! না, যাব না! যাব! না, যাব না! যাব! না, যাব না! রত্নাক্ষ ভাবতে লাগল। ভাবতেই লাগল।

## ৪৫

### ধর্ম-অধর্ম

সকালবেলায় নিখিল এসে বলল, কী গো জগবন্ধুদা, এখন কেমন আছ? জ্বর ছেড়েছে?

জগবন্ধু পিঠের তলায় বালিশ গুঁজে আধশোয়া অবস্থায় বললেন, তা ছেড়েছে। তবে একদম কাহিল হয়ে গেছি রে। গায়ে কোনও জোরই পাচ্ছি না। একদিনের জ্বরেই কেমন যেন কাবু করে দিয়েছে। তা, কাল কি গিয়েছিলি?

— যাব না? উফ্, কাল যা হল! আমার মনে হয়, এর পর কোথাও কোনও অনুষ্ঠান করার আগে, কাকে কাকে আমন্ত্রণ জানাবেন, তার তালিকা তৈরি করার সময় এই সংগঠনের উদ্যোক্তারা অন্তত হাজার-একবার ভাববেন। শুধু ভাববেনই না, তাঁদের ঠিকুজি-কোষ্ঠী জেনে, তবেই আমন্ত্রণ পাঠাবেন।

— কেন রে? কাল আবার কী হল? জগবন্ধু উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা।

দিন কতক আগেই প্রাণপ্রিয় মহারাজের চিঠি পেয়েছিলেন জগবন্ধু। প্রাণপ্রিয় তাঁর খুব ছোটবেলাকার বন্ধু। এখন ভোল পাণ্টে সবার কাছে প্রাণপ্রিয় মহারাজ হয়ে উঠলেও, গুঁর আসল নাম ছিল প্রাণগোপাল নন্দী। মাঝখানে বহু দিন কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবে মাঝে মাঝেই এর তার কাছে খবর পেতেন, উনি এখন গোটা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন। যখন-তখন উড়ে যাচ্ছেন আমেরিকা, চীন, জাপান, ইংল্যান্ড। ধন্য ধন্য পড়ে যাচ্ছে চারিদিকে। যেখানেই উনি বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন, সেখানেই গুঁর কথা শুনে শ্রোতারা নাকি এতটাই মোহিত হয়ে যাচ্ছেন যে, আমিষ ছাড়া যাঁদের মুখে এত দিন কিছুই রুচত না, তাঁরাও সে সব ছেড়েছুড়ে ঘাসপাতা খেতে শুরু করে দিচ্ছেন।

জগবন্ধু এ সব যত শোনেন, ততই অবাক হন। কারণ, প্রাণগোপালকে

উনি খুব ভাল করেই চেনেন। তাঁর মনে পড়ে যায়, সেই সব দিনের কথা।

তখনও গুঁরা হায়ার সেকেন্ডারি দেননি। এই প্রাণগোপালই একবার কালীপুজোর আগের রাতে, যেখানে গুঁরা আড্ডা মারতেন, সেই পোড়ো শিবমন্দিরে বড় একটা মুখ-বন্ধ চটের ব্যাগ নিয়ে এসে হাজির। ব্যাগের ভিতরে কী যেন খানিক বাদে-বাদেই ছটফট করছিল। জিজ্ঞেস করতেই উনি বলেছিলেন, ‘পাশের পাড়ার অবনীদা বাড়ি ছিলেন না। সেই সুযোগে পাইপ বেয়ে তাঁর বাড়ির ছাদে উঠে খোপ খোপ করা কাঠের পেটির ছিটকিনি খুলে তাঁর পোষা কতকগুলো পায়রাকে চুরি করে নিয়ে এসেছি। আজ রাতে আমরা সবাই মিলে এগুলো রান্না করে খাব।’

কিন্তু কাটবে কে? বলতেই, উনি বলেছিলেন, এগুলো আবার কাটার কী আছে? আমি তো আছি।

সেই রাতেই ওই পায়রাগুলোর ঘাড় মটকে, ছাল ছাড়িয়ে ছোট ছোট পিস করে উনিই কেটে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ হাত লাগালেও মূলত রান্নাটা উনি একাই করেছিলেন। সে দিন এত আনন্দ হয়েছিল যে, সেই রাতের চুইভাতির কথা এখনও ভোলেননি তিনি।

আর একবার, মূলত গুঁরই পাল্লায় পড়ে কয়েক জন বন্ধু মিলে ‘আমরা বড় হয়ে গেছি’ প্রমাণ করার জন্য শুধু সিগারেট ফুঁকেই ক্ষান্ত হননি, এর-ওর পকেট হাতড়ে যা জোগাড় হয়েছিল, তাই দিয়েই কয়েক ক্রোশ দূরের হাইওয়ের ধারের একটা পাতি হোটেলে ঢুকে ‘আমরা ও সব জাতপাত মানি না’ জাহির করার জন্য ঘটা করে হাতরুটি আর গরুর মাংস খেয়েছিলেন।

দিনের পর দিন রং-বেরঙের প্রজাপতি ধরে একটা বড় কাচের বয়ামে ভরে রাখতেন প্রাণগোপাল। এবং দিন কতক পরে ওগুলো মরে গেলে, সেগুলি ফেলে দিয়ে ফের প্রজাপতি ধরে, মরে যাবে জেনেও সেই বয়ামে ভরে রাখতেন।

যিনি এই রকম একের পর এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন, সেই প্রাণগোপালই কিনা এখন প্রাণহিত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন! আর তাঁর কথা শোনার জন্য পড়াশোনা জানা সমাজের বিদগ্ধ লোকেরা সেখানে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছেন! কী হল কি দেশটার!

তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু সেই প্রাণগোপাল, খুড়ি, প্রাণপ্রিয় মহারাজ, বলতে গেলে গোটা পৃথিবী জয় করে দিন কতক আগে দেশে ফিরেছেন।

ফিরেছেন এই কলকাতায়। জীবনে সে ভাবে কিছুই করতে পারেননি উনি। না-ছিলেন লেখাপড়ায় ভাল, না-জোটাতে পেরেছিলেন ভদ্রস্থ কোনও চাকরি। তার পর হঠাৎ করেই কোথা থেকে যে কী হল, কাউকে কিছু না জানিয়েই ছট করে উধাও হয়ে গেলেন উনি।

লোকমুখে জগবন্ধু শুনেছিলেন, উনি নাকি মাঝেমধ্যেই দেশে ফেরেন। দু'-চার দিন থাকেনও। তার পরেই আবার পাড়ি দেন ভিনদেশে। গোটা বিশ্ব জুড়েই নাকি তাঁর ভক্ত ছড়িয়ে আছে। তা, এত দিন পরে দেশে ফিরে ওঁর বুকি তাঁর কথা মনে পড়েছে, তাই ঠিকানা জোগাড় করে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আগের রাত থেকেই প্রচণ্ড জ্বর হওয়ায় উনি আর যেতে পারেননি।

কিন্তু যেহেতু প্রত্যেকের নামে নামে আসন-সংরক্ষিত করা, তাই উনি আমন্ত্রণপত্রটা নষ্ট করতে চাননি। দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন এই নিখিলকে।

কার্ডে উল্লেখিত অনুরোধ অনুযায়ী অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক পনেরো মিনিট আগেই প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে পড়েছিল নিখিল। ঢুকেই বুঝেছিল, আমন্ত্রণপত্রের অনুরোধ শুধু সে-ই নয়, তার মতো সকলেই মেনেছেন। এবং আমন্ত্রণপত্রের নির্দেশ অনুসারে কেউই বারো বছরের নীচের কোনও বাচ্চাকে সঙ্গে করে আনেননি। আর, যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সম্ভবত সোজা বাড়ি থেকেই এসেছেন। একেবারে ধোপদুরস্থ পোশাকে। এবং যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কেউই এলেবেলে নন, প্রত্যেকেই জ্ঞানীগুণী, সমাজের বিশিষ্ট এক-একজন কেউকেটা। গোটা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে অদ্ভুত এক সুগন্ধি ম' ম' করছে। ফুলে ফুলে সাজানো চারিদিক।

ঠিক ছ'টায় প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিভে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পর্দাও উঠে গেল। মঞ্চে তখন কারুকাজ করা রাজসিক সিংহাসনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন— প্রাণপ্রিয় মহারাজ।

তাকে দেখেই সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়াল নিখিলও। কিন্তু না। কাউকেই এক মুহূর্তের বেশি দাঁড়াতে হল না। মহারাজের হাতের ইশারায় সবাই যে যাঁর আসনে বসে পড়লেন।

নেপথ্যে শুরু হল জলদগম্ভীর গলায় স্তোত্রপাঠ। তার পর মহারাজকে মাল্যদান। চন্দন পরানো। উত্তরীয় পরানোর পালা। পাশাপাশি তিন মন্ত্রী এবং

পাঁচ জন মাল্টি মিলিওনেয়ার বাবসায়ীকে প্রধান অতিথি হিসেবে মাঞ্চে ডেকে বরণও করে নেওয়া হল। তাঁদের মধ্য থেকেই দু’-চার জন সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। যার মূল বক্তব্য— প্রাণপ্রিয় মহারাজ কত বড় মাপের মানুষ। তাঁর উদ্দেশ্য কত মহৎ এবং তিনিই যে স্বয়ং ঈশ্বরের দূত, তা কী ভাবে বারবার প্রমাণিত হয়েছে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশেষে শুরু হল মূল অনুষ্ঠান। প্রাণপ্রিয় মহারাজের ভাষণ। উনি বলতে লাগলেন— প্রাণিহত্যা মহাপাপ। কেউ কখনও ভুল করেও প্রাণিহত্যা করবেন না। কারণ, এই পৃথিবীতে আপনার যেমন বেঁচে থাকার অধিকার আছে, একটা ক্ষুদ্র-অতিক্ষুদ্র প্রাণীরও সমান অধিকার আছে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার। দেখবেন, বন্যা বা দুর্যোগের সময় চারিদিক যখন জলের তলায়, তখন একই গাছের ডালে বিযুক্ত সাপ আর নিরীহ মানুষ কী সুন্দর পাশাপাশি অবস্থান করে। কেউ কাউকে উতালু করে না। ওই ভাবে থাকুন না... না। কেউ কাউকে হত্যা করবেন না। দুর্বল দেখে আপনি যদি কোনও প্রাণীকে হত্যা করেন, তা হলে আপনার চেয়ে শক্তিশালী কোনও প্রাণী এসে কিন্তু আপনাকে হত্যা করবে। সুতরাং নো প্রাণিহত্যা। না। মাছ খাবেন না। মাংস খাবেন না...

ঘোষক আগেই বলে দিয়েছিলেন, মহারাজের বক্তব্যের পরে যদি কারও মনে কোনও প্রশ্ন উঁকি মারে, তা হলে তিনি সেটা সরাসরি মহারাজকে করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই অতি উৎসাহী এক শ্রোতা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকেই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, মাছ খাব না! মাংস খাব না! তা হলে খাব কী?

এতক্ষণ গোটা প্রেক্ষাগৃহ নিশ্চুপ ছিল। এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন প্রাণপ্রিয় মহারাজও। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই উনি বললেন, কে বললেন? উঠে দাঁড়ান।

উনি এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে একটা হালকা আলো ছড়িয়ে পড়ল। সেই আলোয় চোখ ঘোরাতেই নিখিল দেখল, মাঝামাঝি রোয়ের একটি সিটের সামনে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু ওরই নয়, সবার চোখই তখন তাঁর দিকে। কারণ, একটা তীব্র আলোর গোলক তাঁর উপরে পরে আর পাঁচ জন থেকে তাঁকে আলাদা করে দিয়েছে। আর তাতেই, প্রশ্নটা যে উনিই করেছেন এবং মহারাজ যে তাঁকেই উঠে দাঁড়াতে বলেছেন, সেটা বুঝতে কারওই কোনও অসুবিধে হল না।



মহারাজ বললেন, ওকে মাইক্রোফোন দাও।

কেউ এতক্ষণ খেয়ালই করেননি, গোটা প্রেক্ষাগৃহ জুড়েই চার-ছ'টা রোয়ের পর পরই কর্ডলেস মাইক্রোফোন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উদ্যোক্তাদের লোকেরা। তাঁদেরই একজন তড়িঘড়ি করে তাঁর দিকে মাইক্রোফোন এগিয়ে দিলেন।

মহারাজ বললেন, বলুন, কী বলছেন...

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে 'কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না' ভেবে অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু আলো ঝলমল প্রেক্ষাগৃহে, কানায় কানায় ভর্তি প্রেক্ষাগৃহে, বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীজনদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাওয়াটা যে কত কঠিন কাজ, সেটা বোধহয় এই প্রথম বুঝতে পারলেন উনি। তবু মহারাজ বলেছেন দেখে, বারকতক ঢোক গিলে, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে লোকটি বললেন, না... বলছিলাম... মাছ মাংস যদি না খাই, তা হলে খাব কী?

মহারাজ বললেন, কেন? মাছ মাংস ছাড়া কি আর কিছু খাবার নেই? ফল মূল আনাজপত্র... ও সব খান... বলতে বলতে উনি ধর্মের দিকে চলে গেলেন। বললেন, আমাদের ধর্ম বলেছে, জীবহত্যা মহাপাপ। জীব মানে প্রাণী। প্রাণী মানে কিন্তু শুধু মানুষ নয়, গরু, ছাগল, ভেড়াও নয়, এমনকী আরশোলা, টিকটিকিও নয়, মনে রাখবেন, প্রাণী মানে যার প্রাণ আছে, সে-ই প্রাণী। অর্থাৎ, একটা পিঁপড়েও কিন্তু প্রাণী। সুতরাং আইনে না বললেও, আমাদের ধর্ম কিন্তু বলেছে, একটা মানুষকে খুন করলে যে পাপ হয়, একটা পিঁপড়েকে খুন করলেও সেই একই পাপ হয়। তা হলে আপনারাই বলুন, অন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, শুধু মাত্র নিজেদের পেট ভরানোর জন্য আপনারা কি সেই পাপ করবেন? না, আমাদের ধর্ম মেনে নিরামিষ খাবেন?

উনি আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রাণপ্রিয় মহারাজের কথা শুনে লোকটা দমে গেলেও নিখিল আর স্থির থাকতে পারল না। উসখুস করতে লাগল। আর এত লোকের মধ্যেও সেটা নজর কাড়ল মহারাজের। তাই তাকে ও রকম করতে দেখে মহারাজ প্রসন্ন করলেন, আপনি কি কিছু বলবেন?

নিখিল আশপাশে তাকাতে লাগল। কাকে বলছেন এ কথা!

ঠিক তখনই মহারাজ বললেন, আপনি আপনি, আপনাকে বলছি। আপনি কি কিছু বলবেন?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল নিখিল। দাঁড়ানো মাত্র সেই তীব্র আলোর গোলকটা ওই লোকটার উপর থেকে ঝট করে তার মুখের উপরে এসে পড়ল। এতক্ষণে হালকা আলোয় চোখটা অনেকখানিই সয়ে এসেছিল। অল্প আলোতেও সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সে। কিন্তু হঠাৎ করে তীব্র আলোর গোলকটা তার চোখে এসে পড়তেই আশপাশের সব কিছুই কী রকম যেন অন্ধকার হয়ে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কে যেন তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন একটা মাইক্রোফোন। সেটা মুখের সামনে নিয়ে নিখিল সরাসরি প্রাণপ্রিয় মহারাজের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের ধর্ম মানে কোন ধর্ম?

— আমাদের ধর্ম তো একটাই— হিন্দুধর্ম।

— ওটা কোনও ধর্মই নয়।

— হিন্দুধর্ম কোনও ধর্মই নয়! মহারাজের বৃকের ভিতর থেকে বিস্ময়ভরা শব্দটা বেরিয়ে আসতেই দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। নিখিলের কানে ভেসে এল টুকরো টুকরো নানা মন্তব্য। কেউ বললেন, লোকটা কে? কেউ বললেন, কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে একে? কেউ আবার বললেন, ইডিয়ট না কি?

তবু তারই মধ্যে নিখিল দৃঢ়স্বরে বলল, না। শুধু হিন্দু কেন? ধর্ম বলে গোটা পৃথিবীতে যা প্রচলিত আছে, সেগুলির কোনওটাই ধর্ম নয়।

হলের মধ্যে গুঞ্জন আরও বাড়তে লাগল। পিছনের লোকেরা মাথা তুলে, উঁকিঝুঁকি মেরে তাকে যেমন দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন, তেমনই সামনের দিকে যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁরাও সিটে বসেই যতটা পারা যায় শরীরটা বেঁকিয়ে তাকে দেখার জন্য হাঁকপাক করতে লাগলেন। তাঁদের কারও কারও চোখে তখন অপার বিস্ময়— উজবুকটা কে!

আশপাশের লোকেরা তার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন বুঝতে পেরেও এতটুকুও দমল না নিখিল। উল্টে মহারাজের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল সে, ধর্ম বলতে আপনি কী বোঝেন?

খুব ধীরস্থির ভঙ্গিতে মহারাজ বললেন, ধর্ম মানে, ধৃ যুক্ত মন। মানে, যা ধারণ করে, সেটাই ধর্ম। ধর্মের মূল কথাই হল, সত্য কথা বলো। মানুষকে ভালবাসো। পরের উপকার করো। বাবা-মা-কে শ্রদ্ধা করো। গুরুকে ভক্তি করো। গরিবদের সাহায্য করো। রোগীদের সেবা করো। মেয়েদের মায়ের মতো দেখো। এবং ক্ষমা করো। অর্থাৎ মূল কথা হল— ভাল হতে গেলে একটা মানুষের মধ্যে যে যে গুণ থাকা দরকার, সেটাই ধর্ম। আর হ্যাঁ, এটা

শুধু আমাদের ধর্মেরই নয়, পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সব ধর্মেরই মূল কথা হল এটা। মানে, মানুষকে যা সঠিক পথে নিয়ে যায়, শান্তি দেয়, ভাল রাখে, সেটাই ধর্ম।

নিখিল বলল, আমার মনে হয়, আপনি যা বললেন, সেটা শুধু যুগ যুগ ধরে চলে আসা নিছক একটা কেতাবি বুলিমাত্র। এটা কোনও ধর্ম নয়। ধর্ম সম্পর্কে বহু ব্যবহৃত একটা ব্যাখ্যা মাত্র। আসলে, ধর্ম কী জানেন?

এটা জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে যিনি ওর দিকে মাইক্রোফোন এগিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ওই রো-য়ের একেবারে ধার ঘেষে যতটা পারা যায় ঝুঁকে মাইক্রোফোনটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। সেটা দেখে মহারাজ বললেন, নিয়ো না। নিয়ো না। ওকে বলতে দাও।

কিন্তু মহারাজ বললে কী হবে, উদ্যোক্তাদের একজন ততক্ষণে মঞ্চের উঠে নিখিলের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করে দিয়েছেন, আপনি কি জানেন, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন? গোটা বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি ভক্ত ছড়িয়ে আছে এঁর। ইনি গোটা পৃথিবী অন্তত একশো বার ঘুরেছেন। ধর্ম নিয়ে প্রচার করেছেন। আর আপনি তাঁকে প্রশ্ন করছেন, ধর্ম কী জানেন! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

হাতের ইশারায় তাঁকে থামতে বলে নিখিলের উদ্দেশ্যে মহারাজ বললেন, বলুন, আপনার কাছেই শুনি, ধর্ম কী...

নিখিল বলতে শুরু করল, প্রত্যেকের ধর্মই আলাদা।

— প্রত্যেকের ধর্মই আলাদা! অবাক হয়ে এ দিকে ও দিকে তাকাতে লাগলেন মহারাজ। প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে আবারও গুঞ্জন শুরু হল। কেউ কেউ বুঝি ফিক করে হেসেও ফেললেন।

তবু নিখিল বলল, হ্যাঁ। আলাদা। যেমন জলের ধর্ম নীচের দিকে নামা। আগুনের ধর্ম পোড়ানো। আর জীব জগতের ধর্ম হল— খাদ্য এবং খাদকের।

— মানে?

— মানে একটাই, বড় জিনিস সব সময় ছোট জিনিসকে খাবে। এটাই ধর্ম। এত দিন ধরে যেটা হয়ে এসেছে, সেটাই স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম হলেই সর্বনাশ। বিপর্যয় নেমে আসবে ধরাধামে। ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাতেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

মহারাজ এ বার একটু গলা চড়ালেন, তা বলে, আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষ হয়ে জন্মেও মানবধর্ম পালন করব না?

— কেন করবেন না? করুন। যিনি যেমন, তিনি তেমন ধর্ম পালন করুন।

— কে ঠিক করবে, কার কী ধর্ম?

— ঠিক করার তো কিছু নেই। যিনি যা, সেটাই তাঁর ধর্ম। যেমন, যোদ্ধার কাছে যুদ্ধই ধর্ম। সাধুর কাছে সন্ন্যাসটাই ধর্ম। ডাক্তারের কাছে রোগীকে সুস্থ করে তোলাটাই ধর্ম।

— তা বলে অবলা প্রাণীকে আমরা রক্ষা করব না?

নিখিল বলল, না। যে যেমন, সে তেমন ভাবেই নিজেকে রক্ষা করবে। এটাই ধর্ম।

— তা বলে ওই খাদ্য আর খাদকের জোয়ারেই গা ভাসিয়ে দেব? তাদের খাব?

— না খেলে কী খাবেন?

মহারাজ বললেন, কেন? ফল মূল শাকসবজি...

— গাছের প্রাণ আছে, এটা অবিকার হওয়ার আগে এই সব কথা বললে তাও নয় মানা যেত। কিন্তু এখন মানি কী করে?

— কেন? না মানার কী আছে?

নিখিল বলল, আপনি মাছ-মাংস খেতে বারণ করছেন। কাদের খেতে বারণ করছেন? না, যারা ইচ্ছে করলে পালালেও পালাতে পারে। আর কাদের খেতে বলছেন? যারা আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সারাক্ষণ অক্লিঞ্জন জুগিয়ে যাচ্ছে, যারা অসহায়, যারা হাজার চেষ্টা করলেও নিজের জায়গা থেকে একচুলও নড়তে পারবে না, তাদের! এটা কী মানা যায়? না, মানা উচিত?

ও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মাইক স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হয়ে গেল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মেশিন বন্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল, জেনারেটর খারাপ। চলবে না। গরমে হাসফাঁস করতে লাগলেন সবাই। সব ক'টা দরজা-জানালা হাট করে খুলে দেওয়া হল। কখন কারেন্ট আসবে কে জানে!

দল বেঁধে বেঁধে লোকজন প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগলেন। বেরিয়ে এল নিখিলও। নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল, লোডশেডিং হওয়ার আর সময় পেল না!

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ও যেন আকাশ থেকে পড়ল। দেখল, টিকিট কাউন্টারে আলো জ্বলছে। পাখা চলছে। তার মানে লোডশেডিং নয়!

তখনই ওর মনে হল, ওর কথার পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজ হয়তো যথাযথ ঋণও উত্তর দিলেও দিতে পারতেন, কিন্তু উদ্যোক্তারা বোধহয় কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি। তাই বিদ্যুৎ-সংযোগ ছিন্ন করে ওই অপ্রীতিকর অবস্থাটার হাত থেকে অনুষ্ঠানটাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ওরা...

নিখিল এ কথা বলতেই, হো হো করে হেসে উঠলেন জগবন্ধু। নিখিলও হাসি চেপে রাখতে পারল না। সেও হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।



## ঘুমকাতুরে

শময়িতার সন্দেশটা এখন আর সন্দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সে বুঝে গেছে, তার কপাল পুড়তে চলেছে। না-হলে যে শ্রয়ণ সন্ধে গড়াবার সন্ধে সন্ধে ঘুমে ঢলে পড়ত। বিছানাটা পর্যন্ত ঝাড়তে দিত না। একটু উঠতে বললে কোন ঘরে গিয়ে যে শুয়ে পড়ত বোঝা যেত না। খুঁজতে খুঁজতে ওর দম বেরিয়ে যেত। সেই শ্রয়ণই কিনা এখন রাত এগারোটাতেও বাড়ি ঢোকে না! কোথায় যায়! নিশ্চয়ই কোনও মেয়ের পাশ্চাত্য পড়েছে।

না কি আমি যাতে ওর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাই, সে জন্য অফিস থেকে চুপিচুপি বাড়ি ঢুকে অন্য কোনও ঘরে গিয়ে একচোট ঘুমিয়ে নেয়! তার পর পেটের মধ্যে যখন ছুঁচোয় ডন মারে, তখন আর থাকতে না পেরে খাওয়ার জন্য জামাটামা গুঁজে বুটুটু পরে এমন ভাবে ঘরে ঢোকে যেন এক্ষুনি অফিস থেকে ফিরল!

কিন্তু না। সেটাও যে না, তাও প্রমাণ হয়ে গেল। ক'দিন ধরে তন্ন তন্ন করে গোটা বাড়ি খুঁজেও সে তার স্বামীকে কোথাও পায়নি। তা হলে কি এই বাড়ির মধ্যে এমন ঘরও আছে, যার হৃদিশ সে জানে না!

হতেই পারে। এখন অবস্থা অনেকটা পড়ে গেলেও এক সময় তো সবই ছিল। লোক-লস্কর। লেঠেল-বাহিনী। এমনকী বিশ্বস্ত গুপ্তচরও। ছিল প্রচুর জমিজমাও। ওদের জমিদারি নাকি বহু দূর অবধি বিস্তৃত ছিল। এখন অবশ্য সেই অর্থে বলতে গেলে কিছুই নেই। থাকার মধ্যে শুধু আছে ওর বাপ-ঠাকুরদার তৈরি করে যাওয়া এই বাড়ি। কেন যে এত বড় বাড়ি বানিয়েছিলেন কে জানে! এক-একটা ঘর দোতলার সমান উঁচু উঁচু। কড়িবরগার ছাদ। সেখান থেকে লম্বা লম্বা রড দিয়ে আদিকালের সিলিং ফ্যান ঝোলানো। চালালেই ঘটাং ঘটাং আওয়াজ হয়। যত না হাওয়া লাগে, তার চেয়ে বিরক্ত লাগে বেশি। ওগুলো খুলে ফেলে নতুন ফ্যান লাগানোর কথা বলতে গেলেই



শ্রয়ণ একেবারে রে রে করে ওঠে। বলে, না না না। ওগুলো খোলা যাবে না। ওগুলো আমাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতি।

গোটা বাড়িতে লোক বলতে সাকুল্যে তিন জন। সে, তার স্বামী আর তাদের একমাত্র ছেলে। অথচ দোতলাতেই বিশাল বিশাল এগারোখানা ঘর। ঘর তো নয়, এক-একটা ফুটবল খেলার মাঠ। কেউ হুট করে ঢুকলে ডবল বেডের খাটটাকেও তার মনে হবে ঘরের কোণে যেন একটা ছোট্ট জলচৌকি পড়ে আছে।

এ ছাড়া, এ-দিকে ও-দিকে ছোট ছোট ঘর তো আছেই। কিছু তালা দেওয়া, কিছু হাট করে খোলা। এখান-সেখান থেকে নেমে গেছে চোরাগোপ্তা সরু সরু সিঁড়ি। উপরেও উঠে গেছে বেশ কয়েকটা। বাইরে থেকেও আছে খানকয়েক লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। কোনওটা দোতলা, কোনওটা তিনতলা অবধি। সেগুলি আর ব্যবহার হয় না। বেশির ভাগ পা-দানিই উধাও হয়ে গেছে। কারা যে নিয়ে গেছে!

বিয়ের পর এতগুলো বছর কেটে গেলেও এ বাড়ির সব ক'টা ঘর এখনও তার খুলে দেখা হয়নি। নীচে ক'টা ঘর আছে কে জানে! উপরের কয়েকটা ঘর তো পায়রাদের দখলে চলে গেছে। তাদের বকম বকমে প্রথম দিকে ওর ঘুমই হত না। এখন অবশ্য অভ্যাস হয়ে গেছে।

কত লোক এসে ওদের ধরে। থাকার জন্য তো বটেই, কেউ কেউ বন্ধ ঘরগুলো গো-ডাউন হিসেবেও ভাড়া নিতে চায়। তার উপরে আছে নতুন নতুন গজিয়ে ওঠা প্রোমোটরদের নানা প্রলোভন। শুধু সে ভাবে চাপ দিতে পারে না শময়িতার মামাতো ভাইয়ের জন্য।

শময়িতা বহু বার তার স্বামীকে বলেছে, নীচের ঘরগুলো তো খোলাও হয় না। পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পয়-পরিস্কার করে ভাড়া দিয়ে দাও না... টাকার ঢাকাও আসবে। ঘরগুলোতেও আলো-বাতাস ঢুকবে।

কিন্তু শ্রয়ণের সেই এক কথা— না। আমাদের বংশের কেউ কখনও বাড়িঘর ভাড়া দেয়নি। আমিও দেব না। না খেতে পেয়ে মরে গেলেও দেব না। এটা আমাদের ঐতিহ্য।

শময়িতা বহু বার চেষ্টা করেও ওকে বোঝাতে পারেনি, দিন বদলে গেছে। সময়ও পাল্টে গেছে। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারলেই পিছিয়ে পড়বে। বিপদে পড়বে। তোমাদের খুড়তুতো ভাইদের দেখো...

ওদের খুড়তুতো ভাইদের বাড়িটাও ওদের মতোই বিশাল। ওদের বাড়ির লাগোয়াই। খুড়তুতোরা চার ভাই। কেউই কিছু করে না। ওদের গায়ের রং এত ফর্সা যে, যে-পাড়ার লোকেরা দু'পুরুষ আগেও ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পেত না, ওদের প্রজা ছিল, অবস্থা পড়ে গেছে দেখে তারাও ওদের পিছনে লাগে। দেখলেই, 'সাদা পাটালি' বলে খেপায়।

আর ওদের বাবা? মানে শ্রয়ণের কাকা? প্রত্যেক দিন সকালে বাজার যাওয়ার আগে ব্যবহারে-ব্যবহারে শতচ্ছিন্ন ময়লা একটা ফর্দ পাড়ারই একটা মুদিখানা দোকানে জমা দিয়ে যান। ফেরার সময় সেই ফর্দ মিলিয়ে মুদিওয়ালার রেডি করে রাখা প্রতিদিনকার তেল, নুন, মশলা নিয়ে বাড়ি আসেন।

শ্রয়ণ নাকি একবার তার কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এক মাসের না হোক, অন্তত সারা সপ্তাহেরটা তো একসঙ্গে কিনে রাখতে পারেন।

উনি বলেছিলেন, সে তো পারিই। কিন্তু কাল যদি মরে যাই?

কাকার কথা শুনে শ্রয়ণ থ' হয়ে গিয়েছিল। শ্রয়ণদের অবস্থা অবশ্য তার কাকাদের মতো নয়। কাকারা কোনও কিছুই ধরে রাখতে পারেননি। বহু আগেই সব বেচেবুচে দিয়েছেন। এখনও এই বাড়িটা ছাড়াও শ্রয়ণদের আরও একটা বাড়ি আছে। দেশের বাড়ি। সেই বাড়িটা আরও বড়। সাত ভূতে খাচ্ছে। শময়িতা ওই বাড়ির কথা জানার পরে ছ'মাসে ন'মাসে অন্তত একবার কোনও রকমে ঠেলেঠুলে শ্রয়ণকে পাঠাত। যারা ওদের জমি ভাগে চাষ করে, তাদের কাছ থেকে টাকা তুলে আনার জন্য। কিন্তু যেহেতু জমিগুলো একলপ্তে নয়, ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় চাষ করে এবং এখন নতুন নতুন নিয়মকানুন যা হচ্ছে, আর যে ভাবে রক্কে রক্কে রাজনীতি ঢুকে পড়ছে, তাতে জমিতে থেকেই জমি রক্ষা করা যাচ্ছে না। আর তারা তো গ্রাম থেকে পাঁচশো মাইল দূরে বসে আছে। সুতরাং ছড়ানো-ছেটানো চাষের জমিগুলো সব দখল হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

শময়িতা কত বার বলেছে, জমি কখনও কারও বাপের হয় না। দাপের। আমরা ওখানে থাকিই না, তো দাপট দেখাব কী! তা ছাড়া, আমরা তো আর ওখানে থাকতে যাব না। শুধু শুধু অত জমি ওখানে ফেলে রেখে কী হবে? একদিন দেখবে সব দখল হয়ে গেছে। এ বার আস্তে আস্তে জমিজমাগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করো। দরকার হলে ক'টা দিন ওখানে গিয়ে থাকো। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ঘুম পেলে ও আর কিছু চায় না।

এই ঘুমের জন্যই শ্রয়ণ কোনও দিন চাকরিবাকরি করেনি। খুড়তুতো ভাইদের মতোই পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া টাকাতেই বসে বসে খেত। বিয়ের পর শময়িতাই বলেছিল, জানো তো, রাজার ধনও ঝিনুক মাপতে ফুরিয়ে যায়। শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোলে চলবে? এত ভাল রেজাল্ট তোমার, কিছু একটা করো। না। তোমাকে টাকার জন্য চাকরি করতে বলছি না। আসলে, কাজের মধ্যে থাকলে তোমার মনটাও ভাল থাকবে, তাই...

সে হ্যাঁ-ও বলেনি, না-ও বলেনি। তার পর এমপ্লয়মেন্ট গেজেট দেখে শময়িতাই একটা চাকরির সন্ধান দিয়েছিল। ওকে দিয়ে শময়িতাই দরখাস্ত লিখিয়েছিল। এবং শময়িতা নিজে গিয়েই সেটা পোস্ট করে এসেছিল। ইন্টারভিউয়ের দিন শময়িতাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। এবং ইন্টারভিউয়ে টোকার ঠিক আগের মুহূর্তে শ্রয়ণের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, তুমি যদি খুব ভাল করে ইন্টারভিউ দাও, তা হলে টানা তিন দিন তোমার ছুটি। যত ইচ্ছে ঘুমিয়ে। আমি তোমাকে একবারও ডাকব না।

ওই কথা শুনে চকচক করে উঠেছিল শ্রয়ণের চোখ। সত্যি?

শময়িতা বলেছিল, সত্যি। আর তাতেই কাজ হয়েছিল। কিন্তু এই ঘুমের জন্য ও কম দিন অফিস কামাই করেছে? গেলেও, অফিসে বসে বসেই ও ঘুমোত। সেই জন্য ওর সহকর্মীরা পর্যন্ত ওর নাম দিয়ে দিয়েছিল— ঘুমকাতুরে। সেই বদনাম ঘোচানোর জন্যই শময়িতা রোজ সকালে তাকে জোর করে ঘুম থেকে তুলে দিত।

ক'দিন আগে হঠাৎ কী হল, শ্রয়ণ অফিস থেকে ফিরেই চা খেতে খেতে শময়িতাকে বলল, জানো তো, আমাদের অফিসের কলিঙ্গদা, যে সবথেকে বেশি সিগারেট খেত, একেবারে চেন স্মোকার, গতকাল থেকে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

শময়িতা জানতে চাইল, কেন?

— কেন আবার? ওর বউ খেতে বারণ করেছে, তাই।

— বাঃ, তোমাদের কলিঙ্গদাকে তো বেশ ভাল বলতে হবে।

— কেন? আমি ভাল না?

— তোমাকে যে ভাল বলব, তুমি কি তোমার বউয়ের কথা শোনো?

— শুনি না বুঝি? এত বড় অপবাদ? ঠিক আছে, কাল থেকে তুমি যেটা বারণ করো, আমি আর সেটা কিছুতেই কবর না।

— কী?

— পড়ে পড়ে আর ঘুমোব না।

— তুমি? ঘুমোবে না? তা হলেই হয়েছিল।

— এই তো? চ্যালেঞ্জ। কাল থেকে তোমাকে আর ডাকতে হবে না। আমি নিজে থেকেই সকালবেলায় উঠে যাব। দেখে নিয়ো।

শময়িতা একটু হেসে বলল, তার সঙ্গে তা হলে এটাও দেখতে হবে, সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে কি না...

— সূর্যের কথা আমি বলতে পারব না। আমি আমার কথা বলছি।

— ঠিক আছে, দেখা যাবে।

সত্যি সত্যিই শ্রয়ণ যে এটা করতে পারবে, শময়িতা তা কল্পনাও করতে পারেনি। হ্যাঁ, এখন ক'দিন ধরে ওকে আর ডাকতে হচ্ছে না। শ্রয়ণ নিজে থেকেই সকাল সকাল উঠে পড়ছে। অফিসেও বেরিয়ে পড়ছে ঠিক সময়ে। এই সব দেখে শময়িতার মনে হঠাৎ খটকা লাগল, আচ্ছা, অফিসে গিয়ে ও আবার ঘুমোচ্ছে না তো! একটা ফোন করে দেখব! মনে হতেই মোবাইলটা হাতে তুলে নিয়েছিল শময়িতা। তার পর বেশ কয়েক বার পরপর চেষ্টা করে গেল শ্রয়ণকে মোবাইলে ধরতে। কিন্তু না। ওর ফোন নট রিচেবল। অগত্যা শময়িতা ফোন করল, অফিসের ল্যান্ড নম্বরে। দুটো রিং হতে না-হতেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, হ্যালো?

— শ্রয়ণ আছে?

— না। ও তো আজ আসেনি।

— আসেনি?

— না। ও তো দু'-তিন দিন ধরে আসছে না।

— মানে?

— আপনি কে বলছেন?

কথাটা শুনে শময়িতা বলতে যাচ্ছিল, আমি ওর ওয়াইফ বলছি। কিন্তু না। ও আর একটা কথাও বলল না। সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দিল।

এ রকম উত্তর শোনার জন্য শময়িতা একদম প্রস্তুত ছিল না। ভাবতে লাগল, দু'-তিন দিন ধরে ও অফিসে যাচ্ছে না! কিন্তু রোজই তো খেয়েদেয়ে অফিসের নাম করে বেরোচ্ছে। তা হলে যাচ্ছে কোথায়! তবে কি... হ্যাঁ, হতেই পারে। রাইয়ের হাজবান্দা হিমবস্তুদা তো স্কুল টিচার। যথেষ্ট সম্বল অবস্থা।

তবু বউ-ছেলেমেয়েকে আরও একটু ভাল রাখার জন্য একটা কোচিং সেন্টার খুলেছিলেন। পাশের পাড়ায় একটা গ্যারেজ ঘর ভাড়াও নিয়েছিলেন। শুধু সকালেই নয়, বিকেলেও দফায় দফায় ইলেভেন-টুয়েলভের ছেলেমেয়েরা সেখানে টিউশন নিতে যেত। শনি-রবিবারও বাদ যেত না।

সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু তার মধ্যেই ঘটে গেল একটা অঘটন। ওই পাড়ার ছেলেরা হঠাৎ একদিন তাঁকে শুধু বেধড়ক পেটালই না, মারতে মারতে প্রায় আধমরা করে দিল। এবং বলে দিল, এ অঞ্চলের ত্রিসীমানার মধ্যে যেন আর না দেখি...

রাই অবাক। তার স্বামীর মতো স্বামী হয় না। একেবারে মাটির মানুষ। কোনও সাতপাঁচে থাকেন না। আর তাঁকে কিনা এ ভাবে মারধর? পাড়ার দু'জনকে নিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল সে। থানায় গিয়ে শুনেছিল তাঁর স্বামীর কীর্তির কথা। লাস্ট ব্যাচ চলে যাওয়ার পরেও, অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়া সদ্য কোচিংয়ে আসা ক্লাস ইলেভেনের একটি মেয়েকে উনি স্পেশাল ক্লাস নেওয়ার জন্য থাকতে বলেছিলেন। কয়েকটি অঙ্ক দেখিয়ে দেওয়ার পরেই উনি নাকি আচমকা মেয়েটিকে জাপটে ধরে পাগলের মতো অসভ্যতা শুরু করে দেন।

প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে। আশপাশের লোক জড়ো হয়ে যায়। তারা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখে মাস্টারমশাই ঘরের কোণে সিঁটিয়ে আছেন আর মেয়েটি ভয়ে-আতঙ্কে হাউহাউ করে কাঁদছে। খবর পেয়ে দৌড়ে আসে গলির মুখে ক্যারাম খেলতে থাকা পাড়ার ছেলেরা। তাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না কী ঘটেছে। ওরা তার স্বামীকে কলার ধরে টেনে হাঁচড়াতে হাঁচড়াতে ঘর থেকে বার করে এনে রাস্তার উপরে ফেলে এলোপাথাড়ি কিল-চড়-লাথি মারতে থাকে।

মার সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। খবর যায় লোকাল থানায়। পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

শুধু ওই মেয়েটিই নয়, ওই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরে নাকি একে একে আরও অনেক মেয়েই মুখ খুলেছিল। বলেছিল, তাদের সঙ্গেও নাকি উনি অসভ্যতা করেছেন। কিন্তু ভয়ে, লজ্জায়, কে কী বলবে ভেবে তারা চেপে গেছে। কেউ কেউ বাড়িতেও জানিয়েছিল ব্যাপারটা। কিন্তু বেশির ভাগ বাড়ি থেকেই নাকি বলেছিল, যা হওয়ার, তা হয়ে গেছে। কাউকে কিছু বলতে যাস না। এ সব জানাজানি হলে মানসম্মান নিয়ে টানাটানি হবে। থানা-পুলিশ হবে।

আজেবাজে প্রশ্ন করবে। বিয়ে দিতে গেলে সমস্যা হবে। তার চেয়ে বরং চূপ করে থাকাই ভাল। দরকার হলে ওখানে আর পড়তে যাস না।

এই সব শুনে হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল রাই কেমন যেন গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। কারও সঙ্গেই সে ভাবে আর মিশত না। শময়িতার সঙ্গেও না। যেন স্বামী নয়, দোষটা সে-ই করেছে। এটা দেখে রাইয়ের জন্য সমবেদনা হলেও মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছিল সে, আর যাই হোক, তার স্বামী অন্তত ও রকম নয়।

কিন্তু অফিসে ফোন করে এ কী শুনল সে! ও দু'-তিন দিন ধরে অফিসে যাচ্ছে না! ভাগ্যিস ওর মোবাইলে 'নট রিচেবল' আসছিল। তাই বাধ্য হয়ে অফিসের ল্যান্ড নম্বরে ফোন করেছিল। না হলে তো সে জানতেই পারত না, তার বিশ্বাসটাকে ঘুণাপোকারা ভিতরে থেকে কী ভাবে কুরে কুরে ফোঁপরা করে দিয়েছে।

তখনই তার সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল। মনে মনে বলেছিল, না। ও ঠিক করেনি। তার বিশ্বাসে আঘাত করেছে। এ জনাই কি যখন-তখন ছুটহাট করে ও বেরিয়ে যাচ্ছে! রাত করে ফিরছে! তার মাইনের কোনও হিসেব পাচ্ছে না সে! কানাঘুষোয় জানতে পারছে, তার স্বামী একটু একটু করে দেশের জমিজমা বেচে দিচ্ছে! তার মানে সে যা সন্দেহ করছে সেটা সত্যি! ও অন্য কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়েছে! তার পিছনেই ঢালছে সব টাকা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমার কথা নাহয় বাদই দিলাম। এ সব করার আগে কি ছেলের মুখটাও ওর একবার মনে পড়ল না! জানাজানি হলে লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে! মা-বাবাই বা কী ভাববেন! আচ্ছা, ক'দিন আগে কতকগুলো কাগজে আমাকে দিয়ে ও সই করিয়েছিল না! টিক দেওয়া জায়গাগুলো দেখিয়ে বলেছিল, সই করতে। ও বলেছিল বলেই সে সই করে দিয়েছিল। একবার চোখ বুলিয়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করেনি। ওগুলো কীসের কাগজ ছিল! ও আবার কায়দা করে ডিভোর্সের কাগজে সই করিয়ে নেয়নি তো! চাব দিকে যা শুনছি, আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে...

না। আমি ওকে ছাড়ব না। এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। ওর সত্যিই যদি কাউকে মনে ধরে থাকে, তা হলে তাকে নিয়েই থাকুক। আমার কাছে আসতে হবে না। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে আমি। তাঁদের অবর্তমানে গোটা বাড়িটাই আমার। আর বাবার যা ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে, সে সব তো



আমিই পাব। তার সুদে আমার আর আমার ছেলের বাকি জীবনটা খুব ভাল ভাবেই চলে যাবে। দরকার নেই তাকে। ঠিক আছে, দেখি... বলেই, ফোন করেছিল তার মামাতো ভাইকে। সে থাকে পাশের পাড়ায়। ওই এলাকার বেশ হোমড়াচোমড়া। পাটি করে। সব শুনে সে বলল, কিছু ভাবিস না, আমি তো আছি। তাকে পরে ফোন করছি।

শময়িতা জানে, ও এই রকমই। পরে ফোন করছি বলেছে মানে ও আর ফোন করবে না। নানা নক্সাছক্সা করে বেড়ায়।

কিন্তু না। তার কিছুক্ষণ পরেই সে ফোন করল। এবং শময়িতাকে কিছু বলতে না দিয়েই বলল, শোন, তুই যে ওর অফিসে ফোন করেছিলি, ওখানে তোর পরিচয় দিসনি তো?

— না।

— ঠিক আছে। ও এলেও ওকে একদম কিছু বলবি না। ওকে বুঝতেই দিবি না যে, তুই টের পেয়েছিস। বুঝেছিস? ও যখন কাল অফিসে বেরোবে, তার আগে তুই শুধু আমাকে একটা মিস কল করবি, বুঝেছিস? তাকে আর কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করব। দেখি ওর ক'টা পাখনা গজিয়েছে...

মামাতো ভাইয়ের কথামতোই কাজ করেছিল শময়িতা। সমস্ত যন্ত্রণা চেপে রেখে রোজকার মতোই ডাইনিং টেবিলে খাবার বেড়ে দিয়েছিল সে। হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছিল না। এই লোকটাই সে? যে তাকে একদিন ভালবেসে বিয়ে করেছিল! এ-ই সে! বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল শ্রয়ণের চোখের দিকে।

শ্রয়ণ যখন ঐঠো হাত বেসিনে ধুয়ে জামাপ্যান্ট পরার জন্য শোওয়ার ঘরে ঢুকল, শময়িতা তখন পাশের ঘরে গিয়ে রোজকার মতো স্বামীর হাতে তুলে দেবার জন্য রুমাল, পার্স আর চশমাটা নিয়ে— না, মিস কল নয়, চুপিচুপি ফোন করে তার মামাতো ভাইকে খুব চাপা গলায় জানিয়ে দিল, ও এফুনি বেরোচ্ছে।

শ্রয়ণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মুখে এসে টপাটপ বোতাম টিপল মোবাইলের। তার পর দাঁড়িয়ে রইল। সামনে দিয়ে একটা বাস চলে গেল। যেটা ওর অফিসের সামনে দিয়ে যায়। কিন্তু ও তাতে উঠল না। ও ইচ্ছে করলেই একটা কেন, একসঙ্গে দু'-চার-পাঁচটা নতুন গাড়ি কিনতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর

আগে যেহেতু ওর বাবা বলে গিয়েছিলেন, দাখ, আমাদের তো বাপ-ঠাকুরদার রেখে যাওয়া টাকার সুদ সংসার চলে। সেই সুদ কিন্তু দিনকে দিন কমছে। ফলে যতটা সুদ আসছে, তার চেয়ে কম খরচ করতে হবে। কিছু কিছু করে সুদের টাকা জমিয়ে মূল টাকার সঙ্গে ফিক্সড করতে হবে। না হলে মহাবিপদ। কারণ, আমার তো মনে হয়, যে হারে সুদ কমছে, সেই দিন আর বেশি দূরে নেই, যে দিন সুদ দেওয়া তো দূরের কথা, নিরাপদে টাকা গচ্ছিত রাখছে বলে ব্যাঙ্কগুলো উল্টে টাকা চাইবে। সুতরাং এখন থেকে সতর্ক হতে হবে। খরচের বহর কমাতে হবে। এক্ষুনি রাশ টানতে না পারলে আর দেখতে হবে না...

সেই কথা মাথায় রেখেই বাবার মৃত্যুর পরে ও খরচ কমাতে শুরু করেছিল। বাড়িতে দু'-দুটো গাড়ি থাকলেও ও ট্রামে-বাসেই যাতায়াত করত। যখন চাকরি পেল, তত দিনে গাড়ি দুটো পড়ে থেকে থেকে লড়ায়ে হয়ে গেছে। কেজি দরেও বিক্রি করা যাবে না। ও আর গাড়ি কেনেনি।

দু'মিনিটও হল না, ওর সামনে একটা ওলা এসে দাঁড়াল। ও সেটায় উঠে পড়ল।

ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিতেই ওর পিছু নিল একটা নয়, গলির এ মুখে এবং ও মুখে অপেক্ষা করতে থাকা দু'-দুটো ঝাক্কাস বাইক। দুটো বাইকেই চালক ছাড়াও পিছনে একজন করে ছেলে।

টিভি সেন্টারের সামনে দিয়ে এসে ট্যাক্সিটা লর্ডস বেকারির মোড় থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিল। আনোয়ার শাহ রোড ধরে খানিকটা গিয়ে, ডান হাতের লেক গার্ডেনের ব্রিজে উঠল। তার পর লেকের ভিতর দিয়ে শরৎ বসু রোড হয়ে এ গলি ও গলির ভিতর দিয়ে একেবারে ভবানীপুরে। আইকোর বিল্ডিংয়ের পিছনে একটা বাঁ-চকচকে নতুন আটতলা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর সেই বাড়িটার কারুকাজ করা বিশাল লোহার ফটক দিয়ে সোজা ঢুকে গেল ভিতরে।

এই বাড়িটার নীচেই কার পার্কিং প্লেসের সামনের বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে পার্টি অফিস। সকাল-সন্ধ্যে ভিড় লেগেই থাকে। যত না পাড়ার ছেলে থাকে, তার চেয়ে বেশি থাকে অন্যান্য এলাকার ছেলেরা। এত ভিড় হয়ে যায় যে, কার পার্কিং প্লেসে আর কুলোয় না। ফুটপাথেই চেয়ার বিছিয়ে বসে পড়ে। এই সকালবেলাতেই বসে রয়েছে পার্টির তিন-চার জন ছোকরা।

বাইকবাহিনীর কাছ থেকে ফোন মারফত সেই খবর পৌঁছে গেল শময়িতার মামাতো ভাইয়ের কাছে। পৌঁছতেই সে মনে মনে বলল, পেয়েছি ব্যাটাকে।

পালাবে কোথায়! আমার হাত থেকে ওর আর নিস্তার নেই। ওকে একেবারে হাতেনাতে ধরব। ভেবেই, বাইকের চার জনকে ওখানে পাহারায় থাকতে বলে শময়িতার বাড়ি থেকে শময়িতাকে তার সদ্য কেনা অল্টোয় তুলে সোজা হাজির হল সেখানে।

পার্টি অফিসের সামনে যে ছোকরাগুলো বসে ছিল, তাদের প্রায় সকলেই শময়িতার মামাতো ভাইকে চেনে। তাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই তারা এগিয়ে গেল। উনি তখন শময়িতার মোবাইলে তোলা শ্রয়ণের ছবিটা দেখিয়ে ওদের কাছে জানতে চাইল, এই লোকটাকে কি তোমরা চেনো?

ওরা ‘চিনি’ বলতেই শময়িতার মামাতো ভাই বলল, এই লোকটা কি এখানে রোজই আসে?

ওদের মধ্যে থেকে একজন বলল, রোজ নয়, তবে প্রায়ই আসে। কেন বলুন তো? কোনও লাফড়া হয়েছে নাকি?

সে কথায় উত্তর না দিয়ে মামাতো ভাই উল্টে প্রশ্ন করল, কার কাছে আসে?

ওদের মধ্যে থেকে অন্য জন বলল, কার কাছে আবার? উনি গুঁর নিজের ফ্ল্যাটে আসেন।

— নিজের ফ্ল্যাট! চমকে উঠল শময়িতা। তার পরেই কী মনে হতে, নিজের মনেই বলল, বুঝেছি, তার মানে নতুন কোনও সংসার পেতেছে এখানে! ঠিক আছে, দেখাচ্ছি মজা...

মামাতো ভাই ওদের কাছে ফের জানতে চাইল, উনি কি এখানে ফ্ল্যাট কিনেছেন, না কি ভাড়া নিয়েছেন?

— না না। ভাড়া না। ভাড়া নিলে তো আমরা জানতাম। উনি কিনেছেন। তাও তো প্রায় পাঁচ-ছ’মাস হয়ে গেছে। তবে যত দূর জানি, উনি রাতে থাকেন না। গুঁর নাকি অন্য জায়গাতেও বাড়ি আছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে শময়িতা জিজ্ঞেস করল, সঙ্গে কে থাকে?

ছেলেগুলো কিছু বলতে যাওয়ার আগেই মামাতো ভাই বলল, সে যে-ই থাকুক না কেন, অফিসে না গিয়ে ও যখন এখানে এসেছে, তখন নিশ্চয়ই সে আছে। তোমরা জানানো ও কোন ফ্লোরে থাকে?

— হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্স্ট ফ্লোরে।

— চলো তো...

ওরা যখন বাড়ির ভিতরে ঢুকে লিফটের জন্য অপেক্ষা না করেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠছে, তখন নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল শময়িতা, এই জন্যই কিছু দিন ধরে দেখছি, ও আমাকে এড়িয়ে চলছে। রাত করে বাড়ি ফিরছে। তার মানে...

দোতলায় উঠে কলিংবেল টিপছে তো টিপছেই। বারবার টেপাতেও না খোলায় মামাতো ভাইয়ের নির্দেশে ওই ছোকরাগুলো দরজা ধাক্কানো শুরু করল। শুরু করল হাঁক পেড়ে ডাকাডাকি। চিৎকার-চৈচামেচি শুনে এ ফ্ল্যাটের ও ফ্ল্যাটের লোকেরা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। জানতে চাইলেন, কী হয়েছে?

অনেকক্ষণ পরে অবশেষে যে লোকটা লুপ্তি পরে ঘুম-জড়ানো চোখে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, সে আর কেউ নয়, শময়িতার স্বামী— শ্রয়ণ। ঘুমের ঘোরেই সে জিজ্ঞেস করল, কে?

শময়িতা বলল, আমি।

শময়িতার গলা শুনে যেন চারশো চল্লিশ ভোল্টের শক খেল সে। মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল তার ঘুম। কেন? কী হয়েছে? প্রশ্ন করতে যাওয়ার আগেই প্রায় ধাক্কা মেরে শ্রয়ণকে সরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল ও। এ ঘর ও ঘর সে ঘর দেখল। না। তিনটে বড় ঘরের একটাতেও কেউ নেই। কেউ কেন, ঘরে কোনও আসবাবও নেই।

থাকার মধ্যে আছে শুধু একটা ঘরে বড় একটা আনকোরা খাট। তাতে আরও আনকোরা নরম তুলতুলে বিছানা। পলিথিনের মোড়ক অবধি খোলা হয়নি। এক পাশে গুটিয়ে রাখা তোষক। আর দু'দিকে ছড়িয়ে আছে মাথায় দেওয়ার দুটো বালিশ। একটা কোলবালিশও।

খাটের নীচটিচ ভাল করে দেখে, কাউকে না পেয়ে ও দিকের করিডরে গিয়ে উঁকি মেরে শময়িতা দেখার চেষ্টা করল, কলিংবেল আর চিৎকার চৈচামেচি শুনে কেউ ও দিক থেকে পালিয়েছে কি না। না। সে সুযোগ নেই। কাউকে কেন, অন্য কারও কোনও চিহ্নই যখন ও খুঁজে পেল না, তখন শ্রয়ণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও জিজ্ঞেস করল, সে কোথায়?

শ্রয়ণ অবাক হয়ে জানতে চাইল, কে?

— কে বুঝতে পারছ না? যাকে নিয়ে এখানে সংসার পেতেছ, সে।

— সংসার!

— আকাশ থেকে পড়ছ, না? এই তো এরা আছে... বলেই, ওই বাড়ির নীচ

থেকে যে ছোকরাগুলো তাদের সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে শময়িতা বলল, এই, তোমরা বলো তো এর সঙ্গে কে থাকে...

ছোকরাগুলো এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। সেটা দেখে শময়িতা বলল, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমরা বলো।

ওরা একটু ভাবাচাচাকা খেয়ে বলল, কই, কেউ না তো...

— তা হলে কি উনি এখানে একা থাকেন?

— হ্যাঁ, তাই-ই তো দেখি।

— এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? যার অত বড় বাড়ি। বাড়িতে অতগুলো ঘর। একটু খড়কুটো পর্যন্ত নাড়তে হয় না। চাওয়ামাত্র হাতের সামনে সব কিছু পেয়ে যায়। ও সব ছেড়েছুড়ে সে এখানে একা থাকার জন্য আসে?

এতক্ষণ চুপচাপ ছিল শ্রয়ণ। এ বার মুখ খুলল সে— আসে। তোমার মতো বউয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য আসে।

— আমার মতো বউ মানে? আমি কী করেছি?

— কী করেছ জানো না? কোনও দিন শান্তিতে একটু ঘুমোতে দিয়েছ?

মামাতো ভাই বলল, ঘুমের সঙ্গে এখানে থাকার সম্পর্ক কী?

— আমি এখানে ঘুমোতে আসি।

— ঘুমোতে!

শ্রয়ণ বলল, হ্যাঁ, ঘুমোতে।

— কিন্তু ওরা যে বলল, এটা তোমার ফ্ল্যাট?

— না। আমার না।

মামাতো ভাই জিজ্ঞেস করল, তা হলে কার?

— আমার ছেলের।

শময়িতা যেন আকাশ থেকে পড়ল। ছেলের? মানে? বাবাই জানে?

— না।

মামাতো ভাই ফ্ল্যাটের চার দিকে তাকিয়ে বলল, এটার দাম তো মনে হয় কোটি টাকার উপরে...

— আমি কি একবারও বলেছি কোটি টাকার কম?

শময়িতা বলল, এত টাকা তুমি কোথায় পেলে?

— দেশের ওই চাষের জমিগুলো আর রাখা যাচ্ছিল না। যে-কোনও সময়

দখল হয়ে যেত। তাই তুমি বারবার করে বলেছিলে দেখে ওগুলো বিক্রি করে দিয়েছি।

শময়িতা বলল, অতখানি জমি বিক্রি করে দিয়েছে? সেটা দিয়ে তুমি মাত্র তিন কামরার এইটুকু একটা ফ্ল্যাট কিনেছ?

— না। সব টাকা দিয়ে কিনিনি। বাকি টাকা ছেলে আর তোমার নামে ফিক্সড করে দিয়েছি। মনে নেই, তোমাকে দিয়ে সে দিন কতকগুলো কাগজে সই করলাম? তুমি তো উল্টেও দেখলে না কীসে সই করছ। অঙ্কের মতো সই করে দিলে। ওগুলো ছিল ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটের কাগজ।

এটা শুনে শময়িতার দিকে তাকাল মামাতো ভাই। শময়িতা বলল, সেটা তো আমাকে আগে বলতে পারতো। ঠিক আছে, চলো।

— কোথায়?

— বাড়িতে।

— না। আমি যাব না।

— কেন?

— ঠিক আছে, আমি যেতে পারি। তবে একটা শর্তে।

— কী শর্ত?

— ঘুমোবার সময় আমাকে আর কখনও বিরক্ত করবে না...

— আর করি? মাথা খারাপ? একদম বিরক্ত করব না।

মামাতো ভাই বলল, তা হলে এই ফ্ল্যাটটা?

এই বাড়ির নীচ থেকে যে-ছোকরাগুলো তাদের সঙ্গে এসেছিল, তাদের একজন বলে উঠল, এটা ছেড়ে দিলে আমাদের বলবেন দাদা, যে দামে কিনেছেন, তার থেকে অন্তত দশ লাখ টাকা বেশিতে বিক্রি করিয়ে দেব।

শময়িতা মুচকি হেসে বলল, সে তো বলবই। তবে মনে হয় না, আমাদের বিক্রি করার কোনও দরকার হবে। বলেই, ফ্ল্যাটের দরজায় তালা লাগিয়ে সবার সঙ্গে শময়িতাও নীচে নেমে এল। মনে মনে বলল, সত্যি, ঘুমোনের জন্য যে কেউ এ রকম একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারে, বাপের জন্মে শুনি। সত্যিকার পাল্লায় পড়েছি আমি! রক্ষে করো ঠাকুর। রক্ষে করো।





## ঋ-তানিয়া

না। তানিয়া কিছুতেই কথা বলছে না। ওকে কথা বলানোর জন্য গত দু'দিন ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে ঋ। তবুও একটা বর্ণও উচ্চারণ করছে না ও।

কথা বলছে না মানে যে কোনও কাজ করছে না, তা নয়। সেই অষ্টমঙ্গলার গিঁট খুলে এ বাড়িতে আসার পর থেকে ও যা যা করে, মুখ বুজে তা-ই করে যাচ্ছে।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই ও যেমন প্রতিদিন তার খাট-লাগোয়া টেবিলে চা দিয়ে ওকে ডেকে দিয়ে যায়, পরশু দিন তেমনই চা দিয়ে গিয়েছিল। শুধু ডেকে দিয়ে যায়নি। তাই ঋ'ও আর ওঠেনি। যেমনকার চা তেমনই পড়ে ছিল। খানিক পরে কাপ নিতে এসে তানিয়া যখন দেখল, চা-টা ঠান্ডা জল হয়ে গেছে। তখন চা-টা ফের গরম করে যেখানে রাখার সেখানে রেখে লক্ষ্মীর আসন থেকে ছোট ঘণ্টাটা এনে ঢং ঢং করে নাড়াতে শুরু করেছিল।

এত সকালে ঘণ্টা বাজাচ্ছে কে! বিরক্তির সঙ্গে চোখ খুলে ঋ দেখে, সামনে তানিয়া। বিয়ে হয়েছে আট মাসও হয়নি। চাকরিসূত্রে এখানে একটা ঘরভাড়া নিয়ে ঋ থাকত। প্রথম ক'টা দিন মা এসে এখানে ছিলেন। রান্নাবান্না করে দিতেন। কিন্তু দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে তাঁর ভরা সংসার। তিনি না থাকলে সব অন্ধকার। তাই ওখানটা ফেলে রেখে এই ছেলের কাছে আর কত দিন থাকা যায়! কিন্তু তা বলে তার রান্নাবান্না কিংবা ঘরের কাজের জন্য কোনও মেয়েকে রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারে ঘোর বিরোধী। তার বয়স যা-ই হোক না কেন। যা দিনকাল পড়েছে! কী থেকে কী হয়, কিছু বলা যায় না। আর কোনও ছেলেকে যে ভরসা করে রেখে যাবেন, তাও পারেননি। মনের মধ্যে বারবার খচখচ করেছে, তাঁর ছেলে যে রকমটা খেতে ভালবাসে, তাকে দেখিয়ে দিয়ে গেলেও, কোনও ছেলে কি ঠিক সেই ভাবে

আদৌ রান্না করে দিতে পারবে! তার থেকেও বড় কথা, সেই ছেলেটা যে ভাল, তার গ্যারান্টি কে দেবে!

তাই ছেলেকেই শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, কী ভাবে সহজে পুষ্টিকর, সুস্বাদু খাবার রান্না করা যায়। বলে গিয়েছিলেন, ঘরে চিড়ে-মুড়ি-চানাচুর এনে রেখে দিবি। যে দিন রান্নাবান্না করতে ইচ্ছে করবে না, সে দিন ওটা দিয়েই চালিয়ে নিবি। তবু বাইরের খাবার খাস না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। মা চলে যাওয়ার পরেই সে বাইরে খেতে শুরু করেছিল। আর ক’দিনের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল পেটের সমস্যা।

তখন বাড়ি থেকে শুধু মা-ই নন, বাবা আর বড়দাও ছুটে এসেছিলেন। বাবা ওর মাকে বলেছিলেন, ও যখন রান্না করে খাবেই না ঠিক করেছে, তখন ওর রান্না করার জন্য কোনও মেয়ে নয়, বিশ্বস্ত মেয়ে, মানে একটা বউয়ের ব্যবস্থা করি। কী বলো?

ঋ’র মা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে লাফিয়ে উঠেছিলেন, এত বড় একটা সমস্যার সমাধান যে এত সহজে করে ফেলা যাবে, তাঁর মাথাতেই আসেনি। তিনি বলেছিলেন, খুব ভাল কথা বলেছ। এত দিনে সত্যিকারের একটা কথাব মতো কথা বলেছ। করো করো। ব্যবস্থা করো।

ঋ’ও আপত্তি করেনি। ফলে তিন মাসের মাথায় বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ওদের। মা ক’দিন থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে সংসারটা নতুন বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। মা যে-ক’দিন ছিলেন, কোনও অসুবিধে হয়নি। মা চলে যাওয়ার পরেও সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু গত পরশু দিন যে কী হল, পরশু দিন! না তার আগের দিন রাত্রে! কে জানে, ও ঠিক বুঝতে পারছে না। পরশু সকাল থেকে ও যখন এ রকম করছে, তার মানে আগের দিন রাত্রেই সে কিছু একটা করেছে। কিন্তু সে যে কী করেছে! কিছুই বুঝতে পারছে না।

ছোটখাটো কোনও ব্যাপার হলে ও নিশ্চয়ই কিছু বলত। কোনও কথাই বলছে না মানে, সে বড়সড় কোনও একটা গুণ্ডগোল করে ফেলেছে। কিন্তু কী!

না। কোনও কাজের লোক রাখার ব্যাপারে তার মায়ের যেমন একটাই কথা— না। তেমনই তার বউ তনিয়ারও। দু’জনের সংসার। ওই তো একটু রান্না। তার জন্য আবার লোক রাখা! না। একদম না। কোনও লোক রাখতে হবে না।

এখন ঋ'র মনে হচ্ছে, মা না থাক, একটা কাজের লোক না থাক, অন্তত একটা ঠিকে কাজের লোক রাখলেও হত। তা হলে আর কিছু না হোক অন্তত লোকচক্ষুর জন্য তার সামনে ও কথা বলতে বাধ্য হত। কিন্তু সে ব্যবস্থা যখন নেই, তখন উপায়!

সে ওকে কথা বলানোর জন্য কম চেষ্টা করেনি। সকালে ও তাকে যে চা দিয়ে যায়, সে সেটা বলতে গেলে প্রায় শেষ বিন্দুটাও চেটেপুটে খায়। একটু তলানি পড়ে থাকলেই তার বউ ডাক নেয়, কী গো। চা-টা কি ভাল হয়নি?

গতকাল যখন ওর 'কি গো। চা-টা কি ভাল হয়নি?' শোনার জন্য ইচ্ছে না থাকলেও অর্ধেকটার উপরে চা ফেলে রেখে আবার ঘাপটি মেরে শুয়ে পড়েছিল। এবং চোখ পিটপিট করে দেখছিল, ও আসছে কি না। ও যখন এল, তার মনে হল, এ বার নির্ঘাত ও মুখ খুলবে।

কিন্তু না। কিছু বলল না। অর্ধেক চা-সমেত কাপটা নিয়ে চলে গেল। টোস্ট খেতে গিয়ে দেখল, কম মাখন দেয় দেখে, যে-বউকে প্রায়ই তাকে বলতে হয়, মাখন কি ফুরিয়ে গেছে? সে বউই স্লাইজ পাউরুটির উপরে এত পুরু করে মাখন লাগিয়ে দিয়েছে যে, বলার আর কোনও মুখই নেই।

অফিস যাওয়ার আগে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে প্রথম গ্রাস মুখে তুলে মাঝেমধ্যেই যাকে বলতে হয়, 'বাবা, আবার সেই ঝাল?' সে কিনা আজ ঝাল এত কম দেখে কোনও ট্যা ফো-ই করতে পারল না।

বেরোবার সময় হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যে-তানিয়া হয় পার্স, নয় রুমাল কিংবা চশমা— একটা না একটা দেওয়ার কথা ঠিক ভুলে যায়, সেই তানিয়া আজ শুধু ওগুলোই নয়, ঋ দেখল, তার দিকে এক জোড়া ধোয়া মোজাও এগিয়ে দিয়েছে। জুতো পরতে গিয়ে আরও একবার চমকে গেল সে। দেখল, সেটাও পালিশ করা। একেবারে ঝকঝকে তকতকে।

ঋ অফিসে পৌঁছে তানিয়াকে ফোন করল। ভেবেছিল, ফোন করলে কথা না বলে তো আর পারবে না। কিন্তু একবার নয়, খানিকক্ষণ পরপর বেশ কয়েক বার ফোন করে সে দেখেছে, রিং হয়েই যাচ্ছে। তানিয়া ফোন ধরছে না। তাই বাধ্য হয়ে বেলার দিকে আর মোবাইলে নয়, বাড়ির ল্যান্ডফোনে ফোন করেছিল সে। যেহেতু তার বাড়িতে সিএলআই লাগানো নেই, ফলে কোন নম্বর থেকে ফোন করছে তা বোঝারও কোনও উপায় নেই। ফোন বাজলে ওকে ফোন তুলতেই হবে এবং আর কিছু না বলুক, অন্তত 'হ্যালো'টা

তো বলবে। আর একবার কথা বললেই ওর এই মৌনব্রতটা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না।

তানিয়া ফোনটা ধরেছিল ঠিকই। কিন্তু ‘হ্যালো’ তো দূরের কথা, একটা ‘হ্যাঁ’ ‘হুঁ’ও বলেনি। বাধ্য হয়ে ঋ নিজেই বলেছিল— হ্যালো। আর যে-ই সে ‘হ্যালো’ বলেছে, অমনি ঋপ করে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে ও। দু’-তিন বার করার পর আর রিং হচ্ছিল না। শুধু কুক কুক কুক কুক হচ্ছিল। তখনই ঋ বুঝেছিল, ও ক্রেডেল থেকে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছে।

বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে ঝুল-বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়িয়েছিল ঋ। হঠাৎই ঢং ঢং ঢং ঢং। এ দু’দিনেই সে বুঝে গেছে, ঘণ্টার ধ্বনি মানেই তানিয়ার তলব।

তড়িঘড়ি গিয়ে দেখে টেবিলে গরম গরম লুচি, আলুর দম আর বেগুন ভাজা। যেগুলো তার ভীষণ প্রিয়। তার পরেই, না— চা নয়, কফি।

সবই করেছে ও। শুধু কথা বলছে না। কিন্তু কেন? ওর হঠাৎ মনে হল, বিচারক ফাঁসির হুকুম দিয়ে দিল, অথচ অপরাধী জানতেই পারল না, তার অপরাধটা কী।

না। তাকে জানতেই হবে সে কী দোষ করেছে। কিন্তু সেটা জানতে গেলে তো তার মুখ খোলাতে হবে। মুখ খোলাতে গেলে কী করতে হবে! অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে সে একটা পথ বার করল।

গাঁ গাঁ করে টিভি চালালেই ও বলে, কী হচ্ছে কী, আস্তে করো। আস্তে। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। আর ওর যখন ঘুম পায়, যতক্ষণ না ও ঘুমে ঢলে পড়ে, ততক্ষণ একটাই ভাঙা রেকর্ড ক’মিনিট পরে পরেই বাজিয়ে যায়— এ বার বন্ধ করো। চোখের সামনে এত আলো থাকলে ঘুমোনো যায়! কাল আবার সকালে উঠতে হবে তো...

শুধু গাঁ গাঁ করে কেন, একেবারে ফুল ভলিউমে টিভি চালিয়ে ঋ দেখল, তার বউ ঝট করে তার দিকে বিরক্তির সঙ্গে এক ঝলক তাকিয়েই, দু’কানে দুটো বালিশ চাপা দিয়ে পাশ ফিরে শুল। তাই ‘চোখের সামনে এত আলো থাকলে ঘুমোনো যায়!’ বউয়ের মুখ থেকে অন্তত একবার শোনার জন্য, নিজের ঘুম পেলেও বড় বড় চোখ করে ঋ তাকিয়ে রইল টিভির দিকে। তবু তানিয়ার দিক থেকে কোনও উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

এ রকম পরিস্থিতিতে আদর করতে গেলে নিশ্চয়ই ও বেঁকে বসবে।

জোড়াজুড়ি করতে গেলে অন্তত একবার তো বলবে, ‘ছাড়ো তো’ কিংবা ‘ভাল লাগছে না, যাও’ অথবা ‘আমার ঘুম পাচ্ছে’।

কিন্তু না। আদর করতে গিয়ে সে দেখল, ও কোনও আপত্তি করল না। তবে সেই আদরে কোনও সাড়াও দিল না। শুধু মড়ার মতো পড়ে রইল।

কেন? কেন? কেন? কেন ও এ রকম করেছে? কেন? যে দিন থেকে ও কথা বলা বন্ধ করেছে, তার আগের দিন থেকে সে কী কী করেছে, তার কোনটা ওর খারাপ লাগতে পারে, ওকে আহত করতে পারে, ওর মনে লাগতে পারে, সারাক্ষণ ধরে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল ঋ। কিন্তু না। সে রকম কিছুই তার মনে পড়ল না।

যখন বারবার ব্যর্থ হল ঋ, তখন অফিসে তার সবচেয়ে যে কাছের, যাকে অনায়াসে ভরসা করতে পারে সে, তার থেকে বয়সে একটু বড় হলেও, সেই বুদ্ধদার কাছে গিয়েই সব খুলে বলল সে।

বুদ্ধদা সব শুনে বলল, কথা বলছে না? অথচ সব কাজ মুখ বুজে করে যাচ্ছে?

— হ্যাঁ। সব সব। সব কাজ করে যাচ্ছে। অথচ...

— তুই কী করেছিস রে! একবার বল ভাই। একবার বল। যে ভাবেই হোক তুই ওটা খুঁজে বার কর।

— কী?

— কেন ও কথা বলছে না...

— চেষ্টা তো করছি। কিন্তু পারছি কই!

— পারছি না বললে হবে না বস্। খুঁজে বার করতেই হবে। আমার লাগবে।

— আমার লাগবে মানে? কী লাগবে?

— তুই কী করেছিস, যার জন্য তোর বউ তোর সঙ্গে কথা বলছে না, সেটা...

— আমার বউ আমার সঙ্গে কেন কথা বলছে না, সেটা জেনে তুমি কী করবে?

— অ্যাপ্লাই করব ভাই। অ্যাপ্লাই। শুধু আমি না। ওই ওষুধে সত্যিই যদি কাজ হয়, তা হলে দেখবি, গোটা পৃথিবীর সব বিবাহিত পুরুষই তোর নামে ধন্য ধন্য করবে...

— ধন্য ধন্য করবে! কেন?

— আরে, বউ যদি চুপ থাকে, তা হলে তো সংসারে আর কোনও অশান্তিই থাকবে না। শুধু শান্তি আর শান্তি। শান্তির সংসার কে না চায় বল? আর তার উপরে সে যদি নিঃশব্দে কাজ করে যায়, তা হলে তো কোনও কথাই নেই। একেবারে সোনায়ে সোহাগা।

না। বউ কথা বলবে না, সে রকম শান্তির সংসার আমার দরকার নেই। আমি চাই ও কথা বলুক। কথা না বললেও গজগজ করে অন্তত একটু বিরক্তি প্রকাশ করুক। সেটুকুও তো করছে না। তা হলে উপায়!

হ্যাঁ। উপায় একটা আছে। কথা না বলাতে পারি, হাসাতে তো পারি। সামান্য হাসির কথা শুনলেই যে হো হো করে হেসে ওঠে, হাসি থামলেও ঘণ্টাখানেক ধরে চলে দমকে দমকে হাসি। থামতেই চায় না। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে যদি একটা পর একটা জোক পড়ে যাই, তা হলেও কি ও হাসবে না!

রাত্রে খাটে উঠে ও আর টিভি চালান না। মোবাইল থেকে একটার পর একটা চুটকি পড়ে যেতে লাগল। আর এক-একটা চুটকি শেষ হতে না-হতেই আড়চোখে তাকাতে লাগল তানিয়ার দিকে।

না। ও হাসছে না। বেশ কয়েকটা পড়ার পর ঋ যখন আবার ওর দিকে তাকাল, দেখল, তার বউ আঁচলের কোণ দিয়ে চোখ মুছছে। ও কাঁদছে! ঝট করে তানিয়ার দিকে ফিরল সে— কী হয়েছে? কাঁদছে কেন? আমি কী করেছি? আরে বাবা, আমাকে তো বলবে, আমার দোষটা কোথায়? না জানলে আমি নিজেকে শোধরাব কী করে? আবার তো ওই একই ভুল করব...

— তুমি জানো না, তুমি কী করেছ? তিন দিনের মাথায় এই প্রথম মুখ খুলল তানিয়া।

ঋ বলল, জানলে কি জিজ্ঞেস করতাম? বলো, কী করেছি?

— পরশুর আগের দিন রাতে যখন তোমাকে বললাম, টিভিটা অফ করে দাও। দিয়েছ? একবার দু'বার না, কত বার করে বললাম। তুমি শুনেছ? তুমি যখন আমার কোনও কথা শোনো না। তখন আমিও তোমার কোনও কথা শুনব না। শুধু শুনব না-ই নয়, তোমার সঙ্গে আমি আর কখনও কোনও কথাও বলব না।

— ও... এই কথা? সেটা আগে বলবে তো... বালিশের পাশ থেকে রিমোটটা নিয়ে বউয়ের দিকে এগিয়ে দিল ঋ, এই নাও। এ বার থেকে



তোমার যখন যে-চ্যানেল দেখতে ইচ্ছে করবে, দেখবে। যখন ইচ্ছে করবে না, বন্ধ করে দেবে। আমি আর এটায় হাতই দেব না। নাও।

তানিয়ে বলল, থাক। লাগবে না।

— কেন?

— তোমার টিভি... তোমার রিমোট...

— আমি কি সে কথা একবারও অস্বীকার করেছি? হ্যাঁ, এটা আমার টিভি... আমার রিমোট...

এত কিছু পরেও আবার ‘আমার’ ‘আমার’! ঋ’র মুখের দিকে ঝট করে তাকাল তানিয়া। ওকে ও ভাবে তাকাতে দেখে ঋ বলল, সব আমার ঠিকই, কিন্তু আমিই তো তোমার। আর আমি যখন তোমার, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব কিছুই তো তোমার, তাই না? তা হলে? এই নাও, ধরো।

ঋ’র হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে যে চ্যানেল দেখতে ও ভালবাসে না সেটা নয়, বরং যেটা চালালে ও নিজেই রেগে যায়, যেটা ওর দু’চক্ষের বিষ, অথচ ঋ’র খুব প্রিয়, সেই চ্যানেলটা চালিয়ে দিল তানিয়া।

তানিয়ার হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে, তানিয়া যে-চ্যানেলটা দেখতে ভালবাসে, ঋ সেটায় দিয়ে দিল।

তানিয়া ফের রিমোটটা নিয়ে আগেরটা চালিয়ে দিল।

তানিয়া মুঠো করে ধরে রাখলেও, ঋ প্রায় জোর করেই তানিয়ার হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে আবার তানিয়ার প্রিয় চ্যানেলটা চালিয়ে দিল।

তানিয়া বলল, এটা কী হচ্ছে? রিমোটটা দাও।

— তুমি তো এই চ্যানেলটাই দেখতে ভালবাসো।

— এখন আমার এটা দেখতে ভাল লাগছে না। আমি ওটাই দেখব।

— কিন্তু তুমি তো ওটা ভালবাসো না...

— সেটা আমার ইচ্ছে। এই তো একটু আগেই বললে, এ বার থেকে তোমার যখন যে চ্যানেল দেখতে ইচ্ছে করবে, দেখবে...

আর কোনও কথা বলল না ঋ। তানিয়ার দিকে রিমোটটা এগিয়ে দিল। তানিয়া সেটা নিয়ে চ্যানেলটা পাণ্টে দিতেই ঋ ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে টিভির দিকে চোখ রাখল। শুধু ঋ নয়, তানিয়াও দু’চোখ ভরে দেখতে লাগল, এই ক’দিন আগেও যেটা চালালে ও বিরক্ত হত, সেই চ্যানেল দেখতে লাগল। দেখতেই লাগল।